২৬ ভাগ। ২৪ সংখ্যা। | ১লা পৌষ, শনিবার, ১৮০৯ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বল ৩০

প্রার্থনা।

হে কৃপানিধান, তোমার অভিপ্রায় অপরাজেয়। জীব সংসারের নীচবাসনায় পরিচালিত হইয়া তোমার অভিপ্রায় হইতে যত দিন দূরে দূরে ভ্রমণ করে, তত দিন তাহার কিছুতেই অভ্যুদয় হয় না। সে তোমার অভিপ্রায় ছাড়িয়া কত দূর প্রস্থান করিতে পারে? যখন বাসনার প্রতিঘাতে দোলায়মান চিত্ত সাম্যাবস্থা লাভ করিবে, আবার উহা আসিয়া তোমার অভিপ্রায়ের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তৎসহ সংযুক্ত হইয়া পড়িবে। হে নাথ, বাসনা-তাড়িত জীবচিত্ত নিরন্তর তোমার অভিপ্রায় ছাড়িয়া গিয়া সাময়িক অকল্যাণ আনয়ন করিতেছে, পরিশেষে আবার তাহাকে লক্ষ্য স্থানে ফিরিয়া আসিতে হইবে, ইহা যদিও আমরা জানি, তথাপি বিশ্বাস, আশা ও ধৈর্য্যের সহিত প্রতীক্ষা করিতে পারি না বলিয়া মন একান্ত অশান্ত হইয়া পড়ে। অশান্ত মন চঞ্চল হইয়া তোমা হইতে বিচ্যুত হয়, আপনি কিছু করিব বলিয়া বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করে। এইরূপে কোথায় নির্ভর ও বিশ্বাস আশ্রয় করিয়া স্থির ভাবে স্থিতি করিবে, তাহা না হইয়া ক্রমান্বয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া এ দিক্ ও দিক্ করিতে থাকে। বিষয়লালসার দাস হইয়া অপরাধী হইলে যে প্রকার তোমার অভিপ্রায় হইতে বিচ্যুতি হয়, তেমনি, প্রভো, অপরাধীর অপরাধে বিরক্তহৃদয় হইয়া অশান্ত চঞ্চল মন হইলেও বিশ্বাস নির্ভর চলিয়া যায়। বিশ্বাসনির্ভরবিহীনতা অপরাধ তোমা হইতে সাধককে দূরে নিঃক্ষেপ করে। এই বিষম সঙ্কটে নিপতিত হইয়া, হে জীবনসহায়, আজ তোমার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। চারি দিকে যে প্রকার চিত্তের চাঞ্চল্যবৰ্দ্ধক ঘটনা সকল নিয়ত ঘটিতেছে, তন্মধ্যে, প্রভো, আমরা কোন প্রকারে আমাদিগের মনকে নিরবচ্ছিন্ন বিশ্বাসনির্ভরে স্থির রাখিব তাহার সম্ভাবনা দেখিতেছি না। তোমার মঙ্গলসঙ্কল্প সিদ্ধ হইবেই হইবে, কোন মানুষ তাহার প্রতিরোধ করিতে পারিবে না, এ বিশ্বাস ও তোমার প্রতি আস্থা স্থির থাকে না বলিয়া দেখ কত সময়ে আমরা অপরাধী হইতেছি। তুমি আমাদিগকে কৃপা করিয়া তাদৃশ অপরাধ হইতে নিয়ত রক্ষা কর, এই তোমার নিকটে বিনীত প্রার্থনা। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে নিপতিত হইয়া, শত নিরাশার কারণে পরিবেষ্টিত হইয়াও যেন তোমার অভিপ্রায়ের প্রতি আমাদিগের স্থিরবিশ্বাস থাকে, এই তোমার নিকটে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা।

মাঘোৎসব।

এবারকার উৎসবের ধ্বনি 'সম্মিলন'। আমরা ভ্রাতৃবর্গকে মিলনবর্দ্ধনের জন্য সাদরে উৎসবে নিমন্ত্রণ করিতেছি। শত সহস্র আত্মা যেখানে ঈশ্বরেতে সম্মিলিত হইয়া মহানন্দ প্রকাশ করে, সেখানেই উৎসব প্রকাশ পাইয়া থাকে। কে কোথায় একাকী আপনাতে আপনি বাস করিয়া উৎসব করিতে পারে? তবে কি যোগীর উৎসব নাই? যোগী গিরিকন্দরে একাকী বাস করিয়া উৎসব করিতেছেন, ইহা বলা কি অনুচিত? যোগী যখন হৃদয়ে হৃদয়রঞ্জন পরমেশ্বরকে দর্শন করেন, তখন তাঁহার আনন্দ অতুল, কিন্তু যখন সেই হৃদয়রঞ্জন ঈশ্বরেতে ঋষি মহর্ষি মহাজন ও দেবদেবীগণের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, এবং তিনি তাঁহাদিগের সঙ্গে ভগবানের স্তোত্র বন্দনাতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন তাঁহার হৃদয়ে উৎসবের আরম্ভ। যোগীর হৃদয়ের উৎসব তখনই পূর্ণ হয়, যখন অন্তর ও বাহির দুই এক হইয়া যায়। আমরা এ বার ঈদৃশ পূর্ণ উৎসব ভোগে অভিলাষী। যদি আমাদিগের এ অভিলাষ হৃদ্গত হয়, ইহা কখন অপূর্ণ থাকিতে পারে না। আমরা এ বার বন্ধুগণকে সেই পূর্ণ উৎসব সম্ভোগে অনুরোধ করিতেছি। সর্ব্বপ্রকারের মনোমালিন্য দূরে পরিহার করিয়া সকলে ঈদৃশ উৎসব সম্ভোগের জন্য ব্যাকুল হউন, ভগবান্ তাঁহাদিগের প্রাণের আকুলতা অবশ্য পূর্ণ করিবেন।

আমরা বন্ধুগণকে সাদরে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা মিলনের প্রারম্ভের বার্ত্তা শ্রবণ করিয়াছেন। এখনও আমরা সম্যক্ সম্মিলনের সংবাদ দিয়া সুখী করিতে পারিলাম না, ইহাতে আমরা দুঃখিত। কিন্তু এবার আমরা আশাজনকবাক্যে বলিতে পারি, অনেকে সম্মিলন এক প্রকার অসম্ভব মনে করিয়াছিলেন, এখন যখন সে অসম্ভাবনা বিদূরিত হইয়াছে, তখন তাঁহারা সেই সম্মিলন যাহাতে পরিপক্ক ও ঘনীভূত হয়, তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হউ[illegible] দিগের মিলভূমি বিধানপতির শ্রীচ[illegible] আমরা যতই উপাসনা স্তোত্রবন্দনা[illegible] লিত হইব, তত আমাদিগের মিলন সুদৃঢ় হইবে। বিচার তর্ক প্রভৃতিতে ভিন্নতা বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু সহস্র ভিন্নতা একতাতে পরিণত হয়, যেখানে ভগবদ্দর্শন শ্রবণ ভিন্ন অন্য কোন ব্যাপার নাই। অন্য কথা অন্য প্রসঙ্গ পরিহার করিয়া আসুন আমরা ভগবৎপ্রসঙ্গে উৎসবকাল যাপন করি, আমাদিগের শুভ সম্মিলনাভিপ্রায় অবশ্য পূর্ণ হইবে।

আমাদিগের বন্ধুগণ আমাদিগের এ কথা শ্রবণ করিয়া বলিবেন, আমরা আশা করিয়াছিলাম যে এবার আমরা সর্ব্বাঙ্গীন সম্মিলনে আনন্দিতহৃদয় হইয়া উৎসব করিব, যখন তাহাই হইল না, তখন আর উৎসবে যোগদানে উৎসাহান্বিত হইয়া পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া তত দূর গমনে ফল কি? আমরা বলি, এরূপ নিরাশ্বাস কেহ আর হৃদয়ে পোষণ করিতে পারেন না। অসম্ভব অলৌকিক ব্যাপার যদি বিধানরাজ্যে সংঘটিত না হয়, তাহা হইলে বিধানের মাহাত্ম্য আর কি রহিল? যাহা আজ হইয়াছে কয়েক দিন পূর্ব্বে তাহা অসম্ভব ছিল, যখন অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে, তখন যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা কেনই বা সকলে অসম্ভব মনে করিবেন। সম্মিলনের যখন প্রারম্ভ হইয়াছে, তখন তাহার পূর্ণতা অবশ্যম্ভাবী। আমাদিগের এ সম্বন্ধে মনের কথা কি, এক বার ব্যক্ত করিয়া বলা ভাল।

পৃথিবীর আরম্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত যত বিধান আসিয়াছে, তাহাতে একটি বিষয় সম্ভবপর হয় নাই, সেটি বিভিন্ন প্রকৃতির সম্মিলন। ধর্ম্মরাজ্যের ইতিহাস গভীর দৃষ্টিতে পাঠ করিলে দেখা যায়, সর্ব্বত্র ভিন্ন প্রকৃতি ভিন্ন পথে গমন করিয়া পরস্পরকে ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, এবং ভিন্নতা হইতে এক সম্প্রদায় শত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমাদিগের

ধর্ম্মবিধান এই অসম্ভব ব্যা[illegible] জন্য অবতীর্ণ। যাহা এত[illegible] তাহা সম্ভব হইতে গেলে বি[illegible] হইবে, ইহা আমরা কখন[illegible] না যদি ভিন্ন প্রকৃতির এক হইয়া যাওয়া এতই সুলভ ব্যাপার হইত, তাহা হইলে পৃথিবী এ সুখে এত কাল কেন বঞ্চিত থাকিবে? ভিন্ন প্রকৃতির সংঘর্ষণে পৃথিবী ধর্ম্মের নামে শোণিত-পাত দর্শন করিয়াছে, সামান্য ভাবোত্থিত সংগ্রাম তাহার তুলনায় কিছুই নহে। বিধানের বলে এই সংগ্রাম একত্বে পর্য্যবসান হইবে, আমরা এই আশায় বদ্ধহৃদয় হইয়া বসিয়া আছি। যদি সম্মিলনের দুর্ল্লভত্ব হৃদয়ঙ্গম না হয়, তাহা হইলে সম্মিলনসুখের সমাদর ও গৌরব কেন হৃদয় অনুভব করিবে? আজ পর্য্যন্ত যত ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, তাহা সম্মিলনের দুর্ল্লভত্ব প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে। এখন আশা এই, এই দুর্ল্লভত্ব সম্মিলনের সুখ ঘনীভূত করিয়া উপস্থিত করিবে।

শত সহস্র প্রাণ এক হইয়া পূর্ণ উৎসব-সম্ভোগের জন্য আমরা আরম্ভে ভ্রাতৃবর্গকে প্রোৎসাহিত করিয়াছি। তৎপর এতগুলি কথা বলা হইল, তাহা আপাততঃ অসংলগ্ন এবং বিরোধী বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু আমাদিগের নিকটে অসংলগ্ন বা বিরোধী নয়। এ বিধান যোগানন্দে বিভিন্ন প্রকৃতির একতা সাধন করিতে সমাগত হইয়াছে। যেখানে যোগের আনন্দ সেখানে সমুদায় পার্থক্য সেই আনন্দসাগরে ডুবিয়া যায়। যোগানন্দের বিগমে বিলীন পার্থক্য পুনর্ব্বিনিঃসৃত হইয়া একীভূত আত্মানিচয়কে আবার পৃথক্ করিয়া ফেলে। যাঁহারা উৎসবতত্ত্ব ভাল করিয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। সকল ভ্রাতা আসিয়া উৎসবে যোগদান করুন, হৃদয়কে উৎসবপতির করুণার প্রভাবাধীন করুন, দেখিবেন কি বিচিত্র ব্যাপার সংঘটিত হয়। তবে আমরা এই অনুরোধ করি, এবার [illegible] হইবে তাহাই [illegible] একতা করুন। [illegible] ম আছে তাহা [illegible] দয় হয় না। তদ্রূপ সহস্র আত্মার এক হইবার যে ভূমি তাহা পরিহার করিয়া কি প্রকারে একত্ব হইবে, ইহা সকলেরই ভাবিয়া দেখা উচিত।

অহঙ্কারের তম।

"অহঙ্কারের তম" বলিলেই মনের গতি উষ্ণতার প্রতি লক্ষ্য করে। বস্তুতঃ উষ্ণতার নাম তম নহে। তমঃশব্দের প্রকৃত অর্থ অন্ধকার। অহঙ্কারের আবার অন্ধকার কিরূপ? যে বস্তু দৃষ্টির অবরোধ জন্মায় তাহার নাম অন্ধকার। তবে অহঙ্কারও কি দৃষ্টির অবরোধক? হ্যাঁ, অহঙ্কারও দৃষ্টির অবরোধক। কিরূপে অবরোধক তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

অহঙ্কারের মূল ভাব দুইটি। একটি মনুষ্যত্ব দ্বারা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করে, অপরটি মনুষ্যত্ব দ্বারা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য ও প্রভাব অবরুদ্ধ করে। যেটি আপনার উপরিস্থ ঈশ্বরের গৌরব প্রদর্শন করতঃ আপনাকে গোপন ও লুক্কায়িত করে, সেটি বস্তুতঃ অহঙ্কার নামে পরিচিত নহে, তাহার নাম অহংতত্ত্ব। যেটি আপনাকে প্রকাশ করিয়া ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যদর্শনে বাধা জন্মায়, সেইটি অহঙ্কারনামে পরিচিত। দেশীয় শাস্ত্রে সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভেদে এই অহঙ্কার ত্রিবিধ। যেটি সাত্ত্বিক সেটির গুণ প্রকাশ, যেটি তামসিক সেটির গুণ অপ্রকাশ, আর প্রকাশ অপ্রকাশ দুই ভাবের সম্মিশ্রণে রাজসিক অহঙ্কার স্ফূর্ত্তি পায়। তবে এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যেটি প্রকাশাত্মক অহঙ্কার, সেও কি ঈশ্বরদর্শনের অবরোধক? হ্যাঁ সেটিও ঈশ্বরদর্শনের বাধক। যথা—

"ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥"

গীতা।

"আমি এই ত্রিগুণের অতীত। এই যে তিন প্রকার গুণময় ভাব, ইহা দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত; এ জন্য ইহারা আমাকে জানিতে পারে না।" এই সকল শাস্ত্রীয় বাক্য প্রমাণ করিতেছে যে, সত্ত্ব, রজ, তম, ইহারা সকলেই ঈশ্বরবোধের বাধা জন্মায়। যেমন রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী হইলেও একেবারে অন্ধকারশূন্য নহে, সেইরূপ সত্ত্বগুণ প্রকাশাত্মক হইলেও ঈশ্বরদর্শনের সম্পূর্ণ অনুকূল নহে। আমরা বিষয়টি আরও পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিতেছি।

এক জন চেষ্টা করিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করিলেন, জ্ঞানের সাত্ত্বিক প্রকাশে তাঁহার হৃদয়ে নানা দুর্ব্বোধ্য বিষয় প্রতিভাত হইল। যাহা পূর্ব্বে বুঝিতেন না এবং বুঝিবেন বলিয়া আশা করিতে পারেন নাই, এমত দুজ্ঞেয় তত্ত্ব সকল তাঁহার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। জড় ও জীবসম্বন্ধে অনেক অভাবনীয় অচিন্তনীয় বিষয়ও অতি সহজে তাঁহার মনে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে উন্নতির উচ্চ সোপানে তুলিয়া দিল। এক দিকে যেমন এই প্রকার জ্ঞানালোক দ্বারা তিনি নানা দুজ্ঞেয় তত্ত্ব বুঝিতে সমর্থ হইলেন, অন্য দিকে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধকারাবৃত হইয়া পড়িলেন। কেন না তিনি যাহা বুঝিলেন, যাহা করিলেন, সে সমুদয় তাঁহার আপনারই ক্ষমতা ও প্রভাব বলিয়া তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল, সুতরাং যে জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্যে তিনি চক্ষুষ্মান্ হইলেন, সেই জ্ঞানবিজ্ঞানই আবার আত্মগৌরব প্রকাশ করিয়া ঈশ্বরের মুখ প্রচ্ছন্ন করিল, সুতরাং তাহাই তাঁহার অন্ধতার কারণ হইল। অতএব অহঙ্কার সাত্ত্বিক হইলেও এ স্থলে ঈশ্বরদর্শনের প্রতিকূল হইয়া মিথ্যাদৃষ্টি উৎপাদন করিল। এই প্রকার মিথ্যাদৃষ্টির আতিশয্যবশতঃ দিন দিন আত্মগৌরব ও আত্মাদর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যেমন আত্মগৌরব বৰ্দ্ধিত হইল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যের প্রতি হেয়ত্ববোধ অনিবার্য্য হইয়া দাঁড়াইল। আপনাকে যদি বড় বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়, অন্যকে ছোট বলিয়া প্রতীতি হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং এই সত্ত্বগুণের বিকাশ, জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসাদে কেবল ঈশ্বরদর্শনের বিরোধ জন্মাইয়াই ক্ষান্ত হইল না, তাহার সঙ্গে সাধারণ লোকমর্য্যাদাবোধেও অসমর্থ করিয়া তুলিল। যখন লোকমর্য্যাদাবোধে দিন দিন অসামর্থ্য জন্মিতে লাগিল, তাহার সঙ্গে উষ্ণতার তম উদিত হইয়া অকারণে লোকের প্রতি ভৎর্সনা, তিরস্কার, গ্লানি, নিন্দা করিতে প্রবৃত্তি দিতে লাগিল। সুতরাং আপনা অপেক্ষা ক্ষুদ্রবোধে অপরের প্রতি নানাপ্রকার অবাচ্যবচন বলিতেও মনে সঙ্কোচ রহিল না। যে ব্যক্তি সম্মানার্হ ও গুরুজন তাহারও প্রতি অনায়াসে কটু কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ করিতে লজ্জা রহিল না, কেন না এ অবস্থায় স্বভাবতই পরদোষানুসন্ধিৎসা প্রবল হইয়া থাকে। এই জন্যই "অহঙ্কারের তম" বলিলেই মনে উষ্ণতার প্রতি মনোযোগ পড়ে। বস্তুতঃ উষ্ণতাও এক প্রকার ঘোরতর অন্ধকার, কেন না মানসিক উষ্ণতার উদয়ে অন্ধ হয় বলিয়াই অন্যের প্রতি অনায়াসে নানা অবাচ্য বলিতে সমর্থ হয়।

এই শ্রেণীর লোকেরা মিথ্যাদৃষ্টির প্রাবল্যবশতঃ একেবারে যে ঈশ্বরের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায় তাহা নহে। তাহারা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে পারে, ধৰ্ম্মতত্ত্ব ব্যক্ত করিতে পারে, সঙ্গীত ও সংকীৰ্ত্তন ও নৃত্য করিতেও পটু, ধ্যান মননাদিতেও অসমর্থ নহে, কিন্তু ইহার সকলেরই মূলে অহঙ্কারমূলক মিথ্যাদৃষ্টি স্ফূর্ত্তি পায়। সে ইহার একটিও কার্য্য আপনাকে শুদ্ধ শুচি বিনীত ও নম্র করিবার জন্য করে না, কিন্তু আপনাকে অশুচি ও উদ্ধত করিবার জন্য করে। কেন না সে এই সকল কার্য্য দ্বারা কেবল লোকের নিকট আত্মগৌরব ও আত্মমর্য্যাদা প্রকাশ করে। সে ভাবে "আমি অতিশয় পণ্ডিত, আমি অতি উত্তম ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা করিতে পারি, আমি নৃত্য সংকীৰ্ত্তনে অসামান্য ক্ষমতাশালী, কেন না আমার ন্যায় ভাবাবিষ্ট

হইয়া নৃত্য কীর্ত্তন করিতে অন্য কেহই সমর্থ নহে। আবার ভাবে আমি যেমন নীরব ও নিস্পন্দ ভাবে ধ্যানমননাদি করিতে পারি, এমন আর কেহ পারে না। এইরূপে সে অপর সকলের অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে প্রধান এইটি জ্ঞাপন করাই তাহার সমুদায় কার্য্যের উদ্দেশ্য হয়। এই জন্যই ইহারা যাহা বলে ও যাহা করে তাহার সঙ্গে জীবনের কোন সম্বন্ধ রাখা উচিত বোধ করে না।

এই শ্রেণীর লোকেরা পুনঃপুনঃ প্রতিজ্ঞা করে, আর পুনঃপুনঃ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, এক বার প্রতিজ্ঞা করিয়া জীবনে তাহা প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয় না, এবং পুনঃপুনঃ ব্রত গ্রহণ করিয়াও নিষ্ঠাপরায়ণ জীবনী গঠন করিতে সমর্থ হয় না। ইহার কারণ কেবল তমোগুণসম্ভূত অন্ধতা। ইহারা অন্যের গুণ অপেক্ষা দোষ অধিক দর্শন করে, এবং আপনার দোষ অপেক্ষা গুণ অধিক দর্শন করে। কেন না অহঙ্কার হইতে আত্মগৌরব, আত্মগৌরব হইতে অন্যের প্রতি তুচ্ছজ্ঞান এবং সেই কারণে আত্মদোষ অপেক্ষা পরদোষদর্শনে অধিক পটুতা লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং তাহাদিগের কার্য্য ক্রমাগত তাহাদিগের চরিত্রকে দূষিত চরিত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করে। এ জন্য সমাজে ও সাধুসদনে তাহারা তিরস্কার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহা দ্বারা চেতনা প্রাপ্ত হয় না; তাহাদিগের নিজের দোষ ও কলঙ্ক হৃদয়ঙ্গম করে না, প্রত্যুত সাধুদিগের জীবনকে ঈর্ষান্বিত ও ক্রোধন বলিয়া মনে করে। কেন না তমোগুণাক্রান্ত হওয়াতে তাহারা আত্মদৃষ্টি হারাইয়া ফেলে। সাত্ত্বিক অহঙ্কারের এত গুণ। এতদনুসারে বিচার করিয়া দেখিলে রাজসিক ও তামসিক অহঙ্কার কেবল নিবিড় অন্ধকার বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে তৎপক্ষে সংশয় নাই।

অহঙ্কারাশ্রিত ব্যক্তি ঈর্ষাপরায়ণ ও পরশ্রীকাতর হইয়া থাকে। ইহারা পরের দোষকে যেমন বড় করিয়া তোলে, পরের উন্নতিকেও ইহারা তেমনি ভাবে দর্শন করে। ইহার কারণ এই যে অন্যের ধর্ম্ম, সাধুতা, বিনয়, [illegible] অধিক হইলে তাহার অহঙ্কারের প্রতি আঘাত পড়ে। অন্য হইতে যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহা যদি অহঙ্কারীর অহঙ্কারের বিঘ্নজনক হয়, সে কদাচ তাহা সহ্য করিতে পারে না। সুতরাং এখানে বিজ্ঞান অজ্ঞানের এবং আলোক অন্ধকারের কারণ হইতেছে। এই জন্য ধর্ম্মজগতেও শান্তি ও কল্যাণ স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না, এবং বিবাদ বিসংবাদও নিবৃত্তি পায় না। নিঃস্বার্থ হইয়া ঈশ্বরের মঙ্গলময় হস্তে আত্মোৎসর্গ করা অহঙ্কারময় জীবনে অসম্ভব। কেন না অহঙ্কারের তম উদ্ভূত হইয়া ঈশ্বরের পুণ্যময় সৌন্দর্য্য আবৃত করিয়া ফেলে। অহঙ্কারী তাহার অহঙ্কারের ভিতরে কেবল আত্মগৌরব দর্শন করে। আত্মগৌরবদর্শী ব্যক্তি পরগৌরবদর্শনে চিরকাল অন্ধ এবং সে মনে মনে প্রতিনিয়ত কল্পনা করিয়া নানা অভাবনীয় বিষয় আনয়ন করে। যথা—

"ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥
অসৌ ময়াহতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া ॥
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ।"

(গীতা)

"অদ্য আমি এই লভ্য লাভ করিয়াছি—পরে আমি এই মনোরথ পাইব, এই ধন আমার আছে আর ভবিষ্যতে এই ধন আমার হইবে—এই শত্রু আমি বধ করিয়াছি—অপর শত্রু সকলকে ও বধ করিব। আমি আঢ্য, আমি শ্রেষ্ঠ কুলসম্ভূত, আমার তুল্য কে আছে? আমি যজ্ঞ করিব—দান করিব ও আমোদ করিব—অজ্ঞানবিমুগ্ধ লোকেরা এই প্রকার নানা কলুষিত চিন্তায় আপনাকে স্ফীত করিয়া তোলে।" এই জন্য বলিয়াছি যে, বিজ্ঞানই অজ্ঞানের কারণ। এই সকল চিন্তা রাজসিক অহঙ্কারেরই সহচর। যথা—

"দোষপ্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামসমস্পৃহা।
রজসোত্থানি জায়ন্তে কর্ম্মসক্তিম্ দেহিনাম্॥"

"দোষেতে প্রবৃত্তি, নানা কর্ম্মের আরম্ভ এবং অতুলনীয় স্পৃহা রাজসিক অহঙ্কারে এই সকল জন্মে।" এতদ্ব্যতীত অজ্ঞানকৃত সমুদায় কার্য্য তমোগুণসম্ভূত। যথা—

"তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্॥"

তমোগুণ স্বয়ং অন্ধকার, তাহার সঙ্গে যদি আবার অহঙ্কারের যোগ হয়, তবে আর দিগ্‌বিদিক জ্ঞান থাকে না। পূর্ব্ববারে আমরা বলিয়াছি, কোন গুণই অবিমিশ্র থাকিতে পারে না। অমিশ্র থাকিতে পারে না বলিয়াই সাত্ত্বিক অহঙ্কারের ক্রিয়াকালে তদন্তর্ভূত রজ ও তম ক্রমে প্রস্ফুট হইয়া পড়ে এবং অহঙ্কারের তম ঘন হইতে ঘনতর হয়।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি যে, মফঃসলে নববিধানমণ্ডলী মধ্যে আরাধনাবিষয়ে ঘোর ব্যভিচার সমুপস্থিত। যাঁহার যে প্রকার ইচ্ছা, তিনি সেই প্রকারে স্বরূপানচয়ের ক্রমবিপর্য্যয় সাধন করেন। কোন কোন বিশ্বাসী ভ্রাতা ও ভগিনী আমাদিগকে দুঃখের সহিত জ্ঞাপন করিয়াছেন, এবং ইহার কোন প্রতিবিধান হইতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আমরা আরাধনাসম্বন্ধে এক বার যাহা লিখিয়াছি, তাহা যথেষ্ট হইলেও, কোন কোন স্থল হইতে যে যুক্ত্যন্তর আমাদিগের কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহার সমাধান করা কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা এ সম্বন্ধে আবার কিছু বলিতেছি। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহাতেই সকলের প্রতীত হইয়া থাকিবে যে, সত্য, জ্ঞান, অনন্ত এই তিন স্বরূপের সঙ্গে বেদবেদান্তসিদ্ধ, প্রেম, অদ্বিতীয়, পুণ্যস্বরূপের সঙ্গে পুরাণসিদ্ধ, এবং আনন্দস্বরূপের সঙ্গে আগমসিদ্ধ সম্বন্ধের ঘনিষ্ঠযোগ। প্রথম তিন স্বরূপ নির্গুণোপাসনোচিত, দ্বিতীয় স্বরূপত্রয় সগুণোপাসনোচিত, তৃতীয় স্বরূপটি এ দুইয়ের যোগ স্থল। নির্গুণ ব্রহ্মে আনন্দ সগুণ ব্রহ্মে আনন্দ, ইহাই উভয়বিধসাধকের কৃতার্থতা। পুরাণপ্রসিদ্ধ সময়ে বহুদেবোপাসনা প্রচলিত, সে সময়ে অদ্বিতীয়স্বরূপ প্রধান ছিল, ইহা সকলের পক্ষে বিশ্বাস করা সহজ নহে। যাঁহারা পুরাণশাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা স্মরণ করিয়া দেখিবেন, যে পুরাণে যে দেবতা বর্ণিত হইয়াছেন, তাঁহাকে অদ্বিতীয় ঈশ্বররূপে বরণ করত আর সকল দেবতাকে অধঃকরণ করা হইয়াছে। এইরূপে এক অদ্বিতীয়ত্ব দ্বারা ঈশ্বরত্বস্থাপন পুরাণশাস্ত্রের প্রধান লক্ষণ। সে যাহা হউক, প্রেম ও পুণ্যের অভ্যন্তরবর্ত্তী অদ্বিতীয় স্বরূপকে স্থানবিচ্যুত করিয়া সর্ব্বশেষে লইবার যে যুক্তি আমরা শ্রবণ করিয়াছি, তৎসম্বন্ধে কিছু বলিয়া আমরা সামঞ্জস্য সাধনে যত্ন করিব। স্থানবিচ্যুতির যুক্তি এই, প্রেমস্বরূপের অব্যবহিত পরেই পুণ্যস্বরূপের আরাধনা প্রয়োজন, কেন না পৃথিবীতে পুণ্যের সঙ্গে অসংযোগে প্রেম ব্যভিচার আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে। আপাততঃ এ যুক্তি নিতান্ত অকাট্য বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ নহে ইহা প্রেমস্বরূপের স্বরূপ পর্য্যালোচনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারেন। প্রেম নিঃস্বার্থ, প্রেম ও পুণ্য অভিন্ন সামগ্রী। যেখানে পুণ্য নাই, সেখানে প্রেম নাই, ইহা, প্রেমিকগণের নিকট স্বতঃসিদ্ধ কথা। তবে লোকে এ সম্বন্ধে অন্ধ হইতে পারে, এবং যাহা যথার্থ প্রেম নয় তাহা প্রেম বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে, এ জন্য পুণ্যস্বরূপ অব্যবহিত যোগে নিবদ্ধ হওয়া সমুচিত, ইহা বিবেচ্য বিষয় বটে। কিন্তু এ স্থলেও দেখিতে হইবে, অদ্বিতীয়স্বরূপ প্রেম ও পুণ্যকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতেছে, অথবা ঘনিষ্ঠযোগে একত্র নিবদ্ধ করিতেছে। আমরা বলি এ স্বরূপটি যোগসূত্র। প্রেমের বহু বিকাশের মধ্যে একত্ব রক্ষা যেমন অদ্বিতীয় স্বরূপ দ্বারা সাধিত হইতেছে, তেমনি বহুধা খণ্ডিত ইচ্ছার একত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক তদধীনে আনয়ন করিয়া জীবকে পুণ্যবান্ করিতেছে, এবং প্রেমপুণ্যের অবিরোধিত্ব ও একত্ব স্থাপন করিতেছে। এক এক স্বরূপ ব্যাখ্যানের সময় যদিও পূর্ব্ববর্ত্তী স্বরূপনিচয়ের পুনরুল্লেখ হয় না, তথাপি তাহাদিগের একযোগসম্বন্ধ অন্তর্নিহিত থাকিয়া যায়। যেমন যিনি সত্য তিনি জ্ঞান, যিনি জ্ঞান তিনি অনন্ত, যিনি অনন্ত তিনি প্রেম, যিনি প্রেম তিনিই অদ্বিতীয়, যিনি অদ্বিতীয় তিনিই পুণ্য। আমরা আরাধনা কালে অনেক সময়ে যোগসূচক কথার উল্লেখ করি না বটে, কিন্তু ইহাতে কাহারও এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, ঈদৃশ যোগ নাই, স্বরূপনিচয় পরস্পর বিচ্ছিন্ন। আনন্দ সমুদায় স্বরূপের যোগভূমি। এখানে সমুদায় স্বরূপের ঘনীভূত একত্ব একই পুরুষকে আমাদিগের চক্ষুর সন্নিধানে উপস্থিত করিয়া আমাদিগকে ধ্যানের ভূমিতে লইয়া গিয়া উপস্থিত করে। এই একত্বের কথা যদি কেহ সুব্যক্ত ভাষায় ব্যক্ত না করেন, তথাপি সেই একত্ব যে এখানে রহিয়া গিয়াছে, তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে। যাঁহারা আনন্দস্বরূপের পর অদ্বিতীয়স্বরূপ আনয়ন করিয়া একত্ব জমাট করিতে চান, তাঁহারা আনন্দে সমুদায় স্বরূপের জমাট একত্ব বুঝিতে না পারিয়াই এরূপ করিতে অভিলাষী। এখানে বিরোধ কেবল একত্বের যথার্থ ভূমি কোনটি তাহা না বুঝাতেই উপস্থিত হইয়াছে। বেদান্ত ও পুরাণ উভয়ই বহুত্ব নিবারণ করিবার জন্য অদ্বিতীয়স্বরূপ

গ্রহণ করিয়াছে। এইরূপে গ্রহণই যথার্থ ন্যায়সিদ্ধ, কেন না অদ্বিতীয়ত্ব কেবল দ্বিতীয়রাহিত্যমাত্র বুঝায়। আনন্দ হইতে যে একত্ব আইসে তাহা ভাবপক্ষে অভাবপক্ষে নহে। কেন না সকল স্বরূপের সঙ্গে আনন্দের নিত্য স্বাভাবিক যোগ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

৭ই চৈত্র, ১৭৯৭ শক।

হিন্দুদিগের দুই দেবতার বর্ণ অতি ঘন, মুখের রঙ্গ অত্যন্ত ঘন। একটী প্রেমের দেবতা, একটী কালের দেবতা। নাম বলিবার প্রয়োজন নাই। রঙ্গ অত্যন্ত ঘন, ঘন মেঘের ন্যায় ঘন, সমুদ্রের গাঢ় জলের ন্যায় ঘন, আকাশের বর্ণের ন্যায় ঘন। বর্ণকে ঘন করিবার অবশ্য তাৎপর্য্য আছে। অনেক জলে রঙ্গ মাখিয়া রাখিলে যে পাতলা রঙ্গ হয় তাহা হৃদয়কে পরিতোষ করিতে পারে না। রঙ্গ ঘন না হইলে হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে না। দৃষ্টি সহজে কোন বস্তুর প্রতি যাইবে ইহা যদি করিতে চাও, সেই বস্তুকে ঘন, গভীর, উজ্জ্বলবর্ণে অনুরঞ্জিত কর। বর্ণের গভীরতা সত্তার ঘনতার পরিচয় দেয়। যেখানে ঘনতা সেখানে হৃদয় আকৃষ্ট হইবেই। যদি বল ব্রহ্মমন্দিরের বেদী হইতে এ কথা বলিবার প্রয়োজন কি? ঈশ্বর নিরাকার, তবে বর্ণের ঘনতার কথা কেন? কে বলিল নিরাকারের ঘনতা নাই? এক নিরাকার ব্রহ্ম বামে, আর এক নিরাকার ব্রহ্ম দক্ষিণে। জড় বস্তুর সহিত উপমায় ঈশ্বর নিরাকার, জড়ের আকার, বর্ণ ঘনতার সঙ্গে ব্রহ্মের উপমা হইতে পারে না; কিন্তু এই যে নেতি, নেতি, নেতি, বলিয়া বিচার দ্বারা ব্রহ্মহইতে সমুদয় গুণ বিবর্জিত করিয়া লওয়া হইল, সূক্ষ্ম মনোবিজ্ঞান বলিতে পারে, সমুদয় জড়ের গুণবিহীন হইয়া একটি অতি সূক্ষ্মতম নিরাকার পদার্থ রহিল; কিন্তু সহস্র লোকের মধ্যে একটি লোক ইহা নির্দ্ধারণ করিতে পারে। পৃথিবীর অর্দ্ধ হইতেও অধিক লোক বলিবে নিরাকার ব্রহ্মের অর্থ, অর্থাৎ ঈশ্বর নাই। এই কথা মূঢ় জগৎ বলিবেই। মূঢ় বলিয়া তাহাদিগকে ঘৃণা করিও না। তাহাদের এই কথা বলিবার কারণ আছে। যে নিরাকার বস্তু দেখা গেল না, ধরা গেল না, যাহা বুদ্ধির অতীত, প্রেম ভক্তির অতীত, এমন নিরাকার শূন্যকে ঈশ্বর বলিয়া মানিয়া ফল কি? সাধারণ মূঢ় লোকেরা যদি এই ভাবে নিরাকার বলিয়া নিরাকার ব্রহ্মকে অগ্রাহ্য করে তাহাদের দোষ নাই; ইহাকেই আমি এক নিরাকার ব্রহ্ম বামে বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি; কিন্তু যিনি দক্ষিণে আছেন ইনি নিরাকার হইয়াও ঘন। এখানে নিরাকার অর্থ এই যে, ইহাঁর কোন জড় আকার নাই; কিন্তু বিশ্বাসচক্ষের কাছে ইনি অত্যন্ত উজ্জ্বল। আমি বলি যত নিরাকার তত উজ্জ্বল। যেমন সাকারকে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করা যায়, এই নিরাকার পরমাত্মাকে তেমনি প্রত্যক্ষরূপে বিশ্বাস দ্বারা উপলব্ধি করা যায়। এই ভাবে আমি একটি বিশেষণ ব্যবহার করিলাম, "ঘন নিরাকার।" ঈশ্বরের ঘন নিরাকার সত্তা, ঘন নিরাকার জ্ঞান, ঘন নিরাকার প্রেম, ঘন নিরাকার পুণ্য। ঈশ্বরের ঘন প্রেম সুন্দর মুখ, সেই মুখের লাবণ্য অত্যন্ত ঘন। এই ঘন বলার দুই প্রয়োজন। এক ঈশ্বর নিরাকার হইয়াও অত্যন্ত জমাট, তিনি ঘনীভূত হইয়া স্থিতি করিতেছেন; দ্বিতীয়তঃ বিশ্বাসী ভক্তের চক্ষু যখন সেই সমস্ত বিশ্বের ঈশ্বর যিনি, তাঁহাকে এক স্থানে দর্শন করে, তখন সেই চক্ষে ঈশ্বরের অত্যন্ত ঘন সৌন্দর্য্য প্রতিভাত হয়। অতএব এই ঘনতা দুই চক্ষু দেখে। এক বিশ্বাস চক্ষু তিনি যেমন ঠিক ঘন আছেন তেমনই দেখিতে পায়, দ্বিতীয় প্রেমচক্ষু যতই তাঁহাকে নিকটে দর্শন করে ততই সেই ঘনতা বাড়িতে থাকে। যত বিশ্বাস ভক্তি বাড়িবে, তত ঈশ্বরের নিরাকার ঘন রঙ্গ বাড়িবে। ঈশ্বর আকাশের ন্যায় নিরাকার নহেন, বস্তুতঃ তিনি এমনই ঘন নিরাকার যে তাঁহাকে দেখিতেই হইবে। বিশ্বাসী হও, অত্যন্ত ঘনীভূত যে ঈশ্বরের নিরাকার লাবণ্য তাহা দেখিতে পাইবে। প্রেমিক হও, যতই তাকাইবে ততই বিমোহিত হইবে; আরও দেখ, আরও মত্ত হইবে। ঈশ্বরের মুখে যে রঙ্গ নাই তাহা নহে, মনুষ্য ভক্তি দ্বারা কল্পিত নূতন রঙ্গ দেয় না। দুই চক্ষু বিশ্বাস এবং ভক্তি যত উজ্জ্বলতর হয়, ঈশ্বরও তত ঘনতর হইয়া প্রকাশিত হন, তাঁহার ঘনতম মূর্ত্তি কেহই দেখে নাই। ব্রাহ্মগণ, প্রথম যখন তোমরা ব্রাহ্ম হইলে, তখন আকাশের ন্যায় নিরাকার বলিয়া ঈশ্বরের পূজা করিতে। এখন তোমাদের বিশ্বাস ভক্তি কি বাড়িয়াছে? এখন এক বার ঈশ্বরকে দেখ দেখি। দেখিতে পাইতেছ, এক জন ঘন নিরাকার ঈশ্বর তোমাদের সমক্ষে রহিয়াছেন? এ দিকে তাকাইলে বলিতে পার না ঈশ্বর নাই; ওদিকে তাকাইলে বলিতে পার না ঈশ্বর নাই, কিছুতেই বলিতে পার না ঈশ্বর নাই। প্রথম বুদ্ধির কাছে ঈশ্বর সত্তা বলিয়া ধরা পড়িয়াছিলেন, এখন তিনি তাঁহার নিজের রঙ্গে, নিজের ঘনীভূত বর্ণে ধরা পড়িলেন। এমনি ঘনীভূত বর্ণ কার সাধ্য তাহা অতিক্রম করে? সুনীল, আকাশে, অগাধ সমুদ্রে, গম্ভীর পর্ব্বতে, সমস্ত জীব জন্তুতে অন্তরে, বাহিরে সর্ব্বত্র ঘনীভূত বর্ণের সৌন্দর্য্য। সর্ব্বত্র সেই ঘন ব্রহ্ম ঘন বিশ্বাসনয়নে ঘন ভক্তি নয়নে। সাধক, দুই বৎসর পর দেখিবে ঈশ্বর ঘনতর হইলেন। ব্রহ্মের সত্তা যাহাতে আকার নাই তাহা ঘনীভূত, গাঢ় হইয়া আসিল, কোথায় বা থাকে পাথর পর্ব্বত। পাথর পর্ব্বত

হইতেও সহস্র গুণ অনন্ত গুণ এই নিরাকার সত্তা গাঢ়, ঘন, কঠিন, অটল হইয়া আসিল। এই যে ঈশ্বরের মহা গম্ভীর, ঘন নিরাকার সত্তা, ইহা যোগী, ঋষি এবং ভক্তেরা মানিবেন, আর কেহ মানিতে পারে না। বিশ্বাসী প্রেমিকের নিকট ঈশ্বরের সত্তা ঘন। যাহার হৃদয় বিশ্বাস এবং প্রেম নয়নে এই ঘন সত্তা দেখিতে পায়, সে চিরকালের জন্য মুগ্ধ হয়।

বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

বিগত ৮ই পৌষ প্রাতঃকালে শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ট্রেণে ময়মনসিংহ হইতে ঢাকায় যাত্রা করেন। ভাই রামচন্দ্র সিংহ, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ও ভাই বৈকুণ্ঠনাথ ঘোষ এবং অপর ৭।৮ জন ব্রাহ্মবন্ধু সেই সময়ে এক গাড়ীতে ময়মনসিংহ হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। তাঁহারা খোল করতাল বাজাইয়া ৩।৪ ষ্টেশন পর্য্যন্ত মহা উৎসাহে "নববিধানের রেলের গাড়ী চলে যায়" প্রভৃতি সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। একটি উৎসাহী যুবা ষ্টেশনে ষ্টেশনে পুস্তক বিক্রয় করিতে করিতে চলিয়াছিল। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ঢাকায় আসিয়া সদলে তাঁহার বিশেষ বন্ধু রোড-সেসের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু মাধবচন্দ্র রায় বাহাদুরের নবাবপুরস্থ আবাসবাটীতে তাঁহারই আতিথ্য গ্রহণ করিয়া স্থিতি করেন। ৯ই শুক্রবার সন্ধ্যাকালে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় জগন্নাথ নাটকগৃহে প্রায় দুই সহস্র শ্রোতার সম্মুখে "ষ্টীম অব টেণ্ডেন্সি" বিষয়ে ইংরাজিতে মহাতেজস্বিনী বক্তৃতা করেন। বক্তার বাগ্মিতাশক্তিতে সকল লোক চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ১১ই রবিবার বিধান-পল্লীতে তথাকার নববিধানসমাজের উপাচার্য্য শ্রদ্ধেয় ভাই বঙ্গচন্দ্র রায়ের গৃহে উপাসনা ও ভোজন হয়, বহুসংখ্যক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ সেই উপাসনায় ও ভোজনে যোগ দান করিয়াছিলেন। রাত্রিতে নববিধানমন্দিরে উক্ত শ্রদ্ধেয় ভাই উপাসনা করেন। সেই দিন খ্রীষ্টের জন্মোৎসব ছিল, তৎ-সময়োপযোগী অতিশয় গম্ভীর ও সুললিত উপদেশ হইয়াছিল। ১২ই সোমবার রাত্রিতে বাঙ্গলাবাজারস্থ ধনী শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র দাস মহাশয় উক্ত শ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতার সম্মানার্থ ইংরাজি রকমের বৃহৎ ভোজ দিয়াছিলেন। সেই দিন প্রাতে লক্ষ্মীবাজারস্থ মাননীয় শ্রীযুক্ত কালীনারায়ণ গুপ্ত মহাশয়ের গৃহে ভোজন ও পারিবারিক উপাসনা হয়। ১৩ই পৌষ সন্ধ্যাকালে জীবনকৃষ্ণ বাবুর ডাইলবাজারস্থ প্রশস্ত নাটমন্দিরে শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা "দি ফ্ল্যাগ অব্ দি নিয়ুডিস্পেন-সেশন" (নববিধান পতাকা) বিষয়ে ইংরাজি ভাষায় বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা যার পর নাই উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। নববিধান এমন পরিষ্কাররূপে এ পর্য্যন্ত এখানে অন্য কেহই বুঝাইতে পারেন নাই। শ্রোতৃবর্গ বক্তার অসাধারণ ক্ষমতা দেখিয়া মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। এ দিবস পূর্ব্ব দিন অপেক্ষা অধিক শ্রোতার সমাগম হইয়াছিল, বহু সম্ভ্রান্ত লোক প্রবেশ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ১৪ই পৌষ অপরাহ্ণে এই স্থানে বাঙ্গলা ভাষায় যোগধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা হয়। বক্তা সুগভীর বিষয় এমন সুললিত ভাষায় সুস্পষ্ট ও সুপ্রণালী-মতে বর্ণন করিয়াছিলেন যে অন্য কাহারও সেরূপ ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা নাই। সেই বক্তৃতাশ্রবণে অনেক বিশেষ উপকৃত হইয়াছেন। ১৫ই বুধবার অপরাহ্ণ দুই টার ট্রেণে শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও ঢাকাস্থ বিধানবাদী বহু প্রচারক ও ব্রাহ্ম নারায়ণগঞ্জ বন্দরে উপস্থিত হন। শ্রীযুক্ত বাবু মাধবচন্দ্র রায় বাহাদুর ও এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু কালীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সঙ্গী হইয়াছিলেন। নারায়ণগঞ্জের সব রেজিষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু মোহন-চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে তথাকার স্কুলগৃহে সাধারণ ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে বাঙ্গলা ভাষাতে বক্তৃতা হয়। ছাত্রগণ স্কুলগৃহটী পুষ্পপত্রাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়াছিল। ৪।৫ শত শ্রোতা উপস্থিত হইয়াছিল। বক্তৃতান্তে মোহন বাবু ঢাকা হইতে সমাগত সকলকে সাদরে ভোজন করান। পর দিন প্রত্যূষে ষ্টীমারে শ্রদ্ধাস্পদ প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কলিকাতায়, শ্রদ্ধাস্পদ রামচন্দ্র সিংহ মহাশয় রাজসাহী অভিমুখে যাত্রা করেন। ঢাকায় কয়েক দিন মাধব বাবুর বাড়ীতে বিশেষ জমাটরূপে উপাসনা হইয়াছিল। ঢাকাস্থ বহুনরনারীগণ উপাসনায় যোগ দান করিয়াছিলেন। ঢাকাস্থ অনেক বন্ধু অধিক দিন ঢাকা স্থিতি করিয়া কার্য্য করিবার জন্য শ্রদ্ধেয় ভ্রাতাকে আগ্রহসহকারে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

করাচির সমুদ্রবক্ষে ব্রহ্মোপাসনা।

করাচি নগর ভারতের পশ্চিম সীমায় আরব সাগরের কূলে সংস্থাপিত। ইহা একটি ভারতের মধ্যে প্রসিদ্ধ বন্দর। পূর্ব্বে হয়তো ইহা সমুদ্রতটে অবস্থিতি করিত, এখন সমুদ্র হইতে প্রায় এক ক্রোশ অন্তরে স্থিতি করিতেছে। কিয়মারী নামে নগর সমুদ্রতীরে স্থাপিত, কিন্তু এখান হইতেও প্রশস্ত সাগর দেখা যায় না। এখানে গঙ্গা-নদীর দ্বিগুণ অথবা তিন গুণ প্রশস্ত সমুদ্রের একটি বাহু আছে, তাহার অপর পারে ম্যানরা নামক ক্ষুদ্র পার্ব্বতীয় দ্বীপ দৃষ্টিগোচর হয়। প্রশস্ত সমুদ্রের সম্মুখীন হইতে হইলে এই স্থান হইতে নৌকাযোগে মীনরা দ্বীপে অথবা তাহার অপর পার্শ্বস্থ রামঝরোকী প্রভৃতি নামক সমুদ্র বক্ষোপরি বিরাজমান অপর কয়েকটি পর্ব্বতে যাইতে হয়। করাচির অপর দিকে ক্লিফ্টন নামক স্থানে গেলেও প্রশস্ত সমুদ্র

নয়নগোচর হয়। ম্যানেরা দ্বীপ একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতোপরি নির্ম্মিত, কারাচি বন্দরের প্রবেশ দ্বারে স্থিত। করাচি বন্দর ভারতরাজ্যপ্রবেশের একটি উপায়। এই জন্য রাজপুরুষগণ শত্রুদিগের সম্বন্ধে অনতিক্রমণীয় ও দুর্ভেদ্য করিবার জন্য এই স্থানকে সুসজ্জিত ও ইহার সম্মুখস্থ সমুদ্রস্থলে অর্ণবযুদ্ধসম্বন্ধীয় বিবিধ আয়োজন করিতেছেন। এই সমস্ত কারণে এবং একটি লাইট হাউস ও ব্রেক্ ওয়াটর (Break Water) আছে বলিয়া এখানে অনেকগুলি কার্য্যালয় আছে। এ স্থান জনপূর্ণ নগরবিশেষ। আমরা অত্যন্ত নির্জ্জনতার পক্ষপাতী হইয়া ম্যানরার অপর পার্শ্বে যে কয়েকটি জনশূন্য ক্ষুদ্র পর্ব্বত অবস্থিতি করিতেছে, তাহাদের মধ্যে প্রধানতমটীর দিকে গমন করিলাম। এইটির নাম রামঝরোকা। দশরথপুত্র শ্রীরামচন্দ্র নাকি এই স্থানে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। ইহার উচ্চতা সমুদ্রগর্ভ হইতে প্রায় ৫০০ ফিট হইবে। ইহাতে কয়েকটী গুহা আছে এবং যোগিগণ আসিয়া এখানে সময়ে সময়ে যোগ সাধন করিয়া থাকেন। এই কথা শুনিয়া আমাদিগের মনে ইহার প্রতি অধিকতর ভক্তি আকৃষ্ট হইল। সমুদ্রতরঙ্গ জন্য কিয়ামারী হইতে এখানে অন্যান্য সময় আসা প্রায় অসম্ভব। সমুদ্রলহরীতে যে কত নৌকা জলমগ্ন হইয়াছে তাহার স্থিরতা নাই, কিন্তু শীতকালে সমুদ্র যেরূপ ধীর ভাব ধারণ করে, তাহাতে উক্ত স্থানে যাওয়া নিতান্ত সহজ। বায়ুভরে আমাদের নৌকা শন্ শন্ বেগে তথায় উপনীত হইল। যাইতে যাইতে এক স্থানে দেখা গেল সমুদ্রের আস্ফালন এই পর্ব্বতের একটি স্থল ভেদ করিয়া ইহার এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত একটি প্রশস্ত সুড়ঙ্গ বাহির করিয়াছে। এই সুড়ঙ্গটি সমুদ্রের দুর্জ্জয় প্রতাপের পরিচয় উচ্চৈঃস্বরে প্রদান করিতেছে। আমরা ক্রমে পর্ব্বতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সমুদ্রজলে এক স্থানে অবগাহন স্নান করিয়া শরীর ও আত্মাকে শুদ্ধ ও শীতল করিলাম। যদিও সমুদ্রজল অত্যন্ত লবণাক্ত কিন্তু ইহা অত্যন্ত শীতল। সম্মুখে যে অপূর্ব্ব গুহাটী ছিল তাহা তিনটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত, তাহা যোগিজনের নিতান্তই মনোরম স্থান। দুইটি প্রকোষ্ঠে আমাদের উপাসনার স্থান ও অপরটিতে রন্ধনের দ্রব্যাদি রক্ষিত হইল। আমি সস্ত্রীক সেই তীর্থে গিয়াছিলাম, সঙ্গে ভ্রাতা হীরানন্দ ও অপর দুইটি বাঙ্গালী বন্ধু ছিলেন। পর্ব্বতটি বৃক্ষচ্ছায়াশূন্য রৌদ্রে পরিপূর্ণ, কিন্তু সুস্নিগ্ধ বায়ুতে রৌদ্রের প্রখরতা একেবারে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। আমরা এই ক্ষুদ্র পর্ব্বতে পদার্পণ করিবামাত্র দেখিলাম সম্মুখে চতুষ্পার্শ্বে অকূল সাগর, তন্মধ্যে সেই ক্ষুদ্র পর্ব্বতটি। তরঙ্গ সকল তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া তাহার উপর আস্ফালন করিতেছে। প্রকৃতির অতুল বলের মধ্যে আমরা আপনাদের ক্ষুদ্রতা হৃদয়ঙ্গম করিতে লাগিলাম, এবং সাগরের ভয়ানক প্রতাপ দেখিতে দেখিতে আপনাপনি অহঙ্কারের জন্য অনবরত আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলাম। এ ভয়ানক প্রকৃতির বলের মধ্যে আমি যে কিছুই নহি, একটি ক্ষুদ্র পিপীলিকা সদৃশ। সমুদ্রের সামান্য একটি তরঙ্গে এক পলকের মধ্যে আমার মত সহস্র সহস্র অতি ক্ষুদ্র জীব কোথায় রসাতল যায়, স্ত্রী পুত্র পরিবার আত্মীয় বন্ধু কেহই কাহার নহে, কারণ কেহই সে বিপদে আমাকে কিছু মাত্র সহায়তা করিতে পারে না। মনুষ্য যে নিতান্ত নিরাশ্রয় তাহাই ক্রমাগত ভাবিতে লাগিলাম। এই ভাবিতে ভাবিতে আত্ম অহঙ্কার সেই সময়ের জন্য যাই চূর্ণ হইয়া পড়িল, অমনি সমুদ্র তাহার মহাশক্তি ব্রহ্মশক্তিকে প্রদর্শন করিল। এই শক্তিমধ্যে সমুদ্র অবস্থিত। ইহার নিকট মহত্ত্বসম্বন্ধে সমুদ্র একেবারে পরাস্ত হইয়া গেল, কারণ সমুদ্র ইহার আজ্ঞাকারী। তখন সেই দুর্জ্জয় ব্রহ্মশক্তির তুলনায় সমুদ্র একেবারে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সমুদ্রকে ভুলিয়া গিয়া সেই সমুদ্রের প্রভুকে ভাবিতে লাগিলাম, এবং এক এক বার নিজের মনের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আপনার মনের শক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। মনে হইতে লাগিল, আমিতো ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র, এত বড় প্রকাণ্ড পুরুষ যাঁহাকে ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিতে পারে না, তাঁহাকে কেমন করিয়া আমি চিন্তা করিতেছি। জড়বাদী নাস্তিকেরা যে বলে, মনে অনন্তকে একটুমাত্র ধরিবার বল নাই, তাহা নিতান্ত মিথ্যা বলিয়া বোধ হইল। এই সমস্ত চিন্তাসাগরে মগ্ন হইয়া গুহার মধ্যে উপাসনা আরম্ভ করা গেল। উপাসনাপ্রারম্ভেই দেখি পাপীর অহঙ্কার চূর্ণ করিবার জন্যই যেন ভয়ানক ধমকাইয়া সমুদ্র তর্জ্জন গর্জ্জন সহকারে বলিতে লাগিল, "সংসারের ক্ষুদ্র কীট, আমার পরাক্রম দেখিতেছিস্, তোর মত কত কীটকে আমি যে উদরসাৎ করিয়াছি কাল তাহার সাক্ষী। কত শত শত অর্ণবপোত, দিক্‌পাল এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাজাকে ক্রীড়া করিতে করিতে অনায়াসে আমি নিমেষের মধ্যে ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছি। তোকে কোন্ মনুষ্য আমার পরাক্রম হইতে রক্ষা করিতে পারে? তুই কদাকার পতঙ্গ, আর আমি কত কাল হইতে যে এই তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছি তাহা কে লিখিয়া রাখিয়াছে? আমি পৃথিবীর যে কত পরিবর্ত্তন দেখিয়াছি, কত লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি, কত ব্যাপার দেখিয়াছি, তাহা কে বলিতে পারে? আমি কত কীর্ত্তি করিয়াছি, কত পদার্থ ধ্বংস করিয়াছি, তাহার সংবাদ আজ কেহ প্রাপ্ত হয় নাই।" আমি সমুদ্রের তিরস্কারে আহত হইয়া আপনার অহঙ্কারের জন্য লজ্জিত হইয়া শ্রীশাক্য দেবকে ভাবিতে লাগিলাম। নির্ব্বাণের রাজা শাক্য আমার মত লোককে আশ্রয় দিবেন কেন, অধিকতর ধিক্কার দিতে

লাগিলেন। শুষ্ক ও কঠোরহৃদয় আমি দুঃখে কাঁদিতে লাগিলাম। ক্রমে সমুদ্র বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া তাহার সেই স্বয়ম্ভূ নিরাকার প্রভুকে প্রকাশ করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ—

উৎসবের জন্য প্রস্তুতি।

নবদেবালয়।

বিগত ১৮ই পৌষ হইতে মাঘোৎসবের প্রাথমিক অনুষ্ঠানসূচক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং নববিধান ও মাতৃভূমি এবং গৃহ, শিশু ও ভৃত্য, দীনসেবা, যোগ, মহাজনগণ, মানবহিতৈষিগণ ইত্যাদি এক এক বিষয়ে ক্রমশঃ এক এক দিন দেবালয়ে আচার্য্যদেবের জলন্ত প্রার্থনা ও উপদেশ পঠিত হইয়াছে, এবং তদ্ভাবানুযায়ী সেই সেই দিনের উপাসনা প্রার্থনাদি হইয়াছে। ২২ শে পৌষ শিশুসেবা উপলক্ষে সন্ধ্যার পর প্রায় আশিটি বালক বালিকা কমলকুটীরে সমবেত হইয়াছিল। পুষ্পমালায় অলঙ্কৃত আলোকমণ্ডিত গৃহে তাহাদিগকে আসনে বসান হয়। ভাই উমানাথ গুপ্ত প্রধান সেবকরূপে মহা উৎসাহে সেই দিন কার্য্য করেন। অতিশয় স্বর্গের দৃশ্য হইয়াছিল। সুন্দর সুন্দর পুত্তল ও নানাপ্রকার ক্রীড়ার সামগ্রী এবং উৎকৃষ্ট ফল মূল ও মিষ্টান্নাদি সুকুমার বালক বালিকাদিগকে প্রদান করিয়া তাহাদিগকে আদর করা হয়। তাহাদের কণ্ঠে পুষ্পমালা ও হস্তে পুষ্পগুচ্ছ প্রদান করা হইয়াছিল, পরে তাহাদের আমোদের জন্য পুত্তল নাচ হয়। ২৩ শে পৌষ রজনীতে ভৃত্যসেবা হইয়াছিল। চাকর, চাকরাণী, ধোপা, নাপিত, দ্বারবান্ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ৫০। ৬০ জন ভৃত্য একত্রিত হইয়াছিল। এক গৃহে পুরুষ চাকরগণ অপর গৃহে চাকরাণীগণ আসনে উপবিষ্ট হয়। প্রচারকপত্নী ও আর্য্যনারীসমাজের মহিলাগণ দাসীদিগের এবং প্রচারকগণ বিশেষভাবে ভাই উমানাথ গুপ্ত ভৃত্যদিগের সেবা করেন। প্রথমতঃ সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। এক জন প্রচারক ৩ জন ভৃত্যের চরণ ধৌত করেন, এবং দুই জন বৃদ্ধা পরিচারিকার পদেও জল ঢালিয়া দেন। তাহাদের মস্তকে সুগন্ধি তৈল ও অঙ্গে আতর প্রক্ষণ করা হয়। প্রচারকগণ চাকরদিগকে ও ব্রাহ্মিকারা চাকরাণীদিগকে লুচি তরকারী মিষ্টান্নাদি পরিবেশন করিয়া ভোজন করান, ও প্রচারকপত্নীগণ স্বহস্তে লুচি তরকারী ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক চাকরচাকরাণীকে এক এক খানা গামছা প্রদান করা হয়। ২৪ শে পৌষ শনিবার দীনসেবা হইয়াছিল, সেই দিন বিশেষ কারণ বশতঃ অল্পসংখ্যক দুঃখী কাঙ্গালকে আহ্বান করিয়া দান বিতরণ ও ভোজন করান হইয়াছিল। সেই দিবস জাগরণ করিয়া শেষ রাত্রি হইতে দেবালয়ে উপাসনা ধ্যানাদি হইয়াছিল। ২৫ শে পৌষ রবিবার আচার্য্যের স্বর্গারোহণের দিন। প্রত্যূষে সকলে দেবালয় হইতে আচার্য্যদেবের শয়নগৃহে যাইয়া তাঁহার শয্যাকে বেষ্টনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইয়া সমস্বরে ব্রহ্মের অষ্টোত্তর শত নাম পাঠ করেন। নামপাঠান্তে ভাই উমানাথ গুপ্ত আচার্য্যদেবকে উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন করিয়া কয়েকটী হৃদয়ভেদী কথা কহেন, তাহা শ্রবণে অনেকেই অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। তৎপর সঙ্গীতপ্রচারক ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল তৎসময়োপযোগী একটি সঙ্গীত করেন। পরে এক দল বৈষ্ণব আচার্য্যের সমাধিকে বেষ্টন করিয়া মত্ততার সহিত কীর্ত্তন করে। এই দিবস প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ৯ টা পর্য্যন্ত আচার্য্যদেবের ইংরাজি বাঙ্গালা পুস্তক সকল অর্দ্ধমূল্যে বিক্রীত হয়। ৮টার পর হইতে দেবালয়ে উপাসনা আরম্ভ হইয়াছিল। উপাসকমণ্ডলীতে দেবালয় পূর্ণ হয়। ভাই গৌরগোবিন্দ রায় উপাসনা করেন। চারি বৎসর হইল, এই দিবস আচার্য্যদেব ৯টা ৫৫ মিনিটে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন, সেই ৯টা ৫৫ মিনিটের সময় ঘণ্টা ধ্বনি হইলে সকলে নিঃস্তব্ধ হইয়া ধ্যান ধারণা করেন। তৎপর ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার হৃদয়ভেদী প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেই প্রার্থনায় উপাসকগণ অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। পরিশেষে ভাই গৌরগোবিন্দ রায় আচার্য্যের যোগবিষয়ক গভীর প্রার্থনাটী পাঠ করেন। সেই দিন অপরাহ্নে দেবালয়ের রোওয়াকে এক দল বৈষ্ণব কীর্ত্তন করে। তৎপর জীবনবেদের একটি অধ্যায় পঠিত হয়। সন্ধ্যাকালে ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল আচার্য্য চরিত্র বর্ণন করেন। মন্দিরে অত্যন্ত লোকাকীর্ণ হইয়াছিল। ভাই গৌরগোবিন্দ রায় উপাসনা করেন। তিনি আচার্য্যের সংকট পীড়ার সময়ে যে তাঁহার গভীর ব্রহ্মযোগ ও প্রেমোন্মত্ততা দর্শন করিয়াছিলেন উপদেশে তাহা ব্যক্ত করেন। ২৬ শে পৌষ মহাজনগণের প্রতি ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শিত হয়। এই দিন বৈকালে বিশেষ ভাবে দীনসেবা হইয়াছিল। প্রায় এক সহস্র স্ত্রী পুরুষ, বৃদ্ধ যুবা, বালক বালিকা দুঃখী কাঙ্গাল উপস্থিত হয়। সকলকে পয়সা ও চিড়ে মুড়কি মিষ্টান্ন ও অন্ধ খঞ্জদিগকে এবং বিশেষ বিশেষ পাত্রকে বস্ত্র ও কম্বল প্রদান করা হইয়াছিল, দরিদ্র বালক বালিকাগণ খেলার সামগ্রী সকল প্রাপ্ত হয়। রাত্রিতে বহুসংখ্যক নিম্ন শ্রেণীর দুঃখী দরিদ্রকে কমলকুটীরের সম্মুখে রাস্তার উভয় পার্শ্বে শতরঞ্চের উপর সারি সারি বসাইয়া লুচি তরকারী ও মিষ্টান্নাদি ভোজন করান হইয়াছিল। অনেক প্রচারক সেই দুঃখী কাঙ্গালদিগের সঙ্গে বসিয়া ভোজন করেন। সেই স্থান কাচাধারস্থিত আলোকমালায় ও ফুলের টবে সাজান হইয়াছিল। দরিদ্রদিগের

ভোজন ও তাহাদিগকে দান বিতরণের সময় খোল করতাল সহ সঙ্কীর্ত্তন ও একতারা সহকারে ব্রহ্মসঙ্গীত করা হইয়াছে। ২৭ শে পৌষ মানবহিতৈষীদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন হয়। এই দিবস অপরাহ্ণে ভাই উমানাথ গুপ্ত ও ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মানবের পরম হিতৈষী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভবনে যাইয়া তাঁহার গলদেশে পুষ্পমালা ও হস্তে পুষ্পস্তবক ও কিছু ফল প্রদান করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহাদের অনেক মিষ্টালাপ হয়। দরিদ্রসেবা কোন্ সময় হইয়াছিল বিদ্যাসাগর মহাশয় জানিতে পারিলে তিনি কমলকুটীরে উপস্থিত হইতেন এরূপ বলিলেন। পরম দয়ালু বিদ্যাসাগর মহাশয় কয়েকটী টাকা ভাই উমানাথ গুপ্তের ভিক্ষার ঝুলিতে প্রদান করেন। ২৮ শে উপকারিগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা হয়। প্রার্থনার পর কোচবিহারের মহারাজ ও মহারাণী সিন্ধুদেশের নেভল রাও, লাহোরের লালা কাশীরাম এবং কলিকাতার বাবু কালিদাস সরকার প্রভৃতির উপকার স্মরণ করিয়া ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র সকৃতজ্ঞহৃদয়ে নমস্কার করেন। কোন কোন উপকারীর বাড়ীতে যাইয়া তাঁহাকে সম্মান প্রদান করা হয়, অনেক উপকারীর গলে পুষ্পমালা প্রদান করা হইয়াছিল। ২৯ শে মাদ শক্রকে প্রীতি করা হয়। এই কয় দিন দেবালয়ে অনন্ত ভাবে উপাসনাদি হইতেছে। মঙ্গলগঞ্জ হইতে প্রীতিভাজন লক্ষ্মণচন্দ্র আস সংগে আসিয়া উপাসনাদিতে যোগ দানপূর্ব্বক বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছেন।

সংবাদ।

ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় উড়িষ্যাদেশের নানা স্থানে বিধান প্রচার ও অরণ্য পর্ব্বত ভ্রমণ করিয়া কটকে আসিয়াছেন। উড়িষ্যার অন্তর্গত বামণ্ডা ও বোধের রাজগণ তাঁহাকে বিশেষরূপে সম্মান করিয়াছেন। ভাই নন্দলাল আচার্য্যের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে ২৫ শে পৌষ কটক নগরে উৎসব করিয়া কলিকাতায় অদ্য পঁহুছিয়াছেন।

ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু সিন্ধুদেশের অন্তর্গত হায়দারাবাদ হইতে করাচি, লাহোর, সক্কর, কাণপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থান হইয়া এবং স্থানে স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। ভাই লক্ষ্মণ পাণ্ডাও সিন্ধুদেশে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। বিহারে প্রচারব্রতে ব্রতী ভাই দীননাথ মজুমদার ও ভাই বলদেব সহায় উৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় স্থিতি করিতেছেন।

রামপুর বোয়ালিয়া কোন বন্ধু লিখিয়াছেন, "১৮ ও ১৯ পৌষ নিম্নলিখিত প্রণালী মতে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্ত সাহা ডাক্তারের বাটীতে বোয়ালিয়া পারিবারিক দ্বাবিংশ বর্ষীয় সাংবৎসরিক উৎসব হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সিংহ উপাসনার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন। ১৮ ই পৌষ, ১২৯৪, রবিবার;—প্রাতঃকালে,—ভোর কীর্ত্তন, উপাসনাদি, সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন। মধ্যাহ্ন,—দীন দুঃখীকে দান। সন্ধ্যার পর,—উপাসনাদি সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন। ১৯ শে পৌষ সোমবার,—প্রাতঃকাল,—উপাসনাদি, সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন। মধ্যাহ্ন,—ঈশ্বরালোচনাদি। অপরাহ্ণ,—নগর সংকীর্ত্তন। সংকীর্ত্তনকালে শ্রদ্ধাস্পদ রামচন্দ্র সিংহ মহাশয় বাজারে দণ্ডায়মান হইয়া সংক্ষেপে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা এমন সুমিষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে তৎকালে সকলেই তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কোন কোন হিন্দু ভদ্রলোক প্রথমে নিন্দাবাদের আশঙ্কাপ্রযুক্ত বক্তৃতা দানে আপত্তি করেন, পরে তাঁহারাও আবার বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করেন। ২০ শে পৌষ মঙ্গলবার সায়ংকালে সাপ্তাহিক উপাসনা ও সংকীর্ত্তন হয়। ২১ শে পৌষ ইং ৪ ঠা জানুয়ারি বুধবার অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময় ৺ লোকনাথ স্কুল গৃহে "আমাদিগের জাতীয় উন্নতি" বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। বক্তৃতা ১।০ ঘণ্টা কাল হইয়াছিল এবং শ্রোতৃবর্গ অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।"

বিগত ১৬ই হইতে ২০ শে পৌষ অবধি গোরাবাজার নববিধান সমাজের সপ্তম সাংবৎসরিক উৎসব সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দুই দিন প্রাতে উৎসবমণ্ডপে উপাসনা ও সায়ংকালে বহরমপুর ও গোরাবাজারে নগরসংকীর্ত্তন ও বক্তৃতা হইয়াছিল। তৃতীয় দিবসে সমস্ত দিন উৎসবে সায়ং প্রাতে উপাসনা, অপরাহ্ণে সৎপ্রসঙ্গ, স্বপ্ন প্রার্থনা ও কীর্ত্তনাদি, সায়ংকালীন উপাসনার পূর্ব্বে আরতি ও প্রাতঃকালীন উপাসনান্তে আজিমগঞ্জের বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীমান্ হরিচরণ রক্ষিত নামক জনৈক যুবার নববিধানধর্ম্মে দীক্ষাসংস্কার হইয়াছিল। ১৯ শে পৌষ সামাজিক উপাসনাগৃহ ও দৈনিক সাধন স্থল "বিধানকুটীরের" দ্বিতীয় তলে মাধ্যাহ্নিক উপাসনা ও বহরমপুর "গ্রাণ্টহলে" অপরাহ্ণে গৃহস্থপ্রচারক শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্রনাথ মিত্রের "চারিপ্রকার পৌত্তলিকতা ও পাঁচ প্রকার নাস্তিকতা" বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। তৎপর দিন দীনসেবার দ্বারা উৎসব সাঙ্গ হইয়াছে। বিষয়বিশেষে গৃহস্থ প্রচারক শ্রীমান্ নগেন্দ্রনাথ মিত্রের সহায়তা লইয়া শ্রীযুক্ত ভাই দীননাথ মজুমদার কয় দিন যাবৎ উৎসবের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। সেখানকার উৎসাহী উন্নতিশীল যুবাদল একটি মন্দিরের অভাব বিশেষরূপে অনুভব করিতেছেন। আমা-

দের আন্তরিক প্রার্থনা যে, বিধানজননীর কৃপায় একটি উপযুক্ত মন্দির প্রতিষ্ঠার দ্বারা নববিধান বিশ্বাসের জয়ধ্বজা সেখানে চিরদিনের জন্য উড্ডীন হইয়া বিশ্বাসী দলকে পরিবর্দ্ধিত ও বিস্তারিত করুক।

নিম্ন লিখিত প্রণালীতে উৎসবকার্য্য সম্পন্ন হইবে।

১ মাঘ শনিবার	সায়ংকালে আরতি।
২ মাঘ রবিবার	মন্দিরে উপাসনা।
৩ মাঘ সোমবার	সৎপ্রসঙ্গ।
৪ মাঘ মঙ্গলবার	বিভিন্ন ধর্ম্মসমাজের সঙ্গীন ও উপাসক ও অধ্যক্ষগণের সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা।
৫ মাঘ বুধবার	মঙ্গলবাড়ীর সাংবৎসরিক। আলবার্ট হলে পাঁচটার সময় যুবকবৃন্দের প্রতি উপদেশ।
৬ মাঘ বৃহস্পতিবার	আনন্দবাজার, অবলাগণের জন্য।
৭ মাঘ শুক্রবার	আনন্দবাজার, পুরুষগণের জন্য।
৮ মাঘ শনিবার	ভাই প্রসন্নকুমার সেনের গৃহে উপাসনাদি। ইংরেজীতে উপাসনা।
৯ মাঘ রবিবার	সমুদায় দিনব্যাপী উৎসব।
১০ মাঘ সোমবার	ভাই অমৃতলাল বসুর বাটীতে উপাসনাদি।
১১ মাঘ মঙ্গলবার	প্রাতে মন্দিরে উপাসনান্তর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেনের গৃহে সৎপ্রসঙ্গাদি, তৎপর নগর-সংকীর্ত্তন।
১২ মাঘ বুধবার	মদ্যপান নিবারণী সভা। কমল কুটীরে মহিলাগণ কর্ত্তৃক বরণ।
১৩ মাঘ বৃহস্পতিবার	আর্য্যনারী-সমাজ। আলবার্ট হলে রবিবাসরীয় নীতিশিক্ষাবিষয়ক বিদ্যালয়ের সভা।
১৪ মাঘ শুক্রবার	সাধারণ সভা।
১৫ মাঘ শনিবার,	ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের গৃহে উপাসনা।
১৬ মাঘ রবিবার,	মন্দিরে উপাসনা। যুবকবৃন্দের রবিবাসরীয় প্রাভাতিক উপাসনা, আলবার্ট হল।
১৭ মাঘ সোমবার,	প্রান্তরে বক্তৃতা।
১৮ মাঘ মঙ্গলবার,	নবসংহিতা, নির্জ্জনযোগ ও উৎসবান্ত সূচক শান্তিবাচন।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয় সমীপে।

কলিকাতা এবং ঢাকা।

বর্ত্তমান যুগধর্ম্মসম্পর্কে কলিকাতা এবং ঢাকার কি সম্বন্ধ? কলিকাতাবাসিগণের মধ্যে অনেকেই ঢাকা অঞ্চলের ভদ্রগণকে বাঙ্গাল বলিয়া অবজ্ঞা করেন। কিন্তু কলিকাতার যাঁহারা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঢাকাস্থ ব্রাহ্মদিগের প্রতি বিশেষ আদর ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন। অনেকে আশা করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবাঙ্গালা এবং পূর্ব্ববাঙ্গালার মধ্যে বিশুদ্ধ ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে। মানুষের আশা সর্ব্বদা পূর্ণ হয় না; কিন্তু ঈশ্বর কখনও নিরাশ হইতে পারেন না। তিনি সত্যসংকল্প; তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সত্য সত্যই ঈশ্বর এই দৃঢ় পণ করিয়াছেন যে, তিনি কেবল পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ও পশ্চিম-বাঙ্গালার মধ্যে নহে, কিন্তু ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে এবং ইহলোক ও পরলোকের মধ্যে এক আশ্চর্য্য সম্মিলন স্থাপন করিবেন। হতভাগ্য তাহারা যাহারা ঈশ্বরের এই সংকল্পে বাধা দিতেছে। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা ঈশ্বরের এই সংকল্প বিশ্বাসনয়নে প্রত্যক্ষ দেখিয়া সমস্ত প্রাণ মন দিয়া ইহা পূর্ণ হইতে দিতেছেন। পশ্চিমবাঙ্গালার কিংবা পূর্ব্ববাঙ্গালার একটী ঈশ্বরাদেশ বাক্যের বিরুদ্ধেও যাহারা অশ্রদ্ধা কিংবা অপ্রেম প্রকাশ করিতেছে এবং সেই গরল অন্যান্য ভ্রাতাদিগের হৃদয়ে বিস্তার করিতেছে, তাহারা ঈশ্বরবিরোধী। যাহারা ভ্রাতাদিগের মধ্যে দিব্য পিতামাতার ছবি না দেখিয়া কেবল তাঁহাদিগের দোষানুসন্ধান করিতেছে, এবং প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে যথা তথা সে সকল কীর্ত্তন করিতেছে, তাহারা ঈশ্বরের মঙ্গল সংকল্পের বিরুদ্ধে শত্রুতা আচরণ করিতেছে। ঈশ্বর প্রেমস্বরূপ; সুতরাং ঈশ্বর সন্তানেরাও প্রেমসম্ভূত এবং প্রেমগঠিত। যাহারা অপ্রেমে নিঃশঙ্কে এই পবিত্র প্রেমরসকে বিষাক্ত করে তাহারা প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের শত্রু। সমস্ত ঈশ্বর সকলেরই হৃদয় দেখিতেছেন। তাঁহার পরিবারে পবিত্র প্রেমই অমোঘ ন্যায়দণ্ড। যাহারা প্রেমহীন হইয়া রুক্ষ ভাবে কেবল পরস্পরের দোষালোচনা করিতেছে তাহারা নিতান্ত কৃপাপাত্র। দোষ সংশোধনার্থই ঈশ্বরের পবিত্র প্রেম দুষ্ট ব্যক্তির দোষ প্রদর্শন করে। কিন্তু লোকের দোষ লইয়া আমোদ করা এবং দূষিত ব্যক্তিকে আপনা অপেক্ষা হেয় ও নিকৃষ্ট মনে করা ঈশ্বরবিরুদ্ধ। ঈশ্বরের লোক সকল যথা,—শাক্য, ঈশা, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি ঘোর নারকীদিগকেও পবিত্র প্রেমদানে ঈশ্বরের ধর্ম্ম পালন করিয়াছেন। ঈশ্বর কৃপা করিয়া কলিকাতা ও ঢাকার মধ্যে তাঁহার পবিত্র প্রেমসেতু রচনা করুন।

কলিকাতা। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
২১ পৌষ, ১৮০২ শক। কোন ব্যক্তি।

এই পত্রিকা ৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২৩ ভাগ
২ ও ৩ সংখ্যা।

১৬ ই মাঘ ও ১ লা ফাল্গুন, রবিবার, ১৮০৯ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷০
মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে অনন্ত আনন্দের প্রস্রবণ, এবার তোমার আনন্দের সাগরে ডুবিয়া তোমার সন্তানগণ সকল জ্বালা নিবারণ করিবে, সকল ভেদ ভুলিয়া যাইবে, এ জন্য তুমি উৎসব আনয়ন করিলে। এমন কি বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে, যাহা তোমার সে অভিপ্রায়ের প্রতিরোধ করিতে পারে। আমাদিগের বিশ্বাস অতিক্ষীণ, তাই আমরা ভয় পাই, অন্যথা যে আনন্দ তুমি দান করিবে, তাহা কোন প্রকারের বাধায় অবরুদ্ধ হইবে, ইহা কি কখন সম্ভব? এবারকার উৎসবের দ্বার তুমি আশা উদ্দীপন করিয়া খুলিলে, কিন্তু আমাদিগের অপরাধে তাহা মুহূর্ত্তের জন্য সঙ্কুচিত হইয়া আবার এমনই উজ্জ্বল বেশ ধারণ করিয়াছে যে, এ কথা কিছুতেই বলিতে পারি না, ভিতরে কোন বিঘ্ন আসিয়া তাহাকে নিমেষের জন্যও আচ্ছাদন করিয়াছিল। আজ বহুবর্ষ যাবৎ তোমার চরণাশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমরা দেখিয়া আসিতেছি, কোন প্রকার মেঘ আমাদিগের চিত্তাকাশকে বহুক্ষণ আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে পারে না। অন্ধকারের পর আলোক আরও উজ্জ্বল হইবে, এ জন্যই উহার সমাগম। হে জননি, যদি তুমি অভিলাষ করিয়াছ যে, আমরা শত বিঘ্নের মধ্যেও তোমাতে আনন্দিত হইব, তোমাতে আনন্দ আমাদিগের কিছুতেই হ্রাস হইবে না, তবে তাহাই হউক। বিঘ্ন আসিলেও বিঘ্ন গণ্য করে না কে? শিশু। মার প্রতি যাহার প্রগাঢ় আস্থা, যে জানে, মা থাকিতে তাহার আবার ভয় কি, সে কি কখন বিঘ্ন বাধার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে? এক বার আশীর্ব্বাদ কর যে, আমরা তোমার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া তোমাতে লুক্কায়িত হই। সেখানে আর এ সংসারের গণ্ডগোল প্রবেশ করিতে পারিবে না, কোন প্রকারের পরীক্ষা বিপদে আন্দোলিত করিতে পারিবে না। আমরা তোমার চক্ষে দর্শন করিব, তোমার কর্ণে শ্রবণ করিব, তোমার প্রেরণায় কার্য্য করিব, তোমাতেই নিরন্তর বিচরণ করিব, তোমাতেই জীবিত থাকিব, তোমারই গুণ নিরন্তর কীর্ত্তন করিব, ইহা ছাড়া আর আমাদিগের কিছুই থাকিবে না। এবারকার উৎসবে যাহাতে এই যোগের ব্যাপার সিদ্ধ হয়, দীনবন্ধো, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। তোমাতে আনন্দিত হইয়া যাহাতে আমরা সকল প্রকারের ভিন্নতা সকল প্রকারের পার্থক্য বিলুপ্ত করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি তুমি এরূপ কৃপাবিধান কর এই তব শ্রীচরণে ভিক্ষা।

অষ্টপঞ্চাশত্তম সাংবৎসরিক।

আমরা পাঠকবর্গকে উৎসবের বৃত্তান্ত অবগত করিতে বাধ্য। যে সম্মিলনের আরম্ভ হইয়াছিল, উৎসবে তাহা পরিপক্ব হইবে, ইহা সকলে স্বভাবতঃ আশা করিয়াছিলেন, সে আশা অনেকে মনে করিতেছেন, পূর্ণ হয় নাই। আমরাও কি তাঁহাদিগের সঙ্গে যোগ দিয়া বলিব, আমাদিগের আশাভঙ্গ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমাদিগের সাধারণের সহিত একান্ত মতভেদ। আমরা জানি, আমাদিগের সম্মিলন নিত্যসিদ্ধ ব্যাপার, ইহার আরম্ভ বা শেষ নাই, কতকগুলি সাংসারিক ঘটনায় মনে হয় বুঝি সম্মিলন ভঙ্গ হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক কথা এই, উহা কেবল আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে মাত্র। পৃথিবী আজ পর্য্যন্ত যাহা সম্পন্ন করিতে পারে নাই, বর্ত্তমান বিধান তাহাই সম্পন্ন করিতে আসিয়াছে ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই সম্মিলনব্যাপার যে অতিসহজে নিষ্পন্ন হইবে, ইহা কখন আশা করা যাইতে পারে না। যাহার জন্য পৃথিবী রক্তস্রোতে ভাসিয়াছে, সেই ব্যাপার নিষ্পন্ন হইতে কোন প্রকার সংগ্রাম হইবে না, ইহা একেবারে অসম্ভব। আমরা স গ্রামদর্শনে ভীত নই, কেন না আমরা জানি, এই সংগ্রামে সকল প্রকারের পাপ অবিশ্বাস বিচূর্ণ হইয়া বিধান অন্তে জয়যুক্ত হইবে। বিধানের জয়ের প্রতি আমাদিগের বিশ্বাস যে কেবল না দেখিয়া বিশ্বাস তাহা নহে, আমরা জয়চিহ্ন দর্শন করিয়াই ঈদৃশ বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছি। সকলে ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করুন, দেখিবেন আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা সময়ে প্রমাণিত হইবে।

উৎসব প্রারম্ভিক বৃত্তান্ত আমরা পূর্ব্বেই লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ১ মাঘ শনিবার ব্রহ্মমন্দিরের দ্বার উৎসবের জন্য উদ্ঘাটিত হয়। বৎসর বৎসর যেরূপ আরতি হইয়া থাকে এবারও তাহাই হইয়াছে, কিন্তু একটি ব্যতিক্রম সংঘটিত হয়, যাহা ভাবী ব্যাঘাতের পূর্ব্ব লক্ষণরূপে উপস্থিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক, বিধানপতির কৃপাবায়ু এ দিন প্রবলরূপে বহিয়াছিল, এবং আরতির গাম্ভীর্য্য বিশেষরূপে সকলেরই হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল। মহান্ অনন্ত ভূমা পুরুষের আরতি ক্ষুদ্র মনুষ্য ক্ষুদ্র উপকরণে কি নিষ্পন্ন করিবে? যদি কোটি ঢক্কা, কোটি নিশান, কোটি বাদ্যযন্ত্র, কোটি কোটি কণ্ঠ একতানে স্তোত্রবন্দনার সহকারী হয়, তথাপি কিছু হয় না, আমাদিগের সামান্য বাহ্য উপকরণ কেবল আমাদিগের ক্ষুদ্রতারই পরিচয় দান করে। প্রার্থনাকালীন চিত্ত এমনি বিস্ফারিত হইয়াছিল যে, সমুদায় পৃথিবীকে অতি সামান্য বোধ হইয়াছিল। বিধানের নিকটে পর্ব্বততুল্য বাধা বিপত্তি আসিয়া সমুপস্থিত হয়, তথাপি তাহা যে তৃণবৎ অকর্ম্মণ্য কিছুই নয়, ইহা সে দিন বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।

২ মাঘ রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে সায়ঙ্কালীন উপাসনা হয়। ভাই দীননাথ মজুমদার উপাসনা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

৩ মাঘ সোমবার ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের গৃহে সায়ঙ্কালে সৎপ্রসঙ্গে সকলে সমবেত হন। বন্ধুগণ সকলে একহৃদয় হইয়া প্রসঙ্গ করেন। কিরূপে বিধানসমাজের কল্যাণ বর্দ্ধিত হইতে পারে প্রধানতঃ এই বিষয়েরই প্রসঙ্গ হয়। সকলেই এ প্রসঙ্গে হৃদয়ের সহিত যোগ দান করিয়াছিলেন, এবং সকলেরই মুখে আহ্লাদের চিহ্ন লক্ষিত হইয়াছিল।

৪ মাঘ মঙ্গলবার শ্রীদরবারের বিশেষ অধিবেশন হয়। এ দিবস বিধানমণ্ডলীসংগঠনবিষয়ে বিশেষ প্রসঙ্গ হইয়াছিল। ৫ মাঘ বুধবার পাঁচটার সময় যুবকবৃন্দের প্রতি উপদেশ হয়। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার সভাপতিত্বের কার্য্য করেন, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, ভাই গৌরগোবিন্দ রায় মুসলমান ও হিন্দুসমাজের সামাজিক গঠনের বিষয় কিছু কিছু বলেন। ভাই

গিরিশচন্দ্র সেন যাহা বলেন, তাহার সার এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে।

বিশ্বাস ও ভয় এই দুই দ্বারা মোসলমান-মণ্ডলী শাসিত ও নিয়মিত হইয়া আসিয়াছে। একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার ঈশ্বর ও মোহম্মদ তাঁহার প্রেরিত এবং কোরাণ ঈশ্বরের বাণী এই তিনের প্রতি বিশ্বাস, নরকভয় খলিফা বা সমাজপতিদিগের শাসনভয়। মোসলমান-মাত্রেই বিশ্বাস করেন যে, ঈশ্বর নিরাকার অদ্বিতীয়, তিনি ব্যতীত উপাস্য নাই, এবং মোহম্মদ সেই একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন ও তাঁহার পরিত্রাণপ্রদ বিধি প্রচার করিতে তৎ-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন; কোরাণগ্রন্থ প্রত্যাদেশবাণীতে পূর্ণ, হজরত মোহম্মদ স্বর্গীয় দূত জেব্রিল যোগে তাহা শ্রবণ করিয়া প্রচার করেন, এবং উহা লিপিবদ্ধ হয়; প্রত্যেক মোসলমানকে এই তিনে বিশ্বাস করিতে হয়। এই বিশ্বাসের অভাব হইলে কেহ মোসলমান থাকিতে পারে না, তাহাঁকে নানারূপ ক্লেশ পাইয়া মোসলমান সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইতে হয়। কোরাণের বিধির অন্যথাচরণ করিলে নরকদণ্ড ভোগ করিতে হইবে, বিশ্বাসী মোসলমানগণ এই ভয়ে চালিত হন। এতদ্দ্বারা মোসলমান সমাজের একটি দৃঢ়বন্ধন ও একতা রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ খলিফা বা সমাজপতি-দিগের কঠোর শাসন ও দণ্ডভয় বিদ্যমান। কেহ কেহ বিধিমত নমাজ না পড়িলে বা রোজা পালন না করিলে অপরাপর বিধি অনুসারে না চলিলে পূর্ব্বে খলিফা বা সমাজপতি কঠোর দণ্ড দান করিতেন। দণ্ডবিধির মধ্যে পৃষ্ঠে যষ্টি-প্রহার প্রধান দণ্ড ছিল। হজরত মোহম্মদের কথার প্রতি তাঁহার শিষ্যবর্গের প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। পূর্ব্বে মোসলমানবর্গ সুরা পান করিত, অনেকে মদ্যপানে বিহ্বল হইয়া নমাজ পড়িতেন। এক দিন মহাপুরুষ মোহম্মদ এরূপ ঘোষণা করেন যে অদ্য হইতে মাদক সেবন নিষিদ্ধ হইল। তৎক্ষণাৎ সকলে সুরাপান পরিত্যাগ করিলেন, সুরা ঢালিয়া ফেলিয়া দিলেন। এইক্ষণ শত শত সুরাপাননিবারিণী সভার বক্তারা চীৎকার করিয়া গলা ভাঙ্গিতে-ছেন, বিশেষ কিছুই ফল হইতেছে না। কত লোক মদ খাইব না বলিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া তাহার পর দিনই হয় তো মদ খাইতেছে। দেখ হজরত মোহম্মদের প্রেরিত-তত্ত্বের প্রতি বিশ্বাসের কেমন আশ্চর্য্য শক্তি। তিনি এক কথায় সমুদায় মুসলমানসমাজে মদ্য-পান অবরুদ্ধ করিয়া দিলেন। এক জনের প্রতি বিশ্বাস থাকিলে কেমন সমুদায় সমাজ সুশাসনে স্থিতি করে মুসলমান সমাজ তাহার সাক্ষ্য দান করিতেছে।

ভাই গৌরগোবিন্দ রায় যাহা বলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে। ভারত-বর্ষের হিমালয়শিখর হইতে আরম্ভ করিয়া নিম্ন ভূমি পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিলে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, এখানে সকল দেশেরই প্রকৃতির শোভা বিদ্যমান আছে, সেইরূপ এ দেশে পৃথিবীর সকল সমাজের সংগঠনের লক্ষণ লক্ষিত হয়। মনু প্রভৃতি স্মৃতি আলোচনা করিলে ব্রাহ্মণাদিজাতিসম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন বিধিনিয়ম এরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায় যে, এ কালের লোকেরা তন্মধ্যে পক্ষপাত ভিন্ন আর কিছুই দর্শন করেন না। প্রাচীন কালের সকল দেশের ব্যবস্থা মধ্যেই যে এ প্রকার পক্ষপাত ছিল তাহা সকলেরই বিদিত আছে। ঈদৃশ পক্ষপাত দণ্ডবিধানেই বিশেষতঃ লক্ষিত হয়। কিন্তু দেখিতে গেলে আজ পর্য্যন্তও দণ্ডনীতি ঠিক অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। দেশীয় ব্যবস্থা শাস্ত্রে দণ্ডবিধান ছাড়া অন্যত্র যে সকল বিধি ব্যবস্থা আছে, তন্মধ্যে সত্য ন্যায়ের প্রাধান্য সামান্য নহে। ব্রাহ্মণ-জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্বাপেক্ষা সকল বিষয়ে স্বীকৃত হইলেও অন্যান্য জাতিরও সে শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যা তপ-স্যাদিযোগে লাভ হইত দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি যে প্রকার উন্নত হইতে উন্নত অবস্থায়

উপনীত হন, তেমনি তাঁহার সম্বন্ধে বিধি ব্যবস্থা সকল পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। সুদৃঢ় বন্ধন হইতে প্রমুক্তাবস্থা সকলই এই সকল ব্যবস্থা মধ্যে আছে। গৃহী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, ভিক্ষু ও পরিব্রাজক সকলেরই সম্বন্ধে বিশেষ বিশেষ বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। আহার, বিহার, প্রভৃতি সকল বিষয়েরই প্রকৃষ্ট বিধি ব্যবস্থা আছে। বৌদ্ধধর্ম্মে যে সকল নিয়ম ও বিধি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হিন্দুসমাজের বিধি ব্যবস্থার ছায়া ও অনুকৃতি। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার যুবকগণের চরিত্রের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি প্রয়োজন এতৎ সম্বন্ধে কিছু বলিয়া কার্য্য পরিসমাপ্ত করেন।

৬ মাঘ বৃহস্পতিবার মঙ্গলবাড়ীর সাংবৎসরিক। দেবালয়ের উপাসনানন্তর সংকীর্ত্তন করিতে করিতে মঙ্গলবাড়ীতে সকল বন্ধুগণ উপস্থিত হন। ভাই রামচন্দ্র সিংহ প্রার্থনা করেন। প্রার্থনানন্তর প্রীতিভোজ হয়। ৮ মাঘ শনিবার বিডন পার্কে প্রায় দুই সহস্র সমাগত ব্যক্তিগণ সন্নিধানে বক্তৃতা হয়। ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল, দীননাথ মজুমদার, নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বক্তৃতা করেন। বালেশ্বরের ভ্রাতা লক্ষণচন্দ্র পাণ্ডা উড়িয়া ভাষায় বলেন। সায়ংকালে অন্তঃপুরে মহিলাগণ কর্তৃক বরণ। অন্তঃপুরের প্রাঙ্গণ সুশোভন চন্দ্রাতপে আচ্ছাদিত, পুষ্পমালায় সজ্জিত, আলোকনিচয়ে আলোকিত হইয়াছিল। নবীন নববিধান পতাকা দেবালয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তথা হইতে আনীত এবং প্রাঙ্গণের মধ্য স্থানে সংস্থাপিত হয়। নারীগণ বরণের উপকরণ সমুদায় হস্ত ও মস্তকে লইয়া পতাকা পরিবেষ্টন পূর্ব্বক বরণ কার্য্য নিষ্পন্ন করেন। সে দৃশ্যের মনোহারিত্ব এবং গাম্ভীর্য্য কখন লেখনীযোগে ব্যক্ত হয় না। বিধানপতাকা বেষ্টন করিয়া বিধানপতিকে বরণ ইহা কিছু সামান্য ব্যাপার নহে। ভক্তিমতী নারীগণ ভক্তিভরে বরণ সঙ্গীত করিতে করিতে যখন পতাকা পরিবেষ্টন করিতেছিলেন, তখন সকলেই সাক্ষাৎ ভগবানের আবির্ভাব অনুভব করিয়াছেন, এবং তিনি যে এইরূপে কন্যাগণ কর্তৃক বরিত হইতে ভাল বাসেন তাহা সকলেরই অনুভব গোচর হইয়াছে। যে বিধান বিশ্বপতিকে আপনার গৃহদেবতা করিয়াছে, জননীরূপে তাঁহাকে ঘরে বরণ করিয়া লইয়াছে, সে বিধান ভগবান্‌কে লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিবে, ইহা একান্ত স্বাভাবিক। জননীকে লইয়া তাঁহার কন্যাগণ মহা আমোদ প্রকাশ করিতেছেন, বরণের ব্যাপার মধ্যে ইহা দেখিয়া আমরা একান্ত কৃতার্থ। নববিধান নিরাকার অনন্ত পরব্রহ্মকে মার সাজে সাজাইয়া গৃহস্থের বাড়ীতে যখন আনয়ন করিয়াছেন, তখন গৃহবাসিনীগণ বৎসরকার দিনে তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমে বরণ করিবেন না, ইহা কি কখন হইতে পারে? ভগবান্‌কে লইয়া নরনারী এরূপ আমোদ করিতে না পারিলে জীবন নিষ্ফল। আমরা বরণের ব্যাপার দর্শন করিয়া একান্ত মুগ্ধ হইয়াছি, এবং নব বিধানের চির সরসতার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসবান্ হইয়াছি। আচার্য্যমাতা একটী প্রার্থনায় ভগবানের বরণে যে কি আনন্দ এবং এই আনন্দ সম্ভোগের জন্যই যে এই বরণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইহা সুচারুরূপে ব্যক্ত করেন। তাঁহার প্রার্থনার পর আচার্য্যপত্নী প্রার্থনা করেন। তাঁহার প্রার্থনায় বরণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সুন্দররূপে প্রকাশ পায়। মহান্ অনন্ত বিরাট পুরুষের বরণ যে অতীব মহদ্ব্যাপার ইহা তাঁহার প্রার্থনায় সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় এই, আমরা প্রার্থনা দুইটী যথাযথ এখানে লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম না। বরণের সঙ্গীত নিম্নে লিপিবদ্ধ করা গেল।

বরিছে এ জগত বিশাল সংসার ফিরি ফিরি ঘুরিছে নিরন্তর তোমারে। সূর্য্যের চারি ধারে, চন্দ্র তারকারাজী নৃত্য করে বরণ করে সবে তোমারে।

এ ধরা হয়ে আনন্দে ভরা সূর্য্যের প্রেম আকর্ষণে ঘুরিছে চারি ধারে।

এ ধরারাজ্য, জ্যোতির্ম্ময় চন্দ্র সূর্য্য, আরতি করে মহাদেব মহেশ্বরে।

বন উপবন নদ নদী পবন কত ভাবে সদা তোমায় বরণ করে।

যত আছে ধন জন, সন্তান প্রাণ মন, সব দিয়ে আরতি করি মোরা প্রাণ ভরে।

আয় রে সখী, মোরা জগত স্বামীরে বরণ করি নববিধান নিশান ধরি। (১)

আদরে বরণ করি বিধাননিশান। অনন্তের জয়চিহ্ন সত্যের প্রমাণ।

বিশাল ব্রহ্মাণ্ড যার, করে মহিমাপ্রচার, মোরা আর্য্যনারী করি তাঁরি গুণ গান।

দিয়ে দীপ ফুলমালা, সাজায়ে বরণডালা, পরমেশপদে প্রেম ভক্তি করি দান; এস প্রিয় ভগ্নীগণ, আনন্দে হয়ে মগন, গলবস্ত্রে করি তাঁর চরণে প্রণাম। জয় ভগবান্! অনন্ত মহান্! সর্ব্ব শক্তিমান্! (২)

৯ মাঘ রবিবার। অদ্য ব্রহ্মমন্দিরে সমুদায় দিনব্যাপী উৎসব। প্রাতঃকালে ব্রহ্মমন্দির লোকে পরিপূর্ণ। প্রথমতঃ সঙ্গীত হয় পরে প্রাতঃকালের উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন হয়। নিম্ন লিখিত আচার্য্যের প্রার্থনা পঠিত এবং তদবলম্বনে উপদেশ হয়।

"দয়াল শ্রীহরি, এই সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া জীব যখন তোমার নিকট থাকে, তখনই মনস্কামনা পূর্ণ হয়। হরি, তোমার বুকের নামই বৃন্দাবন। শান্তিবক্ষ আনন্দবক্ষের ভিতরে তব পদকৃপায় কোন রকমে জীব আস্তে আস্তে প্রবেশ করে। কেমন করে জীব হরির বক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে ইহা লোকে জানে না, বোঝেও না। হরিকে ডাকিতে ডাকিতে শরীর সংসার ধন ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া আস্তে আস্তে কোন্ দিক্ দিয়া হরির বক্ষে প্রবেশ করে। তখন শরীরের জীব যাইয়া তাহাকে ডাকে, সে কি আর আসিবে? তোমাকে দুহাত তুলে ধন্যবাদ করি, জীবের জন্য এমন সুন্দর মোক্ষ রাখিয়া দিয়াছ! আমি যদি তোমার বক্ষের ভিতরে গিয়া বসি, তাহা হইলে আমি অনন্ত সুখে সুখী হইলাম। দেখ, নাথ, সুখই যথার্থ, কেন না খনির ভিতর গিয়া পড়া। সোণা আর আবশ্যক নাই, কেন না সোণা হইয়া গেলাম। হরি ভক্তদের বক্ষের মধ্যে পুরে তাঁহাদের হরিময় করে দেন। যদি এই দেহে থেকে ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলাম তবে বৈকুণ্ঠবাস হইল না। হরির ঘরে, হরির বুকের বারাণ্ডায় বসিব, হরির বুকের ভিতর খেলা করিব, ইহাই আমরা চাই। হে আনন্দময়ী, ইহাই কর। এক এক সন্তানকে ধরে বুকের মধ্যে রাখ। দেখ্‌ব মা, চির দিন কেমন রাখিতে পার ঐ রকম করে। আর কান্না টান্না একেবারে থামিয়ে দাও। 'সোণা হয়ে যাব' এই কথা জগৎ শুদ্ধ সকলে বলুক। এবার স্পর্শমণি হরিতে সকলে লেগে হরিময় হয়ে যাব। আশা করুক জীব, হরির কৃপা হইলেই হইল। মাগো, তোমাকে ভাবিতে ভাবিতে তোমার বক্ষবৈকুণ্ঠে ভক্তদের সঙ্গে বসিয়া অপার প্রেমসমুদ্রে ডুবে সংসারের প্রলোভনে আর প্রমুগ্ধ হব না, এবং চির দিনের জন্য কৃতার্থ হইব, মা, অনুগ্রহ করিয়া কাঙ্গালদের আজ এই আশীর্ব্বাদ কর।"

উপদেশের সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে।—এবারকার উৎসব সম্মিলনের উৎসব। আমাদিগের সম্মিলন কোথায়? সম্মিলন আমাদিগের শ্রীহরির বক্ষে। আমরা সহস্র যত্ন চেষ্টা করিয়াও কখন আমাদিগের মধ্যে সম্মিলন আনয়ন করিতে পারিব না, যদি আমরা সকলে শ্রীহরির চরণতলে একত্র সম্মিলিত না হই। আমরা দেখিয়াছি, যে সময়ে আমরা শ্রীহরির চরণতলে উপবেশন করি, সে সময়ে সকল বিচ্ছেদ বিয়োগ ভিন্নতা ভুলিয়া যাই, শত প্রাণ মুহূর্ত্তের মধ্যে এক হইয়া যায়। এক বার নয়, দুই বার নয় সহস্র বার আমরা ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমরা বিশ্বাস করি, আমরা এ পৃথিবীতে আসিবার পূর্ব্বে যখন অজ্ঞাত অব্যক্ত ছিলাম, তখন সকলে মিলিয়া আমরা মার বক্ষে নিদ্রিত ছিলাম। আমাদিগের মিলন সেই মার বক্ষ ভিন্ন আর কোথায়? আমরা যত বাহিরে অবস্থিতি করিব, তত বিয়োগের বৃদ্ধি হইবে। আমরা এখানে বাহিরে বিচরণ করিবার জন্য আসি নাই, বাহিরের বিষয়ে আসক্ত হইয়া থাকা আমাদিগের জীবনের লক্ষ্য নহে। আমরা আসিয়াছি, নূতনবিধ যোগে যোগী হইয়া সংসারের সকলকে সেই যোগের অধিকারী করিবার জন্য। যোগের আনন্দ ভিন্ন যোগের সুখ ভিন্ন এ সংসারের অশান্তি দুঃখ ক্লেশ যন্ত্রণা তিরোহিত হইবার নহে। এই আনন্দে এই সুখে জীবের পরিত্রাণ। নরনারী যখন সুখের সাগরে ভাসে, তখন পাপ তাপ

আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, কলহ বিবাদ অশান্তি তাহার নিকটে আসিতে পারে না। এবারকার বিধান আনন্দের বিধান। পবিত্রাত্মা আনন্দরূপে সকলের হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া সকলকে একযোগে নিবদ্ধ করিবেন, সমুদায় ভিন্নতা তিরোহিত হইয়া যাইবে। পৃথিবী আজ পর্য্যন্ত সম্মিলন সুখ অনুভব করিতে পারে নাই। ধর্ম্মে ধর্ম্মে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে মহাজনে মহাজনে সম্যক্ যোগ আজ পর্য্যন্ত কাহার প্রত্যক্ষ হয় নাই। এই অসম্ভব ব্যাপার, এই অলৌকিক ব্যাপার সাধন করিবার জন্য স্বর্গ হইতে নববিধান অবতরণ করিয়াছেন। ইনি এক ব্রহ্মানন্দে সকল নরনারীকে এক করিবেন। ব্রহ্মানন্দ পরিত্যাগ করিয়া কাহারও এক হইবার উপায় নাই। ব্রহ্মানন্দ বলিতে কেশবচন্দ্র সেনের নাম সকলেরই মনে স্বভাবতঃ সমুদিত হয়। তাঁহাতে সমুদায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধান পূর্ণ একত্ব লাভ করিয়াছিল। তাঁহাতে এরূপ একত্ব হইল কেন? ব্রহ্মানন্দে। তিনি যতই ব্রহ্মানন্দের ভিতরে ডুবিতে লাগিলেন, ব্রহ্মেতে যতই তাঁহার আনন্দ বাড়িতে লাগিল, ততই সর্ব্বপ্রকার ভিন্নতা প্রভেদ বিলীন হইয়া গেল। ব্রহ্মানন্দে বিগলিত হইয়া যখন তিনি তাঁহার ভিতরে এই একত্ব দর্শন করিলেন, তখনই পৃথিবীর নিকটে নববিধানের বার্ত্তা অর্পণ করিলেন। তিনি ব্রহ্মানন্দে ডুবিয়া যে অসম্ভব সম্ভব করিলেন, আমাদিগকেও সেই ব্রহ্মানন্দে ডুবিয়া তাহা নিষ্পন্ন করিতে হইবে। যে পর্য্যন্ত জীব হরিতে নিমগ্ন হইয়া স্বর্ণ হইয়া না যায়, সে পর্য্যন্ত তাহার বৈকুণ্ঠবাস হয় না। "হরির ঘরে, হরির বারাণ্ডায়" বসিয়া হরির বুকের ভিতরে কাহারা খেলা করিতে পারে? যাহারা ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হইয়াছে। আমরা ভগবান্কে ভাবিতে ভাবিতে ভগবানের বক্ষোবৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিব, সেখানে ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হইয়া অপার প্রেমসমুদ্রে ডুবিয়া যাইব, আর সংসারের পাপ প্রলোভন কিছুতেই মুগ্ধ করিতে পারিবে না। যদি ব্রহ্মানন্দে আমাদিগের প্রাণ নিরন্তর ডুবিয়া থাকে, তবে কি আর সংসার আমাদিগের প্রতি কোন ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারে? ভিন্নতা কোথায়, বিরোধ কোথায়, বিবাদ কোথায়? যেখানে ব্রহ্মানন্দের অভাব। নরনারী যখন ব্রহ্মানন্দসাগরে ডুবিয়া যায়, তখন শত বিবাদ বিসংবাদ কলহ বিচ্ছেদের ব্যাপার বিলুপ্ত হইয়া যায়। যখন আনন্দের বাণ ডাকে, তখন তাহার সম্মুখে কিছুই দাঁড়াইতে পারে না। যদি সম্যক্সম্মিলনসুখলাভের জন্য আমরা ব্যাকুল হইয়া থাকি, তাহা হইলে যোগের মাত্রা বাড়াইতে হইতেছে। আমাদিগের মধ্যে যোগের অভাব উপস্থিত হওয়াতেই পার্থক্য বাড়িয়া গিয়াছে। আবার যোগ সমাদৃত হউক, সকলের প্রাণ ব্রহ্মেতে আনন্দিত হউক, সমুদায় পার্থক্য তিরোহিত হইয়া একত্বের সুখ সকলে সম্ভোগ করিবেন। এবার ব্রহ্মানন্দে সমুদায় ভিন্নতা তিরোহিত করিবার জন্য আমরা উৎসবক্ষেত্রে আহূত হইয়াছি। যাহাতে সমুদায় বৎসর যোগের অভাব বিদূরিত করিয়া আমরা ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়া ব্রহ্মের সঙ্গে এক হইয়া জীবের সঙ্গে সমুদায় পার্থক্যবিরহিত হই, এই যত্ন এই চেষ্টা আমাদিগের জীবনে সার কার্য্য হউক।

প্রাতঃকাল হইতে ৫ ঘণ্টাকাল সঙ্গীত উপাসনা উপদেশে অতিবাহিত হয়। পুনরায় একটার পর মাধ্যাহ্নিক উপাসনা হয়। ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় উৎসবে উপস্থিতসত্ত্বেও তাঁহার ইচ্ছাক্রমে ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মাধ্যাহ্নিক উপাসনাকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। উপাসনানন্তর পাঠ, ধ্যান, সৎপ্রসঙ্গ ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা হয়। এ সমুদায়েতেই প্রকাশ পাইয়াছে, উৎসবের গাম্ভীর্য্য ও মধুরতায় সকলের হৃদয় কেমন সমগ্র দিন আচ্ছন্ন ছিল। বৎসর বৎসর ভগবানের কৃপা যেরূপ বর্ষিত হইয়া থাকে, এবার তৎপক্ষে কিছু ন্যূনতা হয় নাই, ইহা সকল হৃদয়ই বিলক্ষণ অনুভব করিয়াছেন। সে যাহা হউক, সায়ংকালে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ হয়, বিলক্ষণ জমাট সঙ্কী-

র্ত্তন চলিতেছিল, ইতোমধ্যে যে ঘটনা সমুপস্থিত হয় তাহার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া তাহার স্থায়িত্ব সম্পাদন করা সমুচিত কি না তৎসম্বন্ধে আমাদিগের চিত্তে বিলক্ষণ সংশয় আছে। সুতরাং আমরা এ সম্বন্ধে মৌনাবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছি। আমরা জানি এ প্রকার মৌনাবলম্বনে ক্ষতিও আছে, কেন না লোকমুখে নানাপ্রকার অযথা ঘটনার দ্বার এতদ্দ্বারা উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া হইতেছে। যদি আমরা বুঝিতাম, আমাদের লেখাতে তাদৃশ রটনা অবরুদ্ধ হইয়া যাইবে, সাধারণের চিত্ত যথাযথ সমুদায় ঘটনা বুঝিয়া লইবেন, অথচ কোন প্রকার অপ্রিয় সত্য লিপিবদ্ধ হইবে না, তাহা হইলে আমরা ঘটনা যথাযথ বর্ণ করিতে যত্ন করিতাম, কিন্তু যখন কোন প্রকার মহোদ্দেশ্য সাধিত হইবার হেতু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, তখন দুঃখের সহিত এই মাত্র বলিয়া মৌনাবলম্বন করিতে হইতেছে যে, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উপাসনাপ্রণালীর ব্যতিক্রম করাতে,পূর্ব্বে দুই মাস যেমন ব্যতিক্রম পরিত্যাগ করিয়া মন্দিরে উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই রূপে অন্ততঃ উৎসবের দিনের জন্য উপাসনা করেন এ নিমিত্ত সকলে মিলিয়া তাঁহাকে অনুরোধ করেন, তাহাতে তিনি সম্মত হন না। ইহাতে উৎসবের দিনের সায়ংকালের উপাসনার ভার ভাই দীননাথ মজুমদারের উপরে অর্পিত হয়। ভাই প্রতাপচন্দ্র বেদীতে আরোহণ করিবেন অবগত হইয়া কাহার কাহার মনে আশঙ্কা হয় তিনি নিয়ম ভঙ্গ করিবেন। এই আশঙ্কায় এক জন ভ্রাতা বারণ করিতে গিয়া বিভ্রাট্ উপস্থিত হয়। ভাই প্রতাপচন্দ্র বেদীতে আরোহণ করেন, এবং আত্মসম্বন্ধে যে আবেদন করেন, তাহাতে ব্রহ্মমন্দিরে বিষম দৃশ্য উপস্থিত হয়। এই ব্যাপারে সমুদায় দিনের সম্ভোগের পর সকলের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। এ আঘাতের দুষ্ফল কত দিন যে বহন করিতে হইবে তাহা কে জানে?

১০ মাঘ সোমবার। অদ্য আর্য্যনারীসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব। এতদুপলক্ষে দেবালয় অতি সুন্দররূপে সজ্জিত ও সুশোভিত হইয়াছিল। সমাগত নারীগণ স্ব স্ব আসন পরিগ্রহ করিলে উপাসনাকার্য্য আরম্ভ হয়। উপাধ্যায় উপাসনাকার্য্য সম্পন্ন করেন। আচার্য্যমাতা আচার্য্যপত্নী, এবং অন্যান্য মহিলাগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রার্থনা করেন। প্রার্থনা সকল অতি সরল, মধুর, ও ব্যাকুলতা পূর্ণ ছিল। এই সকল প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া মনে স্বতঃ এই একটি ভাব সমুপস্থিত হয় যে, নব বিধান নরনারীনির্ব্বিশেষে এমন একটি অধিকার দিয়াছেন, যে অধিকার প্রদানের জন্য ইহাঁর খ্যাতি চির দিন পৃথিবীতে অব্যাহত থাকিবে। কি পুরুষ কি নারী সকলেই সাক্ষাৎসম্বন্ধে ভগবানের নিকটে উপস্থিত হইয়া আপনার প্রাণের কথা নিবেদন করিতে পারেন, এবং ভগবানের প্রত্যুত্তর লাভ করেন, এ অধিকার কিন্তু সামান্য অধিকার নহে। সংসারে শান্তি ও সান্ত্বনা এই উপায়ে এ বিধানে সকলে লাভ করিতেছেন, এ কথা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। প্রাতঃকালের উপাসনা কালে দুইটী মহিলা দীক্ষিত হন। উপাসনা ১০ টার পর আরম্ভ হইয়া ৫ ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া হইয়াছিল। অপরাহ্নে নারীগণ সংকীর্ত্তন এবং রজনীতে প্রার্থনা করেন। এই দিন আলবার্টহলে মদ্যপাননিবারণী সভা হয়। আকাশের প্রতিকূলতায় শ্রোতৃসংখ্যা অল্প হয়। শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সভাপতির কার্য্য করেন। ইংলিসম্যান পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত এট্‌কিন্ সাহেব, অক্সফোর্ডমিসনের শ্রীযুক্ত বেল সাহেব এবং শ্রীযুক্ত কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন।

১১ মাঘ মঙ্গলবার। অদ্য প্রাতে মন্দিরে উপাসনা হয়। ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। উপদেশ স্থলে শ্রীচৈতন্যের সংকীর্ত্তনের বিষয় পঠিত হয়। উপাসনান্তে আচার্য্যদেবের পূর্ব্বনিবাস

কলুটোলাস্থ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবিহারী সেনের গৃহে সকলে গমন করেন। সেখানে প্রীতি-ভোজনান্তর নগর সংকীর্ত্তন বাহির হইবার উদ্যোগ হয়। ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল কীর্ত্তনের প্রারম্ভিক প্রার্থনা করেন। নিম্নলিখিত সংকীর্ত্তনটি গাইতে গাইতে কলুটোলাস্থ নূতন রাজপথ দিয়া কলেজষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, সুকিয়া ষ্ট্রীট, গুরুদাস চৌধুরীর লেন, ঝামাপুকুর লেন, মেছুয়াবাজার রোড ও অপর সারকুলার রোড দিয়া শান্তিকুটীর ও তৎপরে কমলকুটীরে সকলে সমুপস্থিত হন।

হাসিছেন আনন্দময়ী, হাসি হাসি ডাকিছেন মধুর স্বরে, আনন্দভরে।

মায়ের প্রেমনয়নে, প্রেমাননে অবিরত করুণা অমৃত ঝরে।

কোলে লয়ে ভক্তবৃন্দে, ঈশা গৌর ব্রহ্মানন্দে, ডাকিছেন সকলে আদরে; মায়ের রূপের ছটায় জগৎ হাসে, রবি শশী হাসে সুনীল অম্বরে।

নিরখি মায়ের হাসি, আহ্লাদসাগরে ভাসি, হাসিছে প্রেমিক ভক্তগণ; (হাসি ধরে না ধরে না,—ভক্তমুখে হাসি আর) কিবা হাস্যময় জল স্থল, আকাশ অবনীতল, প্রকৃতির প্রসন্ন বদন। (হাসি ধরে না ধরে না,—প্রকৃতির মুখে) কি বা মায়ের কোলে শিশু হাসে, কাননে কুসুম হাসে, হাসে সতী কুলের কামিনী; হাসে গিরি নদ নদী, তরুকুঞ্জ মহোদধি, বনে বনে হাসে বিহঙ্গিনী। (হাসি ধরে না, ধরে না,—প্রকৃতির মুখে)

হাসিতে মিশায়ে হাসি প্রেমানন্দে নাচি গাই। বিবাদ বিচ্ছেদ, অসার প্রভেদ, একবারে সব ভুলে যাই। কেন রে বিষণ্ণ মুখ, কিসের অভাব ভাই; আমরা মায়ের, মা আমাদের, আর কিছু ভাবনা নাই। মায়ার ছলনে ভুলে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই; মায়ের চরণে অনন্ত মিলনে, আমরা থাকিতে চাই। হাস রে একবার তবে প্রাণ খুলে সবে ভাই; হাসিয়া খেলিয়া নাচিয়া গাইয়া শান্তিধামে চলে যাই। বৃথা মানে অভিমানী হতে আর নাহি চাই; দুঃখ অপমান, পাপ অকল্যাণ এক হাসিতে উড়াই।

আনন্দময়ীর ছেলে হাস রে এবার। (তোরা) মুখ ভার করে ভাই থেক না রে আর। ও রে মায়ের প্রেম ভুবনবিজয়ী, মা আমাদের হাস্যময়ী, তাঁর প্রেমস্রোতে ভাসে জগৎ সংসার। যত ভাই ভগিনীর মুখে, জননীর হাসি দেখে, মায়ের কোলে প্রেমে গলে হব একাকার। ওরে ভাই ভাই বলে, হৃদয়দুয়ার খুলে, হেসে হেসে মিষ্ট ভাসে ডাক একবার। বড় পেয়েছি মরমে ব্যথা, শুনে নিদারুণ কথা, এখন ভালবেসে হেসে দূর কর দুঃখভার। মায়ের অভয়পদ বুকে বেঁধে, প্রেমভরে কেঁদে কেঁদে, হরি হরি হরি বলে চল ভব পার।

মায়ের প্রসারিত প্রেমবাহু, ঐ দেখ দীন হীন কাঙ্গালের তরে।

উৎসবের দিনে অন্তিমে যে প্রকার সকলের হৃদয়ে আঘাত লাগিয়াছিল তাহাতে কেহ আশা করিতে পারেন নাই, কীর্ত্তন এ প্রকার জমাট হইবে। মানুষ যাহা মনে করে, বিধানপতি তাহা কেন হইতে দিবেন? তাঁহার অভিপ্রায় অব্যাহতরূপে সম্পন্ন হইবে, কোন প্রকারের বিঘ্ন বাধা তাহার অন্তরায় জন্মাইতে পারিবে না, এবার তাহা বিশ্বাস করিতে সকলে বাধ্য হইয়াছেন। কমলকুটীরে প্রমত্তসংকীর্ত্তন ও সঙ্গীতানন্তর সকল বন্ধুগণ মিলিত হইয়া ভোজন করেন।

১২ মাঘ বুধবার ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের গৃহে উপাসনা হয়। ১৩ মাঘ বৃহস্পতিবার প্রার্থনান্তে আনন্দবাজার খোলা হয়। এই উপলক্ষে নিম্নলিখিত সঙ্গীতটী গীত হইয়াছিল।

আনন্দে আনন্দবাজার কর দরশন, নিরানন্দ শোক দুঃখ দিয়া সবে বিসর্জ্জন।

হেথায় ভক্তমণ্ডলী, কত রূপে কত ভাবে করেন কেলি। সবে মিলে হরিসনে হল নববৃন্দাবন। তারা দিচ্ছে কত সুধামৃত সাধুবন্ধুগণ।

প্রেমিক সবাই, গৌর নিতাই, ব্রহ্মানন্দ আরো কত করেন হেথায় বিচরণ। তাঁদের কৃপাবলে, এই ভূমণ্ডলে, হচ্চে সুধা বরষণ। যুগযুগান্তরে, অবনী ভিতরে, এক এক মহাজন করেন অবতরণ। ইহাঁদের রসরঙ্গ লীলা খেলা কিছু কিছু বুঝে ভাবুক জন॥

স্বয়ং ভগবান, জীবে দিতে পরিত্রাণ, এ ভবেতে পাঠালেন নূতন বিধান। আমরা দেখে শুনে, চক্ষু কর্ণের করি বিবাদভঞ্জন।

বৃহস্পতি ও শনিবার মহিলাগণের জন্য, শুক্র ও রবিবার পুরুষগণের জন্য আনন্দবাজার হয়। এবার চারি দিন ব্যাপিয়া আনন্দবাজারের কাজ চলিল। দেখা গেল আরও দীর্ঘকাল খোলা থাকিলেও ইহাতে জনসমাগমের ত্রুটি হইবার নহে। আনন্দবাজার সামান্য বাজার

নহে। নরনারী সংসারের বাজারে ভগবানের আবির্ভাব ও ক্রিয়াদর্শন না করিয়া নিজেরা ক্রয় ও বিক্রয় করে, আনন্দবাজার তাহার প্রতিবাদস্বরূপ। আমাদিগের আশা আছে এই প্রতিবাদে কালে, সকলের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইবে।

বৃহস্পতি বার ব্রহ্মমন্দিরে সাধারণ সভা হয়। ভাই দীননাথ মজুমদার আসন পরিগ্রহ করিলে নিম্নলিখিত মত কার্য্য হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের পোষকতায় নির্দ্ধারণ হইল যে, যে সকল দাতা বিধানসমাজের সহায়তার জন্য অর্থ দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ দেওয়া হয়।

শ্রীযুক্ত ভাই রমিচন্দ্র সিংহের প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ ঘোষের পোষকতায় স্থির হইল যে, শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন [illegible] ও শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ চন্দ্র আশ সম্মিলনের জন্য যেরূপ [illegible] ও [illegible]গের সহিত যত্ন করিয়াছেন, সে জন্য বিশেষ [illegible] সহিত ধন্যবাদ দেওয়া হয়।

[illegible] নিম্নলিখিত স্থান সকলে প্রচার কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে।

ভাই রামচন্দ্র সিংহ—বগুড়া, দিনাজপুর, ফুলবাড়ী, নেলফামারী, রঙ্গপুর, কুড়িগ্রাম, কুচবিহার, ময়মনসিংহ, ঢাকা, রামপুর বোয়ালিয়া, খুলনা, যশোহর।

ভাই দীননাথ মজুমদার—রামপুরহাট, বহরমপুর, জিয়াগঞ্জ, ভাগলপুর, মুঙ্গের, মোকামা, মাহিয়ারী, জুরকোলিয়া, ছাপরা, আরা, গয়া, গাজিপুর, মোগলসরাই, বারাণসী।

ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—বালেশ্বর, কটক, দীনকানন, ফলচর, আদ্রগুর, বনরুন্দা, সম্বলপুর, শাদপুর, বোধ, অমরাগড়, ভাস্তাড়া, আকনা, চন্দননগর, চাঁচল, মোকামা।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন—ময়মনসিংহ, সেরপুর, জামালপুর, পিংনা, টাঙ্গাইল, ঈশানগঞ্জ, আঠারবাড়ী, আওড়, কিশোরগঞ্জ, জঙ্গলবাড়ী, বাজিতপুর, ইটনা, আজমিরিগঞ্জ, শ্রীহট্ট, বিথলং, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, আগরতলা, ঢাকা।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—দারজিলিং, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ।

ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল—বাঁকিপুর, আরা, কৈলিয়ার, গাজিপুর, মোগলসরাই, বারাণসী, মোকামা, ভাগলপুর, মঙ্গলগঞ্জ।

ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু—আরা, খগোল, মোগলসরাই, বারাণসী, লক্ষ্ণৌ কাণপুর, লাহোর, শক্কর, হায়দ্রাবাদ, সিন্ধু, করাচী।

ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত—মালদহ, আকনা, পুইনান, অমরপুর, চন্দননগর, চুঁচড়া।

ভাই বলদেব—ভাগলপুর, খটিয়ার, কুশবা।

ভ্রাতা লক্ষ্মণচন্দ্র পাণ্ডা—কটক, বালেশ্বর, সিঙ্কিয়া, অমরা, গুরুদা, ভিন্দিয়া, মুগর, হিগলিকান্দী, বসন্তিয়া, মকুন্দপুর, দলিয়াপুর, মচুন্দালী, গম্ভুক, দোরা, হুগলী, চুঁচড়া, ভাগলপুর, মুঙ্গের, বম্বে, পুনা, আহামেদনগর, নাসিক, ইন্দোর, করাচী, হায়দ্রাবাদ, সিন্ধু, লাহোর।

কলিকাতা ও মফঃস্বলস্থ ব্রাহ্মবন্ধুগণ যাঁহারা ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ অর্পিত হয়।

পশ্চাল্লিখিত স্থান সকল হইতে ব্রাহ্মবন্ধুগণ উৎসবে যোগ দান করিয়াছিলেন,—মুঙ্গের, আরা, দানাপুর, বাঁকিপুর, মোকামা, চুঁচড়া, চন্দননগর, অমরপুর, অমরাগড়ী ভাগলপুর, খুলনা, চট্টগ্রাম, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা, কুষ্টিয়া, মঙ্গলগঞ্জ, কাটিহার, গড় ভবানীপুর, খুটিলপুর, দুলিয়ান, বালেশ্বর, পুনা।

শুক্রবার ভাই অমৃতলাল বসুর গৃহে উপাসনাদি হয়। শনিবারে টাউনহলে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ইংরেজীতে বক্তৃতা দান করেন। বক্তৃতার বিষয় "ভারতে একটি ধর্ম্মসমাজের দৃষ্ট ব্যাপার।" বক্তৃতাস্থলে প্রায় সহস্রাধিক শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। রবিবার মন্দিরে উপাসনা। ভাই দীননাথ মজুমদার উপাসনার কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। আজ তিন বৎসর পর ভাই অমৃতলাল বসু মন্দিরে উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া সকলেই আনন্দিত হয়েন। উৎসবাদিনের সায়ঙ্কালে মন্দিরে যে ভয়ঙ্কর ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, তদ্দ্বারা নিপীড়িতহৃদয় হইয়া মণ্ডলীর মঙ্গলার্থ শান্তি ও প্রকৃত প্রত্যানয়ন জন্য তিনি যে উপায় ভগবানের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলেন, সকলের নিকটে তাহা জ্ঞাপন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি মন্দিরে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার সকরুণ প্রার্থনাতে সকলেরই হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল। তিনি যে উপায় ভগবানের নিকট শ্রবণ করিয়াছেন, সুখের বিষয় এই যে, তাঁহার ভাইগণও তাদৃশ উপায় ভগবানের নিকটে অবগত হইয়াছেন।

শ্রীদরবার, পরীবার ও মণ্ডলী এ তিনের একত্র সম্মিলন ভিন্ন কিছুতেই কল্যাণ নাই, ইহা অতীব সত্য। এ তিনের কোন একটির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া শান্তি প্রত্যানীত হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। নববিধানে কেহ কাহাকেও উপেক্ষা করিয়া কিছু করিবেন, তাহা সম্ভবপর নহে। এ কয়েক বৎসর ইহা বিলক্ষণরূপে সপ্রমাণিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইয়া মণ্ডলীর উপরে স্বীয় প্রভাব কেহ যেন বিস্তার করিতে প্রয়াস না পান, ভাই অমৃতলাল এ বিষয়ে সকলকে বিশেষরূপে সাবধান করিলেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত হইয়া কাহারও সামর্থ্য নাই যে নববিধানসমাজের উপরে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করেন ইহাও বিশিষ্টরূপে সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে। যদি কাহারও এ প্রকার দুর্ব্বুদ্ধি সমুপস্থিত হয়, সময়ে তাঁহার চৈতন্যোদয় হইবেই হইবে, ইহা আমরা একান্ত বিশ্বাস করি। আমাদিগের মণ্ডলীর মৃত্যু হয় নাই। মণ্ডলী যখন জীবিত আছে, তখন তাহার প্রাণভূত একত্বকে দলন করিয়া কাহার সাধ্য যে দণ্ডায়মান থাকিতে পারেন? যদি এত দিনেও কাহারও এ সম্বন্ধে সংশয় থাকে, তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখুন, কৃতকার্য্য হন কি না?

১৭ মাঘ সোমবার ভবানীপুরে প্রচার যাত্রা হয়। শিয়ালদহ হইতে ট্রামে করিয়া সকলে গমন করেন। সমুদায় পথে ট্রামে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে গিয়া ভবানীপুরে অবতরণ করেন। সেখান হইতে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে একটি সম্পন্ন গৃহস্থের গৃহে গিয়া সকলে সমুপস্থিত হয়েন। সেখানে কতক ক্ষণ সঙ্কীর্ত্তন হইয়া ভাই গৌরগোবিন্দরায়, দীননাথ মজুমদার ও রামচন্দ্র সিংহ উপস্থিত ব্যক্তিগণকে লক্ষ্য করিয়া কিছু কিছু বলেন। তৎপর তথা হইতে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে অনেক দূর ভ্রমণ করিয়া ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথের নবনির্ম্মিত বাসগৃহে সকলে উপস্থিত হন। সেখানে বিশেষ উপাসনা হয়।

১৮ মাঘ মঙ্গলবার যোগ, সংহিতাব্রত গ্রহণ ও উৎসবান্তসূচক প্রার্থনানন্তর সাধুশোণিতমাংসভোজনক্রিয়ায় উৎসব পরিসমাপ্ত হয়।

মেষদলের গৌরব কি?

পাশ্চাত্য গ্রন্থাবলীর অধিকাংশ স্থানে শান্ত দান্ত ধীর শুদ্ধ সদাশয় সাধুজীবনের সঙ্গে মেষকে উপমিত করা হইয়াছে। জন মহর্ষি ঈশাকে দর্শন করিয়াই স্বর্গীয় মেষশাবক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। মহর্ষি ঈশা স্বয়ং আপনাকে মেষপালক ও আপন অনুযায়ী শিষ্যবর্গকে মেষদল বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সকল পাঠ করিবামাত্র বোধহয় মেষদলের কোন বিশেষ গৌরব আছে। সেই গৌরব কি, অদ্য আমরা তাহার অনুসন্ধান করি[illegible]

মেষদিগের যে গৌরব [illegible] [illegible]ক্রান্ধ গৌরব নহে, তাহা তাহাদিগের [illegible]ত। তাহাদিগের গৌরবের প্রথম [illegible] দলে বাস করা। মেষ স্বভাবতই দল ভালবাসে এবং দলে অবস্থিতি করে। দলভ্রষ্ট হওয়া মেষের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। দলে থাকিলে লাভ, দল ছাড়িলে ক্ষতি, ইহা তাহারা বিচার করিতে জানে না, কিন্তু তাহাদিগের প্রকৃতির এমন এক আকর্ষণ আছে, যে সেই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া তাহারা দলবদ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না। বস্তুতঃ মেষেরা দলে থাকিয়া সুখী হয়। কিন্তু মেষদল মনুষ্য দলের ন্যায় নহে। কোন মেষ বিপন্ন হইলে, বৃক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে অন্য কাহারও নিকটে সাহায্য পাইবার আশা নাই। বরং অন্য সময়ে নিকটে থাকিলেও বিপৎকালে সকলে ভীত হইয়া পলায়ন করে। তবে দলের বল কি ও ফল কি? বল ও ফল দলে আছে। সে বল ও ফল পালকের দৃষ্টি। দলে থাকিলে পালকের দৃষ্টিতে থাকা যায়, সুতরাং ভয় বিপদ উপস্থিত হইলে অনায়াসে প্রতিকার হইতে পারে। দলভ্রষ্ট হইলে বহু মেষের

মধ্যে কোথাও একটি সরিয়া পড়িয়াছে, কি কি হইয়াছে, ইহা পালক সহসা নাও বুঝিতে পারেন, সুতরাং সেই অবসরে তাহার বুকের ভোজ্যসামগ্রীতে পরিণত হইবার সম্ভাবনা। আর দলে থাকিলে পালকের দৃষ্টি দলের উপরে সর্ব্বদা বিচরণ করিয়া ভয় বিপদ নিবারণ করে। এই জন্য মেষদল যূথবদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করে, ইহা মেষের স্বাভাবিক গৌরব। ধার্ম্মিক সাধু পুরুষেরাও এইরূপ দলপ্রিয়, এইজন্য তাঁহাদিগের সঙ্গে মেষজীবন উপমিত হইয়া থাকে।

মেষের দ্বিতীয় গুণ নির্ব্বিকার পবিত্র স্বভাব। মেষের জীবনে কোন প্রকার বিকার নাই। মেষ আপন হন্তার নিকটেও নীরব প্রশান্ত ভাবে অবস্থিতি করে। উগ্রতা, উদ্ধতা, বিরোধ ও বৈরভাব কি, মেষ তাহা জানে না। মেষ শঠতা ধূর্ত্ততা বোঝে না, প্রহার করিলে প্রতি-প্রহার করে না, এই জন্য মেষ সরল শান্ত দান্ত সাধুজীবনের দৃষ্টান্তস্বরূপ।

মেষের তৃতীয় গুণ প্রতিপালকের প্রতি বাধ্যতা ও বিশ্বস্ততা। মেষ আপন প্রতিপালকের বাধ্য অনুগত ও বিশ্বস্ত। মেষ কখন প্রতিপালকের ইঙ্গিত অতিক্রম করে না। প্রতিপালক যাহা খাইতে দেন মেষ তাহাই ভোজন করিয়া সুখী হয়, শয়ন উপবেশন যখন যেরূপ করিতে বলেন মেষ তাহাই করে। অপিচ বহু লোকের ভিতরেও মেষ আপনার প্রতিপালকের কণ্ঠস্বর বুঝিতে পারে, এবং তদনুসারে তাঁহাকে চিনিয়া লয় ও তাঁহার ইঙ্গিতানুসারে চলে। মেষ কখন ইহার অন্যথাচরণ করে না। সে কখন ভ্রান্ত হইয়া আপন প্রতিপালক পরিত্যাগ করিয়া অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করে না। ইহাও সুশীল সাধুজীবনের একটি বিশেষ লক্ষণ। মণ্ডলীবদ্ধ সাধুগণ মণ্ডলীর নেতা সাধু কিংবা ভক্তবৎসল ভগবানের আনুগত্য করিয়া কখন সাংসারিকতা বা কাম ক্রোধ লোভ মোহাদির অনুগত্য করেন না। তাঁহারা লোভের জন্য তুচ্ছ সংসারসুখের পশ্চাদগামী হইয়া কদাচ প্রবঞ্চিত হয়েন না। এই জন্য মণ্ডলীভুক্ত সাধকমণ্ডলী পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা একাকী জীবন যাপন করিতে ভয় পান। যিনি কোন মণ্ডলীভুক্ত লোক নহেন, কিংবা কোন আচার্য্য কি নেতার অধীনতা স্বীকার করেন না, তাঁহার সঙ্গে মেষজীবনের বড় অধিক সামঞ্জস্য দেখা যায় না, কিন্তু মণ্ডলীভুক্ত জনের সঙ্গে উহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য লক্ষিত হইয়া থাকে। মেষ দলপ্রিয় মণ্ডলীভুক্ত সাধকও দলপ্রিয়। মেষ নেতা বা প্রতিপালকের বাধ্য ও পরিচিত, মণ্ডলীভুক্ত সাধকও নেতা ভক্তের বিশেষ পরিচিত বিশ্বস্ত ও অনুগত। ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তের ভিতরে যে সকল শাসনপ্রণালী বিধি ও নিয়ম, মণ্ডলীর জন্য প্রকাশ করেন, মণ্ডলীভুক্ত সাধক, অবনত মস্তকে তাহা জীবনের সম্বল বলিয়া গ্রহণ করেন। মেষেরা নেতার প্রতি নির্ভর ও বিশ্বাস করে, তাঁহার কথায় কদাচ তাহারা সংশয় করিতে পারে না, ইষ্টানিষ্ট ফলাফল চিন্তা না করিয়া নেতার বাক্যের অনুসরণ করে, মণ্ডলীভুক্ত সাধুও সেইরূপ। মেষ যেমন নির্ব্বিকার নিরীহ, বিরোধ বৈরভাব হিংসা দ্বেষ অহঙ্কার জানে না মণ্ডলীভুক্ত সাধুও সেই রূপ হিংসা দ্বেষ স্বার্থ অভিমান ও অহঙ্কারপরিশূন্য। মেষগণ পান ভোজন শয়ন উপবেশন ও গমন প্রভৃতি সমুদয় ব্যাপার দল বদ্ধ হইয়া করে। কেহ স্বতন্ত্র রুচির অনুসরণ করিয়া আপনার জন্য বিশেষ পুষ্টিকর সুমিষ্ট খাদ্য মনোনীত করিয়া লয় না। তাহাদিগের নেতা প্রতিপালক যে পথ দিয়া যে মাঠে লইয়া যান, তাহারা সেই পথে সেই মাঠে যায়, তাহাতে কোন আপত্তি করে না। একই প্রকারের খাদ্য সকলের জন্য সংগৃহীত হয়, একই খাদ্য সকলে খাইয়া জীবন ধারণ করে। মেষদিগের জীবনের এই একত্র পান ভোজন শয়ন উপবেশন শ্রম ও বিশ্রাম অতি মনোহর দৃশ্য। এই জন্যই মণ্ডলীর কোন সাধুও ভক্তমণ্ডলী পরিত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে

জীবন যাপন করাকে কষ্টকর মনে করেন। খাদ্য যদি মন্দ হয় সকলেরই জন্য মন্দ হয়, যদি ভাল হয়, তাহাও সকলেরই জন্য হয়। বাসস্থান যদি অসাস্থ্যকর নিন্দনীয় হয় সকলেরই জন্য হয়, স্বাস্থ্যকর উৎকৃষ্ট বাসস্থান হইলেও সকলেরই জন্য হয়। মেষের ন্যায় মণ্ডলীভুক্ত সাধুজীবনেরও এ সকল প্রয়োজনীয় বস্তু তুল্য ভাবে সংগৃহীত ও প্রদত্ত হয় কোন ইতরবিশেষ হয় না।

কেহ বলিতে পারেন মেষ পশু, তাহার স্বার্থ পরার্থ বোধ নাই, আত্মানাত্ম বিচারশক্তি নাই, কিসে ইষ্ট কিসে অনিষ্ট তাহা সে বুঝিতে সমর্থ নহে, তাই ওরূপ করে। কিন্তু কেবল মেষই কি পশু? শৃগালও পশু, বৃকও পশু, ব্যাঘ্রও পশু। এ সকল পশু স্বার্থসাধনে মেষের ন্যায় নহে। ইহারা স্বার্থসাধনে মনুষ্য অপেক্ষা কিছু মাত্র ন্যূনকল্প নহে। সুতরাং মেষজাতিকে সমুদায় পশু অপেক্ষা শান্ত নিরীহ বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। বস্তুতও মেষের এ সকল গুণ অনুকরণীয় বলিয়াই সাধুজীবনের দৃষ্টান্ত স্থলে গৃহীত হইয়াছে। বৃক গোমায়ু প্রভৃতি পশু হইলেও তাহারা কদাচ আপন আপন বুদ্ধিচাতুর্য্য পরিত্যাগ করিয়া মেষের ন্যায় বাধ্যতা স্বীকার করে না। তাহাদিগের প্রতি সহস্র প্রকারে বিশ্বস্ততার নিদর্শন প্রদর্শিত হইলেও তাহারা নিজ নিজ বুদ্ধিমত্তার অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বস্ত হইতে পারে না। ভালবাসা বিনয় সৌজন্য ইহার কিছুতেই বৃক প্রভৃতি পশুর ধূর্ত্ততা অবরোধ করিয়া মেষত্ব আনয়ন করিতে সমর্থ নহে। এই জন্য উক্ত পশুদিগের প্রতিপালক নাই। কেন না প্রতিপালকের প্রতি আনুগত্য দেখাইতে তাহারা প্রস্তুত নহে, কিন্তু মেষ প্রতিপালকের প্রতি আনুগত্য ও বিশ্বাস দেখাইয়াছে, তাই তাহাদিগের প্রতিপালক আছে। যদি মেষেরাও বৃকের ন্যায় বিশ্বস্ততা ও নিরীহতা প্রদর্শন করিতে অসমর্থ ও অস্বীকৃত হইত, কেহ তাহাদের প্রতিপালক হইতে পারিত না। কাহার কাহার মনে পশুর সঙ্গে মনুষ্যজীবনের তুলনা অবমাননা বলিয়া বোধ হইতে পারে কেন না মেষ পশু, কিন্তু অল্পচিন্তা করিলেই বোঝা যায় যে, পশুত্বের সঙ্গে তুলনা করা হয় নাই কিন্তু মেষজীবনে যে দেবপ্রকৃতি নিহিত আছে তাহারই সঙ্গে তুলনা করা হইয়াছে। নম্রতা, বিনয় বাধ্যতা, নির্ভর প্রভৃতি সাধুজীবনের ভূষণ মেষ জীবনে আছে, চেষ্টায় নহে, যত্নে নহে আপনি আছে। স্বভাবতঃ মেষের যে সদ্গুণ আছে মানুষের স্বভাব এইরূপ হইলে মেষের সঙ্গে তুলিত হইতে পারে। মেষের সঙ্গে তুলিত হওয়া অবমাননার বিষয় নহে, কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়। আর মেষের সঙ্গে তুলিত হইয়া যদি মহর্ষি ঈশা অবমানিত না হইয়া থাকেন, তবে অন্যের অবমাননার বিষয় কি? পশুত্ব ত্যাগ করিয়া মেষত্ব লাভ করা চাই। মেষত্ব পশুত্ব নহে, কিন্তু দেবত্ব, তাই মেষজীবনের এত সমাদর, এত গৌরব। মানুষ যত দিন আপনাকে বড় বলিয়া, বুদ্ধিমান্ বলিয়া, ধার্ম্মিক বলিয়া অহঙ্কার করিবে, তত দিন মেষত্ব লাভ করিতে পারিবে না। মেষের চতুর্থ লক্ষণ নিরহঙ্কারিতা মূলক মৃদুভাব। এই মৃদুতা দাম্ভিকতা ও অভিমানের পরম শত্রু। যদি দৈবাৎ মেষদলে বৃক প্রবেশ করে, মেষের জীবনে আর সুখ শান্তি থাকে না। কেন না বৃক মেষরক্তপিপাসু হইয়াই দলে প্রবিষ্ট হয়, কেবল পালকের তীব্র দৃষ্টির জন্য পারিয়া ওঠে না। মেষের বেশে বৃক দলে প্রবেশ করিয়া কখন প্রচ্ছন্ন থাকিতে পারে না, পালকের নিকট অতি সহজেই ধরা পড়ে, কেন না বৃক কখন মেষ হইতে পারে না।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

মতভেদে সম্প্রদায়ভেদ অনিবার্য্য বলিয়া সকলেই মনে করেন। পৃথিবী আজ পর্য্যন্ত সম্প্রদায়ভেদ নিবারণ করিতে পারে নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্প্রদায়িকতা নিবারণ করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিল, কিন্তু লোকে দেখিতেছে, ব্রাহ্ম

ধর্ম্ম তাহার প্রতিজ্ঞা স্থির রাখিতে পারিল না। একই ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম এখন ভিন্ন ভিন্ন দলে ভিন্ন হইয়া পড়িতেছে। যদি মূলে বন্ধন দৃঢ় না থাকে, ইহা কত দলে ভিন্ন হইবে কে জানে? আমরা জানি মনুষ্যের যেরূপ স্বাধীন প্রকৃতি ও রুচি, তাহাতে দলে দলে ভিন্ন হইয়া পড়া নিবারিত হইতে পারে না। সমাজের কথা দূরে, এক গৃহে যত গুলি লোক একত্র বাস করে, রুচি ও প্রকৃতি অনুসারে তাহাদিগের মধ্যে যে ভিন্নতা প্রকাশ পায়, তাহাতে দুজন লোক এক নয়, ইহা স্পষ্টতঃ লক্ষিত হইয়া থাকে। এরূপ ভিন্নতা সত্ত্বে একত্র বাস এই জন্য হয় যে, গৃহের এক একটি লোক বাহিরের আর পাঁচটির সঙ্গে যোগ দিয়া স্বতন্ত্র দলে পরিণত হয় না, অমিলসত্ত্বে যে যে বিষয়ে মিল আছে, তাহা অবলম্বন করিয়া একত্র বাস করে। যেখানে গৃহবিচ্ছেদ ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে, সেখানে দশ ভাই ঠাঁই ঠাঁই হইয়া পড়ে। তাঁহারাই চতুর গৃহী যাঁহারা পরস্পরের মিলনের সাধারণ ভূমি আশ্রয় করিয়া এক গৃহে চির দিন বাস করেন। গৃহে একত্র বাস করিবার যে নিয়ম, সমাজে একত্র বাস করিবারও সেই নিয়ম। সাধারণ সম্মিলন-ভূমিতে একতা রাখিয়া এক সমাজে অবস্থিতি, ব্রাহ্মসমাজের ইহাই উপদেশ। এ উপদেশ কার্য্যে পরিণত হওয়ার পক্ষে প্রতিবন্ধক কি, আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায়, ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অনুচিত ব্যবহার। যে কারণেই হউক কোন এক ব্যক্তি যখন নিজমণ্ডলীর বন্ধুগণের মত ও বিশ্বাসের প্রতি উপেক্ষা করিয়া আপনি স্বতন্ত্র ভূমিতে দণ্ডায়মান হন, এবং নিজের শক্তি ও ক্ষমতার পরিচালনায় আর দশ জনকে সেই ভূমিতে আনয়ন করিতে যত্ন করেন, তখনই পার্থক্য সমুপস্থিত হয়। এইরূপ স্বতন্ত্র ভূমিতে দণ্ডায়মান ব্যক্তির ক্ষমতা ও সামর্থ্যের পরিমাণানুসারে নূতন দলসৃষ্টির সম্ভাবনা। মণ্ডলীর লোক সকলের যদি ঈদৃশ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকে যে, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ মণ্ডলী ছাড়িয়া কোন এক ব্যক্তির অনুসরণ করিবেন না, সকলে মিলিয়া যদি তাঁহার সঙ্গে একমত হইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গে এক ভূমিতে দণ্ডায়মান হইবেন, অন্যথা যিনি স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিলেন, তাঁহাকে এরূপ প্রয়াস প্রযত্ন অবলম্বন করিতে হইবে যাহাতে তিনি সমুদয় মণ্ডলীকে আপনার দিকে আনয়ন করিতে পারেন। মণ্ডলী ও ব্যক্তি যদি এইরূপ সম্বন্ধে পরস্পর সম্বদ্ধ হন, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন দলের উৎপত্তি নিবারণ হইতে পারে, অন্যথা উহা অনিবার্য্য। যিনি স্বতন্ত্র ভূমিতে দাঁড়াইলেন, তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা চাই যে, তিনি যত দিন মণ্ডলীকে আপনার করিয়া লইতে পারিতেছেন না, তত দিন মণ্ডলী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন না। ঈদৃশ যত্নে যদি তাঁহার সমুদায় জীবন ব্যয়িত হয়, তাহাতেও কিছু ক্ষতি নাই। কেন না এইরূপ যত্ন করিতে গিয়া তাঁহা হইতে যে সকল সত্য বাহির হইবে, তাহার মূল্য কখন বিনষ্ট হইবার নহে। মনুষ্যের ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা নির্ভর ও শান্তি এত অল্প যে, সে মণ্ডলীকে উপেক্ষা না করিয়া থাকিতে পারে না, যে কোন প্রকারের লোক লইয়া একটি দল গঠন করিয়া ফেলে। মণ্ডলী সুদৃঢ় মুষ্টিতে এরূপ দল গঠন নিবারণ করিতে গিয়া কৃতকার্য্য হন না। কেন না কোন ব্যক্তির স্বাধীনতার ক্রিয়া অবরুদ্ধ করিয়া রাখা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত নহে। যত দিন প্রতিব্যক্তি মণ্ডলী ত্যাগ করিয়া যাওয়া অধর্ম্ম মনে না করিবেন, মণ্ডলীকে স্বভূমিতে আনয়ন জন্য সমুদায় জীবন ব্যয় করিতে প্রস্তুত না হইবেন, তত দিন দলে দলে ভিন্ন হইয়া পড়া নিবারিত হইবার নহে।

আচার্য্য কর্ত্তৃক উপাসনা *।

সোমবার, ২৯ ভাদ্র, ১৭৯৭ শক।

উদ্বোধন।

দুঃখ বিপদের মধ্যে এক মাত্র সহায় যিনি, পাপ প্রলোভন হইতে বাঁচাইবার জন্য যিনি এক মাত্র সহায়, আমাদের কয় জনের পুরাতন পিতা, বন্ধু যিনি, আমরা তাঁহার নিকট উপস্থিত হই, বিনীত ভাবে তাঁহার পূজা করি। এমন কাঙ্গালের ঠাকুর আর পাইব না, এমন শীতল চরণ আর পাইব না। অতএব ভক্তির সহিত তাঁহার চরণতলে পড়িয়া থাকি। তিনি আমাদের হৃদয়ে ভক্তি, একাগ্রতা প্রেরণ করুন যেন আমাদের আর কোন উপায় নাই জানিয়া অনন্যগতি হইয়া প্রেম, ভক্তির সহিত তাঁহার পূজা করিতে পারি।

সঙ্গীত—"কর তাঁর নাম গান, যত দিন রহে দেহে প্রাণ।"

আরাধনা।

তুমি যে চক্ষুর চক্ষু, হে ঈশ্বর, যাহা দিয়া তোমাকে দেখিব তাহাই তুমি, তবে তোমাকে অতিক্রম করি কিরূপে, যে কথা কহিব, সেই কথার বল তুমি, তবে কিরূপে তোমাকে অস্বীকার করি। আমি যে বাঁচিয়া আছি তাহার কারণ তুমি। অন্তরে বাহিরে চারিদিকে তুমি রহিয়াছ, কোন দিকে আমি তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে পারি না। হৃদয়ের ভিতর দেখি সেখানে সমুদয় তোমাতে পরিপূর্ণ। অন্তরে বাহিরে যত কিছু দেখিলাম, সমুদয় তোমাতে বিলুপ্ত হইল। সংসার মিথ্যা, আমি মিথ্যা, তুমিই কেবল সত্য, তোমা ভিন্ন আর সত্য নাই। আমি আর তোমাকে স্বীকার করিব কি? যে স্বীকার করিবে, সে নিজেই মিথ্যা হইল। তুমিই প্রাণস্বরূপ, জীবনের জীবন!

---

* প্রায় এক মাস কাল উপাসনা কালীন সমুদায় উপাসনা লিখিত হইয়াছিল, আমরা মনে করিয়াছি ঐ গুলি ক্রমে প্রকাশ করিব। সং।

তুমি জ্ঞানস্বরূপ, সর্ব্বদর্শী, তোমার চক্ষুর নিকটে পড়িয়া আছি, ঐ চক্ষু কর্তৃক বিদ্ধ হইয়াছি, তোমার আলোকে আমার ভিতরে যাহা কিছু জঞ্জাল মলিনতা ছিল, প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এক একটি করিয়া সব পাপ বাহির করিয়া লইয়াছ। যত বার তোমার নিকট উপাসনায় আসিব তত বার তুমি এরূপে ধরিবে আর মারিবে? এই সংবাদ যদি পাপী পায় যে তোমার কাছে আসিবামাত্র তুমি তাহাকে ধরিবে আর বাঁধিয়া ফেলিবে, তবে কি আর সে তোমার নিকট আসিবে? এই যে হাত জোড় করিয়া বসিয়া আছি, এদিকে তাকাইলে না, তুমি প্রাণের ভিতর গিয়া সমুদয় পাপ দেখিয়া ফেলিলে। তুমি সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বসাক্ষী দেব।

অনন্ত অসীম তুমি, তোমার সীমা কোন দিকেই দেখিতে পাওয়া যায় না, যে দিকে ভাসিতে যাই না কেন, সকল দিক্ অকূল সাগর। পাপীর হৃদয় যে তোমার দৃষ্টিতে ক্ষত বিক্ষত হইল, তার পর যে একটু স্থির হইয়া বসিবে তাহার উপায় রাখিলে না। অসীম আকাশে তুমি কোথায় চলিয়া গেলে? হে প্রভু, হে প্রভু, বলিয়া চীৎকার করিল তোমার সাধক, তোমার উত্তর পাইল না। চন্দ্র সূর্য্য সকলেই তোমার চক্ষুর কাছে ক্ষুদ্র হইয়া পড়িয়া আছে। তোমাকে ধরিতে কেহ আর সাহস করে না, তুমি সকলের অতীত হইয়া অনন্ত আকাশকে তোমার ঘর বলিয়া স্থির করিয়াছ। বুদ্ধি তোমার কাছে যাইতে পারে না, হে দেব, তবে কি ফিরিয়া যাইব? কোথায় তুমি রহিলে, কোথায় আমি রহিলাম, আর যোগ কি তবে হইবে না, তুমি ভূমা, মহান্, অগম্য, অপার।

আনন্দময়, অমৃতস্বরূপ, শান্তিদাতা, পরিশ্রান্ত পথিকের এতক্ষণের পর আরাম স্থল হইল। চারিদিকে কষ্ট যন্ত্রণা পাইয়া এক্ষণে তোমার নিকটে আসিল। যে মুখ ভক্তেরা দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, সেই মুখ তুমি আমাদের কাছে প্রকাশ করিলে, তোমার কাছে যখন তোমার সাধকেরা দুঃখের কথা বলেন, তুমি বল, সন্তান, দুঃখ কর কেন, আমি যে আছি, তুমি কি জান না? কে বা এই পৃথিবীতে পাপ দুঃখ যন্ত্রণার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারিত, কে বা এই সংসারে আগুনে দগ্ধ হইয়া বাঁচিত, যদি সময়ে সময়ে তোমার সেই সুস্নিগ্ধ জ্যোৎস্না আমাদের মনকে পুলকিত না করিত। তোমার কাছে না বসিলে প্রাণ কিছুতেই শীতল হয় না। তাইত ভক্তেরা তোমাকে ছাড়িতে পারেন না। আহার, আমোদ সব পরিত্যাগ করিয়া, সর্ব্বত্যাগী হইয়া তোমারই কাছে তাঁহারা পড়িয়া থাকেন। হে সুখরাশি পরমেশ্বর, তুমিই আনন্দস্বরূপ।

মঙ্গলময়, সেই আনন্দটুকু জগৎকে দিবে বলে, তুমি সেই অমৃতের পাত্র লইয়া এই পৃথিবীতে আসিলে? যাহাদের বৃদ্ধপ্রপিতামহ আছে তাহারাও বলে আমরাও দেখিয়াছি ঈশ্বরের দয়ার উপমা নাই। হে পরমেশ্বর, তোমার কি এই ব্যবসায় হইল যে, বিনামূল্যে প্রেম বিক্রয় করিবে? যেচে যেচে দয়া বিতরণ কর কেন?—আবার নিজে বাড়ী এসে সাধাসাধি, এত বাড়াবাড়ী প্রেম কেন? যা রয় সয় তাই ভাল। আমরা পাঁচটি পাপী মরিয়া গেলামই বা? আমরা যত না আমাদিগকে ভালবাসি, তুমি আমাদিগকে তাহা অপেক্ষা অধিক গুণ ভাল বাস। আমরা মরিতে প্রস্তুত রহিয়াছি, নরকের দিকে দৌড়িতেছি, তুমি কেবল ঘাড় নাড়িতেছ, আর বলিতেছ উঁহু, ঐ দিকে যেও না। আমি বলি মরিলামই বা, তুমি বল আমার এত যত্নের একটি ছেলে কেন মরিবে? অসীম প্রেমের আধার, কাঙ্গালের ঠাকুর তুমি।

অদ্বিতীয় রাজা, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমার শাসনের অধীন। ইহা আর কাহারও নাম করে না। সকলের উপর তুমি বসিয়া আছ। জয় রাজাধিরাজ, জয় রাজাধিরাজ, ভোর না হইতে এই কথা উঠিল, দুই প্রহর রাত্রি হইল, তথাপি এই বন্দনা শেষ হয় না। পর্ব্বতও তানপুরা হাতে করিয়া তোমার নাম গান করে। হে রাজা, আর রাজা নাই, হে প্রভু, আর প্রভু নাই। তুমিই সর্ব্বাধিপতি একমেবাদ্বিতীয়ম্। পাপী তাপীদের এক মাত্র সম্বল, দীন দরিদ্রের এক মাত্র আশা ভরসা তুমি।

হে পুণ্যস্বরূপ, পাপী যাহা বলিবে তাহাই কি হইবে? সে যদি বলে আমি পুণ্যস্বরূপের কোলে গিয়া বসিব, তাই কি হবে? হবে বৈ কি। বাদ বিচার করিলে না। চণ্ডাল—কারও শরীরে কুষ্ঠ, কারও শরীর গলিয়া পচিয়া পড়িতেছে। পরমেশ্বর, একি বিচার তোমার, একটু প্রভেদ করিলে না? তোমার পুণ্য এরূপেই আসে, ব্রাহ্মণ শূদ্রের বিচার করে না। একেবারে পুণ্যের সাগরে, পুণ্যের আবর্ত্তে আমাদের সকলকে ফেলিয়া দিলে? দেবদুর্ল্লভ তোমার সহবাস, তারই ভিতর আজ আমরা ডুবিয়া রহিয়াছি। হে নির্ম্মল, নিষ্কলঙ্ক, স্বয়ং পুণ্য তুমি, তোমাকে আর পুণ্যবান্ কে বলিবে, নিজেই যে তুমি পুণ্য। আমরা তোমার শরণাগত হই, তোমার উপর নির্ভর করি। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় তুমি, অগতির গতি তুমি, অন্ধের চক্ষু তুমি, যার কিছু নাই তার রাশি রাশি সোণা রূপা তুমি। যারা নিরাশ, যাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাদের আরাম তুমি, এই পাপদগ্ধ জগতের উদ্ধারকর্ত্তা তুমি, তোমাকে নমস্কার করি।

ধ্যান।

আরাধনা অপেক্ষা আরও গভীর ব্যাপার সাধক চান। তিনি চান সকলকে ছাড়িয়া, সকলকে ভুলিয়া সেই রাজ্যে যাইবেন, সেখানে গোল নাই। তাঁহার ইচ্ছা সর্ব্বত্যাগী

হইয়া হৃদয়কাননের এক কোণে বসিয়া সেই অন্তরাত্মাকে সর্ব্বদা দর্শন করেন। তিনি ধ্যানের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছেন। তিনি একাকী গোপনে আপনার বন্ধুকে মনের কথা বলিতে ভালবাসেন, এই জন্য তাঁহার হৃদয় সংসার হইতে পলায়নের চেষ্টা পাইতেছে। কোথায় গুপ্ত উদ্যান, কোথায় গিরিগহ্বর, কোথায় হৃদয়নিকেতন অন্বেষণ করিয়া সাধক সেখানে বসিয়া তাঁহার পরমেশ্বরের ধ্যান করেন। ঢের যন্ত্রণা তাঁহার হৃদয়ের ভিতরে, হৃদয়বন্ধুকে বলিয়া সে সমুদায় দূর করিতে চাহেন, ঢের আনন্দ তাঁহার মনের ভিতরে, হৃদয়নাথের নিকট সে সকল প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন। ঈশ্বরও ভক্ত সাধকের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। তাঁহার কাছে গেলেই বলেন, এয়েছ? ভালই হয়েছে। কৃপাময় পরমেশ্বর আমাদিগকে একটি বার দেখা দিন, তাঁহার সহবাসে রাখিয়া আমাদের শরীর মন শুদ্ধ করুন!—

সঙ্গীত—"দয়াময় দীনবন্ধু দরিদ্রের দুঃখভঞ্জন।"—

প্রার্থনা।

দীনবন্ধু দয়াময় পরমেশ্বর, সাধকহৃদয়ভূষণ, পাপীর একমাত্র আশা ভরসা, তোমার সন্নিধানে সাধক আর কি প্রার্থনা করিবে? কঠোর সাধনে ফেলিয়াছ কি করিব, আরও কঠোর, গভীরতর সাধনে ফেল। বুঝিয়াছি, তুমি আমাকে ভালবাস, দয়াবান্ কি না তুমি। আমি গেলাম না তোমার ঘরে, তাই আমাকে লইয়া যাইতে তুমি আমার ঘরে আসিয়াছ। কি পাতকী আমি, তোমাকে ঘরের বাহিরে রাখিয়া দিয়াছি, আর কি না বলিতেছি, দাঁড়াও, আমি ঐ কাপড়খানা নিয়ে আসি, পয়সাটা নিয়ে আসি— আর তোমাকে দেখা দিতেছি না ভয়ে, সেই যে বাড়ীর ভিতর বসিয়াই আছি। তুমি বলিতেছ কবে আসিবে সে? তুমি আরও গভীরতর প্রেমে মত্ত করিবে। এই পৃথিবীতে সুখের আশা রাখিলে পুণ্য শান্তির আশা ত্যাগ করিতে হয়, সব দিক্ বজায় রাখিয়া কি তোমায় পাওয়া যায়, ব্যাকুলহৃদয় শিষ্যকে বল। হে গুরু, সব মিলাইয়া কি আমাদের মত লোক সুখ পাইতে পারে? আমি যদি তোমাকে চাই, আমার উচিত যে সব ছাড়িয়া তোমার কাছে থাকি। পৃথিবীর বন্ধুগণ প্রাণের বন্ধু হলেনই বা? তুমি বড়, না তাঁরা বড়, তুমি যে আমার সর্ব্বাগ্রগণ্য। আমি আরও তোমার ভিতরে যেতে চাই—আরও আরামের ভিতরে টানিয়া লইয়া যাও। বাড়ীর ভিতরের ঘরের আসনে বসে তোমার প্রেমে মত্ত হইয়া সকলে নৃত্য করিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু মনে করিলে কি হইবে? তুমি বলিতেছ, গোলেমালে কিছু হবে না, তাই ত বলি দীননাথ, বিরলে বসাইয়া তোমার প্রেমসুরা পান করাও। কাজ কি পাঁচ রকম সুখে? বৈরাগ্য যদি লইতে হইল বাদ সাদ দিয়ে আর কি হবে? মানুষ বুঝে না—সকলের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে কেন? তোমার মত সাধু আর এমন কে আছে? তবে অন্যের কাছে কেন যাব? তোমার কাছে যোল আনা সুখ। তোমার কাছে যোল আনা সুখ নেব আর বাকি যত ঐ প্রচারের হিসাবে সেই ছেঁড়া খাতায় জমা দেব। অনেক করে কুঁড়ে ঘরটি প্রস্তুত করেছি, চারিদিক্ ফুল গাছে সাজিয়েছি, পৃথিবীর সব ছেড়ে ছাদের উপরে পাঁচ হাত ভূমি নিয়েছি, এখানেও যদি সংসার আসিয়া বৈরাগ্যের ব্যাঘাত করে, আমি এমনই কেঁদে উঠ্‌ব যে সে কান্নায় তোমার স্বর্গের প্রাচীর ভেঙ্গে যাবে। পূর্ণ বৈরাগের জন্য এক জন আবেদন করিতেছে। তোমাকে যেমন ভাল লাগে আর কিছু তেমন ভাল লাগে না। কত পাপ করে এলাম তবু বেজার নও। যেমন তেমন অবস্থা হউক না, তোমায় কাছে পাইলেই হইল। বন্ধু যেমন জান্‌লা খুলে তাকাইয়া থাকে তেমনি তুমি কখন কোন্ কাঙ্গাল সন্তান আস্‌বে, নিরীক্ষণ করে আছ। পাঁচ জন কৌশল করে এসে যে তোমার জায়গায় উৎপাত করবে এ সহ্য হয় না—এ বেনামি অত্যাচার সহ্য করা যায় না। তোমার ভক্ত নাম নিয়ে এসে তপস্যার ব্যাঘাত করিবে এ সমুদয় সহ্য হয় না। তুমি দয়া করে এই দুই হাত স্থান দিয়েছ, সব কাপড় কেড়ে নিয়ে একটু বৈরাগ্য বস্ত্র দিয়েছ, সব খাওয়া বন্ধ করে একটু সামান্য বৈরাগ্যের অন্ন খাওয়াইতেছ, সব জায়গা ছাড়াইয়া এই একটু জায়গা দিয়াছ, এ টুকু তপস্যার স্থানে কেহ যেন বিঘ্ন কর্‌তে না পারে। আর হিসাব করে ধর্ম্ম করা চলে না। যদি পাগল হই স্বর্গে যাব, তোমার সঙ্গে দেখা হবে। আধখানা ধর্ম্মের নৌকা ডুবে গিয়েছে। যোল আনা হৃদয় না দিলে তোমার ধর্ম্ম হয় না, তোমার কর্ম্ম হয় না। এক বার শুক্‌ন, এক বার প্রেমিক, এক বার বিষয়ী, এক বার উদাসীন, সকালে সুন্দর মুখ, বিকালে ম্লান, এরা কেহ স্বর্গে যায় নি। বড় বড় সন্ন্যাসী বৈরাগী উপর থেকে ধাক্কা খেয়ে পালায়ে আস্‌ছে। ওঁদের ঐ দশা তবে আমাদের কি হবে? এই সরু রাস্তার ভিতর দিয়ে যাব, গুণে যোল আনা ভক্তি দিব। আধখানা বৈরাগী বৈরাগী কি? আধখানা প্রেমিক প্রেমিক কি? দুই পাঁচ আনা কম দিয়ে যে ফাঁকি দিয়ে যাব তা হবে না। যদি ঐ গাঁজাই খেতে হল, দম টেনে ধুঁয়ো ছাড়ব কেন? যদি ঐ সুরা পান করিতে হয় তবে একেবারে বেহুঁস হয়ে যাব। যদি সেই রক্ত দিতেই হল, তবে আর মরব বলে ভয় কি? মরে তবে ত আমি তোমার হব। ভাল বেসে বল্‌লে, ছেলে সব দাও, তবে তোমাকে সব দেব, এ আমার প্রাণে সহ্য হয় না। আমার সুখেচ্ছা আছে, সব দেওয়া হল না। আমি

এত ভক্তি করি, এত উপাসনা করি, এত গান করি হল না। পরমেশ্বর, মত্ততাই সার, সুরা পানে নেশাই সার। ঐ ওঁরা স্বর্গে যান; আর আমাদের লোক গুল ভদ্র সুসভ্য বৈরাগ্যের বেশ নিয়ে কেবল সংসার করে। আমার আফিস, আমার টেবিল, আমার কলম, আমার দোয়াৎ, আমার কাগজ, আমার কাপড়, আমার বিছানা সব তুমিই হও। দুখানা না আর থাকে, একখানা তুমি হও। আমার কাছে তুমি সেইরূপ হয়ে থাক—আমার বন্ধুদের কাছে তুমি সেইরূপ হয়ে থাক। দয়াময়, আমরা জানি তুমি মূর্ত্তি হয়ে এস না, কিন্তু তুমি আমাদের কাছে কখনও উপাসনা, কখনও রন্ধন, কখনও কার্য্য, কখনও আলাপ হয়ে এস। আমাদের রক্ত মাংস সব তুমি। আমাদের খাওয়া দাওয়া সব তুমি হও। নৈলে দুই নৌকায় পা দিয়া ডুবব। খুব প্রাণ ভরে আশীর্ব্বাদ কর—"তুই পাগল্ হ, তুই একেবারে স্বর্গে চলে যা।" এমনি একটি আশীর্ব্বাদ ধাঁ করে ফেলে দাও দেখি, তোমার স্বর্গে চলে যাই। এই আশীর্ব্বাদ কর নাথ, তোমার শ্রীচরণে এই প্রার্থনা।

সঙ্গীত—"দয়াময় তোমায় এই মিনতি করি হে, অন্য ধনে নাহি প্রয়োজন।"—

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার ১৯ বৈশাখ ১৭৯৮ শক।

ঈশ্বরকে মূর্ত্তির মধ্যে দর্শন করা, এবং ঈশ্বরকে কার্য্য করিতে দর্শন করা পুরাণ শাস্ত্রের মত। কোন্ মূর্ত্তির কেমন আকার প্রকার, কেমন লাবণ্য, এবং কোন্ দেবতা কি কি অলৌকিক কার্য্য করিয়াছেন, কখন কোন্ দুঃখীকে ধনী করিলেন, কোন্ রোগীকে সুস্থ করিলেন, ইত্যাদি পুরাণ শাস্ত্র। এ সকল লীলাবর্ণনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু পুরাণ হইতে সূক্ষ্ম পুরাণ, হে ব্রাহ্ম, তুমি উদ্ভাবন করিতে পার। ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়, এবং ঈশ্বর কার্য্য করেন, আমরা এই দুই-টিই মানি। এ দুই মতই এক মত। ঈশ্বরকে দেখিতে পাও কি না? এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা বলি, নিরাকারকে আমরা দেখিতে পাই। দ্বিতীয় প্রশ্ন ব্রহ্মকে দেখিতে পাও কোথায়? যোগ ধ্যানের সময় অন্তরের অন্তরে না সংসারের কার্য্য ক্ষেত্রে? বস্তুতঃ এই উভয় স্থলেই ঈশ্বর-দর্শন হয়। এক স্থির শান্ত, গম্ভীর ভাব যাহা দেখিয়া যোগীর মন মগ্ন হয়। আর এক, ঈশ্বর ব্যস্ত হইয়া সংসা-রের যাবতীয় কার্য্য সকল করিয়া দিতেছেন, সেখানে ভক্তের নয়ন তাঁহাকে দেখিয়া পুলকিত হয়। ব্রাহ্মদিগের শাস্ত্রে এই দুই প্রকার প্রকাশেরই ব্যাখ্যা হয়। এক হৃদ-য়ের মধ্যে কর্ম্ম-বিহীন, নিষ্ক্রিয় ঈশ্বর দর্শন, আর এক সংসা-রের কর্ত্তারূপে ঈশ্বর দর্শন। আমার গৃহে প্রাতঃকালে জল ছিল না, কিন্তু আমার ভৃত্য এখন দুইটি কলস জলে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, ইহা নাস্তিকের কথা। যিনি বলেন, এই জল ঈশ্বর সৃজন করিয়াছেন, ভৃত্য কেবল ইহা দ্বারা কলসী পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, তিনি মধ্য শ্রেণীর আস্তিক। যিনি যথার্থ যোগী ভক্ত, তিনি বলিবেন ঈশ্বর আমার জন্য স্বয়ং এই দুইটি কলস তাঁহার জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিয়া-ছেন। যদি অল্পবিশ্বাসী ব্রাহ্ম হও, তবে তুমিও পাষণ্ড-দিগের ন্যায় বলিবে ঈশ্বর জল সৃজন করেন; কিন্তু বাড়ীতে আনিয়া দেন না। যথার্থ ব্রহ্মভক্ত এই কথায় ব্যথিত হন। তিনি অবিশ্বাসীদিগের কথায় প্রতিবাদ করিয়া বলেন, আমি প্রাতঃকালে উঠিয়া দেখিলাম ব্রহ্ম স্বয়ং আমার তৃষ্ণা নিবা-রণ করিবার জন্য এবং আমার শরীর ধৌত করিবার জন্য, স্বহস্তে শীতল জলে এই দুইটি কলস পূর্ণ করিলেন। তিনি আরও বলেন, যোগাসনে বসিয়া অন্তরের মধ্যে যাঁহার গম্ভীর প্রশান্ত ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হই, সংসারের কার্য্য ক্ষেত্রে দেখি তিনিই পরিশ্রমী কর্ত্তা হইয়া জগদ্বাসীদিগের দুঃখ দূর করিতেছেন। ঈশ্বর অমুক সময়ে অমুক দেশে এই অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন, ইহা শুনিয়া আমরা মনো-হর গল্প বলিয়া অবিশ্বাস করি। কিন্তু প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমাদের ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের জন্য যে সকল সংসারের কার্য্য করেন তাহা দেখিলে কে পুরাণ শাস্ত্র অগ্রাহ্য করিতে পারে? আমাদের দেবতা যেমন গুণবান্ তেমনি রূপবান্, তেমনি আমাদের উপকার করেন, অথচ আকারবিহীন। আমার পুস্তকের প্রয়োজন হইল তিনি আনিয়া দিলেন, আমার ক্ষুধা হইল স্বয়ং তিনি অন্ন রন্ধন করিয়া তাহা আমাকে খাওয়াইবার জন্য আমার নিকটে লইয়া আসিলেন। নাস্তিক এই কথা বলে, বাল্য কালে জননী স্বহস্তে খাওয়াইয়া দিতেন, বয়স হইয়াছে পর নিজের হস্তে আহার করি। ভক্ত বলেন, আমার হস্তে আমার নিজের বল নাই। ঈশ্বর তাঁহার শক্তিতে রন্ধন করেন, এবং তাঁহার শক্তিতে আবার খাওয়াইয়া দেন। প্রত্যেক কার্য্য ঈশ্বর স্বহস্তে করেন। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত প্রতিদিন ঈশ্বর তোমার সংসারে বসিয়া তোমার জন্য সকল কার্য্য করেন, হে মূর্খ ব্রাহ্ম, যদি ভক্তিচক্ষুতে দেখিতে পাইতে তবে প্রেমাশ্রুতে বিগলিত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ জড়াইয়া ধরিতে। সংসারে একটি সামান্য কার্য্যও যদি ঈশ্বর স্বহস্তে না করেন মনুষ্যের নিশ্চিত মৃত্যু। অথচ মূর্খ ব্রাহ্ম বলে আমিই সকল করি। ব্রাহ্ম, যখন তুমি অন্তরে বাহিরে অন্ধকার দেখিয়া দুঃখে গ্লানিতে ক্রন্দন কর, তখন কে তোমার পরম বন্ধু হইয়া তোমার অশ্রু মোচন করেন। নিরাকার ব্রহ্ম তাঁহার নিরাকার হস্তে তোমার জন্য এত করেন, তুমি কি তাঁহাকে দেখিবে না? তিনিই

তোমার সংসারের কর্ত্তা। তিনিই তোমার স্ত্রী পুত্রাদিকে অন্ন বস্ত্র দেন, রোগের সময় ঔষধ দেন, স্বয়ং চিকিৎসক হইয়া চিকিৎসা করেন, লেখা পড়া শিখাইয়া দেন। তুমি অকর্ত্তা হইয়া দেখ, তিনিই তোমার প্রত্যেক কার্য্যের কর্ত্তা। ভক্তিচক্ষু খুলিয়া ঘরের ভিতর যাও, দেখিবে ঈশ্বর স্বয়ং তোমার ঘরের সমুদয় কার্য্য করিতেছেন। ঐ তোমার শয্যা আপনার হাত দিয়া প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন, তোমার জন্য অন্ন রন্ধন করিতেছেন, তোমার স্ত্রী পুত্রাদির জন্য স্বয়ং রন্ধন করিতেছেন। এই রূপ হৃদয়কে ভক্ত করিলে শরীর পবিত্র হইবে, মন স্নিগ্ধ হইবে। ব্রাহ্ম, এই ভাবে ঈশ্বরকে যোগের সময় দেখ এবং তাঁহাকে সংসারের কার্য্য করিতে দেখ, তাহা হইলে ঈশ্বরের দয়াতে বিশ্বাস করিয়া নির্ভয় এবং কৃতার্থ হইতে পারিবে।

রবিবার, ২৬ বৈশাখ, ১৭৯৮ শক।

কল্পনাসম্বন্ধে আরও দুই তিনটী কথা বলা যাইতে পারে। অনেকে মরিল কল্পনাজালে পড়িয়া। তাহারা সত্য কল্পনায় প্রভেদ কি বুঝিল না। কল্পনা ছাড়িবে চেষ্টা করিতে গিয়া কল্পনায় জড়িত হইল। অতএব সূক্ষ্মরূপে কল্পনাশাস্ত্র আলোচনা করা আবশ্যক। যদি সত্যকে ঠিক সত্য জানিতে পার তবে বাঁচিবে। অনেকে কল্পনা যাহা নয় তাহাকে কল্পনা জ্ঞান করিয়া মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। যথার্থ সত্যকে কল্পনা মনে করিলে অধর্ম্মে ডুবিবে। এই যে ধ্যানের সময় বলা হইল, যোগীরা আমাদিগকে কুপথ ছাড়িয়া তাঁহাদিগের পথে যাইতে ডাকিতেছেন, ইহা কি যথার্থ কথা না কল্পনা? আমি বলি যথার্থ কথা। হয় নিতান্ত জঘন্য মিথ্যা বলিয়া ইহা পরিত্যাগ কর, নতুবা ইহা সার অমূল্য সত্য বলিয়া সাধন কর। যোগীদিগের ইচ্ছা আমরা বাহিরে না যাই, তাঁহারা যেমন ভিতরের রাজ্যে গিয়া বাঁচিয়াছেন, সেইরূপ সকলেই অসার জগৎ ছাড়িয়া সার জগতে প্রবেশ করিয়া বাঁচিয়া যান। যোগীদিগের হৃদয়ে স্বভাবতঃ এই ইচ্ছা হইবেই হইবে। ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমি বলিব ঐ শুন যোগীরা আমাদিগকে ডাকিতেছেন। কোন্ দিক হইতে ডাকিতেছেন, কে কোন্ ভাষায়, সংস্কৃত কি ইংরাজী ভাষায় ডাকিতেছেন তাহা আমি বলিব না; কিন্তু নিশ্চয়ই ইহা অভ্রান্ত সত্য জানিয়া বলিব যে যোগীরা আমাদিগকে ডাকিতেছেন। তাঁহারা অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন তোমরা ঐ পথে যাইও না, এই পথে এস। অসার ছাড়িয়া আমরা সার রাজ্যে যাই যদি যোগীদিগের এই ইচ্ছা থাকে, তবে তাঁহারা আমাদিগকে ডাকিতেছেন ইহাতে আর ভ্রম নাই। এই হইল পর লোকবাসীদিগের কথা। ইহলোকের একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। পৃথিবীর কতক গুল লোক আমাদিগকে এই মন্দির ছাড়িয়া তাহাদিগের নিকট যাইবার জন্য ডাকিতেছে। কে ডাকিতেছে? ভারতসন্তানগণ। পৃথিবীর অধার্ম্মিক মনুষ্যগণ। মরুভূমিতে যাহারা জল পায় না, পাপতাপে যাহারা দগ্ধ, সেই দুঃখী ভাই, সেই দুঃখিনী ভগ্নীগণ ডাকিতেছে। কেহ কেহ বলিতে পারে, এ ভয়ানক কল্পনা। তাহারা বলিবে, কেহ তোমাদিগকে তোমাদের নাম করিয়া ডাকে নাই। তোমরা কেবল চিন্তাবিলোড়িত মস্তকে এই বলিয়া কল্পনা করিতেছ, বুঝি পৃথিবীর দুঃখীরা আমাদিগকে ডাকিতেছে। ব্রাহ্মগণ, ইহা কল্পনা নহে, ইহা যথার্থ কথা। দুঃখীদিগের দুঃখ মোচন করা উচিত ইহা যদি স্বীকার কর, তবে দুঃখীদিগের কোন প্রকার কাতর ধ্বনি শুনিবার জন্য আর প্রমাণের প্রয়োজন নাই। ভারতের এবং পৃথিবীর যেখানে সেখানে যত দুঃখী আছে, সকলে ডাকিতেছে। তাহাদের ভয়ানক রোলধ্বনি পর্ব্বতাদিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া ব্রাহ্মদিগের কাণে আসিতেছে। যদি বল আমাকে এক জনও ডাকে না। কোন সংবাদ পত্র বা পত্র দ্বারা কেহই আমাকে ডাকে নাই, কেন আমাকে মিথ্যা কথা দ্বারা বিরক্ত কর, তবে তুমি নিজেই মিথ্যাবাদী। সত্যপরায়ণ যদি হও, নিশ্চয় এই কথা বলিবে সন্তপ্ত মনুষ্য সকল আমাকে ডাকিতেছে। এই যে কথা আসিতেছে, ওগো ব্রাহ্মগণ, তোমরা এস আমাদের দুঃখ দূর কর, একথা কল্পনা নহে। যাহারা কল্পনাপরায়ণ তাহারা এই কথায় বিশ্বাস করে না। তাহারা কাণ পাতিয়া ইহা শুনে, অথচ বলে কিছুই শুনি না। পাছে এই কথা শুনিয়া নিজের স্বার্থ ছাড়িতে হয়, এই জন্য তাহারা সুখশয্যায় পড়িয়া ইহাকে কল্পনা মনে করে। ব্রাহ্ম, তুমি কি দেখিতেছ? কি শুনিতেছ? যেখানে সত্য নাই, যেখানে সুখ নাই, সেখানে সত্য এবং সুখ আছে কল্পনা করিলে, আর যেখানে সত্য, যেখানে সুখ, সেখান কেবলই মিথ্যা এবং দুঃখ মনে করিলে। সত্যকে সত্য বল। সুখপরায়ণ হইয়া জগতের দুঃখধ্বনিতে বধির হইও না। তুমি যদি প্রচারক হও, দুঃখীদিগের ক্রন্দন শ্রবণ কর। যে সুখপরায়ণ সে ভাইয়ের দুঃখ দেখিবে কেন? আপনার সুখের ঘর প্রস্তুত হইল তাহা দেখিয়াই সে মত্ত। আপনার পরিবারের প্রতিই সে আসক্ত, অসার আমোদেই সে উন্মত্ত। ধিক্ ব্রাহ্ম, তুমি জগতের আর্ত্তনাদ শুনিলে না। পৃথিবীর সমুদয় দুঃখীরা আমাদের প্রতিজনকে নাম করিয়া ডাকিতেছে। কেশব, নিকটে এস, আমাদের দুঃখ দূর কর। আমি যদি মানুষ হই, এই কথা অবশ্যই শুনিব, যদি মূঢ় এবং সুখ-পরায়ণ হই তবে ইহা শুনিব না। যেমন দুঃখীদিগের কথা শুনিব, তেমনি যোগীদের কথা শুনিব। যোগীরা যদি বলেন, কেশব, ছাড় সংসারের বেশ, পর যোগীর বেশ; তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া আমার গা চম্‌কিয়া উঠিবে। কি আশ্চর্য্য, পর

লোকবাসী যোগীদিগের এত চীৎকার, পৃথিবীর দুঃখীদিগের এত আর্ত্তনাদ, এত ডাকাডাকি, এত আঘাত, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে কেহ শুনিল না। ভ্রম দূর হও ব্রাহ্মসমাজ হইতে। সত্য, তুমি আসিয়া ব্রাহ্মসমাজে প্রতিষ্ঠিত হও।

ব্রহ্মমন্দিরে দুঃখকর ঘটনা।

নিম্নলিখিত পত্রিকা দুই খানি প্রকাশ করিবার জন্য ব্রহ্মমন্দিরের কার্য্যাধ্যক্ষ আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন. আমরা সাধারণের বিদিতার্থ নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়—

সশ্রদ্ধ নিবেদন—

বিগত ১৪ই মাঘ রবিবার উৎসব রজনীতে ব্রহ্মমন্দিরে যে হৃদয়বিদারক দুঃখজনক ঘটনা হইয়াছিল সেই ঘটনার মধ্যে আপনার নাম বিশেষরূপে সংশ্রুত, এ জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি যে, সে বিষয়ের স্বরূপ বৃত্তান্ত যাহা আপনি অবগত আছেন, এবং আপনা দ্বারা যাহা ঘটিয়াছে তাহা আমাকে জ্ঞাত করিবেন। উক্ত ঘটনা অবলম্বন করিয়া নানা স্থানে নানা প্রকার নিন্দা ও গ্লানিসূচক কথার রটনা হইতেছে, আমি লোকহিতের জন্য এবং ব্রাহ্মসমাজের কল্যাণের নিমিত্ত তাহার প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। অতএব আপনি তাহা শীঘ্র আমাকে জানাইয়া বাধিত করিবেন।

নিবেদক—

২৮ মাঘ, ১৮০৯ শ্রীরামচন্দ্র সিংহ।

ব্রহ্মমন্দিরের কার্য্যাধ্যক্ষ।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সিংহ ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়।

নমস্কার নিবেদন—

আপনার ২৮এ মাঘের পত্রের উত্তর আমি আগ্রহের সহিত প্রদান করিতেছি। উৎসবরাত্রে ব্রহ্মমন্দিরের শান্তিভঙ্গ যে সাধারণের বিশেষ দুঃখজনক ঘটনা তাহার সন্দেহ নাই। সেই ঘটনা অবলম্বন করিয়া সংবাদ পত্র সমূহে ও লোকমুখে নানা প্রকার কথা ও নিন্দা রটনা হইতেছে। আমাকে ও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে অবলম্বন করিয়াই সমস্ত ঘটনা আন্দোলিত হইতেছে, প্রকৃত কথা প্রকাশিত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য এবং আপনি তদ্বিষয়ে উদ্যোগী হইয়া আমাকে বিশেষ উপকৃত করিলেন। প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ দ্বারা আমি যদি লোকসমাজে নিন্দিত ও ঘৃণিত হই তাহাতে কিছু মাত্র ক্ষতি নাই। সত্যের জয় হউক, নববিধানের জয় হউক ইহাই আমার প্রার্থনা। অতএব আমি যাহা জ্ঞাত আছি এবং আমা কর্ত্তৃক যাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা বিবৃতরূপে লিখিতেছি।

প্রতাপ বাবু মহাশয় ঈশ্বরবার ও উপাসকমণ্ডলীর নির্দ্ধারণবিরোধে নিয়ম ভঙ্গ না করিয়া মন্দিরে সর্ব্বজনসমাহিত প্রণালী মতে উপাসনা করেন, ইহার জন্য কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতে উৎসবের পূর্ব্ব রাত্রি পর্য্যন্ত প্রেরিতগণ তাঁহাকে বার বার আগ্রহের সহিত অনুরোধ করিয়াছিলেন, এবং ইহাও বলা হইয়াছিল যে, বহু দূর দেশ হইতে যাত্রিগণ অনেক আশা করিয়া উৎসবক্ষেত্রে আসিয়াছেন যাহাতে তাঁহাদের মনঃক্ষুন্ন না হয় তাহাই তিনি করুন। কোন অনুরোধে কিছুই ফল হইল না সকলেই নিরাশ হইলেন।

উৎসবের দিন মধ্যাহ্ন কালে জনরব উঠিল এক জন প্রেরিত শ্রদ্ধেয় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে বলিয়া আসিয়াছেন যে তিনি সন্ধ্যাকালের উপাসনা নিজ প্রণালীমতে করিতে পারিবেন। যাঁহার নামে এই কথার রটনা হইল তিনি অস্বীকৃত হইলেন। রাত্রে শ্রদ্ধেয় ভাই দীননাথ মজুমদার মহাশয় বেদীর কার্য্য করিবেন ইহাই ধার্য্য হইল। প্রতাপ বাবুর নিকটেও এ সংবাদ দুই জন ব্রাহ্ম জানাইয়া আসিলেন।

মধ্যে মধ্যে প্রতাপ বাবুর গৃহ হইতে এক এক জন লোক আসিয়া এক একটী আশঙ্কাসূচক কথাই শুনাইতে লাগিলেন। সমস্ত কথা মিলাইয়া বুঝিলাম, রাত্রে একটী ভয়ানক ঘটনা অনিবার্য্য। সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বেই শুনিলাম, শ্রদ্ধেয় প্রতাপ বাবু এমন দল বল লইয়া যোগাড় করিয়া আসিতেছেন, যদ্দ্বারা তিনি বলপূর্ব্বক বেদী অধিকার করিয়া নিজ প্রণালী মত উপাসনা করিতে পারেন। কোন কোন সুরকসভ্য ইহার প্রধান উদ্যোগী, তাঁহারা বিশেষরূপে উহাঁর পক্ষ সমর্থন করিবেন।

কীর্ত্তন আরম্ভ হইল, আমিও সে সময় কীর্ত্তনের মধ্যে ছিলাম। হঠাৎ পার্শ্বে দৃষ্টি পড়িবামাত্র দেখিলাম শ্রীযুক্ত প্রতাপ বাবু বেদীতে উঠিবার সোপানের সম্মুখে বসিয়া আছেন। তাঁহার দক্ষিণে তাঁহার অনুগত এক জন উপবিষ্ট, তাঁহার বামে আর এক জন যষ্টি হস্তে দণ্ডায়মান, পশ্চাৎ দিকে তৎপক্ষের অপর কয়েক জন লোক বসিয়া আছেন। সমস্ত দিনের কথা মনে পড়িতে লাগিল, নিশ্চয় একটী দুর্ঘনা ঘটিবে বুঝিলাম, আর কীর্ত্তনে যোগ দিতে পারিলাম না, মনে নানা প্রকার চিন্তা আসিতে লাগিল। এক বার ভাবিলাম, যখনই উঠিতে যাইবেন তখনই বারণ করিব, আবার মনে হইল, যিনি আমায় সন্তানের ন্যায় স্নেহ করেন, যাঁহার নিকট কত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছি, যিনি আমাকে লইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া কত জ্ঞানোপদেশ দান করিয়াছেন, আমি ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশাবধি ১৪ ১৫ বৎসরের মধ্যে কি কলিকাতায় কি বিদেশে নীচ ভৃত্যের ন্যায় ইহাঁর যে প্রকার সেবা করিয়াছি এমন আচার্য্যদেবেরও করি নাই, নিজ প্রাণনাশের শঙ্কা স্থলেও পাছে সেবার ব্যাঘাত

হয় বলিয়া নিজ জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া অসম সাহসিক কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছি. এখন সেই ব্যক্তি বেদীর উপর বসিয়া ব্রহ্মোপসনা করিবেন অন্য কোন কার্য্য নহে, এ কার্য্যে আমি কখনই বাধা দিব না। বিশেষতঃ আমি ব্রহ্মমন্দিরের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার মধ্যাের পক্ষ হইতে একজন সভ্য মাত্র, কার্য্যাধ্যক্ষ উপস্থিত থাকিতে কোন দুর্ঘটনার জন্য আমি তত দায়ী নহি। অতএব আমি বাধা দিব না ইহাই স্থির করিয়া রাখিলাম। দাঁড়াইয়া কীর্ত্তন শুনিতেছি দেখি শ্রদ্ধেয় মহাশয় বেদীর মধ্য সোপানে আরোহণ করিয়াছেন। আমি পূর্ব্ব মত সত্ত্বেও আত্মবিস্মৃতের ন্যায় প্রবল আবেগে পরিচালিত হইয়া চমকিত ভাবে বেদীর দিকে উভয় হস্ত বাড়াইয়া বলিলাম "মহাশয় অনিয়ম হইতেছে।" এই সময় তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ভ্রাতা "এই ও" বলিয়া আমার হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করেন, যষ্টিধারী ভদ্র লোক যষ্টি প্রদর্শন করেন। প্রতাপ বাবু মহাশয় আমরা দিকে ফিরিয়া বলিলেন "প্রাণ কৃষ্ণ, তুমি কি বলিতেছ?" আমি আবার বলিলাম "আপনি অনিয়ম করিতেছেন, আপনার উপাসনা করিবার কথা নাই।" সেই সময় দক্ষিণ পার্শ্বে যে ভ্রাতা ছিলেন তিনি আমায় পুনরায় আকর্ষণ করিলেন। কীর্ত্তনের ভিতর হইতে একটি ভ্রাতা আসিয়া আমাকে ছাড়াইয়া লইয়া গেলেন। যখন পশ্চাৎ ফিরিলাম তখন পৃষ্ঠে একটী ঘুঁষা এবং একটি যষ্টির আঘাত পাইলাম। প্রতাপ বাবু বেদীর উপর উঠিলেন এবং তথায় বসিয়া হাসিতে লাগিলেন। আমি সে স্থানে আর না দাঁড়াইয়া সঙ্গীতের স্থানের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলাম। কিছু ক্ষণ পরে কীর্ত্তন বন্ধ হইলে কোন কোন ভাই প্রকাশ্যে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, যে শ্রদ্ধেয় মহাশয়ের চরণে ধরিয়া বলিতেছি তিনি যেন মন্দিরের প্রণালী অনুসারে কার্য্য করেন।

প্রতাপ বাবু মহাশয় উপাসনা না করিয়া লোকদিগের সহানুভূতি বাড়াইতে হয় তজ্জন্য বলিলেন, তিনি লাঞ্ছিত অপমানিত ও তাড়িত হইতেছেন, তাঁহার পৈতৃক ধন ঐশ্বর্য্য ব্রাহ্মসমাজে ব্যয় করিয়াছেন, তাঁহার দেহ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যে রুগ্ন ভগ্ন ও হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল কথার মধ্যে তিনি বলিলেন. "আমার এক ভাই আমায় গলাধাক্কা দিল।" এ কথা শ্রবণমাত্র অনেক লোক স্বভাবতঃ উত্তেজিত হইয়া ভয়ানক গোলযোগ করিয়া উঠিল, এবং প্রচারকমণ্ডলীর, বিরুদ্ধে নানা প্রকার অভদ্রোচিত কথা ব্যক্ত করিতে লাগিল। আমি উঠিয়া এ কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম "ইহা মিথ্যাকথা মিথ্যাকথা" একজন লোক উঠিয়া বলিলেন "আমি স্বচক্ষে গলাধাক্কা দিতে দেখিয়াছি।" শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপচন্দ্র কথাটী ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন, "গলধাক্কা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল।"

বেদীর উপর হইতে ব্রহ্মোপাসনার পরিবর্ত্তে, ঈশ্বরের দিকে মণ্ডলীকে আকর্ষণ করিবার পরিবর্ত্তে আত্মসহানুভূতির দিকে আকর্ষণ ও পরিষ্কার ভাষায় অযথার্থ কথা প্রচার হইল দেখিয়া আমি আর মন্দিরে দাঁড়াইতে পারিলাম না, তখনই চলিয়া আসিলাম। আমি শ্রদ্ধেয় ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছি তাহাতে বেদীর উপর উঠিবার পথে বাধা দেওয়া হইয়াছে ইহা আমারও বিশ্বাস, কিন্তু গলাধাক্কা বা বেদী হইতে আকর্ষণ করিয়া নামাইয়া আনা ইত্যাদি কথার কোন অর্থ নাই।

কলিকাতা। ২৯ এ মাঘ, ১৮০৯ শক। } আপনার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী— শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত

সংবাদ।

গত রবিবার ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল ব্রহ্মমন্দিরে বেদীর কার্য্য করিয়াছেন।

ভাই দীননাথ মজুমদার মেদিনীপুরে, ভাই কেদারনাথ দে ও ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গলগঞ্জে এবং ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় আপন প্রচারক্ষেত্র ঢাকা ও ভাই বলদেব ভগলপুরে গমন করিয়াছেন।

ভাই উমানাথ গুপ্ত উৎসবের প্রায় দুই মাস পূর্ব্ব হইতে প্রেরিতবর্গের মধ্যে প্রেম ও সম্মিলন স্থাপন করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি আগ্রহ ও অনুরাগের সহিত চেষ্টা করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি কষ্ট ও মনস্তাপ অল্প সহ্য করেন নাই। ইদানীং তিনি আপন জীবনে প্রেম উদারতা বৈরাগ্য বিনয় ও দীনতার বিশেষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবানের চরণে প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়া সকলকে পবিত্র প্রেমবন্ধনে বদ্ধ করিতে তিনি অলৌকিক উৎসাহসহকারে পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছেন। তাঁহার আশা ছিল যে এবারকার উৎসবে তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হইবে। উৎসবরজনীতে হৃদয় একান্ত আহত ও একেবারে আশা ভগ্ন হওয়াতে মনোদুঃখে তিনি ফকির বা বৈরাগীর বেশে গৃহের বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছেন। দিবাভাগে একতন্ত্রী বাজাইয়া বাড়ী২ শূন্যপদে প্রভুর নামগুণ গান করিয়া থাকেন. কখন কখন কোন কোন উদ্যানে যাইয়া স্তুতি করেন। দিবাতে প্রায়ই অন্নাহার হয় না। কোন গৃহস্থের আশ্রয়ে সচরাচর রাত্রি যাপন করেন। রজনীতে গৃহস্থেরা অতিথিভাবে খাদ্য উপহার যাহা প্রদান করেন, তিনি তাহা ভোজন করিয়া থাকেন। অঙ্গে শীত নিবারণোপযোগী স্থূল বস্ত্র নাই। শুনিলাম এই অবস্থায় এক দিন বাগানে নিশা যাপন করিয়াছিলেন। সেই রাত্রে ঝড় বৃষ্টি হওয়াতে শীতে অতিশয় ক্লেশ পাইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে প্রাতঃকালে এক বন্ধুর গৃহে উপস্থিত হন, সেখানে

উত্তাপ ভোগ করিয়া ও অঙ্গে লেপ জড়াইয়া কোনরূপে শীত নিবারণ করেন। পরে তথা হইতে চলিয়া যান। কয়েক দিন কলিকাতার বাহিরে কোন কোন পল্লীগ্রামে ভ্রমণ করিয়াছেন। এইক্ষণ কোথায় আছেন জানি না। নগরসঙ্কীর্ত্তনের দিন কলুটোলাস্থ আচার্য্যদেবের পৈতৃক ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং সেখানে সঙ্কীর্ত্তনে যোগদান ও প্রার্থনা করিয়া পুনর্ব্বার অন্তর্হিত হইয়াছেন। গৃহে ফিরিয়া প্রচারকবন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইবার জন্য অনেকে তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন তাহা সফল হয় নাই। তিনি নাকি আর কোঠা বাড়ীতে থাকিবেন না, পূর্ব্ববৎ আমাদের সঙ্গে মিলিত হইবেন না। শ্রদ্ধেয় বন্ধুর জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত ও চিন্তিত, তাঁহার পুত্র কন্যা এবং রোগজীর্ণ পত্নী শোকাকুল। বন্ধুর শরীরের যেরূপ অবস্থা তাহাতে অল্পাহার বা অনাহার এবং শীত কষ্ট সে শরীর যে কত দিন বহন করিতে পারিবে আমরা জানি না। যে পর্য্যন্ত মণ্ডলীর মধ্যে বিশেষ প্রেম ও সদ্ভাব না হয়, বোধ করি সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে আর আমরা ফিরিয়া পাইব না।

ভাই দীননাথ মজুমদার ও ভাই রামচন্দ্র সিংহ হইতে তাঁহাদের উপদেশের সার প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহা অসময়ে পাওয়াতে এবার প্রকাশিত হইতে পারিল না, আগামী-বারে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আছে।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, সিন্ধু-দেশের রহিগ্রামনিবাসী লালা ভেরুমল ঋণপরিশোধের জন্য আমাদিগকে এককালীন ৫০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

আমাদিগের প্রাচীন শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মভ্রাতা শ্রীযুক্ত কানাই-লাল পাইন মহাশয় উৎসবে পাঠের জন্য একটি প্রবন্ধ দেন। উহাতে ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান দুরবস্থা এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্মযোগ ভিন্ন উহা বিদূরিত হইবার নহে, ইহা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিয়া ব্রাহ্মসমাজের অগ্রণীগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন। ভরসা করি, প্রবন্ধটি আগামী তত্ত্ববোধিনীতে মুদ্রিত সকলে দেখিতে পাইবেন।

ব্রাহ্মসমাজের ও নাটকের ঋণ পরিশোধের জন্য নিম্ন লিখিত পত্র সকলকে লেখা হইতেছে। আশা করি, সকলে এ বিষয় সাধ্যানুরূপ সাহায্য করিবেন।

সবিনয় নিবেদন—

অনেক দিন হইতে প্রচারক পরিবারগণের ভরণপোষণ এবং অন্যান্য ব্যয়নির্ব্বাহে অর্থ অকুলান হেতু প্রায় ৭০০৲ টাকা ঋণ রহিয়াছে। তাহার উপর নব-বৃন্দাবননাটক অভিনয় জন্য যে নাটমন্দির প্রস্তুত হয় তাহাতে আরও প্রায় ৪০০৲ টাকা দেনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। মহাজনগণ এই সকল টাকা না পাইয়া বিশেষরূপে উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছেন। এই ঋণ-দায় হইতে মুক্তি লাভ করিবার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া আমরা আমাদিগের সমা-জের আরম্ভ হইতে বিশ বৎসর কাল মধ্যে যে সমস্ত ব্রহ্ম-সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন রচিত ও সংগৃহীত হইয়াছে সেই সকল একত্র ভাল কাগজে ও ভাল অক্ষরে মুদ্রিত করিয়া অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতেছি। আপনাকে বিশেষ অনুরোধ করি যে, আপনি কৃপা করিয়া নিজের এবং বন্ধুবান্ধবের জন্য   খানি পুস্তক নগদ মূল্যে ক্রয় করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে ঋণমুক্ত করিবার জন্য সহায়তা করেন।

ব্রহ্মসঙ্গীত সংকীর্ত্তন ১ম হইতে ৭ম ভাগ কাগজের মলাট ...
ঐ ঐ কাপড়ের মলাট ... ১।০
ব্রহ্মসঙ্গীত সংকীর্ত্তন ৮ম ভাগ কাগজের মলাট ... ৵০
ডাক মাশুল প্রতি খণ্ড ৵০ করিয়া—

কলিকাতা। ১লা ফেব্রুয়ারি ১৮৮৮।

সেবক
শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র
কার্য্যাধ্যক্ষ।

উড়িষ্যাদেশের অন্তর্গত ঢেনকানল রাজধানীতে একটি নববিধান সমাজ স্থাপিত হইয়াছে। ভাই নন্দলাল বন্দ্যো-পাধ্যায় সেখানে কয়েক দিন প্রচার করিয়াছেন। মহারাজ তাঁহাকে বিশেষ আদর সম্মান করিয়াছেন।

আমার অত্যন্ত শোকসন্তপ্তহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের প্রিয় বন্ধু কিশোরগঞ্জ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সেনের সহধর্ম্মিণী আমাদের প্রিয়তমা কন্যা তুল্যা একান্ত স্নেহপাত্রী কিশোরীমোহিনী বিগত ১লা মাঘ, অপরাহ্নে কলিকাতা নগরে ক্ষয়কাশরোগে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। তাঁহার বয়ঃক্রম ২৪ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। বাল্যকালহইতে তিনি আমাদের পরিবার মধ্যে থাকিয়া শিক্ষাদিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রায় সাত বৎসর হইল তাঁহার বিবাহ হইয়াছে, তিনি অবগণ্ড শিশু রাখিয়া গিয়াছেন, বিহারিলাল ধর্ম্মপরায়ণা সুশীলা ধর্ম্মপথ ও সংসার পথের এক মাত্র সহকারিণী সহধর্ম্মিণী হারাইয়া নিতান্ত শোকাকুল হইয়াছেন। কিশোরগঞ্জে অব-স্থান কালের কিশোরীমোহিনীর জীবন অনুকরণীয়। সাংসা-রিক অবস্থা একান্ত প্রতিকূলসত্ত্বেও তিনি পরিশ্রম সহিষ্ণুতা ও বিশ্বাস সহকারে গৃহধর্ম্ম সাধন করিয়া আপনার জীবনের উচ্চতা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং জীবনের শেষ কয়েক মাস কলিকাতার ভিক্টোরিয়া স্কুলের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য চালাই-য়াছেন। রোগশয্যায় জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত নিজের বিশ্বাস ও সহিষ্ণুতা অটল রাখিয়াছিলেন। দয়াময় ঈশ্বর সেই পরলোকগতা কন্যার আত্মাকে আপন শান্তিক্রোড়ে গ্রহণ করুন এবং তাঁহার শোক সন্তপ্ত স্বামীর মনে সান্ত্বনা দান করুন।

☞ এই পত্রিকা ৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্।
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে।

২৩ ভাগ।
৪ সংখ্যা।

১৬ই ফাল্গুন, সোমবার, ১৮০৯ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফঃস্বল ঐ ৩,

প্রার্থনা।

হে দীনবন্ধু হরি, তোমার লীলা কে বুঝিতে পারে? তুমি কখন কি অভিপ্রায়ে কি কর, কেহ কি তাহা নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ? আমরা তোমার লীলা বুঝিতে না পারিয়া অনেক সময়ে ঘোর অন্ধকারে নিপতিত হই। আমরা যখন মনে করি, আর আলোকের আশা নাই, অন্ধকারের ভিতরে যে প্রবেশ হইল, ইহা হইতে আর কখন উদ্ধার হইতে পারিব না, তুমি তখন আমাদিগের অবিশ্বাস দর্শন করিয়া হাসিতে থাক, এবং এখনও যে তুমি আমাদিগের বিশ্বাসের পাত্র হইতে পারিলে না ইহা দেখিয়া প্রেমের উপর আরও প্রেম প্রকাশ করিতে থাক। যাহারা শত বার তোমার প্রেমের নিদর্শন দেখিয়া বিশ্বাসী হইল না, তাহাদিগের প্রতি কেন যে উদাসীন হও না, আমরা কিছুই বলিতে পারি না। প্রেম ভিন্ন আর কিছু যদি তোমার স্বভাবে থাকিত, তাহা হইলে তুমি কখন আমাদিগের অবিশ্বাস ও অকৃতজ্ঞতা দেখিয়া প্রেমের বিপরীত ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারিতে না। আমরা এ জীবনে কেবল নিরবচ্ছিন্ন তোমার প্রেম দর্শন করিলাম, প্রেমদর্শন করিয়া আমাদিগের আশা বিশ্বাস কত দূর বাড়িল, আমরা কেবল তাহারই পরীক্ষা দিতে বাধ্য। যেখানে ভয় ও অন্ধকার উপস্থিত, সেখানে মাতৃক্রোড়স্থ শিশু কি ভয়ে অবসন্ন হয়? ভয় ও অন্ধকারের মধ্যে যদি তোমার মুখ দর্শন করিয়া আমরা হাসিতে না পারিলাম, কোথায় ভয় কোথায় অন্ধকার বলিয়া যদি অবিশ্বাসী পৃথিবীর বিশ্বাস উৎপাদন করিতে না পরিলাম, তবে তোমার প্রেমে আমাদিগের অটল বিশ্বাস কি প্রকারে সপ্রমাণ হইল? আমাদিগের মন তোমার প্রেমলীলার প্রতি এত দূর স্থির বিশ্বাসবান্ হউক যে, সে লীলার বিচ্ছেদ যেন এক নিমেষের জন্যও মনে না আইসে। সমুদায় পৃথিবী বিপর্য্যস্ত হইয়া যাউক, তথাপি আমাদিগের সম্বন্ধে তোমার বিচিত্র লীলা তন্মধ্যে চলিতেছে বিশ্বাস করিয়া যেন আমরা সর্ব্বদা নিশ্চিন্ত থাকি। হে দীনজনগতি, তুমি আমাদিগের সকল প্রকার অল্পবিশ্বাস নির্ব্বাণ করিয়া তোমার প্রেমে প্রমত্ত করিয়া দাও, এই তব পাদপদ্মে বিনীত ভিক্ষা।

নব সন্ন্যাস।

আমাদিগের দেশীয় শাস্ত্রে সন্ন্যাস সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া অবস্থিত। সন্ন্যাস প্রকৃতি-

বিরুদ্ধ নহে, ইহা অতীব স্বাভাবিক। সন্ন্যাস কাহাকে বলে? সন্ন্যাস শব্দের অর্থ কি? ঈশ্বরের হস্তে সমুদায় সম্যক্ সমর্পণ সন্ন্যাসের প্রকৃত অর্থ। শাস্ত্রে ঈশ্বরের হস্তে কর্ম্মফল সমর্পণকে সন্ন্যাস বলিয়া থাকে। সন্ন্যাসী হইলে এ দেশের লোকেরা সংসার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পথের ভিখারী হইয়া থাকে, ইহা কি যথার্থ শাস্ত্রসম্মত? যদি শাস্ত্রসম্মত হয়, তবে কেনই বা এ প্রকার অনুষ্ঠান হইত? এখন এই সন্ন্যাসধর্ম্ম কি আকারেই বা নব বিধানে প্রবিষ্ট হইয়াছে?

অতিপ্রাচীন কালে যোগানুরক্ত গৃহিগণ কর্ম্মফল ঈশ্বরের হস্তে রাখিয়া সর্ব্বপ্রকারের অনুষ্ঠান করিতেন। ইহাতে সন্ন্যাসের প্রকৃত তাৎপর্য্য তাঁহাদিগের জীবনে সাধিত হইত। আবার অনেকে গৃহসংসার পরিত্যাগ করিয়া উদাসীন হইয়া বাহির হইয়া যাইতেন। এ দুইয়ের মধ্যে আরম্ভে বস্তুতঃ প্রভেদ না থাকিলেও পরিশেষে মহান্ ভেদ উপস্থিত হইত। যাঁহারা গৃহে স্থিতি করিতেন, তাঁহারা কর্ম্মফল ত্যাগ করিতেন বটে, কিন্তু কখন কর্ম্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিতেন না। যাঁহারা গৃহ ত্যাগ করিতেন, তাঁহারা প্রথমাবস্থায় কতক দিন অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সকল স্থিরতর রাখিতেন, কিন্তু পরিশেষে আর ক্রিয়ার সঙ্গে তাঁহাদিগের কোন সম্বন্ধ থাকিত না, তাঁহারা অনিকেত হইয়া কেবল নানা দেশ নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন। পরিশেষে তাঁহাদিগের দেহ যখন পর্য্যটনাদিক্লেশবহনে অসমর্থ হইয়া পড়িত, তখন তাঁহারা অনশন প্রায়োপবেশন, ভৃগু আদি হইতে পতন বা অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা জীবন শেষ করিতেন। এরূপে মৃত্যু তাঁহারা পাপকর মনে করিতেন না, কেন না তাঁহারা মনে করিতেন, তাঁহারা শাস্ত্রের অনুবর্ত্তন করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিলেন।

কোন কোন শাস্ত্রে গৃহে স্থিতি, অথবা গৃহ হইতে প্রস্থান এ দুই সমতুল্যরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। উহাতে সাধকের চিত্তের অবস্থানুসারে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হইয়াছে, সুতরাং বন ও গৃহ এ দুইয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু সে সময়ের লোকাচার আলোচনা করিয়া দেখিলে প্রতীত হয়, গৃহিগণ উচ্চ সন্ন্যাসধর্ম্মাক্রান্ত হইলেও অন্যান্য গৃহস্থের ন্যায় বাস করিতেন বলিয়া তাঁহারা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসিগণের ন্যায় সাধারণের আদরপাত্র ছিলেন না। তবে যাঁহারা অসাধারণ ছিলেন, তাঁহারা গৃহে থাকিয়াও গৃহত্যাগিজনাপেক্ষাও সমধিক সম্মান লাভ করিতেন, ইহা স্বতন্ত্র কথা। গৃহে স্থিতি প্রচ্ছন্ন সন্ন্যাসিগণ লোকচক্ষুর অগোচর ছিলেন, সুতরাং গৃহস্থসন্ন্যাসী বলিয়া এ দেশে কেহ পরিগণিত হন নাই, যাঁহারা গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই সন্ন্যাসী বলিয়া গৃহীত হইয়াছেন। কালে এইরূপে সন্ন্যাস ও গৃহ ত্যাগ এক হইয়া পড়িয়াছে, এবং কর্ম্মফলত্যাগরূপ যথার্থ সন্ন্যাস লোকের দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়াছে।

আধুনিক সময়ে সন্ন্যাস ও গৃহত্যাগ এক হইয়াছে বলিয়াই মহাত্মা শ্রীচৈতন্যকে মস্তকমুণ্ডন করিয়া গৃহত্যাগী হইতে হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন, গৃহে স্থিতি করিলে তাঁহার ধর্ম্ম কেহই গ্রহণ করিবে না, তাই তিনি জীবের পরিত্রাণের অনুরোধে গৃহত্যাগী হইয়া সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইয়া গেলেন। এ দেশে সন্ন্যাসী হইয়া গৃহত্যাগ করার এমনই একটি আকর্ষণ আছে যে, আজ যদি সন্ন্যাসীর বেশে কেহ বাহির হইয়া যায়, তাহা হইলে শত লোক তাহার পশ্চাদ্গামী হয়। নববিধান সমুদায় ধর্ম্মের যথার্থ মূলতত্ত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন, সুতরাং লোকে আকৃষ্ট হইল বা না হইল তাহার দিকে দৃষ্টি না করিয়া ঠিক যাহা সন্ন্যাস তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। এই সন্ন্যাসের সঙ্গে ফলকামনাত্যাগ আছে, অথচ কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, প্রাচীন সন্ন্যাসে যে গৃহ ও কর্ম্মত্যাগ ছিল, তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে। কেন হই-

য়াছে, এক বার তাহার মূল অন্বেষণ করা যাউক।

সন্ন্যাসী কর্ম্মের ফল ঈশ্বরের হস্তে যদি সমর্পণ করিলেন তবে সময়ে কর্ম্ম পর্য্যন্ত কেন ত্যাগ করিবেন না? কর্ম্মফলত্যাগী সন্ন্যাসীর কর্ম্মানুষ্ঠান করিবার মূল কি যদি অন্বেষণ করা যায়, তবে দেখিতে পাওয়া যায়, কর্ম্মানুষ্ঠানের মূল ভগবদিচ্ছা। রাজর্ষি জনক চিরকাল বনে ঈশ্বরচিন্তানুধ্যানে কালযাপন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবানের আজ্ঞায় তাঁহাকে সে আগ্রহ ত্যাগ করিতে হইল, প্রকাণ্ড রাজ্যপালনরূপ বৃহৎ কর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহাকে নিয়ত প্রবৃত্ত রহিতে হইল। প্রহ্লাদাদি সকল-ভক্তসম্বন্ধেই ইহা ঘটিয়াছে। কর্ম্মের নিত্যতা-সম্বন্ধে প্রাচীন কালে মতদ্বৈধ ছিল, এবং আধুনিক সময়েও এ দেশের লোকের সংস্কার কর্ম্মের নিত্যতাপক্ষে বিরোধী। যোগাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মের নিত্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, কিন্তু ব্যাখ্যাতৃগণের হাতে পড়িয়া তাঁহার সে মত প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এ সম্বন্ধে মহর্ষি ঈশা নূতন যুগ উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি যে দিন বলিলেন, "আমার পিতা এখনও কার্য্য করিতেছেন আমি কার্য্য করিব না?" সেই দিন ঈশ্বরের নিত্য কর্ম্মশীলতার সহিত জীবের নিত্য-কর্ম্মশীলত্ব সমুপস্থিত হইল। ঈশ্বরকে শক্তি বলিলে, শক্তি ও ক্রিয়া এবং তাহার নিত্যতা যেমন তখনই প্রতীত হয়, তেমনই জীবের জীবশক্তি সহকারে নিত্যক্রিয়াশীলত্ব প্রতীত না হইয়া থাকিতে পারে না। ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরতি নাই, জীবের তদনুসরণে বিরতি হইবে কি প্রকারে? ধ্যান চিন্তন পরসেবা প্রভৃতি সমুদায় ক্রিয়ার অন্তর্গত, সুতরাং নিত্যক্রিয়াশীলত্ব চির কাল স্বভাবের মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

নবসন্ন্যাসধর্ম্মে কর্ম্মত্যাগ নাই, ইহা মানা সহজ হইল, কিন্তু গৃহত্যাগ নাই, এ কথা সকলের মনে প্রতিভাত হওয়া সহজ ব্যাপার নহে? নবসন্ন্যাসে গৃহত্যাগ অধর্ম্ম কি না এই প্রশ্ন কোন না কোন সময়ে উপস্থিত হইবেই হইবে? গৃহত্যাগ যদি অধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি কি প্রকারে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রাচীন সন্ন্যাস ও নবসন্ন্যাস এ দুইয়ের পার্থক্য সুস্পষ্ট সকলে দেখিতে পাইবেন। প্রাচীন কালে পত্নীকে সহধর্ম্মিণী বলা হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সহধর্ম্মিণীত্ব যজ্ঞাদিক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠানের সঙ্গিনী বলিয়া, উচ্চতম অধ্যাত্ম যোগধর্ম্মের সঙ্গিনী বলিয়া নহে। অসাধারণ নরনারীসম্বন্ধে যোগধর্ম্মেও সঙ্গিনীত্ব দেখা যায়, কিন্তু সাধারণ শাস্ত্রীয় বিধি যজ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্গিনীত্ব জন্য। শ্রীচৈতন্য প্রভৃতির সময়ে পত্নীগণকে যোগধর্ম্মের সঙ্গিনী করিয়া লইবার বিধান সমুপস্থিত হয় নাই, তাই তাঁহাদিগের গৃহত্যাগ অধর্ম্মমধ্যে গণ্য হইতে পারে না, কিন্তু নববিধানে যদি ব্যবস্থাপিত হইয়া থাকে, পতিকে পত্নী সহ অধ্যাত্মবিবাহে ক্রমে উন্নত হইতে উন্নত সোপানে আরোহণ করিতে হইবে, তাহা হইলে গৃহস্থ কোন কালে প্রাচীন সন্ন্যাসোচিত পরিব্রজ্যা অবলম্বন করিতে পারেন না, করিলে তাঁহাকে বিধানের বিরোধে স্বেচ্ছাচারের পথে গমন করিতে হয়। নববিধান পতিপত্নী উভয়কে সন্ন্যাসধর্ম্মে প্রবিষ্ট করিয়া এই ধর্ম্মকে অতীব নবীন করিয়া তুলিয়াছেন, এবং এই নবীনত্বেই উহাঁর যথার্থ গৌরব। যিনি কখন বিবাহ করেন নাই, তিনি মণ্ডলীর সঙ্গে বিবাহসূত্রে বদ্ধ, সুতরাং জনসমাজত্যাগ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। যাঁহার পত্নীর শরীরসম্বন্ধে বিয়োগ হইয়াছে, তিনি অধ্যাত্মযোগে তাঁহার সঙ্গে এবং মণ্ডলীর সঙ্গে আবদ্ধ, সুতরাং এ নবসন্ন্যাসের বিধি হইতে কেহই আপনাকে প্রমুক্ত করিতে পারেন না। ধন্য নববিধান, যিনি এই প্রকার "নবসন্ন্যাসধর্ম্ম" প্রতিষ্ঠিত করিয়া জনমণ্ডলীর মধ্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন।

চারিটী অবস্থা।

মানুষের জীবন আলোচনা করিলে তাহাতে ক্রমান্বয়ে চারিটী অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। এই চারিটী অবস্থা হইতে ক্রমে চারি প্রকারের ভাবের অভ্যুদয় হইয়া থাকে। যথা জড়-ভাব, পশুভাব, মানবীয় ভাব ও দেবভাব। যে অবস্থাতে সুখদুঃখাদির বোধ থাকে না তাহাকে জড়াবস্থা বলা যায়। যে অবস্থাতে সুখদুঃখাদির বোধ জন্মে, কিন্তু ন্যায় অন্যায়, সত্য মিথ্যা, ঈশ্বর পরলোক ইত্যাদি বোধ থাকে না, তাহাকে পশুভাব বলা যায়। যে অবস্থায় সুখ দুঃখ হিতাহিত, ন্যায় অন্যায়, সত্য মিথ্যা, ঈশ্বর পরলোক বোধ জন্মে, কিন্তু দেবত্বের মর্য্যাদাতে আসক্তি অনুরাগ জন্মে না, তাহা মানবীয় অবস্থা। যে অবস্থাতে দেবত্বের প্রতি অনুরাগ জন্মে, তাহাকে দেবভাব বলা যায়। মনুষ্যেতে ক্রমান্বয়ে এই ভাবচতুষ্টয়ের রাজত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্য যখন জননীগর্ভে ভ্রূণাবস্থায় অবস্থিতি করে, তৎকালে তাহার সুখদুঃখাদির বোধ থাকে না, সেই অচেতন অবস্থাকে জড় ভাব বলা যায়। তৎপর সে যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন তাহার দুঃখাদির বোধ জন্মে, কিন্তু হিতাহিত, ন্যায় অন্যায়, সত্য মিথ্যা ঈশ্বর পরলোক ইত্যাদি বুঝিতে পারে না। তৎপর কৈশোর বয়স হইতে ক্রমে ক্রমে ইষ্টা-নিষ্ট ন্যায় অন্যায় প্রভৃতি বিচার করিতে তাহার সামর্থ্য জন্মে, এবং এই সামর্থ্য হইতেই তাহার মনে দেবত্বের প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত হইতে থাকে।

এই যে ক্রমোন্নতির অবস্থা, এক সোপান হইতে ক্রমে অন্য সোপানে পদনিক্ষেপ করিবার অধিকার, ইহা মনুষ্যব্যতীত অন্য কাহার নাই। কেবল মনুষ্যই জড়ত্ব হইতে পশুত্বে, পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বে, মনুষ্যত্ব হইতে ক্রমে দেবত্বে আরোহণ করিতে পারে ও করে। ইহা মনুষ্যজীবনের প্রাকৃতিক উন্নতি। যেরূপ উপরে ক্রমোন্নতি প্রদর্শিত হইল তাহাতে বোধ হয়, যেন মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করিয়া জড়ত্ব ও পশুত্বের সঙ্গে সম্বন্ধবর্জ্জিত হয়, বস্তুতঃ তাহা নহে। সহসা একেবারে মানুষের পশুত্বমোচন হয় না। জড়তা ও পশুত্ববর্জ্জিত হইতে হইলে সাধন চাই। "সাধন বিনা সে ধন মিলে না" এ কথা বলি কেন শোন। যখন জড়ত্ব হইতে পশুত্ব জন্মে, তখন জড়ীয় ভাব তিরোহিত হয় না, কিন্তু জড়ত্বেই পশুত্বের প্রকাশ হয়। আবার পশুত্বেই মানবত্ব সমাবিষ্ট হয়, সুতরাং পশুত্ব-মোচন হয় না। আবার যখন দেবত্ব সমাগত হয়, তখনও পূর্ব্বকথিত ভাবত্রয় থাকে, তাহা-রই মধ্যে দেবত্বের প্রকাশ হয় মাত্র। এই জন্য জড়ত্ব ও পশুত্ব হইতে বিমুক্ত হইতে চাহিলে সাধন চাই, বিনা সাধনে পশুত্ব হইতে মুক্তি-লাভের আশা নাই। এ স্থলে একটি বিষয় ভাবিলে মনে বিস্ময় জন্মে। সে বিষয়টি এই—জড় বস্তুর সুখদুঃখাদি বোধ নাই, সুতরাং দুঃখের প্রতি বিরাগ সুখের প্রতি অনুরাগও নাই। সুখদুঃখে অনুরাগ বিরাগ নাই সুতরাং তজ্জন্য চেষ্টাও নাই। কাজেই জড় চেষ্টা করিয়া জড়ত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে না। পশুর সুখদুঃখবোধ আছে, কিন্তু তমোগুণ-সম্ভূত ইন্দ্রিয়াকর্ষণে তাহারা এমত আকৃষ্ট যে, তাহা হইতে আত্মমোচনকরাকে তাহারা দুঃখ বৈ সুখ বলিয়া কখন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। কাজেই যাহা দুঃখ নহে, প্রত্যুত সুখ বলিয়া জানে, তাহা হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা হওয়া অসম্ভব। বিশেষতঃ সত্য মিথ্যা, ন্যায় অন্যায়, ইষ্টানিষ্ট বিষয়ে বিচারশক্তি না থাকাতে তাহারা অন্ধকার হইতে বাহির হইতে অসমর্থ। কিন্তু যখন মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করে, তখন হিতাহিত, সত্য মিথ্যা, দেবত্ব আসুরিকতা ইত্যাদি কিরূপ, তাহার মর্য্যাদা কি, সমুদয় বুঝিতে পারে। সুতরাং এই অবস্থায় জড়ত্বের অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া অবস্থিতি করা অসম্ভব। দুঃখের দুঃখজনকতা বোধ হইলে চেষ্টাশীল মনুষ্য তাহা

অতিক্রম করিতে সযত্ন না হইয়া থাকিতে পারে না। আসুরিক ভাবের নিকৃষ্টতা ও দেবত্বের গৌরব মনে প্রতিভাত হইলে একের প্রতি হেয়ত্ব বোধ অন্যের প্রতি সমাদর স্বভাবতই উপস্থিত হয়, সুতরাং মনুষ্য তখন জড়ত্ব, পশুপাশ ও মানবীয় স্বার্থময় নীচতার বন্ধন ছেদন করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ হয়। মনুষ্য এই স্থানে সমাগত হইয়া সহজেই দেবত্বলাভে সমর্থ হইতে পারিবে বলিয়াই ভগবান তাহাকে এই ক্রমোন্নতির অবস্থা দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু মানুষ তাহা করে না।

মানুষ বাল্যজীবনে যে জড়তা, অন্ধকার ও পশুত্বের প্রলোভনে নিপতিত ছিল, যৌবনেও সেই স্থানে সেই ভাবেই অবস্থিতি করে, কিন্তু বলপূর্ব্বক তাহা অতিক্রম করিতে আর যত্নপরায়ণ হয় না। সে কালও পশু, আজও পশু। বিশেষতঃ সদ্গুরু ও সাধুসঙ্গরূপ সদুপায় যাহারা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সমুদয় দেবত্ব ও পশুত্বের উচ্চনীচতা বুঝিতে পারিয়াছে, তাহাদিগের যদি জড়তা ও পশুত্ব বিমোচিত না হয় তবে বড়ই দুঃখের কথা। এই সকল পশু, মহাপশু নামে পরিচিত। কেন না ইহারা মর্য্যাদা বুঝিয়াও দেবত্বের প্রতি অনাদর করে এবং দুর্গতি বুঝিয়াও নরকে থাকিতে ভাল বাসে। ইহাদিগের জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানবলে অপরকে তিরস্কার করিবার সময়ে পশুবলমিশ্রিত অনেক জ্ঞানের কথা, ভাবের কথা বলিতে পারে, কিন্তু স্বয়ং চিরকাল পশুবলের অধীন হইয়া অন্ধকারে অবস্থিতি করিবে। যদি অন্য কোন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি ইহাদিগের চরিত্রের বিরুদ্ধে, প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কিংবা ব্যবহারের বিরুদ্ধে কিছু বলে, তাহা হইলে ইহাদিগের ভিতর হইতে ক্রোধরূপী মৃগরাজ গর্জ্জন করিয়া বহির্গত হয়। চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, হস্ত পদ কাঁপিতে থাকে, এবং নানা প্রকার সম্বন্ধ বর্জ্জিত ভাষা ভাষিত হইতে থাকে। ইহারা স্বয়ং স্বজীবনের দুর্গতি দেখে না, কেহ দেখাইলেও তাহা গ্রাহ্য করে না। কেবল ইহাই নহে, এ অবস্থাতে মানুষ সাধুদিগের সাধুতাতেও বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক সমাদর করিতে পারে না।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাধনবলে পশুত্বাদি দুর্গতির অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ করা যায়, সেই সাধন কি, জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল জন্মিতে পারে, এই জন্য পশুত্বমোচনের সাধনপ্রণালী বলা যাইতেছে। যখন কোন জীবনে মনুষ্যত্ব প্রকাশিত হয়, তখন সে ব্যক্তি স্বর্গ এবং নরকের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করে। ইহা স্বর্গও নহে, নরকও নহে, কিন্তু এ স্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া দর্শন করিলে স্বর্গ ও নরক উভয়ই দেখিতে পায়। সুতরাং স্বর্গের উপাদেয়ত্ব ও নরকের হেয়ত্ব, স্বর্গের সদ্গতি ও নরকের দুর্গতি, স্বর্গের সুখ ও নরকের দুঃখ অতি সহজেই বোধগম্য হয়। এই রূপ বোধ জন্মিলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখমোচনের চেষ্টা হওয়া স্বাভাবিক। এই সময়ে জড়তা আসিয়া চেষ্টা উদ্যমে বাধা জন্মায় এবং পশুত্ব আসিয়া বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে, আবার মানবীয় স্বার্থ ও অহঙ্কার উদিত হইয়া ত্যাগ স্বীকার করিতে বারণ করে। অতএব প্রযত্নপরায়ণ হইয়া এই বিবিধ প্রতিবন্ধকের মূলচ্ছেদ করা অতীব কর্ত্তব্য।

যখন আলস্য, নিরুৎসাহ, অবসাদ ইত্যাদি জীবনে স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে, তখন পাপ কুপ্রবৃত্তির প্রতিকারের প্রতি উপেক্ষা জন্মে। এ স্থলে সত্বরতাই পরম উপায় বলিয়া গ্রাহ্য। যেমন নিদ্রাবিষ্ট ব্যক্তির গৃহে অগ্নি লাগিলে, সত্বরতাই তাহার প্রাণ রক্ষার উপায়, সেইরূপ যখন পাপের প্রতি উপেক্ষা জন্মে তখন সত্বরভাব অবলম্বন করাই তাহার মহৌষধ। যাই জানিতে পারিলে, ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ভোগের প্রতি প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করিতেছে, অমনি মনোমধ্যে বিষয়ভোগজনিত দুর্গতি, মালিন্য ও ভোগসুখের ক্ষণভঙ্গুরতা চিন্তা করিতে থাকিবে।

চিন্তা করিতে করিতে বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা সহজেই উদিত হইবে। এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সময়ে যদি মানবীয় স্বার্থ অহঙ্কার প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া বাধা জন্মায়, তখন দেবত্বের রমণীয়তা, অবিনশ্বরতা, এবং নিরাপদ অবস্থা পুনঃ পুনঃ চিন্তা করা আবশ্যক। এই উভয়বিধ চিন্তা দ্বারা একের ত্যাগ অন্যের গ্রহণ আপনি জীবনে সুসম্পন্ন হইতে থাকে। প্রত্যেক মনুষ্যজীবনে সঙ্কলন ও ব্যবকলনের প্রণালী আছে। তদনুসারে দুঃখ ত্যাগ করিয়া সুখ সংগ্রহ করিবার জন্য চেষ্টা সকলেরই হইতে পারে। জড় ও পশু আপনার অবস্থা অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে, কারণ তাহাদের সঙ্কলন ও ব্যবকলনের ক্ষমতা নাই। জড়ের চেতনা নাই, পশুর চেতনা থাকিলেও বিচার করিবার অধিকার নাই বলিয়া সে চেতনা নামের যোগ্য নহে। মনুষ্য বিচারশক্তিসম্পন্ন। যে কোন বিষয় হউক তৎপ্রতি মনোযোগ দিয়া সচেতনভাবে তাহারা তাহার ইষ্টানিষ্ট ফল চিন্তা করিতে পারে, অনিষ্টাংশ পরিহার ও ইষ্টাংশ গ্রহণ করিতে পারে, নিরুৎসাহ গ্লানি ও অবসাদ প্রভৃতি জড়তার প্রতিকূলে স্ফূর্ত্তি উদ্যম অধ্যবসায় প্রভৃতিকে উত্তেজিত করিতে পারে, ইন্দ্রিয়াকর্ষণের প্রতিকূলে প্রতিজ্ঞা, প্রযত্ন ও আত্মানাত্ম বিচার করিয়া একের প্রতি-সমাদর ও অন্যের প্রতি অনাদর করিতে পারে, এবং স্বার্থ অহঙ্কার প্রভৃতি মানবীয় বাধার প্রতিকূলে দেবত্বের গৌরব, প্রেম পুণ্য শান্তি সংযমের গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, এ শক্তি ভগবান্ কৃপা করিয়া তাহাদিগকে প্রদান করিয়াছেন। এই জন্য মানুষ জড়ভাব ও পশুভাবের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বর্গের দিকে উত্থিত হইতে পারে। তাহার প্রতিজ্ঞা আছে, দৃঢ়তা আছে,অধ্যবসায় আছে, সে সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতঃ পশুকে বলিদান করিতে পারে। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে এত সম্পদ থাকিতেও মানুষ পশুর সহিত পশুভাবে থাকিতেই ভালবাসে, দেবভাব চাহে না। মানুষ দেবভাব, দিব্যজীবন চাহে না, কিন্তু দেবত্বের আবরণ চাহে। সেই দিব্য আবরণে আবৃত হইয়া সে গোপনে পশুত্ব পোষণ করে। তাহার অন্তরে ক্ষমা নাই, কিন্তু ক্ষমাশীল দেবতার ন্যায় শত্রুর জন্য প্রার্থনা করে। সেই প্রার্থনারূপ দিব্য আবরণের ভিতর হইতে পশুত্বের ক্রোধ বিদ্বেষ প্রভৃতি স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। সে মনে করে আমার যত্নপোষিত পশুভাব কেহ বুঝিতে পারিবে না; কিন্তু তাহার যে অভিসন্ধি পূর্ণ হয় না। কেন না প্রকৃত দেবতা কখন পশুপোষক হইতে পারে না। তাহার হৃদয় অতি নীচ যে সেই নীচতা প্রচ্ছন্ন রাখিয়া উচ্চতা প্রদর্শন করিতে যত্ন করে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে না। তাহারই সাধন ভজন যথার্থ, যাহার জীবনে প্রচ্ছন্ন পশুবল স্ফূর্ত্তি পায় না। ভিতরে বাহিরে পরিস্ফুত সারল্যের শুভ্র জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতে থাকে। সত্যের আলোক, পুণ্যপ্রেমক্ষমাশান্তি-পরিভূষিত হৃদয়ের ভাব সহজেই লোকের প্রাণ মন মুগ্ধ করে, কৃত্রিম প্রচ্ছন্ন পশুজীবন তাহা করিতে কদাচ সমর্থ হয় না। তাহারই সাধন বল অকৃত্রিম যাহার জীবন হইতে সাধনবলে চিরকালের জন্য পশুবল অন্তর্হিত হইয়াছে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

এমন কি আছে, যাহা প্রার্থনা দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না, অথচ আমরা নিয়ত শুনিতে পাই প্রার্থনা করিয়াও সিদ্ধিলাভ হয় না। বৈষ্ণবশাস্ত্রে এক হরিনামে সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়, সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়, ইহা ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখিত আছে, এবং বৈষ্ণবগণ এ কথায় অবিশ্বাস করেন না। জীবনে হরিনামের ঈদৃশ ফল সর্ব্বদা লক্ষিত হয় না দেখিয়া বৈষ্ণবসিদ্ধান্তশাস্ত্রে ইহার কারণ কি অন্বেষণ করা হইয়াছে এবং নামের প্রতি অপরাধ বশতঃ ফলের অবরোধ হয়, ইহা তাঁহারা স্থির করিয়াছেন। প্রার্থনা করিয়াও ফল লাভ হয় না, একথা যখন আমরা শুনিতে পাই তখন এখানে কোন প্রকার অপরাধ অবশ্য আছে, স্বতই আমাদিগের মনে উদিত হয়। এ অপরাধ কি, ভাল করিয়া নির্দ্দেশ

হওয়া সমুচিত। সকলেই জানেন, প্রার্থনা করিতে গেলে হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিতে হয়। হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া দিলাম না, অথচ আলোক ও নিঃশ্বসিত প্রাণের ভিতরে আসিয়া প্রবিষ্ট হইবে, ইহা কি কখন সম্ভবপর? হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন এ কথা শুনিতে কবিত্ব মনে হয়, এ কবিত্বের ভাষার মধ্যে মূল বিষয় কি নিহিত আছে, সকলেরই ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করা সমুচিত। জ্ঞান ইচ্ছা ও প্রেমে দোষ থাকিলে, উহা প্রার্থনা কালে হৃদয়ের দ্বার অবরোধ করিয়া দেয়। যদি আমাদিগের কোন একটি বিষয়ে জ্ঞান সদোষ থাকে, সেই সদোষ জ্ঞান আমাদিগের যথার্থ প্রার্থনাপথের অবরোধক হইবে। আমরা সেই সদোষজ্ঞানকে যথাবস্থ রাখিয়া যদি সহস্র বার প্রার্থনা করি, তথাপি প্রার্থনার ফল জ্ঞানের দোষে অবরুদ্ধ হইয়া থাকিবে। জ্ঞানের দোষে মতের দোষ উপস্থিত হয়, মতের দোষে প্রার্থনা বিফল হয়। এইরূপ যেখানে ইচ্ছাগত দোষ আছে, সেখানে সে ইচ্ছাগত দোষ পূর্ব্বে অপনীত না হইলে উহাই প্রার্থনার ফলাবরোধক হয়। ইচ্ছাগত দোষের সহিত নীতিশৈথিল্যের ঘনিষ্ঠ যোগ। নীতিশৈথিল্য যে প্রার্থনার ফলাবরোধক, ইহা অনেকের মনে হয় না, কিন্তু সচরাচর এই নীতিশৈথিল্য হইতেই প্রার্থনা নিষ্ফল হইয়া থাকে। প্রেম যখন মায়ার সঙ্গে মিলিয়া গিয়া বিকৃত হয়, তখন উহা যে কত বড় প্রার্থনাফলের প্রতিরোধক তাহা অল্প লোকে বিচার করিয়া দেখেন, কিন্তু এসংসারে এই মায়ার অবরোধ অতীব মারাত্মক। অনেকে বলিবেন, যদি প্রার্থনা সমুদায় দোষের অপহারক হয়, তবে জ্ঞান, ইচ্ছা, প্রেমের দোষ তদ্দ্বারা ক্ষয় না হইয়া প্রার্থনাফলাবরোধক কি প্রকারে হইয়া থাকে। সকলেরই একথা স্মরণে রাখা সমুচিত, কোন একটি স্থিরতর লক্ষ্য ভিন্ন প্রার্থনা হইতে পারে না। প্রার্থনার অর্থ যাচ্ঞা। আমি কি চাহিতেছি যদি না জানিলাম, তবে চাহিব কি প্রকারে? জ্ঞান, ইচ্ছা, ও প্রেমের দোষ অপনয়ন করিতে হইলে, সেই সেই দোষ প্রার্থনার বিষয় হওয়া চাই। যদি ঐ গুলি প্রার্থনার বিষয় না হয়, তবে উহাদিগের নিরসন কখনই সম্ভবে না। এ গুলির উচ্ছেদ না হইলে যে কোন বিষয়ে প্রার্থনা হউক, ইহারা হৃদয় মন প্রাণের দ্বারাবরোধক হইয়া প্রার্থনা অসিদ্ধির হেতু হইবে। কেহ হিমালয়শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া যদি নির্জ্জনে সময়াতিপাত করেন, এবং মনে করেন যে, তিনি এইরূপে সিদ্ধমনোরথ হইবেন, আমরা বলিব, তিনি কখন এরূপে সিদ্ধকাম হইতে পারিবেন না। সমুদায় দিন উপাসনা প্রার্থনায় অতিবাহিত করিলেও এই দ্বারাবরোধক বিঘ্নগুলি যত দিন অপনীত না হইতেছে, কিছুতেই কিছু হইবার নহে। এই সকল সাধন ভজন উপাসনাদিতে হৃদয় কোমল হইতে পারে, অনেক অনেক সদ্ভাবের কুসুম প্রস্ফুটিত হইতে পারে, তাহাতেই যে, চরিত্রের মূল পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ হইয়া যাইব, মতদোষ তিরোহিত হইবে, মায়ার বন্ধন ছেদন হইবে, ইহা কখনই কাহারও মনে করা সমুচিত নয়। এ সম্বন্ধে অনেকের মনে ভ্রম আছে বলিয়া, যথার্থ প্রার্থনা উপাসনা দিন দিন অত্যন্ত বিরল হইয়া পড়িতেছে। অনেকে ভাবের স্রোতে প্রবাহিত হইয়া মনে করেন, উপাসনা প্রার্থনা ঠিক চলিতেছে। উপাসনা প্রার্থনা ঠিক চলিতেছে তখনই বলিব যখন দেখিব, প্রার্থনামাত্র তৎফল হাতে হাতে লাভ হইতেছে, চরিত্রের মূল পর্য্যন্ত শুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। আমাদিগের মধ্যে এ সম্বন্ধে অনেকের মনে অযথাসংস্কার উপস্থিত দেখিয়া অদ্য আমরা প্রার্থনাবিষয়ে একটু বিশেষ আলোচনা করিলাম, যদি প্রার্থনার অবরোধক দোষগুলি অপনয়নে সকলে সযত্ন না হন, আমাদিগের ভয় হয়, পাছে প্রার্থনাবিষয়ে সংশয়বাদ উপস্থিত হইয়া অনেকের বা সর্ব্বনাশ হয়।

উৎসবে ভবানীপুর প্রচার যাত্রায় ভাই দীননাথ মজুমদারের বক্তৃতার সার।

এই বিস্তীর্ণ জনমণ্ডলের প্রতি বিশেষরূপে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাওয়া যায় জাতি, সম্প্রদায়, সমাজ, ও পরিবার প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের মধ্যে বিধাতার আশ্চর্য্য পালন ও পরিত্রাণের কৌশল নিহিত রহিয়াছে। পিতা মাতা, পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগিনী, স্বামী স্ত্রী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধজনিত মানবমানবীগণ কেমন সুশৃঙ্খলা ও সুনিয়মে পরস্পরকে পরিপোষণ করিতেছেন, একের সহযোগে অপরের শ্রীসৌন্দর্য্য বল বুদ্ধি ও পুষ্টি বৃদ্ধি হইতেছে। স্বামীর পার্শ্বে স্ত্রীর শোভা, স্ত্রীর সহযোগে স্বামীর স্বামিত্ব, পিতা মাতার ক্রোড়ে পুত্র কন্যার শ্রী, পুত্রকন্যাযোগে পিতামাতার গৌরব। মায়ের সৌন্দর্য্য কখন? পুত্র কোলে যখন। এইরূপে বয়স, অবস্থা ও সম্বন্ধভেদে এক অন্যের প্রতি ব্যবহার ও কর্ত্তব্য সাধন দ্বারা পরস্পরের পুষ্টি সাধন করিতেছে। বিশুদ্ধ প্রেমের পোষণ ও শাসনে পরস্পরকে সুখের পরিবার করিয়া তুলিতেছেন। ধর্ম্মজগতে পরম প্রজাপতি মানবের পরিত্রাণের জন্য যুগে যুগে যে ধর্ম্ম বিধান প্রেরণ করিয়া থাকেন, তাহার প্রেরিত জনেরাও এইরূপ একটি পরিবারে নিবদ্ধ, ভিন্ন প্রকৃতির ভিন্ন ভিন্ন জনে এক বিধানপরিবারে বদ্ধ হইয়া একের ভাব অন্যের অন্তরে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া থাকেন। প্রত্যেক প্রত্যেককে সহায়তা করিয়া সম্বন্ধনির্ব্বিশেষ অলক্ষিতভাবে সকলেই সকলকে বলিষ্ঠ, ভ্রষ্টি ও স্ব স্ব নিয়োজিত কর্ত্তব্য সম্পাদনে উপযোগী করিয়া তোলেন। ঈশ্বর আমাদের সকল বিষয়েই

আদর্শ, কিন্তু ক্ষুদ্র জ্ঞান ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির দ্বারা আমরা সকল সময়ে তাঁহার অনন্ত আদর্শকে আয়ত্ত করিতে পারিব না বলিয়া, আমাদের শিক্ষা সাধনের জন্য সংসার মধ্যেই তিনি বিবিধ বিষয়ের নানা ক্ষুদ্র আদর্শ সৃষ্টি করিয়াছেন। তদ্বিষয়ক আদর্শের প্রতি দৃষ্টি পড়িলে বিশ্বস্রষ্টার প্রদর্শিত আদর্শ হইতে তাঁহার কার্য্যকৌশল অবগত হইয়া সেই সেই বিষয়ের জটিলতা ভেদ করত অনায়াসে তাহার যথাযথ মীমাংসায় উপনীত হইতে পারি।

ঘোর কলিযুগে এই বর্ত্তমান শতাব্দীতে নানা প্রকারের পাপ দুরাচার অনাচার স্বেচ্ছাচার মায়া মোহ প্রভৃতি মহানর্থকর তমসাচ্ছন্ন জনসমাজের উদ্ধারের জন্য বিশ্ববিধাতা যে নববিধান প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার আশ্রিত প্রেরিতগণকে যিনি ঐরূপ একটি পরিবারে নিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন. প্রেরিত মণ্ডলীর কেহ কাহাকেও ছাড়িলে তিনি বলবিহীন হইয়া আপন নিযোজিত কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে ভগ্নসামর্থ্য হইয়া পড়েন। পরিবার মধ্যে আত্মীয়গণের স্নেহ শুশ্রূষা পরস্পরের শ্রীসৌন্দর্য্যের হেতু। পরিবারস্থ অন্য জনের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং গৃহস্বামী যদি গৃহ ত্যাগ করিয়া প্রাচীরের বাহিরে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে তিনি পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগিনী, এবং সহধর্ম্মিণী স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসজনিত সুকোমল ভাব, স্নেহ প্রীতি ভক্তি প্রভৃতি হইতে বঞ্চিত হইয়া, এবং পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন জন্য যে স্থৈর্য্য শান্তি গাম্ভীর্য্য সাহিষ্ণুতা ও প্রফুল্লতা প্রভৃতি উচ্চ গুণলাভের অবকাশ হারাইয়া বিকৃত মনা হইয়া যান; গৃহিণী গৃহপ্রাচীর অতিক্রম করিয়া অবস্থিতি করিলে সম্পূর্ণ নিরাশ্রয় হইয়া পড়েন ও পরিবার মধ্যে যে মান মর্য্যাদা সম্ভ্রম শ্রদ্ধা ভক্তি কর্ত্তৃত্বাধিকার পাইতেন. সে সমস্ত হারাইয়া লোকের কৃপাপাত্র হইয়া পড়েন, সকল গুরুত্ব হইতে বিচ্যুত হইয়া তৃণের ন্যায় লাঘব স্বীকার করিয়া অবস্থার স্রোতে ইতঃস্তত পরিচালিত হইতে হয়। ঝঞ্ঝাবাত রৌদ্র বৃষ্টি দুষ্ট জন ও হিংস্র পশ্বাদির আক্রমণের বিষয় হইয়া তাঁহাদিগকে দুরূহ ক্লেশকষ্ট বহন করিতে হয়, না আপনাকে রক্ষা করিতে পারেন না আপরকেই রক্ষণের পথে সহায়তা করিতে পারেন. অভিমান অহঙ্কার স্বার্থাদি নীচবৃত্তি প্রবল হইয়া তাঁহার সকল গৌরব ও মহত্ত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং আত্মরক্ষার জন্য সর্ব্বদাই ব্যাকুল হইয়া 'আমি ছিলাম কি হ'লাম কি, কোথায় গৃহের মাতা না আজ পথের কুটা, ঘরে কত গৌরব আজ কিনা লোকের কৃপাপাত্র হ'য়ে রয়েছি' এইরূপে আপনার ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে দিন রাত্রি মাথার উপর দিয়া চলিয়া যায়।

আমরা দেখিতে পাই সামান্য একটু বাতাস উঠিলেই এই বিস্তীর্ণ জনসিন্ধুতে ভীষণ তরঙ্গ উঠিতে থাকে। সম্প্রতি আমরা সেইরূপ তুফানে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছি। মহা আন্দোলন হইয়া আমাদের এই বিধানতরী ভয়ানক আঘাত প্রতিঘাতে নিস্তাড়িত ও নিমগ্ন প্রায় হইয়া পড়িতেছে। ব্যাপার ভয়ানক বটে, কিন্তু ভয় নাই, কেহ ভুলিও না যে নববিধানের তরী সেই মহান্ কাণ্ডারীর হাতে রহিয়াছে। কেহ ব্যস্ত হইও না. নড়িও না, যে যেখানে আছ নিজ নিজ স্থানে খুব দৃঢ় হইয়া বসিয়া থাক; নড়িলে নৌকা আরও টলিবে, টলিলে জল উঠিয়া ডুবিয়া যাইবে। যিনি আতঙ্কে নৌকা হইতে লাফাইয়া পড়িয়া বাঁচিবার চেষ্টা করিবেন তিনি এই ভীষণ তরঙ্গমালা আঘাতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। তাই বলি সকলে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিয়া কেবল ঐ অনন্তলীলাময় কাণ্ডারির মুখের দিকে চাহিয়া থাক, সকল ভয় ভাবনা সত্বর চলিয়া যাইবে। কেবল একটি কাজ আমাদের করিবার আছে, প্রত্যেকে তাহারই জন্য বিধিমতে চেষ্টা করি। সাগরে তুফান উঠিলে সেই ভীষণ তরঙ্গরাজিকে প্রশান্ত করিতে পারে, কেবল স্নেহ তৈল এই তুফানের উপর ঢালিতে থাক, যাহার যত স্নেহ—প্রেম আছে খুব ঢাল—ক্রমাগত ঢাল, অন্য কথা ছাড়িয়া দাও, কেবল ঢাল ঢাল, প্রেম ঢাল, স্নেহ ঢাল সাগরবক্ষ শান্ত ভাব ধরিবেই ধরিবে, এবং বিধানতরী যাত্রিদল লইয়া নির্ব্বিঘ্নে কূলে উপনীত হইবে। প্রেমের জয়ধ্বনি আকাশকে নিনাদিত ও স্বর্গকে প্রতিধ্বনিত করিবে। স্বর্গের ভক্তেরা দেবগণ, আমাদের অগ্রবর্ত্তী নেতা ভক্তব্রহ্মানন্দ যোগী ভাইকে লইয়া সকলের সঙ্গে মিলিয়া আনন্দধ্বনি করিবেন, স্বর্গমর্ত্তে প্রেমের জয়ধ্বজা—নববিধানের জয়ধ্বজা উড়িতে থাকিবে এবং সকল দুঃখ কষ্টের অবসান ও শান্তির অবতারণা হইয়া আনন্দে প্রফুল্ল হৃদয়ে আমাদিগকে উৎসবের প্রসাদ সম্ভোগের অধিকারী করিবে। সকল ভার কাণ্ডারীর উপর দিয়া প্রেমতৈল ঢালিতে ঢালিতে আমরা বুদ্ধি সুদ্ধি ছাড়িয়া কেবল সেই প্রেমময়ী জননীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকি।

ভাই রামচন্দ্র সিংহের বক্তৃতার সার।

বন্ধুগণ, আমি দুই একটি জীবনে পরীক্ষিত কথা বলিবার জন্য আপনাদিগের সম্মুখে দাঁড়াইলাম। দেখুন, সুখের জন্য মনুষ্যমাত্রেই ব্যাকুল ও ব্যস্ত। এই ব্যস্ততাতেই তাহারা যেন পাগল হইয়া অধীর হইয়া পড়ে, সুতরাং স্থির ভাবে সুখের বিষয় নির্দ্ধারণ না করিয়া যাহা কিছু আপাততঃ উপস্থিত সুখ দেয়, তাহাই সুখের সামগ্রী বলিয়া গ্রহণ করে, অবশেষে বিড়ম্বিত হয়। ধনে মানে ঐশ্বর্য্যে সুখ আছে বটে, কিন্তু সে সুখ নিত্য সুখ কি না কে তার বিচার করিবে? আমিও এক জন আপনাদের দলের

লোক সংসারে সুখের আশয়ে অনেক বেড়াইয়াছি, এবং আমার চেহারাই প্রমাণ দিবে যে আমি এক জন সংসার-পথের পুরাতন ভুক্তভোগী। পথিক হইয়া চারি দিকে ফিরে ঘুরে দেখিলাম পৃথিবীর সামগ্রীমাত্রই অস্থায়ী, এবং অস্থায়ী সামগ্রী কেমন করিয়া স্থায়ী ফলস্বরূপ নিত্য সুখ দিবে তাই খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলাম পৃথিবীর বস্তু চাকিয়া জানিলাম যে ইহারা কেবল শরীরের উপযোগী আরাম দেয়, কিন্তু নিত্যানন্দ নিত্যারাম এ সকল ইহাতে পাইবার আশা নাই। নিত্যসুখ পৃথিবীর ভক্ষ্য ভোজনে নহে, কিন্তু ভগবানের ভজনায়—শ্রীহরির সেবায় ভগবদ্ভক্তিতে হরিনাম সাধন ও কীর্ত্তনে নিত্যানন্দ নিত্যারাম। তবে যদি বল কেন মানুষ সে উপায় গ্রহণ করে না, সে পথে চলে না, সে কেবল যেমন আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি মানুষের ব্যস্ততা অধৈর্য্য ও ভ্রান্তি, দেখ না সুপথ্যে স্বাস্থ্য-রক্ষা ও স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করে—কুপথ্য তাহার বিপর্য্যয় ঘটায়—তথাপি বিকারী রোগী জানিয়া শুনিয়া নিষেধ না মানিয়া কেমন অপথ্য কুপথ্য সেবনে রত, তাহার বিকারসম্ভূত অরুচি কেবল কুরুচিতে যেন অনুরক্ত—কুপথ্য সেবনে সুখ অনুভব করে। ঠিক এইরূপ হরিনামে মানুষের অরুচি। কিন্তু বিশ্বাসী ভক্তবৃন্দের রুচি অন্যপ্রকার—তাঁহারা হরিনামরসাস্বাদনে মত্ত হইয়া সংসারের অস্থায়ী বিষয়কে অতিক্রম করিলেন, ভক্ত প্রহ্লাদ ও চৈতন্যের কথা তো আপনারা জানেন কত কষ্ট ও বিপদ তাঁহাদিগের উপর পড়িল, কিন্তু কিছুতেই তাঁহারা হরিকে ছাড়িলেন না, ভুলিতে পারিলেন না, কেন না হরিনামামৃতরস এমনি তাঁহাদিগকে মত্ত করিয়াছিল। তাই আজ আপনাদিগকে অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতেছি, আপনারা দিনান্তে নিশান্তে এক বার ব্রহ্মনাম সাধন করুন, ভগবানকে স্মরণ করুন ও হরিনাম কীর্ত্তন করুন। ইহাতে সকলি পাওয়া যায়—ভগবানের প্রসাদে হরির নামের গুণে সব দুঃখ দূর হয়। পরিবারপ্রতিপালনে দোষ নাই, ব্যবসায় বাণিজ্যে কোন অপরাধ নাই, টাকা উপার্জ্জনে বিশেষ পাপ নাই, কেবল হরির অনুগত হইয়া এ সকল কর—পাপ মুক্ত হইবে, হরিকে ছাড়িলে লক্ষ্মীছাড়া হইতে হয়—হরিকে ভুলিলে বিষম ভ্রান্তি সমুপস্থিত হয়। তাই আবার বলি, অসার পরিত্যাগ করিয়া হরিধন সাধন কর। দেখ জহরি কষ্টি-পাথরে সব কসিয়া মাজিয়া সোণা রূপা ক্রয় করে—সে জন্য সে ঠকে না। আপনারা মৃত্যুরূপ কষ্টিপাথরে পৃথিবীর সব সামগ্রী ও সম্বন্ধ কসিয়া দেখুন, দেখিয়া কি নিত্য কি আপন বুঝিয়া লউন। তাহা হইলে আর প্রতারিত বিড়ম্বিত ও দুঃখিত হইতে হইবে না। কেন না, হরিধন নিত্যধন, তাহা লাভ হইলে সব ক্ষতিপূরণ হইবে, হরিভক্তি মুক্তির পথ প্রকাশ করিয়া দিবে, এবং ভক্তবৎসল শ্রীহরি কখনই কোন কালে কোন ভক্তের মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ রাখেন নাই, হরিকে ভজে হরিতে মজে যুগে যুগে পাপী উদ্ধার হইয়াছে, অধমতারণ পতিতপাবন পরমেশ্বর চিরকাল ভক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া বিশ্বাসরজ্জুতে বন্ধন করিয়া এবং নামসাধনে প্রবৃত্তি দিয়া পতিত উদ্ধার করিয়া পতিতপাবন নামের মহিমা প্রচার করিয়াছেন। অতএব নিরাশ হইও না, আশা ও বিশ্বাসের সহিত হরিনাম স্মরণ কর, ব্রহ্মগুণ গান কর, দুঃখ আর পাইবে না সুখসাগরে সহজে মগ্ন হইবে। তাই আবার বলি, বার বার বলি ভগবানের ভজনা কর—হরিনাম কীর্ত্তন কর, কেন না হরি ইহকাল পরকাল চিরকালের গতি মুক্তি তিনি আমাদের আশা ভরসা সুখ শান্তি সকলই।

করাচির সমুদ্রবক্ষে ব্রহ্মোপাসনা।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

ভগবানের অনন্তত্ব বাহির হইয়া পড়িল। ভূতভবিষ্যৎ তাঁহার দুই বাহুতে এবং কোটি কোটি সমুদ্র তাঁহার পদতলে। আমি একেবারে "স্বয়ম্ভূ স্বয়ম্ভূ" করিয়া ডাকিতে লাগিলাম। ভগবানের অনন্তত্বে মন নিতান্ত প্রপীড়িত হইতে লাগিল যেন বুক ভাঙ্গিয়া যাইতে এবং মস্তিষ্ক ঘুরিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল আমি অনুপযুক্ত পাপী, কেন আমি এ স্থানে আসিয়াছিলাম, এ ঋষি যোগীদিগের স্থান, আমি সহরে ফিরিয়া গিয়া শান্তি লাভ করি। এই প্রকার ভয়ানক চিন্তা করিতেছি এমন সময় সমুদ্র বলিল, অত ভয় নাই, চিন্তা নাই, এই দেখ আমার বক্ষে কত জীব, কত জন্তু, কত মৎস্য, কত গুগ্‌লি, কত সামুক, কত কীট কত কীটাণু। বল দেখি কে তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছে? তাহাদের মধ্যে অতি ক্ষুদ্রতমটির পীড়া হইলে কে তাহার চিকিৎসা করিয়া তাহাকে সুস্থ করে? এবং জননীর মত প্রত্যেকের নিকট কে বসিয়া আছে? ঐ পর্ব্বতবক্ষে কত সামুক গুগ্‌লি, কত কীটাণু আছে, কে তাহাদের প্রত্যেকের নিকট বসিয়া তাহাদের মর্ম্মবেদনা সকল জানিতেছেন, এবং সকলের অভাব সমভাবে দূর করিতেছেন? তিনি বৃহৎ তিমির প্রতি পক্ষপাতী নহেন, অতি ক্ষুদ্র কীটাণুকে বিস্মৃত নহেন, সমান ভাবে সকলকে তিনি পালন করিতেছেন। তখন আমি অনন্ত দয়া কাহাকে বলে তাহার আভাসমাত্র পাইলাম, এবং সমুদ্রের মহত্তত্ব ও অনন্তত্ব দ্বারা নিতান্ত প্রপীড়িত হইয়া অনন্ত দয়ার প্রতি বার বার দৃষ্টি করিতে লাগিলাম, এবং তাহার মধ্যে আশ্রয় লইয়া যেন বাঁচিলাম। বার বার বলিতে লাগিলাম, "সমুদ্র দাদা ভয় দেখাইও না, আমি পাপী অহঙ্কারী তোমার নিকট এক দিন মাত্র আসিয়াছি, আবার নিকট মার দয়ার

কথা বল, দয়াই আমার জীবন, ব্রহ্মকৃপাই আমাদের আশ্রয়, ব্রহ্মকৃপাই আমাদের অবলম্বন, ব্রহ্মকৃপাই ইহকাল ও পরকালের সম্বল, ইহা ব্যতীত আর যাহা কিছু সমস্তই দম্ভ ও মায়া এবং অসার। তখন আহত বালকের মত মার দয়ার মাতৃক্রোড়ে প্রবল বেগে আশ্রয় লইতে চলিলাম। শ্রীআচার্য্যদেবকে বার বার মনে পড়িতে লাগিল, তাঁহার আরাধনা যে কত উচ্চ ও খাটি ছিল তাহা মনে হইতে লাগিল. সমুদ্রবক্ষে সেই কেশবচন্দ্রের প্রকাশ দেখিয়া মন অপূর্ব্ব ভাব সম্ভোগ করিল। আর অনন্তের দিকে দৃষ্টি করিতে পারিলাম না। বলিলাম আমরা মার কোল ছাড়িয়া কোথায় অনন্তের ভিতর ডুবিয়া মরিব। পূজ্যপাদ পরমহংস মহাশয় যে আমাদের নিকট আসিয়া বলিতেন যে তোমাদের নিকট আসিলে নিরাকার অনন্ত সমুদ্রে পড়িয়া প্রাণ হু হু করে।" প্রবল বেগে তিনি যে মা মা বলিয়া ডাকিয়া মার কোলে গিয়া প্রেমধারা বিসর্জ্জন করিতেন ও বালকত্ব প্রকাশ করিতেন তাহার অর্থ এই সময় হৃদয়ঙ্গম হইল। এই প্রকারে মার কোলে আছি, এমন সময় আর একটি আশার কথা শুনিলাম। কে যেন বলিতেছে, "ঐ সমুদ্র দেখিতেছ, উহার অত বিক্রম, অত আস্ফালন উহা অত প্রকাণ্ড ও মহৎ, কিন্তু বল দেখি, ও কি আমাকে জানে? আমার মহিমা ও গৌরব সমুদ্রমস্তকে বহন করিতেছে, কত রাগ মানে আমার কত নামই কত কাল ধরিয়া সমুদ্র গান করিতেছে, কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ দেখি ও কে? ও অত প্রকাণ্ড হইলেও তবে জড়, আমাকে জানিবার শক্তি উহার নাই, সে শক্তি বৎস, আমি স্নেহ করিয়া তোমাকে দিয়াছি, তুমি আমার প্রিয় পুত্র, কত পাপ তুমি করিয়াছ, কত বার আমার বিরোধী হইয়াছ, কত অনুপযুক্ত তুমি, তোমার সমস্ত জীবন আমার বিরোধী বলিলে হয়, তথাচ তুমি যখন একটু ভক্তি ও বিশ্বাসসহকারে আমাকে "মা" বল, শত শত সমুদ্র আমার নিকট তুচ্ছ। তোমার প্রেম একটু পাইলেই আমি তৃপ্ত হই, এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমাকে দিতে চাই।" আমার প্রাণ কঠোর, মা আর কত কথা বলিলেন, আমি তাহা বলিতে পারি না। তখন মার এই অপূর্ব্ব প্রেমের কথা শুনিয়া নববিধানকে বার বার প্রণাম করিতে লাগিলাম, নববিধান ব্যতীত এ সমস্ত গূঢ় প্রেমের কথা আর কেহ জানেন না। মার চরণে অশ্রুবর্ষণ করিয়া বার বার প্রণাম করিয়া এই প্রার্থনা করিতে লাগিলাম যে তোমার এই প্রেমের সংবাদ আমার নিকট তুমি নিরন্তর বলিয়া কৃতার্থ করিতে থাক। আমি আর কি করিব, আমি জীবনের অবশিষ্ট দিন সেই গুলি উৎসাহের সহিত নিরাশায় আহত ভ্রাতা ভগিনীদিগের নিকট অকপট ভাবে বলিয়া জীবনকে সার্থক করি।" গভীর ও সজীব উপাসনান্তে আমরা দুই জনে পবিত্র খিচুড়ী অন্ন প্রস্তুত করিয়া সমভিব্যাহারী ভ্রাতাদিগের সেবা করিলাম, এবং অকূল সমুদ্র দেখিতে দেখিতে চিন্তায় বিহ্বল হইয়া আমরাও সেই পবিত্রান্ন গ্রহণ করিলাম। সেই স্থানে থাকিবার জন্য মন অত্যন্ত ইচ্ছুক হইল, কিন্তু মাঝিদিগের উত্তেজনা ও ভ্রাতাদিগের অনুরোধে "গৃহে ফিরে যেতে আর মন নাহি চায়" এই গান করিতে করিতে নৌকারোহণ করিলাম। সমুদ্রের মধ্য দিয়া পালভরে শন্ শন্ বেগে ক্ষুদ্র নৌকা চলিতে লাগিল, এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে আবার কিয়ামারী নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম তথা হইতে শকট যোগে করাচিতে উপনীত হইলাম।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ২১ আশ্বিন, ১৮০০ শক।

গত কল্য দুর্গা প্রতিমার বিসর্জ্জন হইল, বঙ্গদেশ আবার যেন ম্লান হইল; কিন্তু দুর্গতিহারিণীর বিসর্জ্জন হয় না, ব্রহ্মদেশও ম্লান হয় না। যদি বহু যত্ন করিয়া মূর্ত্তি গঠন করিলাম, নানাপ্রকার সৌন্দর্য্য দ্বারা সেই মূর্ত্তিকে বিভূষিত করিলাম, এবং আদর করিয়া সেই মূর্ত্তির পূজা আরম্ভ করিলাম তবে বিসর্জ্জন করিব কেন? যদি লক্ষ্মীকে আনিয়া ঘরে বসাইলাম তবে তাঁহাকে আবার গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিব কেন? ভয়ঙ্কর দশমী ব্রহ্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ব্রাহ্মদিগের এই পরম সৌভাগ্য। ব্রাহ্ম হইয়া সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী পূজা করিব; কিন্তু দশমী পরিত্যাগ করিব। যাহাকে কত ভাল বাসিলাম, কত ভক্তি প্রেম উপহার দিলাম, সেই আদরের সুন্দর মূর্ত্তিকে কি জলে ফেলিয়া দিব? জলে বিলীন হইবে সেই সোণার প্রতিমা? সত্যধর্ম্ম, তুমি আমাদিগকে এই বিপদ হইতে বাঁচাও। এত দিনের উৎসবের পর আবার যেন দুঃখের জলে ভাসিতে না হয়। যোগ হইল কি বিয়োগের জন্য? এমন প্রেম ভক্তির যোগের পর কি এই বিচ্ছেদ সহ্য হয়? ঈশ্বর কি কেবল তিন দিনের জন্য ভক্তের ঘরে আসিবেন? যদি ব্রহ্ম দয়া করিয়া আমাদিগের দেশে আসিলেন তবে চতুর্থ দিনে যেন তাঁহার পূজা নিঃশেষিত না হয়। যদি পৃথিবীতে চির নবমী থাকে, তবে আমরা দুর্গতিহারিণীর পূজা করিব। যদি উৎসবের পর আবার শোক আসে, শুভদিনের পর আবার কাল রজনী আসে তবে অল্পক্ষণের জন্য ব্রহ্মপূজা করিয়া কি হইবে? কিন্তু ধন্য দয়াময় যে তিনি এমন নিয়ম করেন নাই। তাঁহার এই নিয়ম যে যতই আমরা প্রেম ভক্তি উপহারে তাঁহার পূজা করিব, ততই তিনি আমাদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়া চির কাল আমাদিগের সঙ্গে থাকিবেন। যথার্থ দুর্গতিহারিণীর পূজাতে বিচ্ছেদ, বিসর্জ্জন নাই। যথার্থ দুর্গতিবিনাশন ঈশ্বর, যত দিন ভক্তের দুর্গতি হরণ করিতে না পারেন, তত দিন

তাঁহার সঙ্গে থাকিবেন। তিন দিনের পূজাতে অসুর বধ হয় না। মনুষ্যহৃদয়ের অসুরকে ঈশ্বরের পরাক্রমস্বরূপ জীবন্ত ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ পরাস্ত করিতে পারে না। কবে সেই যথার্থ দুর্গতিহারিণী সিংহবাহিনী হইয়া আমাদিগের ঘরে আসিবেন? কবে জননী পুণ্যের সিংহ, প্রেমের সিংহ লইয়া আসিয়া আমাদিগের মনের অসুর বধ করিবেন? যত দিন না অসুর বধ হয়, তত দিন ত যথার্থ ঈশ্বরের পূজা হইল না। ঈশ্বর যে মনকে অধিকার করিয়াছেন। তাহা বুঝিব কিরূপে? ফল দ্বারা। অসুর সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইল তবে ত বুঝিব যে অসুরনাশিনী জননীর পূজা হইল। মনের সকল দুর্গতি চলিয়া যাইবে, তবে ত জানিব যে যথার্থ দুর্গতিহারিণী অন্তরে আসিয়া বসিয়াছেন। যদি সত্যই যথার্থ দুর্গতিনাশন ঈশ্বর দয়া করিয়া বঙ্গদেশ নিবাসীদিগের মনের মধ্যে আসিয়া থাকেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি তাঁহার অব্যর্থ তীক্ষ্ণ অস্ত্র সকলের দ্বারা আমাদিগের আসুরিক বৃত্তি সকল ছেদন করিবেন। সমুদয় অসুর তিনি বিনাশ করিবেন। যতই তিনি আমাদিগের অন্তরের অসুর সকল নিপাত করিবেন, ততই আমরা "ব্রহ্মের জয়" "ব্রহ্মের জয়" বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিব, তখন কি আমরা দশমীর বিজয়া ভাবিতে পারিব? সে সময় কি আমরা ব্রহ্মকে বিদায় করিয়া দিতে ইচ্ছা করিতে পারিব? চির কাল দুর্গতিনাশন ব্রহ্মকে আমরা বক্ষের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিব। তিনি হৃদয়ের মধ্যে বদ্ধ থাকিলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গনেশ, কার্ত্তিক সকলকেই হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করিয়া রাখিতে পাবে। তাঁহার সঙ্গে থাকিলে লক্ষ্মীশ্রী অর্থাৎ সকল সম্পদ লাভ হয়, এবং শুদ্ধ সম্পদ লাভ করা যায় তাহা নহে; কিন্তু বিদ্যা, কল্যাণ, সৌন্দর্য্য, পুণ্য, তেজ সকলই লাভ হয়। তাঁহার সঙ্গে থাকিলে, সেই সম্পদ পাওয়া যায় যাহাতে সংসারের সকল সম্পদ তুচ্ছ বোধ হয়, এবং সেই বিদ্যা লাভ হয় যাহা দ্বারা বিনয় বৃদ্ধি হয়। যিনি সমুদয় গুণের আকর ব্রহ্মকে হৃদয়ের মধ্যে নিত্য ধারণ করেন, তিনি বিজয়া স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করেন না। যথার্থ ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বর তাঁহার সমুদয় স্বরূপ সকল লইয়া নিয়ত প্রকাশিত হন। ভক্তের হৃদয়ে কত প্রেমের তরঙ্গ, কত নূতন নূতন ভাবের প্রসঙ্গ কে তাহা জানিবে? দুর্গতিহারিণীর সাধক কত সুখে সুখী!! যতই সাধক গভীরতর ভক্তির সহিত তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকেন, এবং তাঁহার চরণ জড়াইয়া ধরেন ততই আরও তাঁহার লক্ষ্মীশ্রী, বিদ্যা, কল্যাণ, সৌন্দর্য্য সকলই বৃদ্ধি হয়, এবং তাঁহার আন্তরিক অসুর নষ্ট হয়। বাহ্যিক পূজায় পৌত্তলিকেরা নির্জীব দুর্গার নিকট কয়েকটি পশু বলিদান করিয়াই ক্ষান্ত হয়; কিন্তু অন্তরের অন্তরে যিনি যথার্থ দুর্গতিহারিণীর পূজা করেন, তাঁহার বলিদান শেষ হয় না। দুর্গতিহারিণী ক্রমাগতই তাঁহার সাধকের সমুদয় শত্রু বিনাশ করিতে থাকেন। এইরূপে সাধক যতই শত্রুদিগের হস্ত হইতে মুক্ত হন ততই তিনি তাঁহার দেবতার প্রেমমুখে নূতন নূতন সৌন্দর্য্য দর্শন করেন। যদি তাঁহার দেবতা কদাচ মলিন ভাব ধারণ করিতেন, তবে ব্রহ্মসাধক সেই কল্পিত দেবতাকে বিদায় করিয়া দিতেন। কিন্তু যথার্থ ব্রাহ্ম ব্রহ্মকে বিদায় করিয়া দিতে পারেন না, কেন না যতই তিনি ব্রহ্মের মুখের পানে তাকা'ন, ততই তাঁহার মধ্যে তিনি নব নব সৌন্দর্য্য দেখিতে পান, এবং তাঁহার আনন্দ বাড়িতে থাকে। তিনি দেখিতে পান জীবনের এক এক বৎসর, এক এক যুগ চলিয়া যাইতেছে, আর তাঁহার দেবতার প্রেমমুখ আরও উজ্জ্বলতর এবং সুন্দরতর হইয়া তাঁহার নিকট অধিকতর মনোহর এবং প্রিয়তর হইতেছে। এবং তাহার প্রেম ভক্তি, উন্নতি হইতে উচ্চতর উন্নতি লাভ করিতেছে। বঙ্গদেশে দুর্গাপূজা শেষ হইল বলিয়া কি ব্রহ্মদেশের দুর্গতিহারিণীর উৎসব শেষ হইবে? বাহ্যিক অসার ভাব শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়; কিন্তু ভিতরের সারভাব ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হয়। ভারত বর্ষে যতদিন পর্য্যন্ত না যথার্থ দুর্গতিহারিণীর পূজা প্রচলিত হইবে ততদিন পুরাণ বৃথা। দশভুজার অর্থ কি? অসুর বিনাশ করিয়া ঈশ্বর পাপীদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার অসীম পরাক্রম অথবা অনন্ত বাহুবল প্রয়োগ করিতেছেন, ইহা দেখাইবার জন্য এই পুরাণের সৃষ্টি। ব্রাহ্মগণ, এই উৎসব হইতে তোমরা ঈশ্বরের দুর্গতিহারিণী শক্তির পূজা করিতে শিক্ষা কর। যে পূজা দশমীর বিজয়াতে শেষ, তাহা তোমরা পরিত্যাগ কর। তোমরা তিন দিনের জন্য ব্রহ্মকে ঘরে আনিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পার না। নিত্য ব্রহ্মপূজা করিব এই আমাদের আশা। মনুষ্যের হস্তরচিত পুতুল বঙ্গদেশের প্রেম ভক্তি উদ্রিক্ত করিল; কিন্তু তিন দিনের পূজার পর আবার তাহা গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত হইল। আর এক দিকে প্রাণের পুতুল, যথার্থ প্রেমের বর্ণে রঞ্জিত, পরম সুন্দর এবং মনোহর, কারে সাধ্য তাঁহাকে বিনাশ করে। তাহাকে কিরূপে বিদায় দিবে? অনন্ত কাল তাঁহার পূজা করিতে হইবে। ঈশ্বর এই ভারতবর্ষে দিন দিন তাঁহার জীবন্ত পূজা বিস্তার করুন! যেন সকলেই দেখিতে পায় যে যথার্থ দুর্গতিহারিণী ভারতবর্ষে আসিয়াছেন, তিনি অসুর বধ করিয়া সকলকে বিদ্যা, সম্পদ এবং কল্যাণ ও সৌন্দর্য্য বিতরণ করিতেছেন। ব্রাহ্ম অন্ধ, এখনও সেই দুর্গতিহারিণীর মূর্ত্তি দেখিতে পায় নাই। কোথায় সেই মূর্ত্তি? এমন স্থান কি আছে যেখানে দুর্গতিনাশন ঈশ্বর লক্ষ্মী, সরস্বতী, এবং গনেশ কার্ত্তিককে সঙ্গে লইয়া বাস করিতেছেন? আছে, সেই মূর্ত্তিকে কুমারটোলী হইতে কিনিয়া আনিতে

নয় না; কিন্তু আমাদিগের ভিতরের স্বভাব হইতে উদ্ভূত হয়। বাহিরে যেমন সকলে সাকার মূর্ত্তির উৎসবে মত্ত হইয়া রহিয়াছে, ভিতরেও তেমনি জীবন্ত ঈশ্বরকে লাভ করিয়া ভক্ত যথার্থ উৎসবের আনন্দে প্রমত্ত হন, ভিতরে সেই সুন্দর নিরাকার মূর্ত্তি দেখিয়া ভক্তের সমুদয় কোমল ভাব প্রস্ফুটিত হয়। ভক্তের চক্ষু বাহিরের অসার পুতুল পরিত্যাগ করিয়া ভিতরের প্রাণের পুতুলকে দর্শন করে। এস অসার বস্তু ছাড়িয়া মনের মধ্যে নিত্য প্রকৃত দুর্গতিহারিণীর পূজা করি। ব্রহ্মপূজার শেষ নাই। এখানে দশমী নাই। ব্রহ্মকে বিসর্জ্জন দিতে পারি না, একবার যিনি আমাদিগের ঘরে আসিয়াছেন, চিরকাল তিনি সেখানে থাকিবেন। যে পূজা ফুরাইল তাহা মূর্ত্তিপূজা; কিন্তু নিরাকার যথার্থ দুর্গতিহারিণীর পূজার শেষ নাই. সেই পূজা ক্রমাগত অনন্তকাল চলিবে। ঈশ্বরের মনোহর প্রেমমুখের প্রতি প্রকৃত ব্রাহ্মের প্রেম, কি দিন দিন বাড়িবে। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা হৃদয়ের মধ্যে নিত্য সেই প্রেমময়ী দুর্গতি হারিণীর পূজা করেন!

সংবাদ।

বিগত পক্ষে প্রেরিতগণ এক এক দিন সন্ধ্যার পর কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন পল্লীনিবাসী নিম্নলিখিত বন্ধুগণের আবাসে সৎপ্রসঙ্গ সঙ্গীত, সঙ্কীর্ত্তন, পাঠ ও প্রার্থনাদি করিয়া প্রচার করিয়াছেন; যথা ডাক্তার মৃত্যুগোপাল মিত্র, নরসিংহের লেন। বাবু উমানারায়ণ সেন, চোরবাগান। বাবু শ্যামলাল সেন, বেনেটোলা। প্রেমচাঁদ বড়াল, চাঁপাতলা। প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন, সীতারাম ঘোষের লেন।

বিগত শ্রীদরবারের অধিবেশনে এরূপ নির্দ্ধারণ হইয়াছে যে, দরবারের সভ্যদিগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যক্ষেত্রে যে সকল প্রেরিত কার্য্য করেন, তাঁহারা অন্ততঃ মাসান্তে আপনাদের কার্য্য বিবরণ দরবারের সম্পাদকের নিকটে লিখিয়া পাঠাইবেন। সম্পাদক তাহার প্রকাশযোগ্য অংশ, ধর্ম্মতত্ত্ব ও নববিধান পত্রিকায় প্রকাশ করিতে দিবেন, এবং তিনি দরবারের নির্দ্ধারিত জ্ঞাতব্য বিষয় বিদেশস্থ প্রেরিতদিগকে জানাইবেন এবং তাঁহাদের জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর দান করিবেন।

সম্প্রতি কোচবিহারের মহারাজকে ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া জি, সি, এস্, আই, এই উচ্চতম উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। অযাচিতরূপে এই উপাধি লাভ করাতে কোচবিহারের মহারাণী গত শুক্রবার রাত্রিতে উডল্যাণ্ড রাজবাড়ীতে বিশেষ উপাসনা করিয়াছিলেন। তদুপলক্ষে কলিকাতাস্থিত অনেক প্রচারক উপস্থিত ছিলেন। উপাসনা প্রার্থনান্তে প্রীতিভোজন হইয়াছিল।

ভাই দীননাথ মজুমদার সপ্তাহকাল মেদিনীপুরে থাকিয়া সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন উপাসনা উপদেশ ও সৎপ্রসঙ্গাদি দ্বারা নববিধান প্রচার করিয়াছেন। তথাকার সম্ভ্রান্ত লোক সকল বিশেষ উৎসাহসহকারে তাঁহার কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন। দুই দিবস সামাজিক উপাসনা এক দিন গোপগিরিতে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার সময় উলুবেড়িয়ার অনতিদূরস্থ বাঁটুল গ্রামে ৩। ৪ দিন প্রীতিভাজন প্রিয়নাথ মল্লিকের বাড়ীতে অবস্থিতি করেন। সেখানে সামাজিক উপাসনা ও কীর্ত্তনাদি হয়, এবং তত্রত্য জমীদার ঘোষাল বাবুদিগের বাড়ীতে সঙ্কীর্ত্তন এবং স্কুলগৃহে বক্তৃতা হইয়াছিল।

ভাই গৌরগোবিন্দ রায় দিনাজপুরের অন্তর্গত ফুলবাড়ীতে তথাকার ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছেন।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মঙ্গলগঞ্জে, ভাই দীননাথ মজুমদার বাঁকিপুরে যাত্রা করিয়াছেন।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ভগলপুরের ব্রাহ্মসমাজের উৎসব কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য তথায় গিয়াছিলেন।

ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র কোচবিহারে গিয়াছেন।

বিগত শনিবার কলিকাতার অনতিদূরস্থ মুদিয়ালিগ্রামে আমাদিগের বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী দেবের দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী সুশান্তবালার সঙ্গে, যশোহর জেলার অন্তর্গত পেঁড়েগ্রাম নিবাসী শ্রীমান্ নিবারণচন্দ্র বসুর শুভ বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছে। পাত্রীর বয়স ১৫ বৎসর ও বরের বয়ঃক্রম ২২। ২৩ বৎসর। বিবাহসভায় প্রায় ৫০০ শত নরনারী উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতা হইতে বহু সংখ্যক প্রচারক ও ব্রাহ্মবন্ধু যাইয়া এই বিবাহে যোগ দিয়াছিলেন। ভাই অমৃতলাল বসু আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। আমরা বর কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করি। এই বিবাহে একটি নূতন সঙ্গীত গীত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

গীত।

কর জোড়ে করি মা গো এই নিবেদন।
নব দম্পতীরে ক্রোড়ে কর মা গ্রহণ॥

পবিত্র প্রেম বন্ধনে, বাঁধিয়ে আজি দুজনে, রাখ তব শ্রীচরণে জনমের মতন।

এত দিন যে বালিকার, লালন পালন ভার, রেখে ছিলে তাই আবার লইয়ে এখন; নব যুবকের করে, সমর্পিলে দয়া করে, দেখ যেন পারে ভার করিতে বহন।

সুকোমল লতা সম স্বভাবে বাড়িতে ছিল, জনক জননী কোলে সন্ততি রতন; যদি নব তরুবরে, জড়াইয়া দিলে তারে, ফল ফুলে সুশোভিত রেখ সর্ব্বক্ষণ।

গিরি ছাড়ি নদনদী পথে সম্মিলিত হয়ে, সিন্ধুতে মিলিতে বেগে ধায় গো যেমন; তেমনি এ দুজনার প্রেমনদী মিলে আজি, তব প্রেমসিন্ধু পানে করিল গমন।

আজি সংসার বিপিনে, প্রবেশিছে দুই জনে, হৃদয়ে ভাবিয়ে তব অভয় চরণ; হিংস্র জন্তু বহুতর, আছে বিপিন ভিতর, সভয়ে ডাকিলে মা দিও দরশন।

এই পত্রিকা ৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ।
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ।

২৩ ভাগ । ৫ সংখ্যা । | ১লা চৈত্র, মঙ্গলবার, ১৮০৯ শক । | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা ।

হে বিশ্বপালক, পরমেশ! এবার তুমি বিধাতা (লীলাময় হরি) রূপে প্রকাশিত হইয়াছ। তোমার ইচ্ছা আমরা তোমাকে হৃদয়-মূলে প্রতিনিয়ত ভক্তবৎসলরূপে অবতীর্ণ দেখিয়া বিমুগ্ধ হইব, তোমার অযাচিত করুণা সম্ভোগ করিয়া নিঃসঙ্কোচে তোমার হস্তে জীবন উৎসর্গ করিতে পারিব, কিন্তু তাহা অদ্যাপি হয় নাই। হরি হে, তোমার লীলার কথা অনেক শুনিয়াছি, নিজেও লোকের নিকটে অনেক বলিয়াছি; তোমার কৃপা সম্ভোগ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি, ধন্য হইয়াছি ইহাও লোকের নিকট ব্যক্ত করিতে ত্রুটি করি নাই, কিন্তু জীবনে ত তাহার প্রমাণ দেখাইতে পারিলাম না। যদি তোমার করুণা সম্ভোগ করিয়া সত্য সত্যই কৃত-কৃত্য হইতে পারিতাম, তবে এ জীবনে ভাব-বৈষম্য থাকিত না। তোমার নিকট যেমন শুনিতাম, যেমন দেখিতাম, লোকদিগকেও তাহাই দেখাইতাম ও শুনাইতাম, কিন্তু তাহা ত হয় না। অনেক সময়ে আমি যাহা বলি ও যাহা করি, তাহা যেন কৃত্রিম বলিয়াই বোধ হয়, কেবল কথা ও কার্য্য যে কৃত্রিম তাহা নহে, অনেক সময়ে তোমাকেও কৃত্রিম করিয়া লই। তোমার স্বরূপ ও বর্ণ ছাড়িয়া তোমাতে আমার কৃত্রিম স্বরূপ ও বর্ণ আরোপ করি। হে ভক্ত-বৎসল হরি, নিজের মনঃকল্পিত সজ্জাতে তোমাকে সজ্জিত করিয়া অনেক সময়ে প্রতারিত হই। যদি খাটি হয়ে তোমার নিকট হৃদয়দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিতে পারিতাম, তাহা হইলে তোমার পবিত্র মুখচ্ছবি অবাধে আমার হৃদয়ে পড়িতে পারিত। ঠাকুর! আশীর্ব্বাদ কর, দিন ত প্রায় শেষ হইল, এখনও পর্য্যন্ত যে কল্পনার রাজ্যে বাস করা দূর হইল না। তুমি লীলাময় বিধাতা অতি নিকটে আছ। জল বায়ু তেজঃ প্রভৃতি অপেক্ষাও তুমি অতি সহজলভ্য। তবে তোমাকে ছাড়িয়া মন, কল্পিতভাবের অনুসরণ করে কেন? তুমি কৃপা করিয়া চক্ষু দেও, খাটি চক্ষু দেও। যে চক্ষু আছে তাহা যে দৃষ্টিবিহীন; এ চক্ষু দ্বারা তোমার সৌন্দর্য্য ভালরূপে দেখা যায় না। ভালরূপে তোমাকে দেখিতে না পাইলে, কৃত্রিম ভাব দূর হইবে না। জীবনও যথার্থ নববিধা-নের অনুরূপ হইবে না। যে প্রতিনিয়ত তোমার পবিত্রহস্তে আপনাকে রাখিতে পারে, তাহার জীবন প্রতি দিন নূতন পুণ্য, নূতন প্রেম সঞ্চয় করিয়া নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিবেই করিবে। তাই বলি প্রভো! যাহাতে দিন দিন

পুরাতন ভাব পরিত্যাগ করিয়া নূতনত্ব লাভ করিতে পারি, দাসকে তাহার অনুরূপ আয়োজন করিয়া দাও, যাহাতে এ জীবনে নববিধান প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহা তোমার ক্রীড়া ভূমি, বিহার ভূমি রূপে পরিণত হয় তাহার অনুরূপ আশীর্ব্বাদ কর। এখন হইতে যেন তোমার দাসানুদাস হইয়া জীবন যাপন করিতে পারি।

"একমেব সমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি বহুনির্গুণাঃ।
একহীনা ন শোভন্তে যথা সংখ্যাঙ্কবিন্দবঃ।"

"যেমন সংখ্যাবাচক '১' এই রাশির উপরে যত শূন্য সন্নিবিষ্ট হইবে ততই তাহার বহুগুণ মূল্য বর্দ্ধিত হইবে, কিন্তু '১' এই রাশির অভাব হইলে কেবল শূন্যমাত্রের আর কোন মূল্য ও শোভা থাকে না, সেইরূপ এ সংসারে একক আশ্রয় করিয়া অনেক নির্গুণ গুণবন্তের ন্যায় প্রকাশ পায়, একের অভাব হইলে তাহাদিগের তাদৃশ শোভা ও মূল্য আর থাকে না।"

আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণের পর এই বাক্যটিকে আমরা বিলক্ষণরূপে সপ্রমাণ করিলাম। আমরা কিছুই নহি, আমরা মূল্যবিহীন শূন্যমাত্র। ঈশ্বরপ্রসাদে তিনি বস্তুরূপে আশ্রয়রূপে আমাদিগের নিকটে থাকিয়া আমাদিগকে শোভাযুক্ত ও মূল্যবান্ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন তাঁহাকে হারাইয়া আমাদিগের দুর্গতির সীমা নাই। তিনি আমাদিগের জীবিকা ও জীবন ছিলেন, আমরা তাঁহাকর্ত্তৃক জীবিত ছিলাম। জীবিকাও জীবনের অভাবে জীবিত যেমন আর জীবিত থাকিতে পারে না, আমাদিগের দশা তাহাই ঘটিয়াছে, অমরা জীবনসত্ত্বেও মৃতের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছি, সসার হইয়াও অসারবৎ প্রতিপন্ন হইতেছি। আমরা যে অসার অপদার্থ পদেপদে তাহার পরিচয় দিলাম। আমাদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বড় তিনি কত বড় তাহা আর এখন বুঝিতে পারা যায় না। কেন না এক জনের অভাবে সকলেরই মূল্য সমান বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে কিন্তু মিথ্যাদৃষ্টির প্রাবল্য হইতে আমাদিগের এই শোচনীয় দশা উপস্থিত। "তিনি আমাদিগের নিত্য কালের অনন্তকালের জীবনসঙ্গী, তাঁহা হইতে বিচ্যুত বা বিচ্ছিন্ন হওয়া আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব ও অসাধ্য।" এই বিশ্বাসের অদৃঢ় ভাব হইতেই আমাদিগের ঈদৃশ দশা ঘটিয়াছে। ভক্তবৎসল ভগবানের ইচ্ছাতে আমাদিগের সঙ্গে তাঁহার যোগ হইয়াছে, এই যোগের ভিতরে আমাদিগের ও জগতের পরিত্রাণের বীজমন্ত্র গুপ্ত ভাবে বা ব্যক্তভাবে নিহিত রহিয়াছে। এ বিশ্বাস যদি আমাদিগের দৃঢ়তর হইত, আমরা কদাচ তাঁহার শাসনে (শিক্ষাতে) অগ্রাহ্য বা অনাদর করিতে সমর্থ হইতাম না। মিথ্যাদৃষ্টির প্রাবল্য হেতু জীবনে অহঙ্কার স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে, এবং তাহা হইতেই আচার্য্যের উক্তি ও আচরণের মধ্যে দেবপ্রভাব অনুভব করিতে আমাদিগের বাধা জন্মে। অহঙ্কারের বল মিশ্রিত থাকাতে এই বাধা সত্যের ও ন্যায়ের কল্পিত ছদ্মবিরূপে প্রতিভাত হয়, তাই আমরা ইহার প্রতিকূলাচরণ করিতে অসমর্থ হই, এবং ক্রমে ক্রমে আচার্য্যের প্রদত্ত শাসন (শিক্ষা) হইতে স্খলিত বা ভ্রষ্ট হইয়া পড়ি।

যখন আমরা অন্যের অনুরাগের আশা করি, তখন "আমি তাঁহার বাল্যসঙ্গী, চিরসঙ্গী, আমার সঙ্গে তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা, আমার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত ভালবাসা, আমার প্রতি তাঁহার অমুক কার্য্যের ভার অমুক কার্য্যের ভার" ইত্যাদি কথা দ্বারা লোকের অনুরাগ আকর্ষণের চেষ্টা করি, কিন্তু তাঁহার স্বর্গীয়বলপূর্ণ শাসন গ্রহণ করিয়া জীবন গঠন করিতে যত্ন করি না, এবং একবারও ভাবি না যে যাঁহার কথা বলিতেছি, তিনি ত কেবল মৌখিক ভালবাসায় অপ্যায়িত নহেন। জীবন দিয়া তাঁহাকে গ্রহণ না করিলে তাঁহার প্রীতিভাজন হইবার আশা

নাই। এ কথা ভাবি না, বুঝি না কেন? মিথ্যাদৃষ্টির জন্য বা অহঙ্কারের জন্য। অহঙ্কারের বল বৃদ্ধি পাইলে আপনাকেই সর্ব্ববিষয়ে সম্পন্ন বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং আচার্য্যশাসনে দেব-নিঃশ্বসিত অনুভব করিয়া তাঁহার আনুগত্য করিতে প্রবৃত্তি হয় না। যখন আচার্য্য স্বর্গ-গামী হইলেন, তখন হইতেই আমাদিগের উপর অহঙ্কাররূপী শয়তানের দৌরাত্ম্য আরম্ভ হইয়াছে, তখন হইতেই সকলে স্ব স্ব প্রধান হইয়া আপন আপন রুচির অনুসরণ করিয়া সুখী হইতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না, কেন না এ পথে কৃতকার্য্যতা নাই। যদি আমরা আপন আপন রুচির বশবর্ত্তী হইয়া স্বেচ্ছা কল্পিত পথে চলিতে চেষ্টা না করিতাম, এবং আচার্য্যদেবকে (তাঁহার শরীরা-বস্থানকালে যেরূপ করিয়াছি,) মধ্যবিন্দু করিয়া তাঁহার শাসন গ্রহণ করিতাম, তাঁহার ইঙ্গি-তানুসারে যদি চলিতে পারিতাম। তিনি স্বশরীরে কোন কথা বলিলে যেমন দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহা প্রতিপালন করিতাম, শরীর ত্যাগের পরেও যদি তাঁহার উপদেশগুলির প্রতি সেইরূপে সমাদর করিয়া জীবন গঠনের চেষ্টা করিতাম, কদাচ আমাদিগের মধ্যে অমি-লন অসমন্বয় স্থান পাইতে পারিত না। সমাজ, দল, প্রেরিত, গৃহস্থবৈরাগী, সাধক প্রভৃতি সকলেই প্রায় উৎসন্ন দশা প্রাপ্ত হইতে চলি-লেন। যত দিন যাইতেছে তত অধোগমন বাড়িতেছে, কিন্তু কাহারও চেতনা হইতেছে না। যেমন মাদকসেবী অন্যের হিতোপদেশ শুনিয়া কিম্বা দৃষ্টান্ত দেখিয়া চেতনা প্রাপ্ত হয় না। সে কদাচ মাদকসেবনরূপ নিত্যকৃত্য পরিত্যাগ করিতে পারে না, সেইরূপ সংসার-মদে মত্ত হইয়া আমরাও চেতনাহীন হই-য়াছি। আপন শোচনীয় ভাব প্রত্যক্ষ দেখিয়া ও বুঝিতে পারিতেছি না।

এখনও সময় আছে, বিন্দু সকল চেতনা-বিহীন, চেষ্টাবিহীন তাই তাহারা চেষ্টা করিয়া রাশির আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে না কিন্তু মানুষ সচেতন ও সচেষ্ট। ইচ্ছা করিলেই চেষ্টা করিয়া পুনর্ব্বার রাশি বা আশ্রয় লাভ করিতে পারে। সে চেষ্টা যদি মেষদলের চেষ্টার ন্যায় সরল ও শীলতাপূর্ণ চেষ্টা হয়, অবশ্যই ফলবতী হইবে, কিন্তু চতুর সংসারী বৃকের ন্যায় চেষ্টা করিলে সফল হওয়া অস-ম্ভব। এখনও যদি আমাদিগের মণ্ডলীর বন্ধু-গণ সচেতন হইয়া প্রকৃত কল্যাণের পথে পদার্পণ না করেন তবে যে তাঁহাদিগের পরিণাম আর ভয়াবহ হইবে তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। যিনি এই প্রস্তাবের লেখক তিনিও এই মণ্ডলীভুক্ত একজন, সুতরাং তিনি কেবল পরোপদেশে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতেছেন না। তাঁহার আন্তরিক সরল অভিলাষ এই যে বন্ধুগ-ণের সঙ্গে মিলিত ভাবে চিরসঙ্গী আচার্য্যদেবকে জীবনে গ্রহণ করিয়া সুখী হন, কিন্তু বন্ধুবর্গের আনুকুল্য ব্যতীত এ আশা সফল হওয়া অসম্ভব। তাই সে বিনীত প্রার্থনা করিতেছে, যে স্বস্বরুচি পরিত্যাগ করিয়া সকলেই আচার্য্যদেবের আজ্ঞার অনুসরণ করুন। ইহা লেখকেরও নহে পাঠকেরও নহে, কিন্তু আচার্য্যের আজ্ঞা। সুতরাং লেখকের বটে পাঠকের বটে। ইহার জন্য লিখক দায়ী ও পাঠক ও দায়ী। এই আজ্ঞা পালন করিলে লিখক, পাঠক, ও জগৎ সকলেরই কল্যাণ হইবে নিশ্চয়। অবমাননা বা অনাদর করিলে, যাহা হইবে তাহাত প্রত্যক্ষ। পাঠক যদি তাঁহাকে আচার্য্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, এবং তাহা যদি তাঁহার প্রাণগত ধ্রুববিশ্বাস হয়, আর তিলার্দ্ধও বিলম্ব করিবেন না। যদি মনে করিয়া থাকেন যে আপন মনঃকল্পিত পথে চলিলেই জয়ী হইতে পারি-বেন, তাহা বড়ই দুরাশা। কেন না ৪ বৎসর চেষ্টা করিয়া কেবল অবনতি ভিন্ন আর কিছুই হস্তগত হয় নাই। এখনও চেষ্টা করিলে

আমাদিগের অকল্যাণ চলিয়া যাইতে পারে, অতএব সাহসে নির্ভর করিয়া কল্যাণের পথ আচার্য্যদেবের উপদেশ গ্রহণ করুন। ইহা করিলে অন্যের মতে চলা হইবে না, কিন্তু এত কাল দ্বিরুক্তি না করিয়া যাঁহার মতে চলিয়াছি সেই আচার্য্যদেবের মতেই চলা হইবে।

বিধানেই মিলন।

"বিধানেই মিলন" কিম্বা "মিলনের জন্যই বিধান" এই কথা দুইটি অতি রহস্যপূর্ণ। কেন না বিধান আসিল, দেশ দেশান্তরে, দিগদিগন্তরে প্রচারিত হইল, কত দুর্ব্বোধ্য সত্য বোধগম্য হইল, কত গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইল, ভিন্ন ভিন্ন দেশের, ভিন্ন ভিন্ন যুগের সাধু শাস্ত্র ভাব জ্ঞান বিজ্ঞান সমুদয় একত্র সন্নিবিষ্ট হইল, এবং স্রোতোনিক্ষিপ্ত তৃণের ন্যায় অনেক মানবদেহ অজ্ঞাতসারে একত্র সমবেত হইল. কিন্তু দেহের মিলন জীবনে পরিণত হইল না। সুতরাং মিলন কেবল কথার কথা হইয়া দাঁড়াইল। এখন লোকের নিকট বিধানের কথা বলিতে গেলে কেবল ব্যঙ্গ বিদ্রূপ শুনিতে হয়। বিধানের শুভ সংবাদ আর কেহ ভক্তি শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিতে চাহে না। কেন না বর্ত্তমান বিবাদ বিসংবাদের অবস্থা দর্শনে তাহারা বিধানের প্রতি সন্দিগ্ধচিত্ত হইয়াছে। এখন তাহারা বলে "যদি সত্য সত্যই বিধান আসিত তাহা হইলে দৈববলের জয় হইত, এবং প্রেরিত প্রচারক সাধক,গৃহস্থবৈরাগী ও সাধারণ উপাসক এ সকলের মধ্যে প্রাণে প্রাণে যোগ প্রতিষ্ঠিত হইত, কিন্তু কৈ তাহা ত দেখা যায় না। বিবাদ বিসংবাদ যত দেখা যায়, মিলন ত তাহার শতাংশের একাংশও দেখা যায় না, তবে বিধানের আগমন সত্য বলিব কিরূপে?"

এই সকল বিষয়ে আমাদিগের কিছু বলিবার আছে তাহা বলিতেছি। প্রথমতঃ "নববিধান কি" যদিও এ বিষয় ধর্ম্মতত্ত্বে অনেকবার আলোচিত হইয়াছে, তথাচ ইহাতে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করা অনেকের ভাগ্যে ঘটে নাই। কেন না প্রকৃত জ্ঞান জন্মিলে বিশ্বাস ও তদনুরূপ হইত কিন্তু তাহা হয় নাই, সুতরাং অদ্যকার উপযোগী বলিয়া প্রকারান্তরে তাহা পুনর্ব্বার স্মরণ করাইয়া দিতেছি। "বিধাতার সাক্ষাৎ ক্রিয়ার ফল নববিধান" এই কথাটি আর কিছু পরিস্ফুট হওয়া উচিত। বিধাতার সাক্ষাৎ ক্রিয়া কোথায়? বৃক্ষ, লতা, পর্ব্বত, প্রস্তর, মেঘ, বৃষ্টি, বজ্র, প্রভৃতিতে নহে কিন্তু মনুষ্য জীবনে। কোন মানবহৃদয়ে ভক্তবৎসল ভগবান অবতীর্ণ হইয়া সেই হৃদয়কে নানাবিধ স্বর্গীয় উপাদানে গঠিত ও সজ্জিত করেন। এইরূপে বিধাতা-কর্ত্তৃক যে ভক্তজীবন নবভাবে গঠিত ও সজ্জিত হয়, সেই নবগঠিত ভক্তজীবন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভক্তবৎসল ভগবানের (বিধাতার) নববিধান। ভক্তজীবনে দৈবশক্তি আবির্ভূত হইয়া সমুদয় ধর্ম্মতত্ত্ব, সমুদয় শাস্ত্র যুক্তি, সমুদয় সাধুভক্ত, সমুদয় জ্ঞান বিজ্ঞান ও ভজন সাধনের প্রণালীকে এক সম্বন্ধসূত্রে বা সমন্বয়সূত্রে গ্রথিত করিয়াছে। সুতরাং শাস্ত্র যুক্তি জ্ঞান বিজ্ঞানাদি, যাহা ভক্তজীবনের ভিতর দিয়া বাহিরে প্রকাশ পায় তাহা বিধানের বাহ্যপ্রকাশ কিন্তু মূলবিধান নহে। সাক্ষাৎ বিধান ভক্ত-জীবন। যদি এইরূপ সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় তাহা হইলে ভক্তজীবনের দৈববলে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা অতি আবশ্যক। কেন না এই বিশ্বস্ততা হইতেই সকলের নবজীবন পাইবার আশা, সুতরাং ইহাই মিলনের প্রকৃত ভূমি। কিন্তু এই ভূমিতে সকলের বিশ্বাস তুল্য না হওয়াতেই বিবাদ বিসংবাদ সংঘটিত হইয়া থাকে। আমি ভক্তজীবনের দৈববলে বিশ্বাস করি সুতরাং দৈববলপ্রসূত সমুদয় বিধি ব্যবস্থা আমার পরিত্রাণের উপায় বলিয়া মান্য করি, মণ্ডলীর অপর সকলেও তাহাই করেন তবে আর বিবাদ আসিবে

কোথা হইতে? আমি যাহা চাই আর আর সকলে তাহাই চাহেন, আমি যাহা বিশ্বাস করি, অন্য সকলেও তাহাই বিশ্বাস করেন, এরূপ হইলে বিবাদ অনৈক্য হওয়া অসম্ভব। বস্তুতঃ এই মূলভূমিতে, এই মূল বিধানে সকলের বিশ্বাস তুল্য নহে। যাঁহারা বিশেষ ভাবে অনায়াসে বিদ্যা বুদ্ধির গৌরস লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা দৈবকৃপায় পাইলেন বলিয়া মনে করেন না, কিন্তু আপন ক্ষমতাবলে উপার্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাস করেন, সুতরাং তাঁহারা আপনার ক্ষমতা ও বল বিস্মৃত হইয়া ভক্তজীবনের দৈববলের আনুগত্য করিতে পারিয়া ওঠেন না। কেবল তাহাই নহে, ইহাঁরা মণ্ডলীর অপর ব্যক্তিদিগের সঙ্গে আপনাকে তুল্যাধিকারী ও তুল্যমর্য্যাদ বলিয়াও বিশ্বাস করিতে পারেন না। ইহাঁরা আত্মজীবনকে যেমন দৈবশক্তি-বিহীন মনে করেন, ভক্তজীবনকেও তাহাই করেন। যদি ইহার বিপরীত হইত ইহাঁরা ভক্তের প্রকাশিত বিধি ব্যবস্থাতে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেন। যখন তাহা করেন না তখন ভক্তের দৈববলে বিশ্বাস করেন, ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায়? যিনি ভক্তজীবনের দৈবশক্তিতে সন্দিহান হইলেন, তিনি নববিধানেও সন্দিহান হইলেন, ইহা অতি সহজেই মনে হয়। কেন না ভক্তজীবন আর নববিধান একই বস্তু। এই সংশয়, অবিশ্বাসই বিনাশের বীজ। এ বীজ সজীব থাকিতে ঐক্য সম্মিলনের আশা নাই।

কেবল তাহাই নহে। মণ্ডলীর ভিতরে তুল্য কামিত্বও নাই। মণ্ডলীর সকলে একবস্তুর অভিলাষী নহেন। কেহ বা ধর্ম্ম চাহেন, কেহ পদমর্য্যাদা, ও বিশেষ সমাদর সম্মান চাহেন, কেহ সুখ সচ্ছন্দে আহার বিহারাদি পাইবার আশা করেন, সুতরাং পরস্পরে মিলে না—মতে ভাবে ঐক্য হয় না। এই কারণে, এই অমিলনের কারণে বিধানের প্রতি অবিশ্বাস করা চক্ষুষ্মান্ লোকের কার্য্য নহে। কেন না যে কার্য্য বা যে নিদর্শন দর্শন করিয়া বিধান সমাগত বলিয়া বিশ্বাস করা উচিত তাহা দেখা গিয়াছে। প্রথম নিদর্শন, এক জন মানুষের ভিতরে দৈবশক্তির আবির্ভাব, দ্বিতীয় নিদর্শন, সেই মানুষের দৈববলের অধীন হওয়া, তৃতীয় নিদর্শন এক জনের দৈববলে বহু লোক আকৃষ্ট হওয়া, চতুর্থ নিদর্শন অযোগ্য লোকদিগের যোগ্যতা লাভ, নানা তত্ত্বের আবিষ্কার ও মিলন বা সমন্বয় এ সমুদায় হইয়াছে; এবং পৃথিবী বিশেষ ভাবে এ সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছে, সুতরাং বিধানসমাগত বলিয়া নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা উচিত। আমাদিগের এই মতের সঙ্গে অনেকের ঐক্য হইবে না। কেন না মুখে যে যাহা বলুন, কার্য্যতঃ তাঁহারা ভক্তজীবনের অধীন হইতে প্রস্তুত নহেন। অনেকে ভক্তের সঙ্গে আপনাকে তুল্যবল ও তুল্যক্ষম বলিয়া মনে করেন। কেহ বলেন, যে ভক্ত স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমি একাকী কিছু নহি, সমুদয় দল মিলিত হইয়া কার্য্য করে, আমি দলের এক জন মাত্র" ভক্ত, দলকে এইরূপ উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু দল সেই উচ্চ আসনের অযোগ্যতার পরিচয় দিয়াছেন, দল আপনার জীবনের প্রকৃত দায়িত্ব বুঝিয়া কার্য্য করিতে অসমর্থ হওয়াতে সেই ভক্তই আবার তাঁহাদিগকে ফেলিয়োর (অযোগ্য) বলিয়া স্বহস্তে আসনচ্যুত করিয়া গিয়াছেন। আমরা জানি, এবং বিশ্বাস করি, ভক্ত, দলকে উন্নত করিবার জন্যই আসনচ্যুত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও চেতনা জন্মে নাই। বিশেষতঃ নববিধানে যত নূতন ভাব নূতন সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, যত সাধন সমন্বয় প্রকাশিত হইয়াছে তাহার একটিও দলের অপর কাহারও জীবন দ্বারা হয় নাই। সমুদয় এক ভক্তজীবন হইতে প্রসূত ও প্রকাশিত হইয়াছে। অপর সকলে সেই আবিষ্কৃত ও সমন্বিত

সত্য সকল দৈববলপ্রসূত বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন মাত্র। এই স্বীকার ও সাক্ষ্যদানেই দলের গৌরব। কেন না পৃথিবীতে শত শত, সহস্র সহস্র লোক আছে, আর কেহ সে দৈববলে আকৃষ্ট হয় নাই, অন্য কেহ সেই দৈববলসহ বিশেষ ভাবে পরিচিতও হয় নাই। যাঁহারা দৈববলকে দৈববল বলিয়া চিনিতে পারিলেন ও গ্রহণ করিলেন, তাঁহারাই সেই বলে আকৃষ্ট হইয়া দলবদ্ধ হইলেন। দল যেমন দৈববলকে দৈববল বলিয়া চিনিতে পারিয়া তাহা অঙ্গীকার করিয়াছিল বলিয়া মহিমান্বিত হইয়াছিল তেমনি যদি চিরকাল সেই ভাবটি দ্বারা জীবনের পুষ্টিসাধন করিতে পারিত, দলের দুর্জ্জয় বল কেহ সহ্য করিতে পারিতনা, কিন্তু দল তাহা পারিল না। পরস্পর মিলিত ভাবে সেই দৈববল গ্রহণ করিবার জন্য যত্ন না করিয়া, দল পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মনে মনে দৈবশক্তির প্রতি সন্দেহ করিতে লাগিল, ভক্ত জীবনের অনুরক্ত হইল না। তবে আর রক্ষা পাইবার আশা কি? পূর্ব্বে দল ছিলনা, যখন সকলে স্ববশে থাকিয়া স্ব স্ব রুচির অনুসণ করিয়া চলিত তৎকালে দল ছিল না। আবার যখন সকলে দৈবানুগত হইল, ভক্তের জীবনে দৈবশক্তি দেখিয়া মোহিত হইল এবং ভক্তের পবিত্র রুচির অনুসরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল, তখন দল হইল, যখন অজ্ঞাত সারে সকলে দৈব পরিচালিত হইয়া একত্র সমবেত হইল, যখন সকলের এক অভিলাষ এক লক্ষ্য এক গম্য এক অভিপ্রায় হইল তখন দল হইল। আবার যখন তাহারা দৈবানুগত্য পরিত্যাগ করিয়া স্ববশ হইল, স্ব স্ব রুচির অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল, সকলেরই ভিন্ন অভিলাষ, ভিন্ন লক্ষ্য ও ভিন্ন অভিপ্রায় হইল তখন দল ভাঙ্গিয়া গেল, সমুদয় বিচ্ছিন্ন হইল, এই কথা স্মরণ করিয়া কার্য্য করিলেই আবার দল হয় আবার মিলন হয়।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ত্যাগের জন্য সংন্যাসী প্রসিদ্ধ, বিশেষতঃ "কাম্যানাং কর্ম্মণাং ত্যাগং সংন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।" সর্ব্বপ্রকার অভিলাষ আকাঙ্ক্ষার পরিত্যাগই প্রকৃত সংন্যাস। মনে ইষ্টানিষ্ট ফলাফল লাভালাভ চিন্তা না করাই সংন্যাসীর পক্ষে বিধি, কিন্তু মানুষ বাহিরের সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া সংন্যাসীর লক্ষণ প্রদর্শন করে, বাহিরের বস্তু ত্যাগ করা সহজ। ভাল খাদ্য, ভাল শয্যা, ভাল গৃহ ও স্ত্রীপুত্রাদির সঙ্গস্পৃহা এ সমুদয়ই সে পরিত্যাগ করিয়াছে ও করিতেছে, কিন্তু ভিতরকার অহঙ্কারাদি সহজে যায় না। ভিতরকার অমুক শত্রু, অমুক মিত্র, অমুক আত্মীয়, অমুক পর ইত্যাদি ভাবঘটিত মানসিক বৈষম্য বহু কাল থাকিয়া যায়। এই জন্য পরিচ্ছদের বৈরাগ্য বা সংন্যাস চিরকাল মানুষকে সন্তুষ্ট রাখিতে পারে না। বাহিরের পরিচ্ছদ লোকচিত্তরঞ্জনের পক্ষে উপযোগী, কিন্তু চিত্তশুদ্ধির অনুকূল নহে, বরং প্রতিকূল বলিয়াই অনেক সময়ে বোধ হইয়া থাকে। এই জন্য পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের উপার্জ্জিত সম্পদ এক দিনে বিনষ্ট হইতে দেখা যায়। এ জন্য বিশেষ আন্তরিক সাধন চাই, যিনি ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগী, বিষয় আপনিই তাহাকে পরিত্যাগ করে। প্রকৃত বিশ্বাসজনিত অনুরাগ না হওয়া পর্য্যন্ত রিপু সকল মরেও না সরেও না।

যিনি সত্য কথা বলেন, সত্য কার্য্য করেন, তাঁহার ব্যবহার সরল না হইলে তাহা হইতেই মিথ্যা প্রসূত হয়। বাহিরে যে অসরল ব্যবহার প্রকাশ পায়, তাহা সত্যের আবরণ সন্দেহ নাই। কেন না সত্যকে প্রচ্ছন্ন করা ব্যতীত অসরলতা প্রকাশের আর কোনই কারণ দেখা যায় না। অসরল ব্যবহার যে কেবল সত্যের আবরণ তাহা নহে—ইহা দ্বারা বিশ্বাসেরও ত্রুটিসূচিত হয়। যিনি বিশ্বাসী, ঈশ্বর তাঁহার সঙ্গের সঙ্গী, হৃদয়ের আধার ও জীবনের নিয়ামক। ঈশ্বর কাছে আছেন ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াও কেহ অসরল ব্যবহার করিতে পারে না। যে ঈশ্বরকে প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করে, সে সরল ও নির্ম্মল হয়, যে মনে মনে ঈশ্বরের প্রতিসন্দিগ্ধ, সেই অসরল ব্যবহার করিতে সমর্থ।

পূর্ব্বে হিন্দুসমাজে সাধনের বল প্রবল ছিল, ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুদয়ে কুসংস্কারাদি যেমন পলায়ন করিয়াছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভজন সাধনের প্রয়োজনীয়তাও তিরোহিত হইয়াছে। কথায় অনেকে ভজন সাধনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন সত্য, কিন্তু কাজে তাহা ঘটিয়া ওঠে না। এই জন্য আজ কাল কথার ধর্ম্ম যেমন প্রচুর

পরিমাণে দেখা যায়, কিন্তু সাধনের সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যমনে গূঢ় ভাবে নাস্তিকতা কিম্বা সন্দিগ্ধতা উদিত হইয়াছে। অনেক বড় লোকের হৃদয়ও সান্দিগ্ধতারূপ তমোজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে। ইহা কথায় যত প্রকাশ হউক বা না হউক, কার্য্যে সর্ব্বদাই প্রকাশ পাইতেছে। আমরা এই দুরবস্থা দর্শনে বিশেষ ক্ষুণ্ণ আছি। বিধানবিশ্বাসীগণ প্রত্যেকে আপনার জীবনে বিধাতার জীবন্ত হস্তের চিহ্ন দেখাইয়া জগৎকে আশস্ত করিবেন ইহা আমাদিগের আশা।

আচার্য্যের উপদেশ।

বসন্তোৎসব।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

শুক্রবার ১৪ চৈত্র ১৮০১ শক।

ইহ কালের ধর্ম্মেতে স্বর্গের ধর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে প্রকাশিত হয়। আমরা যখন নিমীলিত নয়নে ব্রহ্মচিন্তা করি, কিম্বা সংসারের মধ্যে ধর্ম্ম সাধন করি তখনও স্বর্গের আভাস দেখিতে পাই। এখানকার ধর্ম্মগৃহের গবাক্ষের মধ্য দিয়া স্বর্গের বস্তু সকল, স্বর্গের পুণ্যঐশ্বর্য্য প্রভৃতি নয়নগোচর হয়। ইহ লোকে থাকিয়াই আমরা সময়ে সময়ে স্বর্গের উৎকৃষ্ট রঙ্গের দ্রব্য সকল দর্শন করিতে পাই। ইহা যদি সত্য না হইত আমরা এখানে থাকিয়া স্বর্গীয় প্রেরিত মহাপুরুষদিগের উৎসব ভোগ করিতে পারিতাম না। ইহলোকে থাকিয়াই আমরা পরলোকবাসীদিগের সঙ্গে যোগ নিবদ্ধ করিতেছি। তাঁহাদিগের আত্মা এখনেই আমাদিগকে বিশুদ্ধ এবং প্রফুল্ল করিতেছে। ঈশ্বরের আজ্ঞাতে এই পৃথিবীতেই স্বর্গের পদার্থ সকল শ্রান্ত পথিকদিগের নয়নগোচর হয়। কেবল যে পরলোকবাসী সাধুরাই স্বর্গভোগ করিতেছেন তাহা নহে, ঈশ্বর এই পৃথিবীর লোকদিগকেও স্বর্গের আভাস পাইতে অধিকার দিয়াছেন। এই পৃথিবীতেই কিছু কিছু স্বর্গের ধন আমাদের হস্তগত হইতেছে। কিরূপে এই মলিন পৃথিবীতে সে সকল স্বর্গের বস্তু আসিল আমরা জানি না; কিন্তু সময়ে সময়ে আমরা সে সকল ভোগ করিতেছি। কিরূপে স্বর্গের বস্তুসকল পৃথিবীতে আসিল? পৃথিবী স্বর্গের মধ্যে যে প্রাচীর রহিয়াছে তাহা কি ভাঙ্গিয়াছে? আকাশে কি ছিদ্র হইয়াছে? স্বর্গীয় লোকেরা কিরূপে পৃথিবীতে আসেন? সময়ে সময়ে কি স্বর্গের দ্বার খোলা হয়? ঈশ্বরের রাজ্যশাসনের নিগূঢ় কৌশল জানি না, কিন্তু তাঁহার আশ্চর্য্য প্রেমলীলা দেখিয়া অবাক্ হইতেছি। তাঁহার অপার করুণাগুণে এই পৃথিবীতে সময়ে সময়ে স্বর্গের বায়ু আসিয়া আমাদিগের চিত্ত রঞ্জিত করিতেছে। আমাদিগের চারিদিকে পৃথিবীর বস্তু সকল, কিন্তু মধ্যে মধ্যে স্বর্গের সামগ্রী দেখিতেছি, সহস্র সহস্র পৃথিবীর টাকার মধ্যে দুই একটি স্বর্গের রত্ন দেখা যাইতেছে। সমস্ত পৃথিবীতে অপ্রণয় ও স্বার্থপরতার মলিন পঙ্কিল জল; কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় আমরা সময়ে সময়ে স্বর্গের সুমধুর প্রেমরস আস্বাদন করিতেছি। হে বন্ধুগণ, স্থির হৃদয় হইয়া ভাবিয়া দেখ, এই জড় জগতের মধ্যেও স্বর্গের শোভা দেখিতে পাইবে। পৃথিবীতে অনেকগুলি বস্তু আছে, যে সকল দেখিলেই মনে হয় যে এ সকল পৃথিবীর বস্তু, পার্থিব, অসার, অস্থায়ী, কষ্টপ্রদ, কিন্তু এই পৃথিবীর মধ্যেই এমন অল্প কতকগুলি জিনীস আছে যে সকল জিনীস স্বর্গের শোভা প্রকাশ করে, এবং যে সকল বস্তু দেখিলে মনে হয় এই নরকের মধ্যে এ সকল কেন? এসকল বস্তু দেখিলে মনে হয় যেন স্বর্গের বস্তু সকল পৃথিবীতে মুখ বাড়াইতেছে। যেন পৃথিবীর জানলার ভিতর দিয়া স্বর্গের দেবতারা পৃথিবীর লোকের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। এ সকল বস্তু পৃথিবীতে থাকে না, ইহারা পৃথিবীতে আসে, পৃথিবীতে আসিয়া ইহারা স্বর্গের ভাব উদ্বোধন করিয়া করিয়া দেয়। ইহারা যাত্রীরূপে, পথিকরূপে, আমাদিগের নিকটে সময়ে সময়ে আগমন করে। এ সকল বস্তু পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে উচ্চ। পৃথিবীর অন্যান্য দ্রব্য পৃথিবীর রঙ্গের সঙ্গে মিসিয়া গিয়াছে; কিন্তু এই বস্তুগুলি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র। অন্য বস্তু সকল পৃথিবীর লক্ষণবিশিষ্ট, এই বস্তুগুলি স্বর্গহইতে আসিয়াছে, এবং স্বর্গের লক্ষণাক্রান্ত।

হে ভাবুক, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যখন তোমার মনে নানা ভাবের উদয় হয় তখন তুমি তুলনার জন্য কোথায় যাও? মধুকর ফুলের মধ্যে কেন যায়? লৌহেতে যায় না কেন? তুমি ভাবের ভাবুক যদি হও তবে তুমি তোমার ভাব চরিতার্থ করিবার জন্য সকল বস্তুর কাছে যাও না, কয়েকটি বিশেষ বস্তু আছে, যাহার কাছে তুমি যাও। এমন কতকগুলি বিষয়, সময়, অবস্থা এবং বস্তু আছে যাহা তুমি সর্ব্বদা মনে মনে স্মরণ কর। সর্ব্বাগ্রে তুমি চিন্তা করিয়া থাক "কি আমার হওয়া উচিত?" যখন তোমার বসন্ত কাল মনে হইবে তখন তোমার এইরূপ ইচ্ছা হইবে "চিরবসন্ত যেন আমার জীবনের অবস্থা হয়।" বসন্ত দেখিয়া আর তোমার শীত, গ্রীষ্ম, শরৎ ভাল লাগে না। বসন্তের সঙ্গে জীবনের উৎকৃষ্ট অবস্থার তুলনা হয়। বসন্ত কালে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয়, বসন্ত কালে বিচিত্র পক্ষীসকল সুস্বরে গান করে। এই সময় মানুষের মন অত্যন্ত সুখী হয়। এই সময়ে ঈশ্বরপ্রেমিকেরা বন উপবনে ঈশ্বরকে সঙ্গে লইয়া কত সুখ সম্ভোগ করেন। বসন্ত কাল যেন পথ

ভুলিয়া স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আসিয়াছে। বাস্তবিক বসন্ত কাল আর এক দেশ হইতে পথ ভুলিয়া এই দেশে আসিয়াছে তাহা নহে; কিন্তু দয়াসিন্ধু ঈশ্বর, আমাদিগকে সুখী করিবার জন্য তাঁহার স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে বসন্ত কালকে প্রেরণ করেন। বিশেষরূপে জীবের দুঃখ কষ্ট দূর করিবার জন্য বসন্ত কালের আগমন হয়। ভাবুক ব্যক্তি অভিলাষ করেন বসন্ত কালে যেমন শরীরের অবস্থা হয়, আত্মার অবস্থা যেন সেইরূপ হয়। আত্মার চিরবসন্ত যথার্থ মোক্ষধামের অবস্থা। বসন্ত স্বর্গের আভাস প্রকাশ করে।

যেমন বসন্তকাল স্বর্গীয় লক্ষণাক্রান্ত সেইরূপ পূর্ণিমার চন্দ্রও স্বর্গের ভাব উদ্বোধন করে। আকাশে নিত্য কত পরিবর্ত্তন হইতেছে, কত বিচিত্র আলোক ঝক্মক্ করিতেছে, কিন্তু যেই দিন আকাশে পূর্ণচন্দ্র হাসিতে লাগিল সেই দিন ভাবুকের মন জিজ্ঞাসা করিল, আজ কেন চারিদিক সুধাময়, আজ কেন ভূলোক দ্যুলোক হাসিতেছে? যদি কেবল আলোক দেওয়াই চন্দ্রের উদ্দেশ্য হইত তবে চন্দ্র জ্যোৎস্নায় এত সুন্দর হইবার কি প্রয়োজন ছিল? পূর্ণচন্দ্র দেখিলে মনে হয় যেন আকাশের জানালার ভিতর দিয়া স্বর্গের পরী মুখ দেখাইতেছে। চন্দ্র যেন ভাবুককে বলিতে থাকে, "আমি স্বর্গে আছি, স্বর্গের ভিতরে থাকিয়া পৃথিবীকে আমার কিয়দংশ রূপ লাবণ্য দেখাইতেছি।" আকাশে আর আর যত তারা দেখা যায়, চন্দ্র তাহাদিগের শ্রেণীবদ্ধ নহে। বরং নক্ষত্রের আলোক পৃথিবীর উপযুক্ত; কিন্তু এমন পূর্ণচন্দ্রের শোভা পৃথিবীর উপযুক্ত মনে হয় না। এমন মনোহর চন্দ্র যিনি সৃজন করিয়াছেন, চন্দ্র তাঁহারই স্বর্গের আভাস প্রকাশ করে। চন্দ্রের জ্যোৎস্না দেখিয়া ভাবুক কবি এবং ভক্তেরা ঈশ্বরের একটি নাম রাখিয়াছেন "প্রেমচন্দ্র"। যেমন আকাশে চন্দ্রোদয় হইয়া জ্যোৎস্না বর্ষণ করে সেইরূপ হৃদয় আকাশে প্রেমচন্দ্র উদিত হইয়া প্রেমসুধা বর্ষণ করেন। চন্দ্রের নিকটে আমরা এ সকল সুন্দর উপমা পাইয়াছি। চন্দ্র সহজে স্বর্গের ভাব উদ্বোধন করে।

এইরূপে পূর্ণিমার চন্দ্র যেমন মনুষ্যের শরীর মন স্নিগ্ধ করে, সুশীতল সমীরণও উত্তপ্ত শরীরকে শীতল করে। যখন জীব সকল সূর্য্যের প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত হয় তখন সুস্নিগ্ধ বায়ু আসিয়া তাহাদিগের উত্তপ্ত শরীর শীতল করে। যখন দক্ষিণ সাগরের বক্ষের উপর দিয়া শীতল সমীরণ আসিয়া ক্লান্ত উত্তপ্ত শরীরকে শীতল করে, তখন ভাবুকের মনে কত ভাবের উদয় হয়। যেমন জড়রাজ্যে সুশীতল সমীরণ উত্তপ্ত শরীরকে স্নিগ্ধ করে, সেইরূপ ধর্ম্মরাজ্যে শান্তিসমীরণ আসিয়া পাপতাপে উত্তপ্ত আত্মা সকলকে সুস্নিগ্ধ করে। যখন মন্দ মন্দ সমীরণ নদীর উপর দিয়া আসিয়া উত্তপ্ত শরীরের উত্তাপ হরণ করিয়া আরাম দেয় তখন ভাবুকের মনে হয় যেন স্বর্গ হইতে বেড়াইতে বেড়াইতে এই বায়ু আসিল। বাস্তবিক করুণাসিন্ধু ঈশ্বর শ্রান্ত উত্তপ্ত জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য স্বর্গ হইতে সুশীতল সমীরণ প্রেরণ করেন। সমীরণ স্বভাবতঃ ভক্তের মনে স্বর্গের ভাবের উদ্বোধন করে।

তৃতীয়তঃ—পৃথিবীতে আর একটি বস্তু আছে যাহা দেখিলে স্বর্গ মনে হয়। সেই স্বর্গীয় বস্তুটি শিশু সন্তান। অন্যান্য মানুষকে দেখিলে মনে হয় ইহারা পৃথিবীর উপযুক্ত; কিন্তু ক্ষুদ্র শিশুকে দেখিলে বলিতে ইচ্ছা হয়— "শিশু, তুমি বুঝি স্বর্গ হইতে নামিয়া ভূতলে আসিয়াছ? নির্দ্দোষ শিশু, সুন্দর নির্ম্মল পদ্মের ন্যায় প্রস্ফুটিত তোমার মুখ, তুমি এখানে কেন?" ধর্ম্মের আকর, শুদ্ধতার আকর, মনোহর প্রিয়দর্শন শিশু স্বর্গের শোভা প্রকাশ করিবার জন্য পৃথিবীতে অবতরণ করে। শিশু স্বর্গের লোকদের মত ব্যবহার করে। শিশুর চরিত্রে কপটতা নাই, অপবিত্রতা নাই। এই জন্য এক জন মহর্ষি বলিয়াছেন, শিশু না হইলে স্বর্গে প্রবেশ করা যায় না। নির্দ্দোষ শিশুকে দেখিলে স্বভাবতঃ স্বর্গের ভাব উদ্বোধিত হয়।

চতুর্থতঃ—পাখীর গান স্বর্গের ভাবের উদ্বোধন করে। পাখীদিগের আনন্দপূর্ণ গান ভক্ত ভাবুকদিগকে বৈরাগ্য শিক্ষা দেয়। ঈশ্বর চাহেন যে আমরা পাখীর ন্যায় নিশ্চিন্ত হইয়া কেবল তাঁহার করুণার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার রাজ্যে বিচরণ করি। নতুবা আমাদিগকে পাখীর গান শুনাবার কি প্রয়োজন ছিল? পাখী যখন ডালে বসিয়া মনের আনন্দে গান করে, তখন সে পলকের মধ্যে হাজার লোকের মন বিমোহিত করিতে পারে। যখন পাখী মধুর হইতে মধুরতর স্বরে গান করে তখন তাহার মনের আনন্দ ঘনীভূত হয়, সেই আনন্দধ্বনি শুনিয়া শোকদুঃখসন্তপ্ত মনুষ্যের প্রাণ উল্লাসিত হয়। এই জন্যই কোন কোন রাজা সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াও এক একটি পাখী ক্রয় করিয়া তাহার গান শ্রবণ করেন। তিনি জানেন এই দুঃখ দুর্ভাবনাপূর্ণ পৃথিবীর কণ্ঠে স্বর্গের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। জীবচিত্ত বিনোদন করিবার জন্য স্বর্গের পাখী পৃথিবীতে আসিয়াছে। এমন সুমিষ্ট গান আর কে শুনাইবে? এক একটি পাখী যেন এক এক খানি সুমিষ্ট বীণার আকার ধরিয়া আকাশে উড়িতেছে? স্বর্গেতে ভক্তপাখীদিগের মুখে হরিনাম শ্রবণে জীব কিরূপ মোহিত হইবে তাহার আভাস প্রকাশ করিবার জন্যই ঈশ্বর আমাদিগের নিকট পাখী সকল প্রেরণ করেন। পাখীর গান শুনিয়া ভক্ত ভাবুকের মনে কত ভাবের উদয় হয়।

এইরূপে পূর্ণিমার চন্দ্রে, সুশীতল সমীরণে, ক্ষুদ্র শিশুর মুখে, এবং পাখীর সুমিষ্ট কণ্ঠে ভক্ত ভাবুক স্বর্গ অনুভব করেন।

পঞ্চমতঃ—এই ফুলগুলিও নিশ্চিত স্বর্গের জিনিষ। ফুল-গাছ পৃথিবীতে জন্মে, কিন্তু ফুল মাটিতে জন্মে না। ফুল ঈশ্বরের হস্ত হইতে আসিতেছে। ফুল স্বর্গের উৎকৃষ্ট বস্তু। ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য হইতে সময়ে সময়ে পুষ্প সকল পৃথিবীতে আসে। বিচিত্র রঙ্গের ফুল সকল দেখিয়া মনে হয় প্রেমময় ঈশ্বর কেমন ছবি আঁকিতে পারেন, কত রঙ্গ ফলাইতে পারেন। এ সকল পুষ্প ভক্তদিগকে ডাকিয়া বলিতেছে—"আমরা তোমাদিগকে আমাদের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া মোহিত করিব, এবং তোমাদের নাসিকায় সুগন্ধ দিব।" ধর্ম্মরাজ্যের সাহিত্যে ফুলের উপমার অন্ত নাই। পুণ্য ফুল ফুটিল, প্রেম ফুল ফুটিল, ইত্যাদি কত কথা আমারা ব্যবহার করি। যখন আমাদের প্রাণকে কোমল করিতে ইচ্ছা হয়, তখন বলি ইহাকে ফুলের মত কোমল করিতে হইবে। প্রেমফুল ফুটিয়া হৃদয়বাগান আমোদিত করুক, ব্রহ্মপাদপদ্ম বক্ষে ধারণ করিয়া হৃদয় শীতল করি, ভক্তিরাজ্যে প্রায়ই এ সকল কথা ব্যবহৃত হয়। হরিপাদপদ্ম বলিলেই ভক্তের মনে স্বর্গের সৌন্দর্য্য, সৌরভ এবং কোমলতা মনে হয়। এই জন্য চরণ বলিলেই ভক্তের মনে চরণকমল মনে হয়। কমল হইতে চরণকে বিচ্ছিন্ন করা ভক্তের পক্ষে অসম্ভব। দুই বস্তু ভাবযোগে একত্র হইয়া গিয়াছে। ভক্ত শুষ্ক পাথরের মত ভাবিতে পারেন না। যেমন পদ্ম অতি সুকোমল, দেখিতে সুন্দর এবং সৌরভবিশিষ্ট এবং পদ্মকে স্পর্শ করিতে, মাথায় রাখিতে এবং বক্ষে রাখিতে ইচ্ছা হয়, সেইরূপ হরিপাদপদ্ম ভক্তের আদরের ধন। তিনি ঐ পাদপদ্মে তাঁহার মাথা রাখেন, গাল রাখেন, বক্ষ রাখেন। হরিপদ স্মরণ হইলেই তাঁহার ফুলের কথা মনে পড়ে। তিনি বলেন "প্রেমফুল দিয়া হরির পূজা করিব, মধুকর যেমন লুক্কায়িত হইয়া ফুলের মধু পান করে তেমনই প্রমত্ত হইয়া হরিপদকমলমধু পান করিয়া ফুলের আনন্দে মগ্ন হইব।" যোগী আধ্যাত্মিক-ভাবে লুকাইয়া হরিপাদপদ্মরূপ কোমল যোগাসনে বসিয়া স্বর্গের মধুপান করেন। এই ফুল বাস্তবিক স্বর্গের জিনিষ। মলিন মানব, অধিক ফুল তুমি গ্রহণ করিও না। ফুলকে পবিত্র জানিও। ফুল ধর্ম্মপথের অত্যন্ত উপকারী সহায়। অতএব ফুলের অপব্যবহার করিও না, অল্প ক্ষণ ফুলকে কাছে রাখিয়া প্রাণের উৎকর্ষ সাধন করিও। যেখানে সেখানে ফুল ফেলিও না। পায়ের তলায় ফুল ফেলিও না। ফুলকে বহু মূল্য জানিয়া মস্তকে রাখিবে। ফুলের মধ্যে সৌন্দর্য্যের আধার পরম সুন্দর প্রাণনাথকে দেখিবে। প্রত্যেক ফুলের মধ্যে ঈশ্বর স্বর্গের সুসংবাদ রাখিয়াছেন জানিবে। ফুলকে অগ্রাহ্য করিওনা, প্রকৃতির মধ্যে ফুল অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। বিলাসের জন্য ফুল নহে। ফুল আসিয়াছে স্বর্গের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিবার জন্য এবং স্বর্গের সৌরভ বিতরণ করিবার জন্য। যেমন বাহিরের বাগানে ফুল ফুটিয়া তোমাদিগকে আমোদিত করে, সেইরূপ তোমাদের হৃদয়ের বাগানে পুণ্য-ফুল, প্রেমফুল প্রস্ফুটিত হইয়া তোমাদিগের ঈশ্বরকে, প্রেমের সৌরভ, ভক্তির সৌরভ প্রদান করুক! হে ব্রাহ্মগণ, বসন্তকালের উৎসবে এই কএকটি স্বর্গের বস্তুকে ভালরূপে চিনিয়া লও। পূর্ণিমার চন্দ্র, সুশীতল সমীরণ, ক্ষুদ্র শিশু, পাখী এবং ফুল এসমস্তই স্বর্গের আভাস প্রকাশ করে। এসমস্ত বস্তুর মধ্যে সর্ব্বদাই তোমরা স্বর্গ দর্শন করিতে যত্ন করিও।

ধর্ম্ম-বিজ্ঞান-বীজ।

চতুর্থ খণ্ড।

শাস্ত্রের দ্বিবিধ ভাব।

শাস্ত্রের দুইটি ভাব আছে, একটি জীবন্ত অন্যটি মৃত। যখন ভক্তহৃদয়ে ব্রহ্মবাণী প্রকাশ পায়, তখন সেই শাস্ত্র জীবন্ত। তাহার প্রভাব ও বল দুর্জ্জয় অসীম। তার পর সেই শাস্ত্র যখন মানবীয় ভাষাতে গ্রন্থবদ্ধ হয়, তখন তাহার পরাক্রম আর তেমন থাকে না, সে তেজ, সে প্রভাব আর অনুভূত হয় না। যে শাস্ত্র প্রহ্লাদকে অভয় দিয়া অগ্নি বিষ পর্ব্বতপাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল—অথবা প্রহ্লাদ যে মহাবাক্য শ্রবণ করিয়া অবলীলাক্রমে বিষভক্ষণ, অগ্নি-প্রবেশাদি করিয়াছিল, সেই শাস্ত্র গ্রন্থবদ্ধ হইয়া আছে—প্রতিদিন অবিশ্বাসী বা অল্পবিশ্বাসী মানবগণ তাহা পাঠ করিতেছে, কিন্তু সেরূপ অভয় প্রাপ্ত হয় কৈ? তাহাদিগের ভীতি (অবিশ্বাস) দিন দিন যেন বাড়িতেছে। সেই মহাপুরুষ ঈশার হৃদয়ে প্রকাশিত শাস্ত্র অদ্যাপি আছে—কত শত শত লোক তাহা পাঠ করিতেছে—কিন্তু তেমন আশা ও অভয় আর কেহ পায় না। সেই মুষা, সেই মোহম্মদ, সেই শাক্য ও চৈতন্যের জীবনময় মহাশাস্ত্র অদ্যাপিও জগতের লোকের নিত্য পাঠ্য হইয়া আছে, কিন্তু তেমন করিয়া আর কাহার নিদ্রা ভঙ্গ করে না—আর তেমন করিয়া কাহাকেও পাপ দুর্ব্বলতা মিথ্যার প্রতিকূলে পরিচালিত করে না। এই সব দেখিয়া শুনিয়া বোধহয় শাস্ত্র সকল যেন মরিয়াছে, তাহাদের ভিতরে যেন আর প্রাণ নাই। সত্য সত্যই কি শাস্ত্রের মৃত্যু আছে? স্বর্গের দেববলে সৃষ্ট হইয়াছে যে শাস্ত্র তাহার কি বল হ্রাস হয়? তাহার তেজ প্রভাব কি খর্ব্ব হয়? কখনও না। শাস্ত্র, যাহা দেববাক্য, দুর্জ্জয় বলের আধার তাহা কখন তেজোহীন নিষ্প্রভ হইতে পারে না। কিন্তু মানুষ মরে, মনুষ্যের হৃদয়, যাহা ঈশ্বরের বিহারভূমি—যাহা দিব্যালোকে আলোকিত, যেখানে প্রতিনিয়ত ভগবানের লীলামহোৎ-

সব হয়, পাপপ্রভাবে সেই হৃদয়ে অসুরগণ প্রবেশ করতঃ অধিকার বিস্তার করিতে থাকে। ভগবানের লীলাভূমি আসুরিক লীলার আশ্রয় হয়। দিব্যালোক, দেবপ্রভাব আর সেস্থানে থাকিতে পারে না। সেই জন্য দৈববাণী (বেদ শাস্ত্র) তাহাতে আর কোন কার্য্য করিতে পারে না। দৈববল সেখানে মৃতপ্রায় বোধহয়। বস্তুতঃ দৈববল পূর্ব্বে যেমন পরেও সেইরূপ আছে—কিন্তু বিষয়বিদূষিত-দৃষ্টি মানবগণ সে দৈববল আর সেরূপ উজ্জ্বল ভাবে দেখিতে পায় না। তাহারা আপনার দৃষ্টিবিহীনতা বুঝিতে পারে না—আপনাদিগের অধঃপাত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না, কিন্তু দৈববলের দোষ দেয়। তাহারা বলে, সে স্বর্গের বল যাহা পাপীর পরিত্রাণের জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা আর পৃথিবীতে নাই। স্বর্গের সম্পদ স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে। যখন মহাপুরুষ ঈশা জন্মগ্রহণ করিলেন, চৈতন্য শাক্য প্রভৃতিরা জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন সাক্ষাৎ দৈবশক্তি স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া দুর্ব্বল মানবহৃদয়ে মহাবিশ্বাসের অগ্নি জ্বালিয়াছিল, এখন কি আর সে দৈবপরাক্রম নাই? ঈশ্বর কি তাঁহার বিশ্বব্যাপিনী মহাশক্তি সঙ্কুচিত করিয়াছেন? কখনই না। এইরূপ নববিধানের অভ্যুদয়ে বহু নিদ্রিত জাগিল—অনেক মৃত পুনর্জীবিত হইল, অনেক মূর্খ পণ্ডিত হইল—রাশি রাশি পাপ তাপ পুড়িয়া ভস্মীভূত হইল,—সুতরাং অনেক পাপী পাপমুক্ত হইল, কত অপরিচিত অকর্ম্মণ্য লোক জগতে পূজিত হইল। সাক্ষাতে স্বচক্ষে দর্শন করিলাম—অল্প দিন যাইতে না যাইতে সেই সকল লোক দুর্ব্বল অল্পবিশ্বাসী হইয়া গেল। যাঁহারা আপনারা দৈবপ্রভাবে দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন—পাপপ্রবৃত্তির পরিবর্ত্তে পুণ্যপ্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন, তাঁহারা ক্ষীণবিশ্বাসী হইয়া বলিতে লাগিলেন, "সে স্বর্গীয় বল আর নাই। যাহা স্বর্গ হইতে আসিয়াছিল তাহা ফিরিয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে।" যদি গূঢ়রূপে অনুসন্ধান কর দেখিতে পাইবে, স্বর্গীয় বল বস্তুতঃ পলায়ন করে নাই, কিন্তু যাঁহারা ঐরূপ বলেন, তাঁহারা আপনারাই অল্পবিশ্বাসী স্বার্থপর হইয়া হিংসা বিদ্বেষ প্রভৃতি দ্বারা আপন আপন হৃদয়কে কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছেন, সুতরাং দৈববলের প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া বলেন যে, "সে বল সে দৈবশক্তি আর পৃথিবীতে নাই।" বস্তুতঃ দৈববল যাহা আসিয়াছিল তাহা আছে, মানবগণ আপনাদিগকে যদি দৈববল ব্যবহারের উপযুক্ত করিতে পারে আপন হৃদয়ে যোগ্যতা সঞ্চয় করিতে পারে, দেখিতে পাইবে তাহার এখনও সেই দৈববলে বলী হইয়া "পর্ব্বতকে স্থানান্তরিত হও বলিলে অমনি উহা চলিয়া যাইবে।"

জ্ঞান ও ভক্তির তারতম্য।

দ্বিতীয় খণ্ড ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজে, উপাসনার প্রয়োজনীয়তা উপাসনায় যোগ্যতা লাভের উপায় কথঞ্চিৎ সমালোচিত হইয়াছে। সেই উপায় সকলের মধ্যে জ্ঞান এবং ভক্তির কথাও বলা হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞান ও ভক্তিমধ্যে তারতম্য কিরূপ তাহা প্রদর্শিত হয় নাই। নববিধানে যদিও কোন ধর্ম্মাঙ্গকে উপেক্ষা করিবার বিধি নাই, তত্রাপি তত্ত্বনির্ব্বাচনসম্বন্ধে তাঁহাদিগের স্বরূপগত তারতম্য প্রদর্শন করা একান্ত কর্ত্তব্য। অতএব চতুর্থ খণ্ডে সেই তারতম্য প্রদর্শনপূর্ব্বক যাহাতে সহজে ভক্তিপথের যাত্রী হওয়া যায় তাহার চেষ্টা করা যাইতেছে।

জ্ঞান এবং ভক্তি মধ্যে একটি মনুষ্যের চেষ্টাপরিপুষ্ট, অন্যটি দেবপ্রসাদলব্ধ। একটিতে সাধক স্বয়ং চেষ্টা করিয়া ঈশ্বরকে ধরেন, অন্যটিতে ঈশ্বর চেষ্টা করিয়া সাধককে ধরেন। সাধকের মানবোচিত দৌর্ব্বল্য আছে, সুতরাং তিনি কেবল নিজের বলে চিরকাল ঈশ্বরকে ধরিয়া রাখিতে পারেন না, কিন্তু ঈশ্বরের বল অমিত, তিনি যাহাকে ধরেন তাহার আর পতন নাই। এইরূপ একটি সংশয়সঙ্কুল, দ্বিতীয়টি নিঃসংশয় ও নিশ্চিত। একটি অহঙ্কার বিজৃম্ভিত, দ্বিতীয়টি আত্মস্ফূর্ত্তি-বিবর্জ্জিত নিরহঙ্কৃত ভাব।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা আরও কিঞ্চিৎ বিশদ হওয়া উচিত। জ্ঞানবস্তু সংশয়সমুৎপন্ন। সংশয় হইতে জ্ঞান কেবল জন্মগ্রহণ করে না, কিন্তু সংশয়েই তাহার পুষ্টি ও জীবন। প্রথমতঃ সংশয় জন্মে, তার পর জিজ্ঞাসা, জিজ্ঞাসা হইতেই জ্ঞানের উৎপত্তি। এ সংশয় অসীম, জিজ্ঞাসাও অসীম, সুতরাং জ্ঞানের গতি নিরঙ্কুশ। জ্ঞানের পথে নিশ্চয় বা অবশ্যম্ভাবী অবস্থা নাই, ভক্তির পথে আছে। মনুষ্যচিত্তকে তাহার প্রকৃতি অনুসারে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। একটি মন, অন্যটি হৃদয়। মনের বংশসম্ভূত জ্ঞান, হৃদয়ের বংশসম্ভূত ভক্তি। মন এবং হৃদয়ের প্রকৃতি অনুসারেই জ্ঞান এবং ভক্তির গৌরব নির্দ্ধারিত হইবে। অভিধানে মন এবং হৃদয়কে এক পর্য্যায়ে গ্রথিত করা হইয়াছে। কিন্তু তত্ত্বশাস্ত্রের প্রণালী অনুসারে উহারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বস্তু, কেন না ইহাদিগের প্রকৃতি পরস্পরের বিপরীত। এক বস্তু হইলে প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন বা বিপরীত হওয়া অসম্ভব। মন চঞ্চল, হৃদয় স্থির। মন অতৃপ্ত, হৃদয় চিরপরিতৃপ্ত, মন সংশয়ী, হৃদয় নিঃসংশয় ও নিশ্চিন্ত। মন হইতে চিন্তা, চিন্তা হইতে সংশয়, সংশয় হইতে জিজ্ঞাসা, জিজ্ঞাসা হইতে জ্ঞান জন্মগ্রহণ করে। অন্য দিকে হৃদয় হইতে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা হইতে বিশ্বাস, বিশ্বাস হইতে ভক্তির জন্ম।

মন চিন্তা করে—ক্রমাগত চিন্তা করে, সে চিন্তার বিরাম নাই। একটি চিন্তিত সংশয়ের পূর্ব্বাপর, ভাবাভাব পর্য্যা-

লোচনা করিয়া জ্ঞান একটি নূতন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, এবং সেইটি মনের সম্মুখে প্রদান করিয়া মনকে পরিতৃপ্ত করিতে চেষ্টা করে। মন সেই সিদ্ধান্তটি লাভ করিয়া অল্পক্ষণের জন্য সন্তুষ্টি প্রকাশ করে বটে, কিন্তু সেই সন্তোষ লইয়া সে চিরকাল নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। সুতরাং আবার চিন্তা, আবার সংশয়, আবার জিজ্ঞাসা আসিয়া মনকে চঞ্চল করিয়া তোলে। আবারও জ্ঞান আসিয়া একটি নূতন সিদ্ধান্ত উপস্থিত করে কিন্তু তাহাতে কি? মন কিছুতেই চির কাল তৃপ্ত ও সুস্থির থাকিতে পারে না। এই প্রকার অতৃপ্তির পর চিন্তা, চিন্তার পর সংশয়, সংশয়ের পর জিজ্ঞাসার বিরাম নাই। সুতরাং জ্ঞানের পথে কখন সংশয়শূন্য অবস্থা আসিতে পারে না। এই জন্য বলা হইয়াছে সংশয় হইতে জ্ঞানের জন্ম, জ্ঞান সংশয়সঙ্কুল। মনুষ্য স্বয়ং চেষ্টা করিয়া ইহা উপার্জ্জন করে অর্থাৎ ইহার পুষ্টি সাধন করে, এই জন্য জ্ঞান অহঙ্কারবিজৃম্ভিত। (ক্রমশঃ)

সংবাদ।

বিগত ১৫ই ১৬ই ১৭ই এই তিন দিন ব্যাপিয়া ফুলবাড়ী ব্রাহ্মসমাজের উৎসব অতি সুন্দর ভাবে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এবার তথাকার ব্রাহ্মগণ বিশেষ উৎসাহ ও যত্ন পূর্ব্বক উৎসব করিয়াছেন। ভাই গৌরগোবিন্দ রায় নিম্নলিখিত প্রচার বৃত্তান্ত প্রেরণ করিয়াছেন,—

১৪ ফাল্গুন শনিবার কলিকাতা হইতে রওয়ানা হইয়া সে দিন পারর্ব্বতীপুর পঁহুছি। তৎপরদিন ১৫ ফাল্গুন রবিবার সায়ঙ্কালে মন্দিরে উপাসনা কার্য্য করা যায়। ১৬ ফাল্গুন সমুদায় দিন উৎসব, অপরাহ্নে সঙ্কীর্ত্তন ও হাটে বক্তৃতা হয়। ১৭ ফাল্গুন প্রাতে উপাসনা, সায়ঙ্কালে প্রকাশ্য বক্তৃতা, বিষয়—"সংসারে থাকিয়া যোগ হয় কি না?" তদনন্তর পরিবারিক উপাসনা ও উপদেশ। ১৮ ফাল্গুন প্রাতে উপাসনা, দুপ্রহর সুন্দারপুরের প্রসঙ্গ, সায়ঙ্কালে পরিবারিক উপাসনা ও উপদেশ। ১৯ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার প্রাতে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র কর্ত্তৃক উপাসনা, স্থানীয় মুনসেফ গৃহে শাস্ত্রব্যাখ্যা, সায়ঙ্কালে পরিবারিক উপাসনা।

চন্দননগর ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তিস্থাপনস্মরণার্থ বিগত ১৫ ফাল্গুন মহোৎসব হইয়াছে। ভাই অমৃতলাল বসু তথাতে বক্তৃতাদি করিয়াছেন।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মঙ্গলগঞ্জে অবস্থিতি করিতেছেন।

ভাই গৌরগোবিন্দ রায় ও কান্তিচন্দ্র মিত্র ফুলবাড়ী ও রংপুরের সাংবৎসরিক উৎসবের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া নিলফামারী ও হলদীবাড়ী হইয়া কলিকাতা প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ভাই গৌরগোবিন্দের শারীরিক অসুস্থতা জন্য তাঁহারা কুড়ীগ্রাম প্রভৃতি স্থানে যাইতে অশক্ত হইয়াছেন।

ঢাকা জিলার অন্তর্গত কিশোরগঞ্জে নবসংহিতা অনুসারে একটি ব্রাহ্মবিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রের নাম শ্রীমান্ নবীনচন্দ্র সেন, পাত্রী শ্রীমতী প্রেমময়ী। ইনি আমাদিগের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত জগন্মোহন বীরের তৃতীয়া কন্যা। ভাই বঙ্গচন্দ্র বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইয়াছেন। বিবাহের পূর্ব্বে পাত্রের অনেক অত্যাচার ও পীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল, কিন্তু সত্যের জয় অবশেষে হইয়া শুভকার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে।

বিগত রবিবার প্রাতে প্রধানাচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আচার্য্যদেবের সমাধি ও নবদেবালয় দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি কিয়ৎক্ষণ দেবালয় মধ্যে গম্ভীরভাবে অবস্থিত করিয়া বেদীর নিকট গিয়া "তিনি এই বেদীতে বসিয়াছিলেন" বলিয়া কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে "এইরূপেই এখন তাঁহার সহিত দেখা করিতে হইবে" বলিয়া দেবালয় পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। আচার্য্যদেবের পরিবার ও শ্রীমান্ করুণাচন্দ্রের সহিত যে প্রকার সস্নেহে কথা কহিতে লাগিলেন তাহা দেখিয়া আমাদের মনে হইল যে, আচার্য্যদেবের সহিত তাঁহার অনন্তকালের গভীর যোগ আছে ও আচার্য্যদেবের পরিবারের সহিত নিকটতর ও অতিপ্রিয়তর সম্বন্ধ অবস্থিতি করিতেছে।

২২ ফাল্গুন রবিবার রঙ্গপুর নববিধানসমাজে দিনব্যাপী উৎসব হয়। পর দিন মদ্যপাননিবারণী আশালতাসভায় বক্তৃতা, এবং তৎপর দিন প্রকাশ্য বক্তৃতা হয়। বিষয়—"যোগ বিয়োগ।" ২৭ ফাল্গুন নেলফামারীতে বক্তৃতা হয়। বিষয়—"ধর্ম্মে বিবাদ নাই, বিবাদ অজ্ঞানতা ও পাপমূলক।" ২৯ ফাল্গুন হলদীবাড়ীতে প্রকাশ্য সভা হইয়া "হলদীবাড়ী সমাজসংশোধনী" সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের বার্ষিক আয় ব্যয় বিবরণ।

জানুয়ারি হইতে ডিসেম্বর, ১৮৮৭ সাল।

আয়।

মাসিক দান।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার দুর্গাদাস গুপ্ত	...	২১৲
" বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন	...	১১৲
" " তারকচন্দ্র সরকার	...	১২৲
" " প্রেমচাঁদ বড়াল	...	১৲
" " প্রিয়নাথ ঘোষ, কুচবিহার	...	৮৲
" " কৈলাসচন্দ্র মান্না	...	৮।০

" " গোবিন্দচাঁদ ধর ...	৭॥০
" " রলারাম ...	৭॥০
" " যদুনাথ ঘোষ ...	৭৲
" " উমানারায়ণ সেন ...	৬৲
" " মধুসূদন সেন ...	৫॥০
" " ক্ষেত্রমোহন দত্ত ...	৫৲
" " গোপীকান্ত সেন ...	৪৲
" " বৈকুণ্ঠনাথ সেন ...	৪৲
" " সাধুচরণ দে ...	৩॥০
" " অম্বিকাচরণ সেন ...	৩৲
" " যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ...	৪৲
" " বিহারিলাল মজুমদার ...	২৲
	১২৮॥০
ক্ষুদ্র মাসিক দানের সমষ্টি— ...	১০৯
	২৩৭॥০

এককালীন দান।

শ্রীশ্রীযুক্ত মহারাজা কুচবিহারাধিপতি বাহাদুর...	২০০৲
শ্রীযুক্ত রায় লেভল রায় সখিরাম আদ ভানি বাহাদুর হাইদ্রাবাদ, সিন্ধ ...	২৫৲
শ্রীযুক্ত রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী জমিদার, কাকিনা রংপুর ...	১০৲
শ্রীযুক্ত বাবু ভগবানচন্দ্র দাস ...	১১৯
" " প্রিয়নাথ ঘোষ, কুচবিহার ...	১০৲
" " লক্ষ্মণচন্দ্র আশ ...	১০৲
" " অভিমুক্তেশ্বর সিংহ ...	৫৲
" " শ্রীনাথ দত্ত ...	৫৲
" " গোপীকান্ত সেন ...	৫৲
" " তারকচন্দ্র সরকার ...	৫৲
" " দীননাথ চক্রবর্ত্তী ...	৫৲
" " অমৃতলাল বসু ...	৫৲
" " নির্ম্মলচন্দ্র সেন ...	৫৲
" " মহেন্দ্রনাথ নন্দন ...	৪৲
" " প্রেমচাঁদ বড়াল ...	৪৲
" " জয়গোপাল সেন ...	৩৲
একটী ব্রাহ্মিকা মহিলা ...	৫৲
ক্ষুদ্র এককালীন দানের সমষ্টি ...	৩৪।৶০
উৎসবে দান সংগ্রহ ...	৪৯৸৶১০
	৪০০।১০

বিশেষ দান।

ট্রষ্টী ব্যয় নির্ব্বাহার্থ দান শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আশ জমিদার, মঙ্গলগঞ্জ ...	১০০৲
	১০০৲

বিবিধ আয়।

ভূমির খাজনা ...	৬৪৲
ব্রহ্মমন্দিরের দারবান্ কারুর গচ্ছিত ...	২১৲
বেঙ্গল ব্যাঙ্ক হইতে সুদ প্রাপ্তি ...	১১৶১৫
কর্জ্জ ...	১৮৸৶০
	১২৩৶১৫
সমষ্টি	৮৬১৸৶৫

ব্যয়।

নিয়মিত মাসিক ব্যয়।

ভৃত্যের বেতন ...	৯৮৲
গ্যাস ...	১১৮৲
অর্গ্যান ...	৩৫।০
পাখাটানাই ইত্যাদি ...	২২/১০
বাত্তি তৈল ইত্যাদি ...	৬৶১৫
টিকিট কাগজাদি ...	২।/১৫
বিবিধ ব্যয় ...	১৪।/০
	২৯৬।৶০

উৎসব ব্যয়।

যাত্রিনিবাসের ব্যয় ...	১২৯৸১০
গাড়িভাড়া ...	১৮৶০
সংকীর্ত্তন ...	১৭॥/০
উৎসব ...	৭৬/০
মুদ্রাঙ্কন ...	১৯
মন্দিরসংস্কার ...	৮৪॥৶১০
	৮৪৫।০

ট্রষ্টডিডের ব্যয়।

ষ্টাম্প ...	১০৲
রেজেষ্ট্রারি ...	৯॥৶০
গাড়িভাড়া ...	১৫৲
বিবিধ ...	৯৸৶০
	৫৪॥০
জুবিলি ব্যয় ...	৯২৶০
আসবাব ক্রয় ...	১৩॥৶০
বেঙ্গল ব্যাঙ্কে সুদ দেওয়া ...	২৯৶৫
পুরাতন দেনা শোধ ...	২৬৸৶০
	৮৫৮॥৫
হস্তে স্থিতি ...	৩৶০
	৮৬১৸৶২

এই পত্রিকা ৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্।
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে।

২৩ ভাগ। ৬ সংখ্যা। } ১৬ই চৈত্র, বুধবার, ১৮০৯ শক। { বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে বিশ্বাসীর পরম বন্ধু, তোমার প্রতি তোমার বিধানের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস লইয়া আমরা ইহলোক হইতে অপসৃত হইতে পারি, ইহাই আমাদিগের প্রাণের একান্ত বাসনা। এ সংসার এমনই ভয়ানক স্থান যে, এখানে বিশ্বাস রক্ষা করা অত্যন্ত সুকঠিন। সংসারী লোকেরা বিশ্বাসীর বিশ্বাসহরণে একান্ত ব্যস্ত। তাহারা আপনাদের অবিশ্বাসবিষ যে কোন প্রকারে হউক বিশ্বাসিগণের হৃদয়ে সংক্রামিত করিয়া তাহাদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করে। প্রভো, যাহারা অবিশ্বাসনয়নে দর্শন করে, তাহারা তোমাতে এবং তোমার বিধানের ভিতরে এমন সমুদায় ব্যাপার অবলোকন করে, যাহার প্রতি তাহারা সুগভীর দোষারোপ করিয়া থাকে। তাহারা যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া সেই-গুলি এমনই সুদৃঢ়রূপে সমুপস্থিত করে যে, বিশ্বাসী তাহার কোন উত্তর দিতে না পারিয়া কুণ্ঠিতহৃদয় হন। যদি তোমার ও তোমার বিধা-নের প্রতি চির অবিচলিত আস্থা না থাকে, এই প্রকারের নিরুত্তর অবস্থা তাঁহাকে ক্ষুব্ধ করে, এবং সেই ক্ষোভ তাঁহার হৃদয়ে এমনই মারা-ত্মক বিষরূপে প্রবিষ্ট হয় যে, তদ্দ্বারা সমুদায় হৃদয়ের বিশুদ্ধ শোণিত দূষিত হইয়া যায়। হে দেব, আমরা তোমার অনেক কার্য্য বুঝিতে পারি না, অনেক বিষয়ের মর্ম্ম উদ্ঘাটন করিতে পারি না, তোমার বিধানে এমন অনেকগুলি বিষয় সময়ে সময়ে উপস্থিত হয়, যাহা আমাদিগের নিকটে আপাততঃ অবিসংবাদী বলিয়া প্রতীত হয়। যদি বিশ্বাস না থাকে, এই সকল দেখিয়া ভয় হয়, এবং ক্রমে ক্রমে মন সংশয়াপন্ন হইয়া উঠে। যাহা মনুষ্য জ্ঞানের অতীত, যাহার গূঢ়তত্ত্ব কেবল তুমিই প্রকাশ করিতে পারে, সে বিষয়ে সাধক নিজ বুদ্ধি চালনা দ্বারা বুঝিতে গেলে তো সর্ব্বনাশ হইবেই। বিশ্বাসী প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন, এবং যখন তুমি বুঝাইয়া দাও আপনাকে কৃতকৃত্য মনে করেন, কিন্তু কখনও চিত্তে সংশয় আসিতে দেন না। হে দেব, আমাদিগের জীবন বিশ্বাসীর জীবন হউক। আমরা যাহা বুঝিব না, তাহার জন্য তোমার আলোকের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব, কিন্তু বুঝি-লাম না বলিয়া কোন প্রকারে অণুমাত্র সন্দিগ্ধ-চিত্ত হইব না। হে ভগবন্, তোমার বিধানে যদি কিছু অবোধ্য অগম্য থাকে, যেন আমরা বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া অগ্রসর হইতে পারি, এবং যথাসময় তৎসম্বন্ধে আলোক লাভ করিয়া কৃতার্থ হই। হে সংশয়ভঞ্জন শ্রীহরি, নিরন্তর

তোমার উপরে বিশ্বাসনয়ন রাখিয়া যাহাতে এই সংশয়সঙ্কুল পৃথিবীতে নিরাময় নিশ্চিন্ত প্রশান্ত বিশ্বস্ত চিত্তে জীবন অতিবাহিত করিতে পারি, তুমি এই প্রকার আশীর্ব্বাদ কর।

তিন শ্রেণীর অনুপ্রবেশে বিধানের পূর্ণতা।

ধর্ম্মের ইতিহাস তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। আমাদিগের মধ্যে এই তিন শ্রেণীরই প্রতিনিধি আছেন দেখিতে পাওয়া যায়। এই তিন শ্রেণীর পরস্পরের ভিতরে সম্যক্ অনুপ্রবেশ হয় নাই, এ জন্য বিধানবাদিগণের জীবনে বিধানের পূর্ণতা আজও লক্ষিত হয় না। সমগ্র ধর্ম্মের ইতিহাসে যে তিন শ্রেণী লক্ষিত হয়, আমাদিগের বর্ত্তমান বিধানের ইতিহাসে তাহা পরপর আবির্ভূত হইয়াছে, এবং আজও তাহার প্রতিনিধিগণ আছেন, এইটি প্রথমতঃ প্রদর্শন করিয়া তৎপর এই তিন শ্রেণীর অনুপ্রবেশে বিধানের পূর্ণতা কিরূপে সম্পাদিত হইতে পারে বলা যাইতেছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের যে সময়ে প্রথম অভ্যুদয় হয়, সেই সময় এবং তৎপরবর্ত্তী সময়ের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, এক ব্রহ্ম তৎকালে সকলের অনুসর্ত্তব্য বিষয় ছিলেন। উপনিষদের ব্রহ্ম জগৎ সহ অভিন্ন, ইহা সকলেই অবগত আছেন। যখন প্রথমে সাধকগণ উপনিষদের ব্রহ্মকে গ্রহণ করিলেন, তখন জগৎ তাঁহাদিগের লক্ষ্যস্থলে নিপতিত হইল। কালের সুমহৎ পরিবর্ত্তনে তৎকালের সাধকগণ অদ্বৈতবাদে নিপতিত হইলেন না, তাঁহারা ব্রহ্ম ও জগৎকে স্রষ্টা ও সৃষ্টসম্বন্ধে গ্রহণ করিলেন, সৃষ্টজগতে ব্রহ্মদর্শন তাঁহাদিগের প্রধান লক্ষণ হইল। সৃষ্টজগতের মধ্য দিয়া তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইতেন বলিয়া তৎকালের সাধকগণকে পরোক্ষপ্রিয় সাধক বলা যাইতে পারে, কেন না তাঁহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্ম দর্শন করিতেন না, সৃষ্টজগতে তাঁহার জ্ঞান ও মঙ্গলভাবের বিকাশ দর্শন করিতেন। সে কালের যতগুলি গ্রন্থ আছে, সেগুলি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, এবং এখনও যাঁহারা সে শ্রেণীতে ভুক্ত আছেন তাঁহাদিগের উপাসনা ও বক্তৃতা শ্রবণ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাঁহারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে ব্রহ্মদর্শন করেন না, কিন্তু জগতে তাঁহার জ্ঞানাদির বিকাশ উপলব্ধ করিয়া থাকেন। জগৎ বলিতে বাহ্যপ্রকৃতি ও মন উভয়ই বুঝায়। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম অভ্যুদয় কালে যদিও বাহ্যজগতে ব্রহ্মের বিকাশ দর্শনের প্রাবল্য ছিল, কিন্তু তথাপি সময়ে অন্তর্জগতের দিকেও দৃষ্টি পড়িয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। বাহ্যজগতে জ্ঞানাদির বিকাশ দর্শনের ন্যায় মনেতেও তাঁহার বিকাশ দর্শন পরোক্ষজ্ঞান। ইটি পরোক্ষ জ্ঞান কেন বিচার করা সমুচিত।

জগতে ঈশ্বরের জ্ঞানকৌশলের নিদর্শন অবলোকন করিয়া তাহা হইতে ঈশ্বরে বিশ্বাস, ইহা কখন সাক্ষাৎ ঈশ্বরদর্শন নহে। ন্যায়শাস্ত্রমতে অনুমানের ব্যাপার। আমাদিগের জ্ঞান বুদ্ধি হিতাহিতবিচারাদিতে বাহ্যজগতের ন্যায় অখণ্ড নিয়মের ক্রিয়া অবলোকনপূর্ব্বক ঈশ্বরানুভব, উহাও তদ্রূপ প্রত্যক্ষের নহে, অনুমানের কার্য্য। অধিকাংশ ব্যক্তি এতদবস্থাপন্ন, ইহা বলিবার অপেক্ষা করে না। যেখানে আজও হেতুবাদ আছে, সেখানে যে প্রত্যক্ষের ব্যাপার উপস্থিত হয় নাই, ইহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। যেহেতুক অমুক কার্য্য করিলে সুফল লাভের সম্ভাবনা, অতএব আমার অনুষ্ঠেয়, এখানে যেমন অনুমান সুস্পষ্ট প্রতীত হয়, তেমনি যেহেতু অদ্য আমার মনে উৎকৃষ্ট ভাবোদয় হইয়াছিল, অতএব আমাতে অদ্য ভগবানের আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহাও তেমনই অনুমান। ব্রাহ্মধর্ম্মে এই অনুমানের সাম্রাজ্য আজও অন্তর্হিত হয় নাই।

দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধকে বিবেকিত্ব সর্ব্বপ্রথমে উদ্ভূত হয়। এই বিবেকিত্বে পুত্রত্বের বিকাশ। ব্রাহ্মসমাজ দ্বিতীয় শ্রেণীগত হইয়া একটী বিশেষ অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত। বিবেকীতে ঈশ্বরের আবির্ভাব সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনুভূত হইয়া থাকে। যদিও প্রথমে প্রথমে বিবেক বৃত্তিরূপে স্বতন্ত্র পরিগৃহীত হয়, কিন্তু এরূপ অধিক দিন থাকিতে পারে না। বিবেকের সমাগম হইতে যুক্তিবাদের তিরোধান হয়, কেন না বিবেক কখন হেতুপ্রদর্শন করেন না, ইহা কর, ইহা করিও না, এইরূপ সাক্ষাৎ আদেশ তাঁহা হইতে সমুত্থিত হয়। যখন ইটি উচিত, ইটি অনুচিত, এইরূপ ঔচিত্যানৌচিত্য বিচার ছিল, তখন সাধকে সাক্ষাৎসম্বন্ধ উপস্থিত হয় নাই, কিন্তু যখন আদেশধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল, তখন সেই আদেশ সাক্ষাৎ যাঁহার মুখ হইতে সমুত্থিত তাঁহার সহিত পরিচয় সহজ হইয়া পড়িল। প্রথমে প্রথমে যদিও যবনিকার অন্তরাল হইতে সমাগত আদেশবাণীর ন্যায় সাধকের নিকটে বিবেকের আদেশ অনুভূত হয়, কিন্তু যখন তিনি বিবেকবান্ হইয়া উঠেন, তখন আর সে যবনিকা আবরক হইয়া স্থিতি করে না। এই সাক্ষাৎসম্বন্ধকালে বিবেকী সাধু মহাপুরুষগণের সহিত নবীনসম্বন্ধ নিবদ্ধ হয়।

দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ সাধকগণের বিধানে বিশ্বাস অতীব সুদৃঢ়। ইহার কারণ এই যে, ঈশ্বরাদিষ্ট ব্যক্তিগণকে লইয়া বিধান। যাঁহারা বিধানে বিশ্বাসী হইবেন, তাঁহাদিগের সর্ব্বাগ্রে আদেশে বিশ্বাসী হওয়া চাই। ব্রাহ্মসমাজের প্রথমাবস্থাতেও আমরা তৎসংস্থাপক রাজা রামমোহন রায়ের প্রশংসাবাদ শুনিতে পাই, কিন্তু সেই প্রশংসাবাদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাইব, তন্মধ্যে মানবীয় ভাব প্রবল, সেখানে দৈবশক্তির প্রশংসা নাই। প্রথম হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে সমাগত ব্যক্তিগণের এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ পার্থক্য। তাঁহারা দৈবশক্তির * প্রশংসা ভিন্ন বিধানসংসৃষ্ট কোন মানবের নাম করিতে পারেন না। দৈবশক্তির বিশেষ অভিব্যক্তি স্থল, মহাজনগণ। এই শ্রেণীস্থ সাধকগণের মহাজনদিগের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। এই আস্থা যখন কেবল মহাজনগণেতেই পর্য্যবসান হয়, অন্যত্র আর প্রসৃত হয় না, তখন তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবেশ অবরুদ্ধ হইয়া যায়।

দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ সাধকগণ যখন বিবেকী হন, তখন তাঁহাদিগের তৃতীয় শ্রেণীগত হওয়া একান্ত স্বাভাবিক। তৃতীয় শ্রেণীতে প্রতিসাধকে ঈশ্বরাবির্ভাব অনুভূত হইয়া থাকে। ঈশ্বরাদেশে প্রতিনিয়ত পরিচালিত হওয়া ইহাঁদিগের প্রধান লক্ষণ। অনেকে মনে করেন, প্রতিব্যক্তি এরূপে পরিচালিত হইলে সাধকমণ্ডলী ও মহাজনগণ সহ বিরোধ উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা। যাঁহারা এরূপ মনে করেন, তাঁহারা ঈশ্বরাদেশ মধ্যে বিসংবাদিতা সম্ভব স্বীকার করেন। ঈশ্বরাদেশে বিসংবাদিতা ইহা কখন হইতে পারে না। একই সোপানস্থ সাধকগণ একপ্রকারের আদেশ চিরকালই লাভ করিয়া থাকেন, ভিন্নসোপানস্থ হইলে ভিন্নতা উপস্থিত হয়। যাঁহারা যথার্থ ঈশ্বরবিশ্বাসী তাঁহারা বিসংবাদিতা স্বীকার করেন না, যথাসময় ঐক্য সমুপস্থিত হইবে বিশ্বাস করিয়া শান্ত ভাবে কাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। যাঁহাদিগের ঈদৃশ ধৈর্য্য ও বিশ্বাস নাই, তাঁহারা বিসংবাদের হেতু হন, ফলতঃ ঈশ্বরাদেশে কোন বিসংবাদ নাই।

* গত বারের ধর্ম্মতত্ত্বে আচার্য্যজীবন ও বিধানপ্রসূতি দৈবশক্তি এ দুইয়ের একান্ত অভিন্নতা প্রদর্শন করিতে গিয়া প্রবন্ধলেখক যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে কাহার কাহার মনে সংশয় উপস্থিত হইয়াছে যে, বিধানপ্রসূতি দৈবশক্তি কেন, সর্ব্বপ্রকারের দৈবশক্তি একাধারে বদ্ধ রাখা হইয়াছে। আমরা ভরসা করি, এ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সে সংশয় তাঁহাদিগের মন হইতে তিরোহিত হইবে।

আমরা যে তিন শ্রেণীর উল্লেখ করিলাম, এ তিন শ্রেণীর একই মণ্ডলীতে স্থিতিতে বিধানের পূর্ণতা হয় না, অনুপ্রবেশে পূর্ণতা হয়, ইহা এখন বুঝিবার পক্ষে সহজ হইল। প্রথম শ্রেণীর সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা তদবস্থ থাকিলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সহিত সমঞ্জস হইতে পারে না। তৃতীয় শ্রেণীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ যখন প্রথম শ্রেণীকে অধিকার করে তখনই সামঞ্জস্য উপস্থিত হয়। জলে স্থলে আকাশে সর্ব্বত্র সাক্ষাৎ হরিদর্শন, দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট সাধকসম্বন্ধে সম্ভবপর। যিনি আত্মাতে, মহাজনে দৃষ্ট হইলেন, তিনিই জগতে দৃষ্ট হইবেন, ইহা নিতান্ত স্বাভাবিক। দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর সাধকের পরস্পর সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। তৃতীয় শ্রেণীতে যিনি পরিপক্ব হইয়াছেন, দ্বিতীয় শ্রেণীর সহিত তাঁহারই যথোপযুক্ত সম্বন্ধ সম্ভবপর। আত্মাতে ঈশ্বর দৃষ্ট হইলে, পরিচিত হইলে মহাজনগণেতে তাঁহার আবির্ভাব সাক্ষাৎ অনুভূত হয়, অন্যথা মহাজনগণের লোকোত্তর গুণ দর্শনে দৈবশক্তি অনুমিত হইয়া থাকে। তৃতীয় শ্রেণীর সাধকগণের কখন পূর্ব্ব দুই শ্রেণীর সহিত অসামঞ্জস্য উপস্থিত হয় না, যেখানে অসামঞ্জস্য হয়, সেখানে বুঝিতে হইবে সাধক এখনও এ শ্রেণীতে যথাযথ নিবিষ্ট হন নাই।

আমরা যাহা বলিলাম, পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে দৃষ্টি করিয়া তৎসহ সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইলে বলিতে হয়, পৃথিবীতে প্রথম দুই শ্রেণীর ক্রিয়া ইতিহাসে প্রতিফলিত হইয়াছে, তৃতীয় শ্রেণীর ক্রিয়া বর্ত্তমানে উপস্থিত। বিধানমহাত্ম্যে যাঁহারা তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়াছেন, এখনও তাঁহাদিগের সে শ্রেণীর প্রথম পাঠ ভাল করিয়া শিক্ষা হয় নাই, এই জন্য তাঁহাদিগেতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রেণীর ক্রিয়া অনেক সময়ে বিশেষরূপে লক্ষিত হয়, তৃতীয় শ্রেণীর ক্রিয়া তেমন প্রস্ফুটরূপে প্রকাশ পায় না। তৃতীয় শ্রেণীতে কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াও যদি পূর্ব্ব দুই শ্রেণীর সঙ্গে একতা উপস্থিত না হয়, বুঝিতে হইবে, এখনও সাধকে বর্ত্তমান বিধানের অভ্যুদয় হয় নাই। জগতে, আত্মাতে, মহাজনে সাক্ষাৎ ঈশ্বরাবির্ভাব দর্শন, তাঁহার লীলা অবলোকন, অন্তর্বহির্যোগে যোগযুক্তত্ব, এবং ভক্তি ও কার্য্যনিষ্ঠত্ব, সাধকমণ্ডলীসহ অভিন্নহৃদয়ত্ব, এ সকল লক্ষণে লক্ষণান্বিত হওয়াই তৃতীয়শ্রেণীর সাধকের পরিপক্বাবস্থা, এবং ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, বর্ত্তমান বিধান সাধকে পূর্ণ প্রমাণে আবির্ভূত।

ভাষা উপেক্ষার বিষয় নহে।

“ভাষা বিনাশ করে ভাব জীবন দেয়” এই প্রসিদ্ধ কথার উপরে সকলেরই বিশ্বাস। এই বিশ্বাসনিবন্ধন ভাষা নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে। অনেকে মনে করেন, ভাষা যে প্রকার হউক না কেন, ভাব যদি বিশুদ্ধ হয়, তাহা হইলেই হইল। ভাষা ভাবের পরিচ্ছদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। উৎকৃষ্ট লোক যদি নিকৃষ্ট বসন পরিধান করেন, তবে সে নিকৃষ্টবসনও উৎকৃষ্ট লোকের সংসর্গবশতঃ অসমাদৃত হয় না, বরং যিনি পরিধান করিয়াছেন তাঁহার বৈরাগ্য বিনয়াদি সদ্‌গুণ তদ্দ্বারা প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই দৃষ্টান্তটি সদোষ একটু বিবেচনা করিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। ভাব যখন বাহিরে প্রকাশ পায়, তখন অনুরূপ ভাষা আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। যদি ভাষা ভাবানুরূপ না হয়, তবে সেই ভাব এখনও সুব্যক্তাকার ধারণ করে নাই, বিমিশ্রতা পরিত্যাগ করে নাই, তাই ভাষাও অপরিস্ফুট রহিয়া গিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। যে ব্যক্তির হৃদয় হইতে ভাব ভাষাযোগে বিনিঃসৃত হইল, সে ব্যক্তি আত্মভাব যে ভাষায় ব্যক্ত করিলেন, সেই ভাষা চির দিন সেই ভাবের

ব্যঞ্জক হইয়া অবস্থিতি করিবে, সে ব্যক্তি আর থাকিবেন না, সুতরাং ভাষা যে কখন উপেক্ষার সামগ্রী নহে, ইহা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয়।

আমরা লিখিবার বা বলিবার সময়ে সাবধান হইয়া শব্দ প্রয়োগ করি না, উচ্ছ্বসিত ভাব আপনা হইতে অনুরূপ ভাষা লইয়া সমুপস্থিত হয়। এ স্থলেও যাঁহারা জনসমাজের প্রতি দৃষ্টিশীল তাঁহারা বিশেষ মনোভিনিবেশ করিয়া দেখেন, যে সকল কথা লিখিতাবস্থায় সাধারণের সম্পত্তি হইবে, সেই সকল কথা এরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে কি না যাহাতে শব্দনিবদ্ধ ভাব লোকের নিকটে অন্যরূপে প্রতীত হইবার সম্ভাবনা নাই। তাঁহারা প্রত্যেক বাক্য এরূপে লিখিতে যত্ন করেন যে, অন্যবাক্যনিচয়নিরপেক্ষ হইয়াও তাহাতে ভাবান্তর আরোপিত হইতে না পারে। আমাদিগের মনে আছে, আমরা এক বার ধর্ম্মতত্ত্বে আচার্য্যদেবের একটি বিশেষ উপদেশ পত্রস্থ করি। পত্রস্থ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখান হয় নাই। পরে দেখিয়া তিনি এই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করেন যে, উপদেশটীর ভাষার মধ্যে মধ্যে পরিবর্ত্তন হওয়া একান্ত আবশ্যক ছিল, কেন না লোকে উহার ভাব যথাযথ গ্রহণ করিতে পারিবে না। আমরা দেখিয়াছি, তিনি লিখিত প্রবন্ধগুলির পদবিন্যাস এরূপ স্থির ধীর ভাবে সাবধানতা সহকারে করিতেন যে তাহার একটি শব্দও পরিবর্ত্তসহ হইত না, অথবা ভাবান্তর প্রকাশ করিত না। আমরা সে স্থিরতা ধীরতা অবলম্বন করিতে পারি না বলিয়া আমাদিগের প্রবন্ধনিচয়ে অনেক বিষয় অস্ফুট থাকে, এমনও হয় যে, পূর্ব্বাপর বিষয়গুলির সঙ্গে না মিলাইলে যথার্থ ভাব প্রকাশ পাওয়া সুকঠিন হইয়া পড়ে।

আমরা বুঝিতে পারিতেছি, ভাষাসম্বন্ধে আমাদিগের উপেক্ষা বিধানসঙ্গত নহে। আমাদিগের বিধান না ভাষা না ভাব কাহারও প্রতি উপেক্ষা করিতে পারে। ভাষা ও ভাব মধ্যে পরস্পরের যে উপযুক্ত সম্বন্ধ তাহা যদি আমাদিগের কর্ত্তৃক সংরক্ষিত না হয়, তাহা হইলে সর্ব্ববিষয়ের সামঞ্জস্য আমাদিগের মধ্যে কৈ সমুপস্থিত হইল? যে ভাষা অবলম্বন করিয়া আমাদিগের অন্তর্ব্বর্ত্তী ভাব ও সত্য চির কাল স্থায়ী হইয়া অবস্থিত করিবে, যে ভাষার দোষে আমরা অযথা ভাবে পৃথিবীর নিকটে পরিগৃহীত হইব, সে ভাষার প্রতি আমরা কখনই উপেক্ষা করিতে পারি না। আমরা ভগবান্ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ যে, আমরা যেন লব্ধ সত্য ও ভাব এমন করিয়া পৃথিবীর নিকটে প্রকাশ করি, যাহাতে অন্য প্রকারে তাহা পরিগৃহীত না হয়। সত্য ও ভাবগ্রহণে লোকে চিত্তের সংস্কারানুসারে ভ্রান্ত হয় সত্য, কিন্তু যাঁহারা সত্য ও ভাব প্রচার করেন, তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য এই যে, তাঁহাদিগের ভাষা এমনই স্বচ্ছ হইবে যে, লোকের চিত্তের সংস্কার যেরূপই হউক না কেন, তাহাতে তাহারা আর কিছু আরোপ করিতে পারিবে না।

আমরা ভাষাব্যবহারসম্বন্ধে এখনও বিধানোচিত ভাবের অনুসরণ করিতে পারি নাই, ইহাতে আমরা আমাদিগের বিশেষ অপূর্ণতা অনুভব করি। আমরা আচার্য্যদেবের ভাষার স্বচ্ছতা আজও নিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি, ভাষাব্যবহারে তাঁহার অতীব সাবধানতা সর্ব্বদা দেখিয়াছি, কোথায়ও ভাষার দোষে কষ্ট কল্পনা করিয়া ভাব বুঝিতে হয়, এরূপ তাঁহার সম্বন্ধে কেহ বলিতে পারে না। পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে আমাদিগের ভাষার প্রতি উপেক্ষা করিলে চলিবে না। ভাষা হইতে ভাবের প্রাধান্য হইলেও ভাষা যখন ভাব প্রকাশের একমাত্র উপায়, এমন কি ভাষার দোষে ভাব প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িতে পারে, লোকের মনে অযথা সংস্কার উপস্থিত করিতে পারে, তখন ভাষার যে জন্য সমাদর আমরা যেন তাহা কখন ভুলিয়া না যাই।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

পূর্ব্ব কালে সাধকগণ বৈরাগ্যাদিসম্পত্তি জনচক্ষুর অগোচরে রাখিবার জন্য প্রোমত্তবেশে বাস করিতেন, এ কালে সংসারাবরণে আবৃত সাধকগণের আর সেরূপ প্রয়াস পাইতে হয় না, ইহা আমরা পুনঃপুনঃ বলিয়া আসিয়াছি। আমাদিগের এ কথা যে সত্য তাহা আমরা প্রতি দিন প্রমাণ পাইতেছি। আমাদিগের আচার্য্যজীবন ঈদৃশ আচরণে নিয়ত আবৃত ছিল। এই আচরণ তাঁহাকে জনসাধারণের নিকটে যথাযথ প্রকাশ হইতে দিত না। কেবল বাহিরের লোকের কথা কেন বলিতেছি, তাঁহার অতিনিকটস্থ ব্যক্তিগণের নিকটেও তিনি অনেক সময়ে অবুদ্ধ ছিলেন। মানুষ আপনার চিত্তবৃত্তি অনুসারে অপরের চরিত্রের বিষয় বিচার করে। যে চক্ষুতে সে দর্শন করিবে, সে চক্ষু তাহার আত্মচিত্তবৃত্তি। লোকে যাঁহাকে কোন একটি বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিবে, তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন চক্ষুতে দৃষ্ট হইতে হয়। যখন তাহারা আত্মচিত্তবৃত্তি অনুসারে ভিন্ন ভাবে তাঁহাকে দর্শন করে, তখন তাহাদিগের দৃষ্টি তাঁহার চরিত্রের সেই অংশে এবং কার্য্যের সেই বিভাগে নিয়ত নিপতিত থাকে, যাহা হইতে তাহারা আত্মচিত্তবৃত্তির অনুরূপ ব্যাপার গ্রহণ করিতে পারে। এইরূপ ভিন্ন ভাবে পরিচালিত হইয়া দর্শন করাতে এই লাভ হয় যে, তিনি এক এক জনের নিকটে এক এক প্রকারে প্রতিভাত হন, এবং সংস্কারদূষিত-চিত্তে দৃষ্ট হওয়াতে তাঁহার যথার্থ চরিত্র ও ক্রিয়া যথাযথ প্রতিভাত হয় না। যিনি বহুজনকর্তৃক দৃষ্ট হইতেছেন, তাঁহাকে কে যথাযথ গ্রহণ করিতেছেন, ইহা সন্দিগ্ধ বিষয়। এই সন্দেহের মীমাংসা সহজ হইলেও, কার্য্যতঃ তৎসম্বন্ধে লোকে নিঃসন্দিগ্ধ হইবে, ইহা সম্ভবপর নহে। যিনি দৃষ্ট হইতেছেন তাঁহার চিত্তবৃত্তির সঙ্গে যাঁহার বা যাঁহাদিগের চিত্তবৃত্তির একতা আছে, তিনি এবং তাঁহারাই কেবল তাঁহাকে যথাযথ গ্রহণ করিতে পারেন। এ মীমাংসা অভ্রান্ত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কিন্তু এই সকল সদৃশচিত্তবৃত্তির লোকদিগকেই বা কেন অপরে বুঝিতে পারিবে? সুতরাং বলিতে হইতেছে, সংসারাবরণে আবৃত থাকা সাধকদিগের পক্ষে অত্যন্ত নিরাপদের অবস্থা। তিনি পূর্ণ বিরাগী হইলেও, সংসার তাঁহাকে যে সকল আয়োজনে আবৃত রাখিবে, তাহাতেই তিনি সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িবেন। সুসজ্জিত ভোজ্যসামগ্রীর মধ্যে যে ব্যক্তি সামান্য খাদ্যদ্রব্য পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করেন এবং ভোগোপযোগী সামগ্রী স্পর্শমাত্র করেন, তাঁহার সে প্রকার ব্যবহার নিপুণ দৃষ্টি ভিন্ন নিশ্চয় করিয়া লওয়া সুকঠিন। এক জন সজ্জিত সামগ্রী দর্শন করিয়া তাঁহাকে ভোগিগণমধ্যে নিবিষ্ট করিবে, আর এক জন এত ভোগের সামগ্রী মধ্যে তাঁহাকে নির্লিপ্ত ও সহজ পান ভোজনে অনুরক্ত দেখিয়া বিরাগী বলিয়া গ্রহণ করিবে। সাধকমাত্রের এরূপ আবরণে আবৃত থাকা সমুচিত, এইরূপ আবরণ তাঁহাকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়া জীবনে অগ্রসর করিবে। যদি কেহ তাঁহাকে না বুঝিতে পারিয়া নিজে বিপথগামী হয়, তবে তজ্জন্য তিনি দায়ী নহেন, কেন না যিনি তাঁহাকে বিপরীত ভাবে দর্শন করিয়াছেন, সেরূপে দর্শন করা তাঁহার নিজ চিত্তবৃত্তির দোষে, দৃষ্টব্যক্তির দোষ নহে।

আচার্য্যের উপদেশ।

[সাহাপুর ব্রাহ্মসমাজ।]

প্রথম সাংবৎসরিক উৎসব।

শনিবার, ৩০ শে ফাল্গুন ১৭৯৬ শক।

কি সত্য কি অসত্য ইহা অনায়াসেই বুঝা যায়। যথার্থ বস্তু কি? কৃত্রিম বস্তু কি? ইহা তর্ক করিয়া বুঝিতে হয় না। কোন্ বস্তু সৎ কোন্ বস্তু অসৎ মনুষ্য স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা বুঝিতে পারে। এই অল্পক্ষণ পূর্ব্বে আমরা সংসারকার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। সংসারে কত মনোহর দৃশ্য কত সুখের বস্তু সকল মনুষ্যের হৃদয়কে আকর্ষণ করে। কিন্তু যে চক্ষু সংসারের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হয়, সেই চক্ষুকে এক বার বল দেখি, চক্ষু, তুমি মুদিত হও। তোমার ইচ্ছানুসারে সেই চক্ষু মুদিত হইল, এমন যে সুন্দর পৃথিবী এবং এত যে ইহার বিপুল সম্পত্তি, এবং সেই যে ইহার মহালোকারণ্য কোলাহল কোথায় চলিয়া গেল। চারি দিকে কেবল অন্ধকার, কেবল অন্ধকারের রাজ্য। সেই পিতা মাতা, ভ্রাতা ভগ্নী বন্ধু বান্ধব ঘোর অন্ধকারসাগরে ডুবিল। নিজের সেই সুন্দর শরীর যাহার উপর এত আশা, ভরসা ও অহঙ্কার রাখিতাম, সেই শরীরও বিলুপ্ত হইল। চক্ষু মুদ্রিত করিলে এত বিনষ্টের কারণ উপস্থিত হয়। এক সময় বলি এত লোক আমাদের, এত ধন মান আমাদের, আর এক অবস্থায় বলি এসকলই অসার, ইহাদের কিছুরই স্থিরতা নাই। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতিজনকে ক্ষমতা দিয়াছেন যাহা দ্বারা আমরা প্রকৃতরূপে সদসৎ বুঝিতে পারি। যথার্থ সার সত্য কি? যাহা পরলোকে সঙ্গে যাইবে। জ্ঞানীরা ইহা বুঝিতে পারেন। সেই সার বস্তু কোথায় পাইব? ভিতরে। মনের ভিতরে একখানি স্বর্গ, একটি বৈকুণ্ঠধাম আছে। সেখানে সাধুভাব, সত্য, ক্ষমা দয়া ইত্যাদি আছে। সেখানে গিয়া যদি প্রতিদিন এ সকল অক্ষয় ধনরত্ন সম্ভোগ ও সঞ্চয় করিতে পারি, তবে জানিলাম, এত কাল যে পৃথিবীতে ছিলাম পরলোকের

সঞ্চয় করিয়াছি। যাহারা এ সকল ধন ভুলিয়া বাহিরে বস্তু পাইয়া ভুলিয়া যায়, তাহারা আত্মপ্রবঞ্চিত হইতেছে, তাহারা সে সকল ব্যক্তিকে বন্ধু বলিতেছে যাহারা ছাড়িয়া যাইবে। এই জন্যই ধনীর সন্তানেরা এই বলিয়া কাঁদিতে থাকে যে, আমাদের ধন বিষয় থাকে না; এইজন্য রাজারা এত রাজত্ব পাইয়াও কাঁদে; এবং বাহিরে যাদের দুঃখের কিছু মাত্র কারণ নাই তাহারাও দুঃখী হয়, কিন্তু যাঁহারা ভিতরের ধন সঞ্চয় করেন এবং বাহিরে তাঁহাদের কোন প্রকার সুখের আয়োজন নাই, সামান্য শাকান্ন আহার করেন এবং পর্ণ কুটীরে বাস করেন, এবং যাঁহারা বন্ধু কুটুম্ববিহীন হইয়া একাকী থাকেন, সেই গরিব ধার্ম্মিকদিগকে জিজ্ঞাসা কর তাঁহারা সুখী না দুঃখী। তাঁহারা বলেন, আমাদের ধন নাই যাহা চক্ষে দেখা যায়; কিন্তু চক্ষু মুদ্রিত করিলে আমরা অক্ষয় ধন দেখিতে পাই। আমাদের মনের ভিতর এমন রত্ন আছে যাহা রাজারও নাই। আর তাঁহারা দুঃখের সহিত বিষয়ীদিগকে এই কথা বলেন, তোমরা যাহা লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছ, পৃথিবীর এ সকল রত্ন ও বন্ধুগণ পড়িয়া থাকিবে। এই জানি যে সাধু যাঁহারা তাঁহারা সুখী হন, ঘোর বিষয়ীরা ভূতলে পড়িয়া ক্রন্দন করেন। সাধু যিনি তিনি অন্তরের অন্তরে স্বর্গ দেখিতে পান। তাঁহার ধন মান বাহিরে নহে; কিন্তু ভিতরে। যখন নিমীলিত নয়নে তিনি ঈশ্বরের দিকে তাকাইয়া থাকেন, তখন তিনি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্টতম সুখধাম দেখিতে পান। যদি হৃদয়ের ভিতরে গিয়া অন্ধকার দেখিলে, তবে হে মনুষ্য, এত কাল তুমি কি করিলে? সেই হৃদয়ের ভিতরে যদি কেবল পাপ এবং অধর্ম্ম থাকে তবে তোমাকে কাঁদিতে কাঁদিতে এই পৃথিবী ছাড়িতে হইবে। পাছে পাপান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া চিরকাল তাঁহার সন্তানদিগকে কাঁদিতে হয়, এই জন্য দয়াময় পরমেশ্বর আমাদিগকে তাঁহার উপাসনা করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। কি পর্ব্বতের উপরে কি নদীতটে বসিয়া যেখানেই উপাসক ঈশ্বরকে ডাকেন, সেখানেই ঈশ্বরের প্রেমনদী বহিতে থাকে। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কত আশ্চর্য্য সুন্দর বস্তু সকল দেখেন। পরলোক তাঁহার নিকট দূর নহে। দেবলোক কোথায়? যেখানে ঈশ্বরকে দেখা যায়। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যদি তোমরা দয়াময় বলিয়া একবার ডাক, এখানেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। পরম আনন্দের সমাচার যে, পরমেশ্বর স্বয়ং আসিয়া পাপীর হৃদয়দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন। যাঁহারা ইঁহাকে দেখিলেন তাঁহাদের ধনরত্ন চিরকালের জন্য সঞ্চিত হইয়াছে। তোমরা যখন পরমেশ্বরকে দেখ তখন তোমাদের কত সুখ। অতএব সংসারের জঘন্য আমোদে আর মুগ্ধ হইও না। প্রকৃত বিশ্বাসী বাহিরে ঘর নির্ম্মাণ করেন না, বাহিরের ঐশ্বর্য্য সঞ্চয় করেন না, এই জন্য সকলেই বলে ইঁহার ঘর নাই, ইঁহার সম্পত্তি নাই; কিন্তু ব্রহ্মসাধক যিনি, এমন ঘর নির্ম্মাণ করেন, যাহা চিরকাল থাকিবে, এবং সেই ধন সংগ্রহ করেন, যাহা অনন্ত এবং অক্ষয়। অতএব তোমরা সকলেই সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় হও। পরমেশ্বর কি সুখ সন্তোষ দিতে পারেন না? লোকদের কুটিল যুক্তি শুনিও না। সংসার ছাড়িবে, পৃথিবীর ধন মান স্ত্রী পুত্রাদিকে ভাসাইয়া দিয়া অরণ্যে যাইবে, পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্ম এই উপদেশ দেন না; কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের এই আদেশ, অনাসক্ত হইয়া স্ত্রী পুত্রের সেবা করিবে, সকলের প্রতি কর্ত্তব্য সাধন করিবে। ভৃত্যের ন্যায় রোগীর সেবা করিবে, পরোপকার করিবে, নির্ধনকে ধনী করিবে, কিন্তু সাবধান সংসারের দাসত্ব করিবে না। সেই স্নেহময়ী মাতার উপরে প্রাণ সমর্পণ করিবে। প্রাণেশ্বর যিনি তাঁহারই কেবল প্রাণের উপর অধিকার আছে। তাঁহাকে প্রাণ মন দিলে এত সুখ তিনি দিবেন যে তোমরা মোহিত হইবে। স্বর্গ কি? এখনও তোমার একথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? এই জন্য যে তোমরা এখনও যথার্থ সাধন অভ্যাস আরম্ভ কর নাই। ঈশ্বর এত আয়োজন করিতেছেন বঙ্গদেশের জন্য, সন্তানদিগকে চারিদিকে বসাইয়া সুখসাগরে ভাসাইবার জন্য। নরনারী, এমন অমূল্য সময় তোমরা অবহেলা করিও না। প্রাণ মন ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ কর, তিনি নিশ্চয়ই তোমাদের সদ্গতি করিয়া দেবেন।

গুরুনানকের জীবন বৃত্তান্ত।

কলিযুগের সহিত নানকের সংগ্রাম ও তাহার উপর জয়লাভের প্রসঙ্গ জন্মসাক্ষীগ্রন্থে দুই বার দুই প্রকারে লিখিত আছে। কথিত আছে যে, গুরুনানক যখন সেতুবন্ধ রামেশ্বর গমন করিয়াছিলেন, সমুদ্রতীরে কলিযুগ মহাভয়ানক বেশ ধারণ করিয়া উপস্থিত হইল, চারি দিকে মহা ঝড় বৃষ্টি বজ্রধ্বনি করিল, প্রস্তর ও অগ্নিবৃষ্টি হইতে লাগিল। কলিযুগ পর্ব্বতসম করাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইল। মর্দ্দানা ভয়ে ভীত হইল, গুরুনানক তাঁহাকে পরম গুরুর নাম জপ করিয়া নির্ভয় হইতে উপদেশ দিলেন। তিনি নিজে কলিযুগের জিহ্বা আকর্ষণ করিয়া তাহাকে পরাস্ত করিলেন। তখন নানকের সমীপে আপন লক্ষণ এই বলিয়া কলি বলিতে লাগিল। "কাম ক্রোধ প্রভৃতি ষড় রিপু, আলস্য, জুয়াখেলা, মদ্যপান, দুরাচার, সংসারাসক্তি ও পরধন অপহরণ আমার চতুরঙ্গ সেনা এবং অহঙ্কার আমার সেনাপতি। আমার রাজ্যে গুরুগণ শিষ্যদিগের অর্থ শোষণ করেন, কিছুমাত্র সত্য উপদেশ প্রদান করেন না। শাস্ত্র বেদ বিধি কেহ মান্য করে না,

সকলেই স্বেচ্ছানুসারে আপন আপন পথে চলে। যাহারা বিচারপতি কাজি তাহারা মালা জপ করিয়া মুখে ঈশ্বর বলে, কিন্তু উৎকোচ গ্রহণ করিয়া সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য করে। হিন্দুগণ ধর্ম্মের নানাপ্রকার বাহ্যাড়ম্বর করে, বিভূতি মাখিয়া যোগিবেশ ধারণ করে, এবং কপট ভাবে নানা প্রকার ধর্ম্মাচরণ করে, কিন্তু তাহারা অন্তরের দিকে দৃষ্টি করে না, সংসারাসক্ত হইয়া নানা প্রকার পাপে লিপ্ত থাকে।" কলিযুগ গুরুনানককে আরও বলিল, "হে নানক, আমার নিকট মুক্তা হীরক স্বর্ণ রূপা এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা আছে। পৃথিবীর সকল রাজ্য আমার, অগণ্য পরমাসুন্দরী মনোমোহিনী আমার নিকট অবস্থিতি করে, নব নিধি অষ্টাদশ সিদ্ধি অর্থাৎ নানা প্রকার অদ্ভুত কর্ম্ম করাইবার ক্ষমতার উপর আমার আধিপত্য। যদি আপনি এক বার সম্মতি দেন সমস্ত আপনার নিকট আনিয়া উপস্থিত করিতে পারি।" এই কথা শুনিয়া গুরুনানক যে শব্দ * উচ্চারণ করিলেন তাহার অর্থ এইরূপ। তিনি আপনার প্রতি সম্বোধন করিয়া বলিলেন "হে নানক, "যদি মুক্তা মাণিকখচিত অট্টালিকা হয়, তাহাতে কস্তুরী, কাঞ্চন, অগুরু চন্দনের সুগন্ধ প্রলেপ থাকে, এবং যদি সত্য নাম তোমার চিত্তে না থাকে এ সমস্ত দেখিয়া তুমি ভুলিও না। যদি সমস্ত পৃথিবীর হীরক এবং বহুমূল্য প্রস্তরে জড়িত বস্তু তোমার হয়, এবং নিরন্তর চিত্তমনোমোহিনী সুন্দরী কামিনীগণ তোমাকে সুখ প্রদানে যত্ন করে, আর যদি সত্য নাম তোমার চিত্তে না থাকে, এ সমস্ত দেখিয়া তুমি ভুলিও না। যদি ঋদ্ধি সিদ্ধি লাভ করিয়া আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কার্য্য সকল করিবার ক্ষমতা হয়, গুপ্ত বিষয় সকল প্রকট করিবার অধিকার লাভ কর এবং সকল লোকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া তোমার যশ গান করে, কিন্তু যদি তোমার চিত্তে সত্য নাম না থাকে এ সমস্ত দেখিয়া তুমি ভুলিও না। যদি দিক্‌পাল সম্রাট্ হইয়া রাজসিংহাসনে পদদ্বয় সংরক্ষা কর, সকল অশ্ব গজ লোক জন যদি তোমার হয়, সকলে তোমার দাসত্ব করিতে প্রস্তুত হয়, কিন্তু যদি তোমার চিত্তে সত্য নাম না থাকে এ সমস্ত দেখিয়া তুমি ভুলিও না।" কথিত আছে, কলিযুগ এই সমস্ত কথায় পরাস্ত হইয়া গুরুনানকের শরণাপন্ন হইল, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "হে প্রভু, আমার এত ঐশ্বর্য্য এত অশ্ব এত হস্তী এত মুক্তা এত সম্পদ এ সমস্ত স্পর্শ করিয়া আমাকে আপনার উদ্ধার করিতেই হইবে, নতুবা আমার গতি কি হইবে?" গুরুনানক তখন কলির প্রতি আদেশ করিলেন, "হে কালকাল, আমি বৈরাগ্য দ্বারা সকল পাপ ও সংসারাসক্তিকে ধ্বংস করিয়া ধর্ম্ম ও পুণ্য প্রতিষ্ঠা করিতে আসিয়াছি, আমি তোমার ঐ সমস্ত পদার্থ গ্রহণ করিতে পারি না, কিন্তু নিরাশ হইও না, তোমার প্রদত্ত পদার্থ সকল আমি গ্রহণ করিব। যথা সময়ে আমি দশম অবতার হইয়া যখন আসিব তখন তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব।" গুরুনানকের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য ঘটনা কি না তাহা আমরা বলিতে চাহি না। অনেকে বলিয়া থাকেন, বর্ত্তমান শিখগণ গুরুগোবিন্দ সিংহ ও তৎপ্রবর্ত্তিত খালসাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জন্মসাক্ষীগ্রন্থে ইহা সংলগ্ন করিয়া দিয়াছে। আমরা দেখিতেছি, ইহার মধ্যে গূঢ় নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সত্য আছে। মহাপুরুষগণ সময়ের ভাব দেখিয়া আপনাদিগের মানসিক প্রভাবে যে বিধানসম্বন্ধীয় ভবিষ্যতের কোন কোন কথা বলিতে অশক্ত তাহা আমরা বলি না। শিখদিগের ইহা দৃঢ় বিশ্বাস এবং শিখশাস্ত্রের ইহা প্রধান শিক্ষা যে নানকের পরবর্ত্তী যে নয় জন গুরু হইয়াছিলেন, তাঁহারা গুরুনানকেরই অবতার অর্থাৎ তাঁহারই ভাবে ও আধ্যাত্মিক জীবনে জীবিত। গুরু গোবিন্দ সিংহ শিখদিগের দশম গুরু, সুতরাং তাঁহাকে নানকের দশম অবতার বলার অর্থ আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। ভারতবর্ষে পূর্ব্বে পূর্ব্বে যত ধর্ম্মসংস্কারক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই এক বিষয়ে গুরু নানক সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে প্রায় সকলেই গৃহত্যাগী বৈরাগিদল প্রস্তুত করিয়াছেন, সংসার ও ধর্ম্মের সমন্বয় কাহার দ্বারা হয় নাই। উচ্চ সাধন অবলম্বন করিতে হইলে সংসার ছাড়িবে, ইহাই তাঁহাদের প্রায় সকলের শিক্ষা, কিন্তু গুরু নানক সে সে জাতীয় ধর্ম্মসংস্কারক নহেন, সংসার ধর্ম্ম তিনি যে সমন্বয় করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রমাণ বিপুলবলবীর্য্যধারী শিখজাতি। ধর্ম্মের নামে তাঁহারা কত কাল যে ভারতে অদ্ভুত রাজ্য করিয়াছিলেন তাহা সকলেই জানেন। গুরু নানকের ধর্ম্মসংস্কার এ প্রকার সর্ব্বাঙ্গীন ছিল যে তাঁহার ধর্ম্মের নামে কেবল যে সহস্র সহস্র গৃহস্থ প্রস্তুত হইয়াছে তাহা নহে, কিন্তু ধর্ম্মের নামে একটি সাম্রাজ্য হইয়াছিল। কেহ কেহ এ কথা বলিয়া থাকেন যে, গুরু গোবিন্দ সিংহ অত্যন্ত ধূর্ত্ত, নানকের সহিত তাঁহার আধ্যাত্মিক যোগ কিছুমাত্র ছিল না। তাঁহার পিতা তেগ বাহাদুর দিল্লির বাদসাহ কর্ত্তৃক নিহত হওয়ায় তিনি কেবল প্রতিশোধ লইবার জন্য নানকের নাম লইয়া একটি স্বতন্ত্র ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি নানকের নাম করিয়া নানকের ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া পৃথিবীর ব্যাপার যুদ্ধ বিগ্রহ সকল প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। অপর কেহ কেহ বলেন, তিনি একটি স্বতন্ত্র ধর্ম্মসংস্কার অথবা রাজ্যসংস্কারের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, নানকের সহিত তাঁহার ধর্ম্মপিতৃত্বসম্বন্ধ ছিল না। আমরা উক্ত দুইটি মতের একটি মতেও সায় দিই না।

* মোতিওমন্দির উসরি ইত্যাদি—শ্রীরাগ মহল্লা

শিখধর্ম্মবিধানের উৎপত্তি ও তাহা প্রতিষ্ঠার সহিত আমরা বিধাতার বিধাতৃত্ব ও ইতিহাসে বিধাতার হস্ত দেখিতে পাই। গুরুগোবিন্দ সিংহ অনেক গুলি পার্থিব অসৎ ব্যাপার আনিয়াছিলেন ইহা কে অস্বীকার করিবে? তাঁহার সম্মুখে তাঁহার অমন পরম সাধু ও নানা গুণের আধার পিতার ওরূপ নিষ্ঠুর ভাবে মুসলমান সম্রাট্ কর্ত্তৃক প্রাণবধ হওয়ায় তাঁহার জীবনে উহা বিশেষ উত্তেজনার কারণ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি এরূপ অনেক শিক্ষা ও বিধি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন যাহা নানকের নহে তাহাও আমরা জানি, কিন্তু তাঁহার ধর্ম্মগুরু ও ধর্ম্মপিতা নানকের শিক্ষার মধ্যে এরূপ বীজ ছিল, এরূপ মূল শিক্ষা ছিল, যাহা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি ধর্ম্মের নামে রাজ্যপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এ কথা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। মূলেতে নানকের ভাবের সহিত তাঁহার যোগ ছিল, কিন্তু অন্যান্য অতিরিক্ত বিষয়ে গুরু গোবিন্দ সিংহ নিজের ভাবের অনুসরণ করিয়াছিলেন, ইহা আমাদিগের বিশ্বাস। এই কারণে এত ভাবের অনৈক্য সত্ত্বেও গুরু গোবিন্দ সিংহকে নানকের ভাবের প্রাধান্য গ্রহণ করিয়া তাঁহার অবতার বলা অন্যায় বোধ হয় না। গুরুগোবিন্দ সিংহ শিখধর্ম্মের নামে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, এই কারণে গুরুনানক কলিকে বলিয়াছিলেন "দশম অবতার তোমার দ্রব্যাদি গ্রহণ করিবেন।' নানকের উপরিউক্ত কথার এইরূপ অর্থ বুঝা যায়।

কথিত আছে, কলিযুগ উক্তরূপ আশ্বাস পাইয়াও পুনরায় বলিতে লাগিল, "হে মহারাজ, আমার রাজ্যে অন্নাভাব জলাভাব হইবে, উহা আলস্য, উদ্বন্ধন দ্বারা প্রাণত্যাগ, দুষ্টতা, দুরাচার, চুরী, সংসারাসক্তি ও অপরাপর মহাপাপের আলয় হইবে। ইহার মধ্যে গুণবানেরা নিন্দনীয় হইবে, সত্যবাদীদিগকে লোকে মূর্খ বলিবে, হৃদয়শূন্য বাচালগণ গুণবান্ পুরুষ বলিয়া সমাদৃত হইবে, নির্গুণ মূর্খেরা রাজদ্বারে সম্ভ্রান্ত হইবে, কৃপণতা ধর্ম্মনামে অভিহিত হইবে, ব্রাহ্মণেরা বেদ পাঠ করিয়া কৃষিকার্য্য করিবে; রাজাগণ প্রজার অর্থশোষক হইবে, বেশধারী সন্ন্যাসিগণ বিপুল ধনের অধিকারী হইবে; গৃহস্থদিগের অন্নবস্ত্রের অত্যন্ত অভাব হইবে এবং সত্য ধর্ম্ম ব্রত জপ উপাসনা সকল বিলুপ্ত হইবে। অতএব হে মহাপুরুষ আমার রাজ্যের কি গতি হইবে?" গুরুনানক উত্তর করিলেন, "হে কলিযুগ, সন্তসমাজে তোমার অত্যন্ত দুর্নাম, তোমাকে সকলেই ঘৃণা করে। তোমার মধ্যে দুরাচারের সীমা নাই কিন্তু তথাপি আমি বলিতেছি নিরাশ হইও না অশ্রুবর্ষণ করিও না। তোমার সর্ব্বযুগ অপেক্ষা অধিকতর গৌরব ও সৌভাগ্য হইবে। তোমার রাজ্যে মনুষ্য এত পাপী হইয়াও অল্প কাল মাত্র ভগবানের শরণাপন্ন হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া তাঁহার নাম জপ করিলে তাহার অশেষ ফল লাভ করিবে। সত্য ত্রেতা ও দ্বাপরে শত শত বৎসর সাধন করিলে যে ফল না হইত, তোমার রাজ্যের লোকেরা অতি অল্প আয়াস করিলে ও অল্প সাধন করিলে তাহা অপেক্ষা অধিক ফল পাবে, তোমার রাজ্যের লোকেরা অধিকতর দুঃখী পাপী বলিয়া ভগবানের বিশেষ কৃপাপাত্র হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া কলিযুগ অত্যন্ত আনন্দিত ও আশান্বিত হইল। নানক বলিলেন, "হে কলিযুগ, তুমি সাবধান থাকিবে। আমার যাহারা শিষ্য হইবে, যাহারা পরমেশ্বরের দাস হইবে, তাহাদিগের উপর তোমার কোন আধিপত্য থাকিবে না। যেখানে শিখগণ একত্রিত হইয়া কথা কীর্ত্তন পাঠ ও সৎসঙ্গ করিবে, তোমার তথায় যাইবার অধিকার নাই। তুমি তাহার বাহিরে বসিয়া থাকিবে।" কলি উত্তর করিল, 'যাহারা প্রাণ মন দিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া তোমার দাস হইবে, তাহাদিগের উপরে আমার কিছু অধিকার নাই, আমি তাহাদিগের ত্রিসীমায় যাইব না। শিখগণ যখন একত্র হইয়া মন দিয়া সাধন ভজন কীর্ত্তন পাঠ ও সৎপ্রসঙ্গ করিবে সেস্থানেও আমি অগ্রসর হইব না। এ সমস্ত কথা আমি মান্য করিলাম, কিন্তু যখন সৎসঙ্গান্তে কড়া প্রসাদ * বিতরিত হইবে, শিখগণ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া তাহা লইতে যাইবে। তখন আমি তাহাদিগের উপর আপন পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করিব, তাহাতে আপনি আপত্তি করিবেন না।" গুরুনানক কলির কথায় তথাস্তু বলিলেন এবং কলি তাঁহার নিকট প্রণাম করিয়া তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

ধর্ম্ম-বিজ্ঞান-বীজ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

প্রজ্ঞার বলে হৃদয় চিরপরিতৃপ্ত। প্রজ্ঞা ঈশ্বরদর্শনের চক্ষু। প্রজ্ঞা অতিসহজে ঈশ্বরকে দর্শন করে ইহা জ্ঞানের ন্যায় সংশয় হইতে জন্মে না, কিন্তু ইহা ধ্রুবজন্মা। সেই দর্শন হইতে নিশ্চিতপ্রত্যয় (বিশ্বাস) জন্মে। এই প্রত্যয়বলে জীবনের সমুদয় অংশ ঈশ্বরচরণে সমর্পণ করিয়া হৃদয় নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হয়। ঈশ্বরের পাদপদ্মে এই প্রকার সর্ব্বস্বদানকেই ভক্তগণ ভক্তি বলেন। এই জন্য ভক্তির পথ নিশ্চিন্ত ও নির্ব্বিকল্প। এখানে কোন

* শিখদিগের মধ্যে এরূপ রীতি আছে যে, তাহারা তাহাদের ধর্ম্মশালায় একত্র সৎসঙ্গ ও ভজনাদি করিবার পর "কড়াপ্রসাদ" অর্থাৎ মোহনভোগ মিষ্টান্ন আনয়ন করিয়া থাকে। এই মোহনভোগ আনিলে লোভের বশবর্ত্তী হইয়া তাহাদের মধ্যে প্রায় অনেকেই প্রসাদ লইবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়ে।

বিপদের আশঙ্কা নাই, কেন না প্রজ্ঞাযোগে যে দেবপ্রসাদ সমাগত হয় ভক্তিকে সেই দেবপ্রসাদ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনেকের মত এই যে, জ্ঞান হইতে ভক্তির উদয় হয়, কিন্তু প্রকৃত ভক্তিতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে ভক্তি হইতে জ্ঞান জন্মে। যথা—

"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্ ॥" ভাগবত ১ ২।৭

ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রযোজিত হইলে অতি-শীঘ্র বৈরাগ্য, এবং হেতুরহিত জ্ঞান জন্মে। এই জ্ঞান সাধারণ বৈষয়িক জ্ঞান নহে। ইহা ঈশ্বর সহ বিশেষ ভাবে পরিচয়প্রদ জ্ঞান। সাধারণ জ্ঞানের বলে ক্রমে ক্রমে অসৎ হইতে সত্যে সমুত্থিত হওয়া যায়, এবং সত্য সহ প্রথম পরিচয়ে ভক্তি জন্মে, এই ভক্তি যত অধিক পরিমাণে বাব-হৃত হইতে থাকে, তত হৃদয়ের বাসনাবিকার বিনষ্ট হইয়া যায়, এবং ভক্তহৃদয়ে ভগবান দিন দিন নব নব সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য সহ প্রকাশিত হইতে থাকেন। এই নব নব ঈশ্বরানুভূতিরূপ জ্ঞান ভক্তিসমুৎপন্ন।

"ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা
ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্-
স্ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ ॥" ভা ১১ ২ ৪৩

এই প্রকার অনুবৃত্তি দ্বারা অচ্যুতাঙ্ঘ্রি (ভগবৎপদ) ভজনা করিলে ভক্তহৃদয়ে ভক্তি, বিষয়বৈরাগ্য এবং ভগ-বৎপ্রবোধ জন্মে। তার পর সাক্ষাৎ পরমা শান্তি প্রাপ্ত হয়

এখানে ভক্তের হৃদয়ে ভক্তি হয় বলাতে বিফলোক্তির ন্যায় বোধ হয়। কেন না ভক্তি না হইলে কেহ ভক্ত হয় না, সুতরাং ভক্তের ভক্তি ইহা পুনরুক্তি বলিয়া বোধ হয়। তার পরে জ্ঞান ব্যতীত সত্য এবং অসত্যের প্রভেদ বোধ হয় না, সত্যাসত্য, আত্মানাত্ম বোধ না জন্মিলে ঈশ্বরবস্তুর সঙ্গে পরিচয় হয় না, ঈশ্বর সহ সাক্ষাৎ বা পরিচয় ব্যতীত তাঁহার প্রতি অনুরাগ হওয়া অসম্ভব। সুতরাং এ সকল (ভক্তি হইতে জ্ঞান হয়) উক্তির মর্য্যাদা বোধ হওয়া কঠিন। এই জন্য পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানের সাহায্যে ভক্তি জন্মে। এ জ্ঞান সামান্য জ্ঞান, যে জ্ঞান ভক্তির সাহায্যে জন্মে তাহা বিশেষ জ্ঞান। অভক্তহৃদয়ে যে প্রথমানুরাগ সঞ্চার হয় তাহা সামান্য ভক্তি। ভক্ত-হৃদয়ে যে নব নব অনুরাগরঞ্জিত ভাবনিচয় অভিব্যক্ত হয়, এবং ভক্তিকে প্রেমে, প্রেমকে ভাবে ও ভাবকে মহা ভাবে পরিণত করে তাহা বিশেষ ভক্তি। এই কারণে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, জ্ঞানের পথে যেমন ভয় বিপদের আশঙ্কা আছে, ভক্তির পথে তাহা নাই। ইহা পাষাণকে গলাইয়া কর্দ্দমে পরিণত করে, সুতরাং সংসার আর প্রবেশ করিতে অবসর পায় না।

"স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণাং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥"

ভাগবত।

ভক্তিযোগ এই জন্য শ্রেষ্ঠ যে, সে বলপূর্ব্বক ত্রিগুণা মায়াকে অতিক্রম করিয়া আমার ভাবের জন্য প্রস্তুত করে। এই কারণে বলা হইয়াছে—

"যানাস্থায় নরো রাজন্ন প্রমাদ্যেত কর্হিচিৎ।
ধাবন্নিমীল্য নেত্রে বা ন স্খলেন্ন পতেদিহ ॥

ভাগবত। ১১

হে রাজন, যাহাকে আশ্রয় করিয়া মনুষ্য কদাচ প্রমাদ-গ্রস্ত হয় না, এবং চক্ষুর্দ্বয় নিমীলিত করিয়া দৌড়াইলেও স্খলিত বা পতিত হয় না তাহা ভাগবত ধর্ম্ম। এ স্থলে নেত্রদ্বয় কি?

"শ্রুতিস্মৃতী উভে নেত্রে বিপ্রাণাং পরিকীর্ত্তিতে।
একেন বিকলঃ কাণো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥"

স্বামিধৃতবচনম্।

শ্রুতি আর স্মৃতি ব্রাহ্মণদিগের দুইটি চক্ষুঃস্বরূপ, একের অভাব হইলে কাণা, দুইএর অভাব হইলে অন্ধ নামে খ্যাত হয়। যদি এই প্রকার অন্ধও ভাগবত ধর্ম্ম আশ্রয় করে, তাহারও পদস্খলন ও পতন হয় না কেন?

"ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥

ভাগবত। ১১ ২।

দ্বিতীয়াভিনিবেশ অর্থাৎ ঈশ্বরাতিরিক্ত বস্তু সংসারাদির প্রতি মনোযোগই ভয়ের কারণ। কেন না দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে আত্মবিস্মৃতি জন্মে এবং আত্মবিস্মৃতি হইতে ঈশ্বর-বিস্মৃতি জন্মে। এ সকল সেই ভগবানের মায়াকৃত। অতএব গুরু ও দেবতাপ্রাণ ব্যক্তি তাঁহাকেই একান্ত ভক্তির সহিত ভজনা করিবেন। কেন না—

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।"

ভগবদ্গীতা।

আমাকে যাহারা আশ্রয় করে এই মায়া হইতে তাহারা মুক্তি লাভ করে। ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি দ্বারা মন সমাকৃষ্ট হইলে সে ব্যক্তিকে অন্য আকর্ষণে আর পতিত হইতে হয় না। তাঁহার সৌন্দর্য্যসাগরে কারুণ্যসাগরে মন একবার ডুবিলে আর উঠিতে পারে না। কাজেই ভক্তির ধর্ম্ম ভাগবতপন্থা নিরাপদ।

অনুরাগ ও বিরাগ।

অনুরাগ ও বিরাগ এই দুইটি যুগলাত্মকবৃত্তি। ইহার একটি থাকিলে অন্যটিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে। অনুরাগ থাকিলে বিরাগ থাকিবে অথবা বিরাগ থাকিলে

অনুরাগও থাকিবে। এক বিষয় নহে বিষয়ান্তরে কিন্তু একই ব্যক্তিতে সমকালে এই দুইটিকে অবস্থিতি করিতে দেখা যায়। অথচ এই দুইবৃত্তি পরস্পর পরস্পরের বিপরীত। যে বস্তুর প্রতি অনুরাগ সে বস্তুর প্রতি বিরাগ হয় না, কিন্তু তাহার বিরোধী বস্তুর প্রতি স্বভাবতই বিরাগ উপস্থিত হয়। যদি কোন ব্যক্তি আমার শত্রু হয়, সেই শত্রুতার জন্য তাহার প্রতি মনের বিরক্তি উদ্রিক্ত হয়, আমি তাহার কথা বার্ত্তা কিছুই ভাল বাসি না, এমন কি তাহার ভাল কার্য্যকেও নিন্দা করিতে ইচ্ছা যায়, ইহা বিরক্তির লক্ষণ সুতরাং তাহার যে শত্রু অর্থাৎ আমার শত্রুর যে শত্রু তাহাকে ভাল বাসিতেও সেই কারণে ইচ্ছা হয়। অনুরাগ বিরাগের একটি উপার্জ্জন করিলে বা উপার্জ্জিত হইলে, অন্যটিও আপনি উপস্থিত হয়, চেষ্টা করিয়া উপার্জ্জন করিতে হয় না। যদি ঈশ্বরানুরাগ জন্মে তবে সেই কারণে বিষয়বিরাগ আপনি জন্মিবে। কেন না বিষয় ঈশ্বরলাভের প্রতিকূল। অন্য দিকে বিষয়ানুরাগ জন্মিলে ঈশ্বরে বিরক্তি হওয়া স্বাভাবিক।

কোন বস্তুর প্রতি চিত্তাভিনিবেশ জন্মিলে, তাহার গুণ কি, দোষ কি, আলোচনা করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। এই আলোচনা বা বিচারের সময়ে মানুষের মন কোন কোন বস্তুর মিষ্টতার ভিতরে ডুবিয়া যায়, আর তাহা হইতে উত্থান করিবার শক্তি থাকে না। এই প্রকারে কোন বস্তুর প্রতি অনুরাগ জন্মিলে তৎপ্রতিকূল বস্তুর প্রতি আপনি বৈরাগ্য জন্মে। যদি বিষয়ের প্রতি চিত্তাভিনিবেশবশতঃ বিষয়ের মিষ্টতায় মন বিমুগ্ধ হয়, তবে ঈশ্বরের প্রতি আর অনুরাগ থাকে না কিন্তু বিরাগ জন্মে। আবার যদি ঈশ্বরের মিষ্টতায় মন নিমগ্ন হয় তাহা হইলে আর উত্থানশক্তি থাকে না, বিষয়ের প্রতি বিরক্তি সেই কারণেই উপস্থিত হয়। এক জন ঈশ্বরভক্তি-পরায়ণা নারীকে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে "তুমি কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতি রিপুবর্গের উপর কি উপায়ে জয়লাভ করিয়াছিলে?" সেই ভক্তিমতী নারী উত্তর করিলেন, "আমি সর্ব্বদা ভগবৎপ্রেমে নিমগ্ন থাকি বলিয়া অন্য চিন্তা করিবার অবসর পাই না, সুতরাং কাম ক্রোধ লোভ মোহ প্রভৃতির সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয় না। যাহাদের সঙ্গে কখন দেখা সাক্ষাৎ নাই, তাহারা আমার শত্রু হইবে কিরূপে? সুতরাং যুদ্ধ করিয়া জয় লাভের চেষ্টা করাও নিষ্প্রয়োজন।"

এই জন্যই বলা হইয়াছে যে, দ্বৈতাভিনিবেশ হইতে ভয় জন্মে, কিন্তু ঈশ্বরাভিনিবেশে নিরাপদ হওয়া যায়, এবং এই কারণে ভক্তির পথ নিশ্চিত ও নিরাপদ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই জন্য সহজে যেরূপ উপায় করিলে ভক্তিপথের যাত্রী হওয়া যায় আমরা তাহা প্রদর্শন করিতেছি।

প্রাপ্ত।

মঙ্গলগঞ্জ।

আমি মহানগরীর কোলাহল ছাড়িয়া কিয়ৎকাল নির্জ্জনবাসের জন্য গত ১৬ই ফাল্গুন মঙ্গলগঞ্জে আসিয়াছি। ২২ দিন এখানে যাপন করিলাম। আর দুই দিন অন্তর এ স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক কৃষ্ণনগর হইয়া নবদ্বীপ যাইবার সংকল্প করিয়াছি। নবদ্বীপ মহাত্মা শ্রীচৈতন্যের জন্ম ও লীলাভূমি, তজ্জন্য তাহা দর্শনের ইচ্ছা অনেক দিন হইতে অন্তরে বলবতী। সেখান হইতে কিয়দ্দিনের জন্য কলিকাতায় ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা আছে।

মঙ্গলগঞ্জ এইক্ষণ বিশেষরূপে সাধারণের নিকটে পরিচিত। অত্রত্য ভূমাধিকারী প্রিয় ভ্রাতা লক্ষ্মণচন্দ্র আসের যত্ন ও অনুরাগবশতঃ এ স্থান চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। সময়ে সময়ে প্রচারক বন্ধুগণ এখানে আসিয়া অবস্থিতি ও সাধন ভজনাদি করিয়া থাকেন। মঙ্গলগঞ্জে নির্জ্জনতা ও সজ্জনতা দুই আছে। আমি প্রতি দিন দিবাভাগ উদ্যানস্থ নির্জ্জন কুটীরে ধ্যান চিন্তা ও অধ্যয়নাদিতে যাপন করিতেছি। পারস্য দেশান্তর্গত শিরাজনগরনিবাসী পরম প্রেমিক খাজা হাফেজের গভীর আধ্যাত্মিক ভাবপূর্ণ সুমধুর পারস্য গজল, এবং হেজরির প্রথম শতাব্দীতে খলিফা আবুবেকর ও ওমর কর্ত্তৃক রোমরাজ্যে প্রেরিত দুর্জ্জয় সৈন্যদিগের জেহাদের বৃত্তান্তবর্ণিত রোমবিজয় নামক আরব্য ইতিহাস গ্রন্থ আমার প্রাত্যহিক পাঠ্য। এক দিকে মহাকবি প্রেমিক হাফেজের মহাভাবময়ী সুরার মত্ততা, গীত বাদ্য, পারস্য উদ্যানবিহারী বোলবোল বিহঙ্গের সুমধুর কণ্ঠধ্বনি, পুষ্পবনের শোভা ও সখার রূপ বর্ণন, অন্য দিকে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম, রক্তপাত, নিষ্ঠুর আক্রমণ ও লুণ্ঠন এবং লক্ষ লক্ষ কাফের বিনাশ, আমি এই দুই বিপরীত বিষয় লইয়া আছি। পারস্যের সুশীতল ছায়াপ্রদ সুরম্য উদ্যান, এবং আরবের উত্তপ্ত ভয়ঙ্কর মরুভূমি এই দুই বিভিন্ন প্রকৃতি স্থানে আমি কল্পনার চরণে বিচরণ করিয়া থাকি। মধ্যাহ্ন কালে তরুমূলে রন্ধনের সময় আচার্য্যদেবের কুটীরের যোগবিষয়ক উপদেশ পাঠ করি। কোরাণের এক একটি অংশও আমার নিত্য আলোচ্য বিষয় হইয়া আছে। প্রতি দিন মধ্যাহ্নে সম্মিলিত উপাসনা ও রাত্রিতে সঙ্গীত সংকীর্ত্তন এবং রবিবার সন্ধ্যার পর সামাজিক উপাসনা এবং এইক্ষণ হইতে প্রাতঃকালে উষা কীর্ত্তন হয়। উপাসনা ও ভোজনাদিতে বন্ধুবর লক্ষ্মণচন্দ্রের ও তাঁহার কর্ম্মচারিবর্গের যোগ আছে। কেবল তরুমূলে রন্ধন ভোজনেতে তাঁহার এক জন প্রধান কর্ম্মচারী ব্যতীত অন্যের যোগ নাই। লক্ষ্মণ বাবু আপন কর্ম্মচারিবর্গের সঙ্গে বন্ধুভাবে ব্যবহার করেন। তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারিগণ সকলেই ব্রাহ্ম। তিনি সময়ে সময়ে কতিপয় কর্ম্মচারিকে

সঙ্গে করিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলেতে সাধারণ লোকদিগের সহিত ধর্ম্মকথা কহেন, এবং তাহাদের নিকটে ভগবানের নাম গুণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ইহাতে বিশেষ উপকার হইতেছে। তিনি এ অঞ্চলের দুঃখী দরিদ্র লোকদিগের হিতসাধনেও মুক্তহস্ত, অনেকরূপে তাঁহার অর্থের সদ্ব্যবহার হইয়া থাকে। এজন্য ধনী জমিদারদিগের মধ্যে তিনি অধিকতর শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। আমার এখানে উপনীত হওয়ার কিয়দ্দিন পরেই ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় আগমন করিয়া অবস্থিতি করেন। তখন হইতে এক দিন আমি ও এক দিন তিনি, এরূপ পালাক্রমে উপাসনা কার্য্য চলিয়াছে। উপাসনা অতিশয় মধুর ও গভীর হইতেছে। বিশেষতঃ তিনি নূতন নূতন সুমধুর সঙ্গীত শুনাইয়া এবং বৃক্ষতলে সুরস ব্যঞ্জন রাঁধিয়া অনেক সাহায্য ও উপকার করিয়াছেন। কয়েক দিন পরেই তিনি উড়িষ্যাপ্রদেশে যাইয়া স্থিতি ও প্রচার করিবার জন্য এখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গমনের কিয়দ্দিন পূর্ব্বে ভাই কেদারনাথ দে মহাশয় আগমন করিয়া অবস্থিতি করিয়াছেন। তিনি ভাই নন্দলালের স্থলাভিষিক্ত (সঙ্গীতবিষয়ে সম্পূর্ণ না হউক) হইয়াছেন। এখানে প্রাত্যহিক উপাসনায় ৭।৮ জন, সামাজিক উপাসনায় ১৫।১৬ জন যোগ দিয়া থাকেন। কুমারখালী নিবাসী এক জন সুগায়ক লক্ষ্মণ বাবুর নিকটে আছেন। তিনি ফিকির ও কাঙ্গালের নূতন নূতন সুমিষ্ট ব্রহ্ম সঙ্গীত গান করিয়া সকলকে পরিতৃপ্ত করিতেছেন। আমরা ভ্রাতৃবর লক্ষ্মণচন্দ্রের নিকটে বিশেষ কৃতজ্ঞ। জগজ্জননী তাঁহার চেষ্টা যত্ন সফল করুন, তাঁহাকে দিন দিন ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ ও সংবৃত করুন।

অনুগত
শ্রীগিরিশচন্দ্র সেন।

সংবাদ।

বিগত ২৩ শে ফাল্গুন অপরাহ্ণে আমাদের মহামান্য রাজপ্রতিনিধির পত্নী লেডি ডফারিণ এবং তাঁহার দুই কন্যা কমলকুটীরে উপনীত হইয়া আচার্য্যের সমাধি ও তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নবদেবালয় দর্শন করিয়াছেন। আচার্য্যপরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও আত্মীয়তা প্রদর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অত্যন্ত সুখী ও সম্মানিত করিয়াছেন। আমাদের রাজপ্রতিনিধিপত্নীর অমায়িক ব্যবহার ও আচার্য্যের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা প্রদর্শন দেখিয়া আমরা বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি। সে দিন আচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত মহিলাদিগের শিক্ষার জন্য ভিক্টোরিয়া কলেজে রাজপ্রতিনিধি সস্ত্রীক উপস্থিত হইয়া আর্য্যমহিলাদিগের উৎসাহ ও আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন।

আমরা শোকসন্তপ্তহৃদয়ে প্রকাশ করিতেছি যে, সুবিখ্যাত ডেপুটী কালেক্টর ও একস্ কমিশনর আমাদের পরম বন্ধু বাবু বিমলাচরণ ভট্টাচার্য্য বিগত ৬ই চৈত্র বাঁকিপুরে পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহার ৪০।৪১ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছিল। ইনি ইতিপূর্ব্বে ডেপুটী কালেক্টারের পদে বাঁকিপুরে ছিলেন, একদা কমিশনরের পদে নিযুক্ত হইয়া কিছু দিন কলিকাতায় স্থিতি করিয়াছিলেন। বাঁকিপুরের ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল, এবং বিহারপ্রদেশের প্রচারক ভাই দীননাথ মজুমদারের তিনি বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তিনি হিন্দুধর্ম্ম ও মোসলমান ধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম সমুদায়কে আদর ও শ্রদ্ধা করিতেন, এক জন মোসলমান ফকিরের নিকটে নাকি দীক্ষিত হইয়াছিলেন। হাঁপানিকাসিতে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব্বে এক দিনমাত্র রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন এ মৃত্যুর কিঞ্চিৎকাল পূর্ব্বে চেয়ারে বসিয়া ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এরূপ অকস্মাৎ মৃত্যু হইবে কেহই জানিত না। আত্মীয় বন্ধু কেহ নিকটে ছিল না, স্ত্রী পুত্র সমুদায় কলিকাতায় ছিলেন। এক জন হিন্দুস্থানী চাপরাশি নিকটে ছিল, মৃত্যুকালে সে বিমলা বাবুকে আল্লাহ শব্দ উচ্চারণ করিতে শুনিয়াছিল। সেই সময় তাঁহার মুখ সুন্দর ও প্রফুল্ল ছিল। তিনি অনেক গুলি সন্তান সন্ততি রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বর পরলোকগত ভ্রাতার কল্যাণ বিধান করুন।

গত ২৯ শে ফাল্গুন গাজিপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসব কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও ভাই দীননাথ মজুমদার তদুপলক্ষে তথায় গিয়াছিলেন। কয়েক দিন হইল ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন।

কোচবিহারের মহারাজ ইংলণ্ড হইতে কুশলমতে বম্বে উপস্থিত হইয়াছেন। এই শুভ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মহারাণী উডলেণ্ড রাজবাটীতে মহিলাগণ সহ বিশেষ উপাসনা করিয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা দান করিয়াছেন।

১লা ফাল্গুন হইতে ১০ই ফাল্গুন পর্য্যন্ত আমবাগিচি ব্রাহ্মসমাজের উৎসব হইয়াছে। এই উৎসবে তথাকার ব্রাহ্মগণ বিশেষ আনন্দ ও উপকার লাভ করিয়াছেন। ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভাই ফকিরদাস রায় উৎসবের কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন।

রঙ্গপুরে প্রিয়ভ্রাতা শ্রীশচন্দ্র দাসের পুত্রের শুভ নামকরণ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার তিন সমাজ এক করিবার জন্য এক বার চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, পুনর্ব্বার সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের নিকটে তাঁহার প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন।

স্বর্গীয় জয়গোপাল সেন মহাশয়ের উইল অনুসারে তাঁহার পুত্রগণ ভাই অমৃতলাল বসুকে ২৫০ ও ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যালকে ১০০ দান করিয়াছেন। ভাই কেদারনাথ দেকেও ১০০ প্রদত্ত হইবে।

গত বারে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের আয় ব্যয় বিবরণ যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে স্থানে স্থানে ভ্রম দৃষ্টিগোচর হইল। সেই ব্যয়গুলি সংশোধন করিয়া নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে।

আয় শিরে—এককালীন দানের সমষ্টি ৪০০।১০ পরিবর্ত্তে ৪০১ ১০ হইবে।

ব্যয় শিরে—উৎসব ব্যয়ের সমষ্টি ৮৪৫।০ পরিবর্ত্তে ৩৪৫।০ হইবে।

ট্রষ্ট ডিডের শিরে—ষ্টাম্প ক্রয় ১০ টাকার পরিবর্ত্তে ২০ টাকা হইবে।

জুবিলি ব্যয় ৯২৵০ পরিবর্ত্তে ৯২৷৷৴০ হইবে।

ব্যয়ের সমষ্টি ৮৬১৮৵২ পরিবর্ত্তে ৮৬১৮৵৫ হইবে।

'এই পত্রিকা ৭৮ নং অপার সার্কুলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২৩ ভাগ। ৭ সংখ্যা। | ১লা বৈশাখ, বৃহস্পতিবার, ১৮১০ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে বিশ্বাসীর ঈশ্বর, এ সময়ে বিশ্বাস ভিন্ন দাঁড়াইবার উপায় নাই। যে সময়ে অবিশ্বাস ছদ্মবেশে ঘরে ঘরে ভ্রমণ করিতেছে, সে সময়ে এমন কে আছে যে, বলিতে পারে, অবিশ্বাস আমাকে ভুলাইতে পারিবে না। হে দীনবন্ধু, যত প্রকারের পাপ আছে, অবিশ্বাস সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক। এ পাপ একবার মনের ভিতরে প্রবেশ করিলে আর বাহির হইতে চায় না, কত প্রকারে বেশ পরিবর্ত্তন করে, আর দুর্ব্বল-চিত্ত ব্যক্তির প্রাণ সংহার করে। অবিশ্বাস এমনই যুক্তি আনিয়া উপস্থিত করে, যাহা শুনিয়া মনে হয়, এ যাহা বলিতেছে তাহা বেশ যুক্তিযুক্ত। কিন্তু তাহার ভিতরে যে প্রচ্ছন্ন ভাবে সাংসারিকতা পার্থিব ভাব প্রবেশ করিয়া আছে, সে তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারে না। হে অনন্ত জ্ঞানের আধার, আমরা তোমার উপাসক হইয়া জ্ঞান যুক্তি সুমতি সুবুদ্ধির বিরোধী কখন হইতে পারি না, কিন্তু অজ্ঞান যখন জ্ঞানের, কুযুক্তি যখন সুযুক্তির, কুমতি যখন সুমতির বেশে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন অজ্ঞানকে জ্ঞান, কুযুক্তিকে সুযুক্তি, কুমতিকে সুমতি বলিয়া গ্রহণ করিয়া যে সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত হয়, তাহারই প্রতিবিধানের জন্য তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি। হে শ্রীহরি, তুমি আমাদিগের প্রাণের ভিতরে সুমতি সুবুদ্ধি-রূপে অবতীর্ণ হও যে, আমরা অবিশ্বাসের সর্ব্ব প্রকার কুযুক্তি অনায়াসে ভেদ করিয়া পূর্ণ বিশ্বাসে তোমার বিধানের বিধি সকল পালন করিতে পারি। তোমার বিধানকে অণুপরিমাণে লঘু করিয়া যাহাতে অবিশ্বাসের হস্তগত না হই তুমি এই প্রকার আশীর্ব্বাদ কর। তোমার কৃপা বিনা এই বিষম অবিশ্বাসপ্রধানসময়ে কেহ যে বিধান বিচ্যুত না হইয়া থাকিবে তাহার সম্ভাবনা নাই। তাই তোমার নিকটে বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি, এই বিষম সময়ে যেন আমরা তোমার একান্ত শরণাপন্ন হই, এবং সর্ব্বপ্রকার অবিশ্বাস হইতে রক্ষা পাই।

আমরা কোথায় যাইতেছি?

সংসারে সকলই অতি চঞ্চল, কিছুই স্থির থাকে না। আজ যাহা দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছি, কল্য তাহা হইতেই ভয় বিষাদ সমুপস্থিত হয়। সংসারের রাজ্য নিতান্ত পরিবর্ত্তনশীল, এই জানিয়া মনুষ্য ধর্ম্মরাজ্যের আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু দুরন্ত সংসার সেখা-

নেও গিয়া অধিবাসিগণের উপরে উৎপাত করিতে প্রবৃত্ত হয়। ধর্ম্মরাজ্যে সকলই স্থির প্রশান্ত, তবে সেখানে এত অস্থৈর্য্য কেন? সেখানে পৃথিবীর কোলাহল আসিয়া কিপ্রকারে প্রবেশ করিল? আজ এ প্রকার কল্য অন্য প্রকার এরূপ কেন এখানে দেখা যায়? অবশ্য সংসার এ স্থানে ধর্ম্মের নাম লইয়া ছদ্মবেশে প্রবেশ করিয়াছে, অন্যথা সংসারের চঞ্চলস্বভাব কেন ধর্ম্মরাজ্যে উপস্থিত?

ধর্ম্মের মধ্যেও যদি সংসারের প্রবেশ সম্ভবপর হয়, তবে আমরা কোথায় যাইতেছি, ইহা এক বার চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। পৃথিবীতে কত ধর্ম্ম আসিল, কত ধর্ম্ম আপনার আধিপত্য বিস্তার করিল, কিন্তু সংসার কোন ধর্ম্মকে বিশুদ্ধ অবস্থায় থাকিতে দেয় নাই। যাঁহারা ধর্ম্মপ্রচারক তাঁহাদিগের মধ্যেই সংসার প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মকে এমন পরিচ্ছদ দান করিয়াছে, যাহাতে নামে সেই ধর্ম্ম থাকিয়া কার্য্যে সংসারের পরিপোষক হইয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আমাদিগের মধ্যে ঘটিবে না, ইহা কখন আমরা বলিতে পারি না, তাই আমাদিগের গতি কোন্ দিকে হইতেছে ভাল করিয়া দেখা সমুচিত।

সংসার যখন ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া ধর্ম্মের বিশুদ্ধি হরণ করিবার জন্য যত্ন করে, তখন সে এমন বেশ ধারণ করে, যাহাতে লোকের প্রতীতি হয়, এতো নীচু নহে, কিন্তু অতি উচ্চ ধর্ম্ম। এমন যে ভয়ানক তান্ত্রিক ব্যভিচার তাহারও উচ্চধর্ম্মের নাম লইয়া সমাগম হইয়াছে। মদ্যাদি সমুদায় সামগ্রীতে ব্রহ্মদর্শন—তান্ত্রিক ব্যভিচারের এই মূল ছদ্মবেশ। ব্রহ্ম বিকারশূন্য, তাঁহার দ্বেষ্য কিছুই নাই, তান্ত্রিকপথাচারীও সেইরূপ বিকারশূন্য, যে কোন বিষয়ের প্রতি বিদ্বেষশূন্য হইবেন। একথা শুনিতে অত্যন্ত উচ্চধর্ম্মের কথা এবং যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানের পরাকাষ্ঠা বলিয়া প্রতীত হয়, সুতরাং সাধারণ লোকে তান্ত্রিক ধর্ম্মের বাগ্‌জালে সহজে নিপতিত হয়। 'বিষ্ঠা ও চন্দন সমান' একথা লোকতঃ তন্ত্রাচারের জন্য প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা তান্ত্রিক সাধক তাঁহাদিগের নিকট 'ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সমান' একথাও এই জন্য প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মবিকারশূন্য তাঁহার কিছুই দ্বেষ্য নাই, এই বলিতে বলিতে তান্ত্রিকগণ কত দূর গিয়া পড়িলেন, তখন তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, এখন আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি।

সংসার সে কালে যেরূপ ছদ্মবেশ ধরিয়া আসিয়াছে একালেও সেইরূপ আসিবে, কিন্তু কোন্ বেশে আসিবে কে জানে? বেশ দেখিয়া ধরিয়া ফেলিতেই বা কয় জন জানে? যদি জানিত, সংসারের অধিকার বিস্তার করা কঠিন হইয়া পড়িত। সংসার কি কি বেশ ধারণ করিয়া আমাদিগের নিকট আসিতে পারে আমাদিগের বুঝিয়া রাখা উচিত, অন্যথা তাহার হাতে আমাদিগের নিশ্চয় মৃত্যু। আমরা শুনিয়াছি আখ্যায়িকার আছে, ছদ্মবেশী রাবণপুত্র বহুবেশ ধারণ করিয়া আসিয়াও রামানুরক্ত দাস হনূমান্‌কে বঞ্চিত করিতে পারে নাই, কিন্তু পরিশেষে ভক্তের বেশ ধারণ করিয়া আসিয়া তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছিল। এ আখ্যায়িকার অর্থ এই যে, আমরা অন্য শত ছদ্মবেশ অতিক্রম করিতে পারি, কিন্তু বন্ধুর বেশ আমাদিগকে সহজে ভুলাইয়া ফেলে।

তান্ত্রিক সময়ে সংসার বা অধর্ম্ম যে বেশ ধারণ করিয়াছিল, তাহা সে কালের উচ্চ ধর্ম্মতত্ত্বের বেশ। সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মযোগে সমুদায় ভেদবুদ্ধিবিলোপ, ইহা সে কালের সর্ব্বোচ্চতম ধর্ম্ম। সংসার সেই বেশ ধারণ করিয়া আসিয়া বলিল, তোমরা মদ্যাদিকে যত দিন হেয় দৃষ্টিতে দেখিবে, তত দিন তোমাদিগের পশুত্ব ঘুচিবে না, তোমাদের ভেদ বুদ্ধি বিলুপ্ত হইবে না, ব্রহ্ম তোমাদিগের নিকট সর্ব্বত্র আপনাকে প্রকাশ করিবেন না। মানুষ স্বভা-

বস্তঃ ভোগাভিলাষী, বহুকষ্টে তাহাদিগকে ভোগত্যাগ সাধন করিতে হয়। যখন সকলে দেখিল যে, ভোগেতে তাহাদিগের মোক্ষলাভ হইবে, এবং ধর্ম্মের উচ্চ সোপানে আরোহণ করিবে, তখন তাহারা অতি ব্যগ্রতার সহিত সেই পথ ধরিল, এবং সর্ব্বাপেক্ষা আপনাদিগকে অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ মনে করিতে লাগিল। আমাদিগের মধ্যে এখন উচ্চতত্ত্ব কি? সামঞ্জস্য ও সম্মিলন। সংসার যদি আইসে তবে এই বেশ ধারণ করিয়া আমাদিগের নিকটে উপস্থিত হইবে, ইহা নিশ্চয় কথা। এই ছদ্মবেশ আমরা এখন কি প্রকারে ধরিয়া ফেলিতে পারি, তাহার উপায় আবিষ্কার করা একান্ত প্রয়োজন। আমরা এই ছদ্মবেশ ধরিয়া ফেলিবার যে উপায় বুঝিতে পারি তাহা বলিতেছি, পাঠকগণ উপায় ঠিক কি না পরীক্ষায় বুঝিয়া লইবেন।

যাঁহাদিগের নিপুণ দৃষ্টি আছে, কেবল তাঁহারাই আসল ও নকল যথার্থ ও ছদ্মবেশ এ দুইয়ের পার্থক্য বুঝিতে পারেন, অপরে পারে না, কিন্তু নিপুণদৃষ্টির লোক পার্থক্যের লক্ষণ বাহির করিয়া দিলে তখন যে কেহ ছদ্মবেশ ধরিয়া ফেলিতে পারে। সংসার যে কোন বেশ কেন ধারণ করুক না, সে একটি লক্ষণ পরিত্যাগ করিতে পারে না, সেটি পার্থিবভাব। তন্ত্রের সময়ে সে ধর্ম্মের উচ্চতত্ত্ব অবলম্বন করিল বটে, কিন্তু পার্থিব ভোগের বিষয়নিচয়কে সেই তত্ত্বের মূলে অবলম্বন করিল। সংসার আসে লোকের মনে পার্থিব ভাব প্রবল করিয়া দিবার জন্য। সে আপনার সে স্বভাব কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না। পরিত্যাগ করিবেই বা কি প্রকারে, তাহা হইলে সে তো আর সংসার থাকে না। সামঞ্জস্য ও সম্মিলন অপার্থিব বস্তু, উহার সঙ্গে অণুমাত্র পার্থিব ভাবের যোগ হওয়া সুকঠিন। সামঞ্জস্য ও সম্মিলন নববিধানে। কেননা নববিধানই এই সামঞ্জস্য ও সম্মিলন পৃথিবীতে আনয়ন করিয়াছেন। যে কোন বিষয় নববিধানকে অণুমাত্র খর্ব্ব করে, উহা স্বর্গীয় নহে পার্থিব। সংসার এমনই বেশ পরিধান করিয়া আসিবে, যেন সে নববিধানের উচ্চতত্ত্ব সমুদায় গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, সে নববিধানের প্রতি অননুরক্ত সম্মানবিরহিত। নববিধানের বিশেষত্ব উড়াইয়া দিয়া সংসার অতীব উদার ভাব প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিবে, নব বিধান বলিয়া আবার বিশেষ বিধান কি? সমগ্র একেশ্বরবাদের বিধানই বর্ত্তমান বিধান, তাহাতে আবার নবশব্দের প্রয়োগ কেন? নবশব্দ প্রয়োগ করিলে যখন অনেকগুলি লোককে হারাইতে হইবে সম্মিলনের ব্যাঘাত হইবে, তখন ও শব্দের প্রয়োগে প্রয়োজন নাই? শব্দ অতি অকিঞ্চিৎকর, ভাবই যথার্থ। শব্দ পরিত্যাগ করিয়া যদি বহু লোককে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সে শব্দ পরিত্যাগ অবশ্য কর্ত্তব্য। এখানে আমরা দেখিতেছি, একটি পার্থিব ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বরের বিধানকে লঘুকরা হইতেছে। যেন মানুষ আগে তাহার পরে ঈশ্বরের বিধান সমাদরের পাত্র। যেখানে সম্মিলনের নামে মানুষকে বাড়াইয়া বিধানকে খর্ব্বকরা হইতেছে, সেখানেই যে পার্থিব ভাব আছে, ইহা এখন সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। যে নববিধান একেশ্বরবাদ কেন সমুদায় বাদের সামঞ্জস্য ও সম্মিলন স্থল, তাঁহাকে ছাড়িয়া পৃথিবীতে সামঞ্জস্য ও সম্মিলনের আশা, বৃক্ষের মূলচ্ছেদ করিয়া ফলপ্রত্যাশার তুল্য। যাহারা নববিধানকেই বিশ্বাস করিল না, তাহাদিগকে লইয়া মিলন সংস্থাপন, ইহা অতীব বিচিত্র। তুমি বলিবে, যে সকল লোক নাম গ্রহণ করিল না, অথচ নববিধানের উচ্চতত্ত্ব সমুদায় গ্রহণ করিল, তাহারা অবশ্য মিলনের পাত্র। নামে কি আসে যায়? নামে কি আসে যায় সত্য, কিন্তু নাম-

গ্রহণেই বা আপত্তি কেন? যখন আপত্তি আছে, তখন অবশ্য তাহার হেতু আছে। সেই হেতুর মধ্যে নববিধানকে লঘু করিবার, উহার অপার্থিবত্ব উড়াইয়া দিবার ভাব আছে, এ ভাব থাকিতে মিলন কি প্রকারে সম্ভবে?

আমরা দেখিতে পাইতেছি, নববিধানকে লঘু করিয়া মিলনের জন্য চেষ্টা আমাদিগের মধ্যে উপস্থিত। কতক গুলি বাহ্যমতের মিলরূপ বেশ পরিধান করিয়া সংসার উপস্থিত। আসিয়া বলিতেছ, যখন সকল বিষয়ে মিল দেখিতে পাইতেছ, তখন এক 'নব' শব্দ আর কেন মিলনের প্রতিবন্ধক হইয়া স্থিতি করে। এই সঙ্কুচিত অনুদার ভাব উড়াইয়া দিয়া আইস আমরা মিলিত হইয়া বিধানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সিদ্ধ করি। তোমরা অতিজ্ঞানহীন অতীব অনুদার লোক, তাই এক সামান্য 'নব' শব্দ তোমাদের মিলনের পথের প্রতিবন্ধক হইয়া রহিয়াছে। তোমরা না আসিতে চাও না আসিলে, আমরা একেশ্বরবাদের অতীব প্রশস্ত ভূমিতে মিলিত হইব। চির কাল পৃথিবী শব্দ লইয়া বিবাদ করিয়া আসিয়াছে, এ তোমাদের সেই বিবাদমাত্র, এ বিবাদের কোন মূল্য নাই। দেখ যাহার যাহাতে বিশেষত্ব তাহা থাকিলেই হইল। যোগে হিন্দু, নির্ব্বাণে বৌদ্ধ, বিবেকিত্বে মুষা, পুত্রত্বে ঈশা, ইত্যাদি যে বিধানের যে বিশেষ ভাব তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক সেই সেই বিধানের নাম গন্ধ না থাকিলে ক্ষতি নাই, ইহা কি তোমরা জান না? নববিধানসম্বন্ধে কেন এ নিয়ম খাটিবে না? নাম গন্ধ না থাকিলে ক্ষতি নাই, ইহা আমরা মানি না, তাই বলি নববিধান নাম না থাকিলে তাহার সামঞ্জস্য ও সাম্মিলন ও থাকে না। তোমার আমার সামঞ্জস্য সম্মিলন—যাহা বস্তুতঃ সামঞ্জস্য সম্মিলন নহে ভানমাত্র—থাকিতে পারে। আমরা ঋষিগণকে ছাড়িতে পারি না, বুদ্ধকে ছাড়িতে পারি না, ঈশাকে ছাড়িতে পারি না, মুষাকে ছাড়িতে পারি না, তাঁহাদের সকলেরই নাম আমাদের নিকট মিষ্ট। তাঁহাদের নাম যেমন সুমিষ্ট, তেমনি নববিধাননামও সুমিষ্ট। কেবল সুমিষ্ট বলিয়া নহে, সেই সেই নাম ও সেই সেই ভাব এক এবং অভিন্ন সুতরাং এক অপরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। হরিনাম করিলে অনেক গুলি অযথাসংস্কারাপন্ন লোকের আমাদিগের সঙ্গে মিলিত হইবার প্রতিবন্ধক হয়, এ জন্য যেমন হরিনাম পরিত্যাগ করিতে পারি না, তেমনি বিধানসমূহের বিশেষত্ব জ্ঞাপক কোন শব্দ পরিত্যাগ করিতে পারি না। যত দিন এ সম্বন্ধে প্রভেদ আছে, সে প্রভেদ সত্য, সুতরাং প্রভেদ স্থলে অপ্রভেদ প্রদর্শনরূপ মিথ্যাচরণে প্রবৃত্ত হওয়া সাংসারিকতা। এ সাংসারিকতার অধীন হইয়া নবধর্ম্মের মহত্ত্ব লঘু করা আমাদিগের ধর্ম্মবুদ্ধির অনুমোদিত নহে। পৃথক্ থাকিয়া ব্যক্তিগত বন্ধুতা ও মঙ্গলকর কার্য্যে যোগ তাহাতে আপত্তি নাই, কিন্তু মণ্ডলীর একত্বপ্রদর্শন সেরূপ নহে। যাহা হউক, আমাদিগের অনুরোধ কাহার কোন্ দিকে গতি হইতেছে একবার দেখুন, এবং যাহাতে বর্ত্তমান যুগে ভগবৎপ্রেরিত নবধর্ম্মের অবমাননা না হয় তজ্জন্য বদ্ধপরিকর হউন।

অবিশ্বাস ও কুসংস্কার।

অল্পবিশ্বাস বা দুর্ব্বলবিশ্বাস বিশ্বাসে পরিণত হয়, কিন্তু অবিশ্বাস কখন সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিশ্বাসে পরিণত হইতে পারে না। অল্পালোক ক্রমে উজ্জ্বল আলোকে পরিণত হয়, অন্ধকার গভীর অন্ধকারে উপস্থিত করে। আলোক ও অন্ধকারের যে সম্বন্ধ বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের সেই সম্বন্ধ। বিশ্বাসে জ্ঞানালোক বিদ্যমান, অবিশ্বাসে অজ্ঞানান্ধকার। বিশ্বাসে ক্রমে জ্ঞানের পরিবৃদ্ধি, অবিশ্বাসে ক্রমিক অজ্ঞানতার উদয়।

অবিশ্বাস হইতে বিশ্বাস আইসে না, কিন্তু অবিশ্বাস হইতে কুসংস্কার আসিয়া থাকে।

অবিশ্বাস ও কুসংস্কারের একত্ব অজ্ঞানতায়। অবিশ্বাসও অজ্ঞানতা, কুসংস্কারও অজ্ঞানতা, সুতরাং এক হইতে অপরের সমাগম স্বাভাবিক। যখন দেখা যায় এক জন ক্রমান্বয়ে অবিশ্বাসের পথে ধাবিত হইতেছে, কিছুতেই আস্থা রাখিতে পারিতেছে না, মন নিরন্তর সংশয়াকুল, এমন কিছু আলম্বন নাই, যাহার উপরে বিশ্বাস দাঁড়াইতে পারে, ক্রমিক অবিশ্বাসজনিত পরিবর্ত্তনে তাহার মন পরিবর্ত্তিত হইতেছে, জানিতে হইবে, অচিরে সে ব্যক্তি ঘোর কুসংস্কারের হস্তে পড়িবে। তাহার এই কুসংস্কার দেখিয়া লোকে মনে করিবে যে, এ ব্যক্তি এখন বিশ্বাসের বাড়াবাড়ী করিতেছে। বস্তুতঃ ইহা বিশ্বাসের বাড়াবাড়ী নয়, অবিশ্বাসেরই বাড়াবাড়ী। অবিশ্বাস যেমন তেমনই আছে, তাহার বাহ্য বেশ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এই মাত্র।

কুসংস্কারের অবস্থায় অবিশ্বাস যায় নাই, অবিশ্বাসই কুসংস্কারের হেতু, ইহা একটু চিন্তা করিয়া না দেখিলে বুঝিতে পারা যায় না। অবিশ্বাস যখন অতিমাত্রায় উপস্থিত হয়, তখন লোকে শান্তিহারা হইয়া পড়ে। এ সংসারে মনুষ্য এমন অবস্থায় অবস্থিত যে, তাহাকে পদে পদে বিপদে ক্লেশে অশান্তিতে নিপতিত হইতে হয়। কোন মানুষ তাহাকে এই সকল হইতে উদ্ধার করিবে বা উদ্ধার করিবার উপায় হইবে, ইহা একেবারে অসম্ভব। মানুষ যত দিন সংসারের ঘোর পরীক্ষায় নিপতিত না হয়, তত দিন অবিশ্বাস করিয়া চলে, কিন্তু এক বার যখন পরীক্ষা আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে, হৃদয়ে শান্তি আর থাকে না, তখন সে এমন কিছু ধরিতে চায়, যাহাতে তাহার অপহৃত শান্তি পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারে। সে যখন সহজ স্বাভাবিক পন্থা অবিশ্বাস জন্য ছাড়িয়া আসিয়াছে, হঠাৎ সে পথে আর সে কেমন করিয়া যাইবে, সুতরাং সংশয় তাহাকে যাহা অলৌকিক, বুদ্ধির অতীত তাহারই দিকে লইয়া যায়। এত দিন তাহার মত ছিল, না বুঝিয়া কিছু মানিব না, এখন তাহার এই মত দাঁড়ায়, না বুঝিয়া বুদ্ধির অতীত সামগ্রী গ্রহণ করিব। কেন না ইহা ভিন্ন সংশয়কে সংশয় করিতে না দেওয়ার আর অন্য উপায় নাই। বুদ্ধিগম্য বিষয়ে সংশয় উত্থাপন করা সহজ, কিন্তু যাহা বুদ্ধিগম্য নহে তাহা হয় একেবারে বুদ্ধিগম্য নয় বলিয়া ছাড়িয়া দাও, না হয় মানিয়া লও, এ দুইয়ের আর কোন মধ্য পথ নাই। মন যখন বিপদ্‌গ্রস্ত, একটা কিছু আর অবলম্বন না করিলে চলে না, তখন কি করে, যাহার উপরে আর কোন কথা চলে না তাহাই মানিয়া লয়। এ মানিয়া লওয়ার মধ্যে বিশ্বাস নাই, কেন না বিশ্বাসে জ্ঞান আছে, জ্ঞানের পরিতৃপ্তি আছে, জ্ঞানের সঙ্গে তাহার কোন বিরোধ নাই। এখানে মানিয়া লওয়াতে জ্ঞান সায় দেয় না, অথচ বলপূর্ব্বক তাহার বিরোধে মানিতে হয়। সুতরাং এখানে অজ্ঞানতার রাজ্য ঘনতর গভীরতর হয়। অবিশ্বাসে যে অন্ধকার ছিল, কুসংস্কার তাহারই ঘনীভূতাবস্থা। এক বার এ নিবিড়ান্ধকারে নিপতিত হইলে আর তাহা হইতে উঠা কঠিন হইয়া পড়ে। যে সকল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অজ্ঞানতার অন্ধকার নিবৃত্ত হইবে, সেই সকল বৃত্তিকেই যখন শত্রু বলিয়া পরিহার করা হইল তখন আর উদ্ধারের উপায় কি ?

এই কুসংস্কারের অবস্থায় নিপতিত ব্যক্তির বিশ্বাসে প্রত্যাবর্ত্তন করা সহজ নহে। অবুদ্ধ বিষয়ের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া তাহার চিত্তের এমনই একটি স্বভাব হইয়া পড়ে যে, কোন একটি বিষয় যাহা সহজ ও স্বাভাবিক, তৎপ্রতি কিছুতেই আর আস্থা জন্মে না। এ ব্যক্তির বাড়ীর পার্শ্বে সহজ স্বাভাবিক প্রণালীতে লোকে জ্ঞানের পর জ্ঞান, সত্যের পর সত্য, শান্তির

পর শান্তি, আনন্দের পর আনন্দ লাভ করিতেছে, তৎপ্রতি তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, কিন্তু পঞ্চাশৎ ক্রোশ দূর স্থান হইতে একটী অলৌকিক ঘটনার বৃত্তান্ত আসিল, সে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সেখানে দৌড়াইল। তাহার প্রতিবেশী ধর্ম্ম চরিত্র সকল বিষয়ে দিন দিন উন্নত হইতেছে, অথচ সে পূর্ব্বে যে প্রকার বিষয়াসক্ত, ইন্দ্রিয়াসক্ত, নীচমনা, অশান্তহৃদয় ছিল, এখনও তাহাই রহিয়াছে অধিকন্তু দিন দিন মিথ্যার রাজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, তথাপি চৈতন্যোদয় নাই। অবিশ্বাসসম্ভূত কুসংস্কার অতীব তীব্র সামগ্রী, ইহার হস্তে নিপতিত হওয়ার তুল্য আর বিপদ নাই।

আমরা অবিশ্বাসসম্ভূত কুসংস্কার বলিলাম, এরূপ বলিবার বিশেষ কারণ আছে। মানুষ যে সমাজে জন্ম গ্রহণ করে, তন্মধ্যে অজ্ঞানতাজনিত যে সকল কুসংস্কার আছে, তাহা ব্যবহারবশতঃ লোকে মনে স্থান দিয়া থাকে। যখন সে ব্যক্তি জ্ঞানাভ্যাস করিতে থাকে, তখন সেই জ্ঞানের আলোকরেখা কুসংস্কারান্ধকার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উহাকে অল্পে অল্পে ক্ষীণ করিয়া ফেলে, পরিশেষে সেই আলোকে অন্ধকার একেবারে তিরোহিত হইয়া যায়। অবিশ্বাসসম্ভূত কুসংস্কারসম্বন্ধে এরূপ হওয়া কঠিন হইয়া পড়ে। কেন না জ্ঞানকে অনাদর করিয়া যে অবিশ্বাসের উদ্ভব, সেই অবিশ্বাস হইতে যে কুসংস্কার আসিল, উহা আর জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া কি প্রকারে তিরোহিত হইবে। একটি উপায় আছে, কিন্তু এ উপায়ের প্রতি সমাদর কৃপাসাপেক্ষ। ভগবানের কৃপার যদি কখন বিরতি থাকিত, আমরা নিরাশ হইতাম, কিন্তু যখন বিরতি নাই, তখন আশা আছে।

এ উপায় কি? এ উপায় আপনার প্রতি দৃষ্টি। কুসংস্কার লোককে ভিতর হইতে বাহিরের দিকে লইয়া যায়। মানুষ কুসংস্কারের অধীন হইয়া অন্তর্দৃষ্টিশূন্য হইয়া পড়ে। বাহিরের নানা অলৌকিক উপায়ে ব্যাপৃত থাকিয়া আত্মাবস্থা ভুলিয়া থাকে। ভগবানের কৃপায় যখন তাহার অন্তরের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি পড়ে, এবং বুঝিতে পারে যে, তাহার আত্মা অত্যন্ত হীন হইয়া পড়িয়াছে, চরিত্রের মূল পর্য্যন্ত কলঙ্কিত হইয়া গিয়াছে, প্রবৃত্তিনিচয়ের উপরে আধিপত্য আর নাই, বাহিরের অলৌকিক উপায় সকল তাহার আত্মার সদ্গতি ও উন্নতির কারণ হয় নাই, তখন তাহার মন সেই সকল দোষনিরসনের জন্য যত প্রবৃত্ত হয়, তত তাহার মনের উপরে বাহিরের আলৌকিক বিষয়নিচয়ের আধিপত্য খর্ব্ব হইয়া পড়ে। যত তাহার মনের অন্তর্মুখীন গতি হয়, তত জ্ঞানালোক প্রদীপ্ত হইতে থাকে এবং আত্মাতে পরমাত্মার সহিত যোগ দিন দিন বাড়িতে থাকে। এইরূপে অবিশ্বাসসম্ভূত কুসংস্কারীর বিমুক্তির দিন উপস্থিত হয়।

ধর্ম্মতত্ত্ব

বিধানতত্ত্ব এখনও অনেকের মনে পরিষ্কৃতরূপে গৃহীত হয় নাই, ইহা আমরা অনেকের ব্যবহারে বুঝিতে পারিতেছি। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধান এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি ভাল করিয়া না বুঝিলে নববিধানতত্ত্ব কাহারও হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা বলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন একটি ধর্ম্মবিধান, তখন নববিধান বলিয়া পুনরায় নামান্তর উপস্থিত করিবার প্রয়োজন কি, তাঁহারা বিধানতত্ত্ব বোঝেন নাই সহজে বুঝা যায়। ব্রাহ্মধর্ম্ম যখন আসিলেন, তখন সর্ব্বপ্রথমে একেশ্বরবাদ লইয়া আসিলেন। এ দেশে বহুদেববাদে একেশ্বরবাদ একেবারে প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং সেই বহুদেববাদখণ্ডনপূর্ব্বক একেশ্বরবাদ স্থাপন জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম অভ্যুদয়। যখন এ দেশে একেশ্বরবাদের উদ্ধার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়, তখন ইউরোপ আমেরিকায় ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টানিটি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। একেশ্বরবাদস্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে যে উপাসনাপ্রণালী স্থাপিত হয়, তাহা তত বিশুদ্ধ নহে। পরসময়ে যিনি আসিলেন, তিনি ঋষিভাব লইয়া আসিয়া উপাসনার ভিতরে হৃদয়ের ক্রিয়া সংযুক্ত করিয়া দিলেন। তৎপরে

নব্য দল বিশুদ্ধ নীতি ব্রাহ্মধর্ম্ম মধ্যে নিবিষ্ট করিয়া দিয়া ইহার সুমহৎ পরিবর্ত্তন সাধন করিলেন। এই সকল যত্ন একীভূত হইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল। এই সমাজকে একটী সংস্করণমণ্ডলী বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ব্রাহ্মসমাজ যখন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে পরিণত হইল, তখন দেখিতে পাওয়া গেল, হিন্দুধর্ম্মের কয়েকটি ধর্ম্মসম্পর্কীয় মূল বিষয় ইহাতে সংশোধিত হইয়াছে;— একেশ্বরবাদে বহুদেববাদ, মনুষ্যের নৈতিক দায়িত্বে অদ্বৈতবাদ, আত্মার অমরত্বে পুনর্জ্জন্মবাদ, প্রার্থনাতে নির্দ্দিষ্টমন্ত্রগ্রহণবাদ, ঈশ্বরের পিতৃত্বভ্রাতৃত্ববাদে জাতিভেদবাদ। আমরা কি বলিলাম, একটু স্পষ্ট করিয়া না বলিলে হয় তো সকলে বুঝিতে পারিবেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম বহুদেববাদ দেশ হইতে উড়াইয়া দেওয়ার জন্য আসিলেন, ইহা সকলেই স্পষ্ট জানেন, কিন্তু মনুষ্যের নৈতিকদায়িত্বে অদ্বৈতবাদ কি প্রকারে উড়িল তাহা জানেন না। অদ্বৈতবাদ ধর্ম্ম অধর্ম্ম পাপ পুণ্য নীতি অনীতি এ দুইয়ের প্রভেদ স্বীকার করে না। যখন অদ্বৈতজ্ঞান উপস্থিত হয়, তখন এ সকল ভেদবুদ্ধি ভ্রম বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। সুতরাং অহং ব্রহ্মবাদী, ইটি কর্ত্তব্য উটি অকর্ত্তব্য ইটি ধর্ম্ম ওটি অধর্ম্ম ইহাতে পাপ হইবে উহাতে পুণ্য হইবে, এ প্রকার ভেদজ্ঞান আর মনে স্থান দেন না। এইরূপ ভেদজ্ঞান থাকে না বলিয়াই স্বয়ং শঙ্করাচার্য্য তত্ত্বজ্ঞব্যক্তির মদ্যের চক্রে যথেচ্ছাচারও তত্ত্বজ্ঞানবিলোপক নয় বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। দাক্ষিণাত্য যেখানে অদ্বৈতবাদের অত্যন্ত প্রাবল্য সেখানে নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলাচার এই জন্য অনায়াসে অনুসৃত হয়। পুনর্জন্মবাদের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, মনুষ্যের আত্মা কুকুরাদি নানাযোনিতে ভ্রমণ করে, অথচ সে যে পূর্ব্বে মানুষ ছিল, তাহার অনুমাত্র বোধ থাকে না। ব্যক্তিত্বে বোধ না থাকিলে, আত্মার আত্মত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়। আত্মা অমর, চিরকাল 'সেই আমি আছি' এ বোধ তাহার থাকিবে। এ মতে বিশ্বাস করিলে পুনর্জ্জন্মবাদ যায়। সুতরাং বলিতে হইবে, ব্রাহ্মধর্ম্ম আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস স্থাপন করাইয়া পুনর্জ্জন্মবাদ উড়াইয়া দিয়াছেন। ক্লীঁ হ্রীঁ প্রভৃতি মন্ত্র জপ করিতে হইবে, সে সকলের অর্থ বুঝি আর না বুঝি তাহাতেই পরিত্রাণ হইবে, এই যে মৃতপুজা পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট মন্ত্রগ্রহণবাদের প্রাণ, তাহা প্রার্থনা প্রচলন দ্বারা বিলুপ্ত হইয়াছে। ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও ভ্রাতৃত্ববাদে জাতিভেদবাদ বিলোপ ইহা আর বুঝাইবার অপেক্ষা রাখে না। এখন দেখা যাইতেছে, এ সকল সংস্করণ ব্যাপার নূতন কিছু সংস্থাপনের ব্যাপার নহে। কোন নূতন বিষয় সংস্থাপিত হইবার পূর্ব্বে অগ্রে সংস্করণ চাই, ক্ষেত্র পরিষ্কার করা চাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্কারের কার্য্যসাধন করিলেন, ক্ষেত্র পরিষ্কার করিলেন, পরিশেষে নববিধানের নূতনতত্ত্বের অভ্যুদয় হইল। যে ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল সংস্করণার্থ সমাজ, নববিধানকে তাহার ভূমিতে অবতারণ করিয়া আনা যে কত দূর অবনতির ব্যাপার এখন বোধ হয় সকলে বুঝিতে পারিতেছেন।

আচার্য্যের উপদেশ।

শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল পাইনের বাটী।

শনিবার, ২৭ এ চৈত্র, ১৭৯৭ শক।

জীবন ক্রমে ক্রমে বাহিরে গমন করে না ভিতরে গমন করে? জীবন ক্রমে উর্দ্ধগামী হয় ইহা সকলে মানিবে। মনুষ্য উচ্চ জ্ঞান হইতে উচ্চতর জ্ঞান, উচ্চ পুণ্য হইতে উচ্চতর পুণ্য লাভ করে। কিন্তু এই উর্দ্ধ দিকে যেমন উন্নতি স্বীকার করিব, তেমনি ভিতরের দিকেই যে মনুষ্যের উন্নতিবেগ যায় তাহা কি আমরা বুঝিতে পারি? অন্তরাত্মা কি আমাদের অধিক প্রিয়তর হইতেছেন? ভিতরের অন্ধকার কি আমাদের ভাল লাগে? যাহারা সভ্যতাপ্রিয়, বাহ্যাড়ম্বরপ্রিয়, অনুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপের মধ্যে যাহারা ধর্ম্মকে বদ্ধ রাখে, মনুষ্যের সহিত সদালাপই যাহাদের উন্নতির প্রমাণ, তাহারা বলিবে জীবনের উন্নতি ক্রমে ক্রমে বাহিরে বিস্তৃত হয়; কিন্তু যাঁহারা অন্তরাত্মাকে ভালবাসেন, যাঁহারা উপাসনাপ্রিয়, তাঁহারা বলেন, জীবনের উন্নতি ক্রমাগত ভিতরের দিকে। যাহা সঙ্গে যাইবে তাহা আত্মার মধ্যে, যত প্রকৃত উন্নতি হইবে তত বাহিরের কার্য্য করিব কর্ত্তব্যানুরোধে, সুখের জন্য নহে। ধনোপার্জ্জন করিব ঈশ্বরের আদেশ জানিয়া। আত্মীয় কুটুম্বের সেবা করিব ঈশ্বরের আদেশ জানিয়া। ঈশ্বরের আদেশ জানিয়া বাহ্যিক তাবৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিব। পরলোকের সম্বল নিজের হৃদয়ের মধ্যে করিব। প্রকৃত উন্নতি ভিতরের দিকে। প্রকৃত শ্রদ্ধা বিশ্বাস ভিতরে। একদিকে যেমন মন উচ্চ হইতে উচ্চতর আকাশে যাইবে অন্যদিকে তেমনি অন্তর হইতে অন্তরতর স্থানে যাইবে। যিনি যত বাহিরে গমন করেন তাঁহার উন্নতি তত কম। ভিতরে বাড়ী আছে, বন্ধু সহায় আছেন, প্রেমোদ্যান আছে। সাধন দ্বারা প্রেমের গভীরতা, আনন্দ শান্তির গভীরতা লাভ করিতে হইবে। ঈশ্বর ভক্তকে ডাকিয়া তাঁহার নিকটে বসাইতে ভালবাসেন ঈশ্বর তাঁহার অন্তরের অন্তরে, অন্তরতম স্থানে ভক্তকে আসন করিয়া দেন। অতএব ব্রাহ্ম, ভিতরে গিয়া বাস কর, সেখানেই তোমার নির্দ্দিষ্ট স্থান, সেখানেই তোমার দুর্গ। সাধন ভজন দ্বারা, হে ব্রাহ্ম, ধর্ম্মের গভীরতা সাধন কর, ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর যোগের ভিতরে গিয়া ঈশ্বরকে দেখিয়া সুখী হইবে।

সাধন কানন।

রবিবার ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৯ শক।

সাধন কাননে অধিবাস করা একটী উচ্চ অধিকার। কিন্তু ইহা সুলভ হওয়াতে আমরা ইহার মূল্য বুঝিতে পারি না, ভবিষ্যতে বুঝিতে পারিব। আমাদের পদতলে যে সকল রত্ন পড়িয়া আছে আমরা এখন সে সমুদয়কে অবহেলা করিতেছি। অনেক উচ্চ অধিকার আছে যাহা বারংবার অবহেলা করিলে পাতকী হইতে হয়। সাধন কাননে বাস করিলে যে ফল হয় সেই অপূর্ব্ব ফল কি আমরা ভোগ করিতেছি? আমাদের বনবাস বল, পর্ব্বতবাস বল, তাহা এই সাধনকাননে বাস। আমরা যে এখানে সহরের কোলাহল হইতে দূরে আসিয়া নির্জ্জনে ঈশ্বরসহবাস ভোগ করিতে পারি ইহাই আমাদের পরম লাভ। কেন আমরা এ জন্য কৃতজ্ঞ হই না? এই সভ্যতার সময় সাধন কাননে বাস করা বিষয়ীর পক্ষে বহুমূল্য অধিকার। যাহারা পর্ব্বতে যাইতে পারে না তাহাদের পক্ষে সাধনকানন অমূল্য রত্ন। যিনি আমাদিগকে ইহা দিলেন তিনি কি আমাদিগকে ইহা ভোগ করিবার ক্ষমতা দিবেন না? তিনি অবশ্যই আমাদিগের প্রাণের মধ্যে বৈরাগ্য প্রেরণ করিবেন। যিনি মরুভূমি হইতে আমাদিগকে এই জলাশয়ের সমীপে টানিয়া আনিলেন তিনিই ইহা ভোগ করিবার জন্য আমাদিগকে ক্ষমতা দিবেন। আমাদিগের সকল আশা ভরসা তাঁহার উপরে। যদি ইহা ভোগ করিতে না দিবেন তবে এমন স্বর্গের সামগ্রী আমাদের হাতে দিলেন কেন? এ রত্ন প্রাণের ভিতরে রাখিব, না ফুল করিয়া বক্ষস্থলে রাখিব? আপনি সম্ভোগ করিব, না পুত্র পৌত্রাদির জন্য রাখিয়া যাইব, না বন্ধুবান্ধবদিগের সঙ্গে ইহা ভোগ করিব, কেমন করিয়া ইহার সদ্ব্যবহার করিব? কিরূপে ইহার উৎকৃষ্ট ব্যবহার করিব ঈশ্বর আমাদিগকে বুঝাইয়া দিন! পাছে ইহার প্রতি অবহেলা এবং অশ্রদ্ধা হয় এই জন্য ইহার মধ্যে আমাদের কাহারও অধিক দিন থাকা উচিত নহে। ইহা দ্বারা কতদেশ উপকৃত হইবে। এ রত্ন পাছে অবহেলা করি বড় ভয়। এ রত্ন তিনি দিলেন যিনি দিতে পারেন। যাঁহারা এখানে আসেন তাঁহারা যেন বুঝিতে পারেন ঈশ্বরপ্রসাদ এই কানন বেশ ধারণ করিয়া আসে। অশান্ত হৃদয়ে শান্তিদাতার সহবাস সম্ভোগ করিতে পারি না, শান্তি পথ ধরিতে পারি না, এইজন্য আমাদের প্রাণকে শান্ত করিবার জন্য এই কানন দিলেন। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন আমরা যেন এখানে শান্তি লাভ করিয়া কিঞ্চিৎ কৃতার্থ হই!

রবিবার, ২৯ এ জ্যৈষ্ঠ, ১৭৯৯ শক।

যেখানে সিদ্ধ হইব এরূপ সংকল্প করিয়া যত্ন আয়াস সহকারে ব্রহ্ম সাধন করি সেই স্থান সাধনের স্থান এবং যে স্থানে কোন প্রকার পাপ প্রলোভন নাই, যে স্থানে বিষয় মনকে চঞ্চল করিতে পারে না, যে স্থান সরোবর এবং বৃক্ষ লতায় সুশোভিত, যেখানে পুষ্প ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করে, বায়ু ঈশ্বরের মঙ্গল সংবাদ আনয়ন করে, যেখানে প্রকৃতি সাধকের মনকে উন্নত করে সেই স্থানকে কানন বলে। যেখানে এই দুইয়ের সংযোগ তাহা সাধনকানন। ঈশ্বর এরূপ স্থানে ভক্তদিগকে রাখিয়া তাঁহাদের সাধনের সহায়তা করেন। সাধকদিগের কোন প্রকার দুঃখ কষ্ট হইলে সেই বিঘ্নবিনাশন স্বয়ং সে সকল দূর করিয়া দেন। এইরূপ অনুকূল স্থানে আমরা কি করিব? আমরা যেন ব্রহ্মপদারবিন্দ ভাবিতে ভাবিতে এমন শিক্ষা লাভ করি, যাহাতে আমরা সাধনে সিদ্ধ হইতে পারি। সর্ব্বদাই যেন সিদ্ধ হইবার দিকে আমাদের দৃষ্টি থাকে। এই ভাব যেন সর্ব্বদাই জাগ্রৎ থাকে। রিপুকুল বশীভূত হইতেছে কি না? প্রকৃতির ঈশ্বর যিনি তাঁহাতে চিত্ত মগ্ন হইতেছে কি না? ধ্যান করিতে করিতে মন অমৃতসাগরে ডুবিতেছে কি না? সর্ব্বদাই যেন সচেতন থাকিয়া এ সকল পরীক্ষা করিয়া দেখি। অভিলষিত বস্তু পাইবার জন্য সর্ব্বদাই গভীর হইতে গভীরতর আগ্রহ এবং যত্ন প্রকাশ করিব। যদি কদাচ লক্ষ্যচ্যুত হইয়া যাই, প্রেমসিন্ধু পিতা যেন আমাদিগকে সতর্ক করেন। সাধন কাননে বাস করিয়া যেন আমরা কখনও সাধনকে অবহেলা না করি। সাধন মনে হইলে কঠোর আয়াস কষ্ট মনে হইবে, আবার কানন মনে হইলেই এখানে প্রকৃতি আমাদের সাধনের সহায়, এই সৌভাগ্য স্মরণ করিয়া ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ হইব, এবং আরও গভীর সাধনের জন্য উদ্যোগী হইব। অতএব সাধন কানন এই দুটী শব্দ যেন আমাদিগের মনে ধর্ম্মরাজ্যের উচ্চ ভাব আনয়ন করে। এই উদ্যানের নামটী যেন বৃথা না হয়। দয়াল প্রভুর নামের গুণে ইহা দ্বারা যেন আমাদের উপকার হয়। এই স্থানের নামে আমাদের উপকার হয়। এই স্থানের নামে আমাদের উপকার হউক, ঈশ্বর এই আশীর্ব্বাদ করুন।

রবিবার, ৪ ঠা আষাঢ়, ১৭৯৯ শক।

মনুষ্য প্রকৃতি ছাড়িয়া অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে। প্রকৃতি মধুর সরোবর। প্রকৃতি স্বর্গের প্রান্তভাগ। প্রকৃতি অকলঙ্কিত, প্রকৃতি মন্দ হয় না, অপবিত্র হয় না। প্রকৃতি বিকৃতি নহে, কখন বিকৃত হয় না. সকলকেই প্রকৃতির দিকে আসিতে হইবে। যাঁহারা পবিত্রতা চান, যাঁহারা প্রকৃত সুখ চান, তাঁহাদিগকে পাখীদের দেশে, কীট পতঙ্গের

দেশে, বৃক্ষ লতার দেশে আসিতে হইবে। যেখানে সভ্যতার আড়ম্বর, হে মনুষ্য, সেখানে এত দূর যাও কেন? পশ্চাৎ গমন কর। প্রকৃতিকে ভাল না বাসিলে সুখী হইতে পারিবে না। কৃত্রিম সভ্যতার অহঙ্কার ছাড়িয়া প্রকৃতির মধুরতা সম্ভোগ কর। জগতের ইতিহাসে, সাধুদিগের জীবনে এই মধুর আহ্বান শুনা গিয়াছে। সাধন কাননের আবশ্যকতা এই জন্য। এখন কৃত্রিম সভ্যতার সমুদ্রে জনসমাজরূপ জাহাজ ভাসিতেছে, সমুদ্রে ভীষণ তরঙ্গ সকল উঠিতেছে, সমুদ্রতটের খুব উচ্চ স্থানে একটি আলোক চাই। সাধন কানন সেই আলোকঘর। বিকৃত সভ্যতার মধ্যে স্বর্গের আলোক দেখাইবে সাধন-কানন। যখন ব্রাহ্মগণ সভ্যতার তুফানে পড়িয়া বিপন্ন হইবেন তখন তাঁহাদিগকে প্রকৃতির আলোক বাঁচাইবে। প্রকৃতির বন্ধু সাধন-কানন, তাঁহাদিগকে বাঁচাইবেন। বনের দেবতা, গ্রামের দেবতা তাঁহাদিগকে বাঁচাইবেন। এমন স্থানকে যে অরণ্য বলে সে ভ্রান্ত। অরণ্যকে সাধন-কানন করিতে হইবে, এবং তন্মধ্যে সংসারকে শুদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। সাধন-কাননে আনিয়া সভ্যতার বিপদে পতিতদিগকে উদ্ধার করিতে হইবে। এই সাধন-কাননে বসিয়া সংসারে স্বর্গের শোভা দেখিতে শিক্ষা করিতে হইবে। এখানকার লতামণ্ডপে বসিয়া স্নেহময়ীর স্নেহপীযূষ পান কর, এই নব নব সুপ্রসন্ন কুসুম সকলকে গুরু স্বীকার করিয়া ইহাঁদের নিকটে নূতন নূতন সরল উপদেশ শ্রবণ কর, এখানকার বৃক্ষাবলীর মূলে বসিয়া সংসারের সম্পর্ক সকল স্থির কর। পুষ্পলতার সৌন্দর্য্য দেখিয়া সংসারকে ভুলিয়া থাকিলে প্রকৃত সাধন হইবে না। তুমি এখানে বসিয়া মজা কর, আর সংসার দগ্ধ হউক, এই কথা ঠিক নহে। ইহা প্রেমময় ঈশ্বরের বিরোধী স্বার্থপরের কথা। ঈশ্বরের আদেশ নরনারী সকলকে লইয়া সাধন কাননে যাইতে হইবে। এখানকার তৃণ দেখিয়া আমাদের মন নম্র হইবে, অভিমানশূন্য হইবে। যেখানে কেবল লতা পাতা সেখানে আবার অহঙ্কার কি? এখানে ছোট বড় গাছ সকলেই ভদ্র, ইহাদের সকলের নিকট আমরা ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, এবং বৈরাগ্য ও নিঃস্বার্থপরতা শিখিব। এখানে সপরিবারে এইরূপ সাধন করিয়া আমরা প্রকৃতিস্থ হইব। দয়াবান্ ঈশ্বর আমাদিগকে প্রকৃতির মহিমা বুঝাইয়া দিন।

ধর্ম্ম-বিজ্ঞান-বীজ।

যোগ ভক্তি জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়।

পূর্ব্ব কালে যোগের সঙ্গে ভক্তির, ভক্তির সঙ্গে জ্ঞানের, জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম্মের বিরোধ ছিল। কেহ যোগী হইয়া যোগ সাধন করিতে চাহিলে ভক্তির সঙ্গে তাঁহার বিবাদ চলিত, আবার ভক্তিসাধক ভক্তের সঙ্গে জ্ঞানীর ঘোরতর বিদ্বেষ ছিল। জ্ঞানী ভক্তকে অজ্ঞ ভাবুক বলিয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতেন, ভক্তও জ্ঞানীকে অগ্রাহ্য করিতে ত্রুটি করিতেন না। আবার জ্ঞানী যোগীর পক্ষে কর্ম্ম বিষবৎ ছিল। কিন্তু নববিধান অবতীর্ণ হইয়া বলিলেন আমি এ বিবাদ থাকিতে দিব না। ঈশ্বরের রাজ্য শান্তির রাজ্য, তাহাতে বিবাদ বিসংবাদ থাকা অসঙ্গত। যোগ যাঁর ভক্তিও তাঁর, যাঁর ভক্তি তাঁহারই জ্ঞান, তাঁহারই কর্ম্ম তবে বিবাদ থাকিবে কেন? সত্য সকল ঈশ্বরের স্বরূপ, সেই সত্যে সত্যে বিবাদ ঘটিলে ঈশ্বর আপনা আপনি বিবাদ করেন স্বীকার করিতে হয়। অতএব পরস্পরে যাহাতে সম্মিলন ও সমন্বয় হয় তাহার উপায় করা কর্ত্তব্য।

বিবাদ মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে, কি লইয়া বিবাদ, তাহা প্রদর্শিত হওয়া আবশ্যক। নতুবা কিরূপে কিসের মীমাংসা হইল বোঝা যাইবে না।

আগে যোগের স্বরূপ লক্ষণ কথিত হইতেছে। দুইটি পৃথক বস্তুর একত্র মিলনের নাম যোগ অর্থাৎ বিষয় সঙ্গ বশতঃ জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার যে দূরতা ঘটে তাহা দূর করিয়া একত্র মিলনের নাম যোগ।

সম্পূর্ণরূপে আত্মবলিদান করতঃ স্ত্রী পুত্র ধন সম্পদাদি সমুদয় সহ ভগবানের হইয়া যাওয়া ভক্তি।

মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥

ভাগবত। ৩। ২৯। ১০

একাত্মতাদর্শন অর্থাৎ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ব্রহ্মসত্তাতে আত্মবিসর্জন করার নাম জ্ঞান। আর ভগবানের প্রতি প্রীতি স্থাপনের জন্য যে অনুষ্ঠান তাহার নাম কর্ম্ম।

"ধর্ম্মো মদ্ভক্তিকৃৎ প্রোক্তো জ্ঞানঞ্চৈকাত্ম্যদর্শনম্।
গুণেষসঙ্গো বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যঞ্চাণিমাদয়ঃ॥"

ভাগবত। ১১। ১৯। ২৭

যে উপায়ে ভগবানের প্রতি ভক্তি হয় তাহার নাম ধর্ম্ম। ধর্ম্ম মানুষের প্রকৃতি, মানুষ ঈশ্বরের স্বহস্ত গঠিত পুত্তলিকা। সেই মানুষ আপন স্বভাব ভুলিয়া ঈশ্বরদ্রোহী হয়, যখন সে সেই বিদ্রোহিতা পরিত্যাগ করিয়া আপন স্বভাব প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আপনাকে ঈশ্বরের হস্তের পুত্তলিকারূপে ব্যবহৃত হইতে দেয় তখন ভক্তি হয়।

সমুদয় বিশ্বের অস্তিত্ব ভ্রান্তিময় বুঝিয়া এক পরমাত্মার অধিষ্ঠানকে সত্যরূপে উপলব্ধি করার নাম জ্ঞান। সত্ত্ব রজস্তমঃ প্রভৃতি গুণেতে অর্থাৎ শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদিতে অনাসক্তি তাহার নাম বৈরাগ্য। অণিমা লঘিমা প্রভৃতি বিভূতির নাম ঐশ্বর্য্য।

যোগী যখন যোগ সাধিতে প্রবৃত্ত হন তখন এইরূপ

প্রণালী অবলম্বন করেন, যথা "ইদং সৎ ইদমসৎ" ইহা সৎ ইহা অসৎ। যাহা অসৎ তাহা ত্যাজ্য, যাহা সৎ তাহাই গ্রাহ্য। জগতে অসদ্বস্তুই সব, সুতরাং নেতি নেতি করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়। কেন না নশ্বরবিষয়চিন্তা মানুষের স্বভাবকে বিকৃত করিয়া দেয় যথা—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥

গীতা। ২। ৬২। ৬৩

বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মনে বিষয়ের প্রতি অনুরাগ জন্মে, অনুরাগ জন্মিলেই সেই বিষয়টি পাইবার ও ভোগ করিবার জন্য প্রবৃত্তি জন্মে। সেই প্রবৃত্তির বিঘাতে ক্রোধের উদয় হয়, ক্রোধ হইলে মোহ (কার্য্যাকার্য্য বোধ রাহিত্য) জন্মে। মোহ হইতে স্মৃতিবিলোপ, স্মৃতিবিলোপে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশেই মৃত্যু।

এই জন্য অসৎ বিষয় পরিত্যাগ করতঃ সদ্বস্তুর দিকে উত্থিত হইতে না পারিলে যোগ হয় না। অতএব যোগী হইতে হইলে ত্যাগী (সংন্যাসী) হইতে হয়।

কেবল বিষয়মাত্র ত্যাগ করিলেও হয় না, মনের ভিতর হইতে বিষয়ের চিন্তা ও তৎপ্রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত বিদায় করিতে হইবে। কেন না—

"অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেনার্থাগমো যথা॥"

ভাগবত। ১১। ২৮। ১৩

অর্থ না থাকিলেও মনের সংসারনিবৃত্তি হয় না। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা বিষয় চিন্তা করে সে স্বপ্নেও অর্থ লাভ করে। স্বপ্নের অবস্থাতে অর্থ নাই, কিন্তু মনের ভিতরে সংসাররূপ অর্থ লালসা আছে, সেই কারণে মিথ্যা দৃষ্টি উপস্থিত হয়।

অতএব—

"বাহ্য স্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয় মশ্নুতে॥
যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এবতে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥"

গীতা। ৫। ২১। ২২

বাহ্য স্পর্শে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সুখে অনাসক্ত হইবে। ইন্দ্রিয়সুখে অনাসক্ত ব্যক্তি আত্মাতে যে সুখ প্রাপ্ত হন তাহা অতুলনীয়, কেননা ইহা হইতে ব্রহ্মযোগে যুক্ত হইয়া তিনি অক্ষয় সুখের অধিকারী হন। ইন্দ্রিয়সুখের আরম্ভ ও শেষ আছে, বিশেষতঃ ইন্দ্রিয়সুখকে সুখই বলা যায় না। সুখ বস্তু অনপায়ী, কখন তাহার অপায় নাই, কিন্তু ইন্দ্রিয়সুখ অল্প ক্ষণ সম্ভোগের পরেই মহা অবসাদ উপস্থিত হয়। সুতরাং সুখই দুঃখের কারণ হইয়া পড়ে; যেমন খাদ্য বস্তু উদরপূর্ত্তি ও স্ফূর্ত্তি-বৃদ্ধি পর্য্যন্তই আহার করা যায়, তৎপরে অতিরিক্ত হইলেই দুঃখ। এই জন্য যোগী হইতে হইলে ত্যাগী হইতে হয়। কিন্তু ভক্তিতে ত্যাগ নাই, ভক্তিতে ত্যাগ অপরাধ। ভক্তিতে আপনার দেহ মন প্রাণ সমুদয় ভগবানের হইয়া যায়। ভক্ত আপনাকে যেমন ভগবানের সামগ্রী জানিয়া তাঁহার চরণে উৎসর্গ করেন, তেমনি অপর বস্তু বা অপর লোকদিগকেও তিনি ভগবানের বলিয়া বিশ্বাস করেন। কেন না তিনি সকলের প্রভু ও সকলের নিয়ন্তা।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ। ৬। ৭।

সকল ঈশ্বরের যিনি পরম মহেশ্বর, সকল দেবতার যিনি পরম দেবতা, সকল পতির যিনি পরম পতি, সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইতে যিনি শ্রেষ্ঠ, সেই আরাধ্য ভুবনেশ্বরকে আমি অবগত হই।

ক্রমশঃ—

অভ্যর্থন পত্র।

ধর্ম্মপরায়ণা শ্রীমতী মহারাণী সুনীতি দেবী "ভারত কিরীট" মহোদয়া সমীপে—

যথোচিত সম্মানপূর্ব্বক নিবেদন—

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসক মণ্ডলী, তাঁহাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রীতি ও সমাদর আপনাকে জানাইতে অগ্রসর হইতেছেন। আপনি ঈশ্বরকৃপায় যে ভাবে ইংলণ্ডে কিয়দ্দিন বাস করিয়া আসিয়াছেন ও আপনি আপনার সরল ব্যবহারে যেরূপ সাধারণের প্রশংসা ও সম্মানের পাত্রী হইয়াছেন, ভারতেশ্বরীর ও রাজপরিবারের নিকট যে ভাবে আদর ও সম্ভ্রম লাভ করিয়াছেন, তাহাতে যে কেবল নববিধানমণ্ডলী বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছেন এমত নহে, সমুদয় ভারতবর্ষের গৌরব বাড়িয়াছে। আপনার জীবন দেখিয়া ইংলণ্ডদেশবাসী নরনারীগণ নববিধানধর্ম্মের সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে পারিয়াছেন, ভারতের উপর তাঁহাদের সম্মান দৃষ্টি জন্মিয়াছে এবং আপনার পিতৃদেব আমাদের ভক্তিভাজন আচার্য্যের প্রতি তাঁহাদের ভক্তি বাড়িয়াছে, ইহা অপেক্ষা আমাদের কৃতজ্ঞ হইবার আর কি বিষয় আছে? নিজের জীবনের ভিতর দিয়া যিনি ধর্ম্মের স্বর্গীয় বল দেখাইতে পারেন তিনিই ধন্য! আপনি সেই

দূরদেশে বিশেষ বিশেষ পরীক্ষার মধ্যে অবস্থিতি করিয়া অসাধারণ সমাদর ও সম্মানের ভিতর থাকিয়া, জীবনে নব ধর্ম্মের বল ও মান্য দেখাইতে পারিয়াছেন ইহা আমাদের পক্ষে বিশেষ আনন্দের বিষয়। আমাদের প্রার্থনা, এইরূপে ভগবৎপ্রদত্ত উচ্চপদের সদ্ব্যবহার করিয়া আপনি আমাদের মণ্ডলীর, আমাদের দেশের, এবং নববিধানধর্ম্মের গৌরব দিন দিন বর্দ্ধন করিতে থাকুন।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরের উপাসকমণ্ডলী

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির } শ্রীরামচন্দ্র সিংহ।
কলিকাতা, ১২ চৈত্র, ১৮০৯। } সম্পাদক।

সংবাদ।

বিগত ১৮ই চৈত্র কোচবিহারের মহারাজ শ্রীমৎ নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছেন। সেই দিন রাত্রিতে উডল্যাণ্ড রাজবাটীতে দরবারস্থ প্রেরিতগণ তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ এবং অভ্যর্থনা-পত্র প্রদান করেন। সেই অভ্যর্থনপত্রের মর্ম্ম এই ;— আপনি মঙ্গলমতে ও সুস্থশরীরে ইংলণ্ড হইতে এক বৎসরের পর স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা আনন্দিত হইয়াছি, এবং আপনাকে সাদরে গ্রহণ করিতেছি। অদ্য আচার্য্যদেব সশরীরে বিদ্যমান থাকিলে আপনার প্রতি সমুচিত আদর প্রকাশ করিতেন, দুঃখের বিষয় আমরা সেরূপ সমাদর প্রদর্শন করিতে পারিতেছি না। ইংলণ্ডে ভারতেশ্বরী ও রাজপরিবারস্থ লোকেরা আপনার প্রতি এবং আমাদের প্রিয়তম মহারাণীর প্রতি যেরূপ উচ্চ আদর ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন এবং ইংলণ্ডের অন্য প্রধান প্রধান পরিবারের ব্যক্তিগণ আপনাকে ও মহারাণীকে যেরূপ গৌরবান্বিত করিয়াছেন তাহাতে আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। ঈশ্বর আপনার ও মহারাণীর এবং রাজকুমারের ও রাজকুমারীর কুশল কল্যাণ বর্দ্ধন করুন। লক্ষ লক্ষ দুঃখী প্রজা আপনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে, আপনি স্বীয় রাজ্যে শুভ প্রত্যাগমন করিয়া রাজার কর্ত্তব্য পালনপূর্ব্বক তাহাদের আনন্দবর্দ্ধন করুন। অভ্যর্থনপত্র পাঠ হইলে দরবারের সম্পাদক মহারাজের কণ্ঠে পুষ্পমালা ও হস্তে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। তৎপর মহারাজ এইরূপ বলেন, আপনারা আমার প্রতি যেরূপ আদর প্রকাশ করিলেন, তাহাতে আমি বিশেষ আনন্দিত হইলাম। মহারাণী সঙ্গে গিয়াছিলেন বলিয়াই ইংলণ্ডে আমাদের এতাধিক গৌরব ও সম্মান লাভ হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় এরূপ উচ্চশ্রেণীর মহিলার এই প্রথম গমন, এবং তিনি প্রিয়তম কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা, তজ্জন্য এত আদর ও সম্মান। আমি একজন নববিধান সমাজের অন্তর্গত লোক, কোচবিহার রাজধানীতে নববিধান সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, মন্দিরও প্রস্তুত, শীঘ্রই তাহার প্রতিষ্ঠা হইবে। এ বিষয়ে আমি আপনাদের সাহায্য চাহি। আমি ছয় সাত মাস কোচবিহারে অবস্থিতি করিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া থাকি, আমার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট, অতিরিক্ত তথায় থাকিতে হইলে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না। ভালরূপে কার্য্য করিতে হইলে স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টিরাখা প্রয়োজন।

বিগত ১৬ ই চৈত্র আমাদের রাজপ্রতিনিধিপত্নী লেডি ডফারিণ আচার্য্য পরিবারস্থ মহিলাদিগকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তিনি আচার্য্যদেবের পুত্রবধূকে বিশেষ স্নেহসহকারে স্বহস্তে পত্র লিখেন। আচার্য্যপত্নী আচার্য্যমাতা আচার্য্যকন্যাগণ ও পুত্রবধূ রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলে রাজপ্রতিনিধিপত্নী ও তাঁহার কন্যাগণ দ্বারা সাদরে গৃহীত হন। লেডি ডফারিণ তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া লইয়া প্রাসাদের সমুদয় প্রকোষ্ঠ প্রদর্শন করেন। তাঁহাদের জন্য নানা প্রকার মিষ্টান্ন ও খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত ছিল। রাজপ্রতিনিধির কন্যাগণ তাহার পরিবেশনাদি করেন। এইরূপ অমায়িক ব্যবহার ও আদর স্নেহ দেখিয়া আচার্য্যপরিবারস্থ সমুদায় মহিলা একেবারে মুগ্ধ হন।

বিগত ২২ শে চৈত্র দরবারে ভাই গৌরগোবিন্দ রায় কোচবিহারে যাইবার জন্য, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন আসাম প্রদেশে ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় উড়িষ্যা দেশে গমনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল এক সপ্তাহের জন্য মঙ্গলগঞ্জে গিয়াছেন।

আগামী সোমবার কোচবিহার ব্রহ্মমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রস্তাব আছে।

বিগত ২০ শে চৈত্র রবিবার কোচবিহারের মহারাজ মন্দিরে যাইয়া উপাসনায় যোগ দান করিয়াছিলেন।

ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে ভাণ্ডাড়, মহানন্দ, আখনা, সোলতান গাছা প্রভৃতি গ্রামে সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতা ইত্যাদি দ্বারা প্রচার করিয়াছেন। ভাণ্ডাড়ায় তিনি কয়েকটী মহিলার নিকটে ২। ৩ টি উপনিষদের শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন। আর এক দিন ২৫। ৩০টী কুলকন্যা ও কুলবধূ ভাই নন্দলালকে ডাকিয়া নিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া নিরাকার ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাঁহার পূজা-সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করেন। তিনি তাঁহাদের এইরূপ আগ্রহ ও অকুণ্ঠিত ভাব দেখিয়া অতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

বিগত ১৮ই চৈত্র ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার শ্রীরামপুরে "বৈকুণ্ঠধাম" এই বিষয়ে ইংরাজিতে বক্তৃতা করিয়াছেন।

২১এ চৈত্র হাটখোলায় শ্রীমান্ শ্রীশচন্দ্র ঘোষের কন্যার শুভ নামকরণ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উপাসনাদি করিয়াছিলেন। কুমারীর নাম নির্ভরপ্রিয়া রাখা হইয়াছে।

ভাই দীননাথ মজুমদার জন্মভূমি চাকদা ষ্টেশনের অদূরে ঘশরা গ্রাম হইতে লিখিয়াছেন, "ঘশরার বাটীতে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে কীর্ত্তন হইত, গ্রামের নরনারী অনেকে আসিয়া আনন্দবর্দ্ধন করিতেন, মহিলাগণ কত অনুরাগের সহিতই কীর্ত্তন প্রার্থনাদি শুনিতেন। প্রায় ১০। ১১ দিন সেখানে ছিলাম, প্রত্যেক দিন এক এক বাড়ীতে আহারের নিমন্ত্রণ হইত। কি ভালবাসা।"

গত ১৫ই চৈত্র মঙ্গলবার বসন্ত পূর্ণিমা উপলক্ষে নবদেবালয়ে উৎসব হইয়াছে। প্রাতঃকালে বিশেষ ভাবে উপাসনা এবং সন্ধ্যার পর দেবালয়ের রোওয়াকেতে উপাসনা কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় বহুকালহইতে ভক্তিভাজন প্রধানাচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিত্য সহচর অনুচর হইয়া আছেন। দিবারাত্রি সকল অবস্থায় তিনি ছায়ার ন্যায় মহর্ষির সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন। মহর্ষির দীর্ঘকালব্যাপী কঠিন রোগের সময় শাস্ত্রী মহাশয় যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহার সেবা করিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। এই সাধুভক্তি ও সাধুসেবার জন্য তাঁহার জীবন ধন্য হইয়াছে। সেদিন শাস্ত্রী মহাশয় কমলকুটীরে উপস্থিত হইয়া আমাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ সৎপ্রসঙ্গ করিয়াছিলেন। সাধুর জীবনের গুণ সকল আমরা আদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিব। তাঁহার দোষের বিচার করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই। বিচারপতি ঈশ্বর, তিনি দোষগুণের বিচার করিবেন। সাধুর দোষ অনুসন্ধান ও সাধু নিন্দা গর্হিত পাপ। তাহাতে জীবনের অধোগতি হয়। এ বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে আমাদের অনেক কথা হইয়াছিল। আমাদের ধর্ম্ম পিতা প্রধানাচার্য্য মহাশয়ের গুণ কীর্ত্তন ও তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা সূচক মাঘোৎসব সময়ে আচার্য্যের যে সুমিষ্ট উপদেশ ধর্ম্মতত্ত্বে মুদ্রিত হইয়াছে, যাহা প্রতিবৎসর উৎসবপ্রারম্ভে দেবালয়ে পঠিত হইয়া থাকে, শাস্ত্রী মহাশয় উহা পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে উহা পড়িয়া শুনান যায়। প্রধানাচার্য্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি, তাঁহার ঋষিভাবের সম্মানা ও তাঁহাহইতে প্রাপ্ত উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা যেরূপ সেই উপদেশে প্রকাশ পাইয়াছে তাহা শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রী অত্যন্ত আহ্লাদিত হন, এবং মহর্ষিকে পড়িয়া শুনাইবার জন্য তাহার এক কাপি তিনি চাহিয়া লইয়া গিয়াছেন।

নববর্ষ উপলক্ষে অদ্য আর্য্যনারী সমাজের কতিপয় মহিলা জীবনে পুণ্য প্রেম বিশেষ সাধনের জন্য নবদেবালয়ে বিশেষ বিশেষ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।

গতকল্য হাবড়ার সন্নিহিত ব্যাটরা গ্রামের প্রার্থনা সমাজের উনবিংশ সাংবৎসরিক উৎসব প্রীতিভাজন ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু হরকালী দাসের ভবনে সম্পাদিত হইয়াছে। প্রাতে ভাই গৌরগোবিন্দ রায়, রাত্রিতে ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন। বহুসংখ্যক প্রচারক ও ব্রাহ্ম কলিকাতা হইতে নিমন্ত্রিত হইয়া যাইয়া এই উৎসবে যোগ দান করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যা হইয়াছে।

ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্র প্রচারক পরিবারের ভরণ পোষণের ভার শ্রীদরবার হইতে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

গতকল্য কোচবিহারের মহারাজের প্রথম কুমারের জন্ম দিন উপলক্ষে উডল্যাণ্ড রাজবাড়ীতে প্রার্থনাদি হইয়াছে। প্রেরিতবর্গ তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়াছিলেন। রাজকুমারের এই ষষ্ঠ বৎসর পূর্ণ হইল। করুণাময় ঈশ্বর তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করুন।

অদ্য প্রাতে নব বর্ষ উপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। ভাই গৌরগোবিন্দ রায় উপাসনার কার্য্য করিয়াছেন।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীযুক্ত ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার
মহাশয় সমীপেষু।

শ্রদ্ধার সহিত নমস্কারানন্তর নিবেদন—

আপনি শ্রীদরবারের সহিত মিলিত না হইয়া "ব্রাহ্মসমাজইয়ুনিয়ম" নামে একটি স্বতন্ত্র সমিতি স্থাপন করিবার জন্য নিয়ম প্রণালী আদি স্থির করিয়াছেন, এবং নববিধানবিরোধী সমাজে গিয়া উপাসনাদি করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, ইহাতে আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি, এবং আমাদিগের মনে আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। শ্রীদরবারের অভিপ্রায় এই যে, আপনি স্বতন্ত্র না হইয়া শ্রীদরবারে মিলিত হইয়া যথাকর্ত্তব্য সাধন করুন।

প্রেরিতদরবার।
৩০ শে চৈত্র,
১৮০৯ শক।

বশংবদ
শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়।
সম্পাদক।

এই পত্রিকা ৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থংসত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্।
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে।

২৩ ভাগ। ৮ সংখ্যা। } ১৬ই বৈশাখ, শুক্রবার, ১৮১০ শক। { বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।° মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে বিধানপতি পরমেশ! আমাদিগকে তোমার পবিত্র বিধানের আশ্রয়ে আনিয়া যে বিধিমতে আপনার বিধান মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতেছ আমরা তাহার বিনিময়ে তোমাকে কি প্রদান করিব? তুমি আমাদের জন্য কি না করিতেছ। আমাদের দেহ মন তোমার চরণে রাখিয়া দিয়া তাহাদের সুখ সাধনোপযোগী কত প্রকার সুব্যবস্থা তুমি করিয়া দিয়াছ। বিবিধ ফল ফুলে সুসজ্জিত করিয়া জগৎকে আমাদের সেবার জন্যই নিয়ত নিযুক্ত রাখিয়াছ। আমরা চাহি আর না চাহি পূর্ব্ব হইতে আমাদের অভাব সকল মোচন তুমি নিজেই করিয়া থাক। এত সুখ এত সম্পদ আমরা কি সম্ভোগ করিবার উপযুক্ত? দেব, আমাদের জন্য তুমি যখন এত করিতেছ তখন আমাদের নিকট হইতে তুমি কি চাও, বল। আমাদিগকে তুমি ডাকিলে কেন? আমাদিগকে তুমি পালন করিতেছ কেন? আমাদিগকে তুমি জগতের নিকট এত সমাদৃত ও সম্মানিত করিলে কিসের জন্য? কেবল কি ইহার জন্যই নয় যে, আমরা তোমার সঙ্গে যোগ দিয়া তোমার বিধান মাহাত্ম্য নিজ নিজ জীবনে ভাল করিয়া প্রকাশ করিব? আমাদের জীবন দ্বারা যদি তোমার এই প্রিয় কার্য্য সাধিত না হয় তাহা হইলে যে আমাদিগকে নিশ্চয়ই বিশেষ অনুতাপিত হইতে হইবে। বিশেষ সময়ে বিশেষ ভাবে বিশেষ কৃপার অধীনে রাখিয়া যাহাদিগকে প্রতিপালন করিলে তাহারা নিশ্চয় তোমার বিশেষ বিধানের গৌরব প্রাণপণে সাধন করে এই তোমার ইচ্ছা। প্রভু, আমাদের সকলকে তোমার এই ইচ্ছা বুঝিতে দাও। আমরা যেন এই বৃদ্ধবয়সে তোমার ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য না করি। প্রাণগত চেষ্টার দ্বারা তোমার বিধানমাহাত্ম্য যুগে যুগে যেমন তোমার ভক্ত সন্তানগণ জগতে প্রচার করিয়া জগদ্বাসী নরনারীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন, আমরাও যেন এবার তাঁহাদের ন্যায় নববিধানগৌরব জগতে প্রচার করিয়া নরনারীর অন্তরে আশাপ্রদান করিতে সক্ষম হই, এবং তোমার নববিধানের বিজয়-নিশান নিষ্কলঙ্ক রাখিয়া উড্ডীয়মান করিতে পারি, এবং সকল প্রকার ব্যভিচার হইতে দূরে থাকি, মা দয়াময়ী, দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

নূতনত্ব কোথায় ?

নিত্য "নূতনত্ব" "নববিধান বিশ্বাসীর লক্ষণ।" নিত্য নববিধাতার নববিধাতৃত্বে বিশ্বাস না করিলে কেহ নববিধান-বিশ্বাসী হইতে পারে না, সুতরাং যিনি বিধানে বিশ্বাস করেন, তিনি বিধাতার নববিধাতৃত্বেও বিশ্বাস করেন। যিনি নিত্য বর্ত্তমান থাকিয়া, নিত্য জাগ্রৎ থাকিয়া সমুদয় মানবাত্মার প্রয়োজন সকল বিধান করেন, তিনি নিত্য-নববিধাতা। এই নববিধাতার নববিধাতৃত্বই বিশ্বাসীর নবজীবন লাভের উপায়। ঈশ্বর বিধাতা হইয়া বিধান করেন আর মানুষ তাঁহার হস্তে থাকিয়া নবভাবে বিহিত হয়। ঈশ্বর বিধান করেন কি ? তিনি বিশৃঙ্খলকে সুশৃঙ্খল করেন, নীরসকে সরস করেন, কুৎসিত বিরূপকে সুন্দর সুরূপ করিয়া দেন। এই জন্য তিনি নববিধাতা। এই নববিধাতা যাহাদিগের উপাস্য দেবতা তাহারা পুরাতন ভাবে থাকিবে কিরূপে ? বিধাতার উপাসনা করিবার উদ্দেশ্যই কেবল নবজীবন লাভ করা। সুতরাং সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হইলে বিধাতার উপাসনা সিদ্ধ হয় না। যাঁহারা আত্মকর্ত্তৃত্ব বিসর্জ্জন করিয়া বিধাতার হস্তে জীবন উৎসর্গ করেন, তাঁহারা নিশ্চয় বিধাতা কর্ত্তৃক নবজীবনে গঠিত হইয়া পুণ্যপ্রেমের শ্রী সৌন্দর্য্য লাভ করিতে পারেন। কেন না যাঁহার হস্তে ভার দেওয়া হইয়াছে তাঁহার ব্যবসায়ই এই। যাঁহার নূতন করা ব্যবসায়, সে বিষয়ে তাঁহার আলস্য বা ঔদাস্য থাকিতে পারে না। কর্ত্তার আলস্য ঔদাস্য ব্যতীত বস্তু কখন মলিন পুরাতন ভাব ধারণ করে না। যে স্থানে এ লক্ষণ নাই সে স্থলে বিশ্বাস প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই নিশ্চয়। কথার ধর্ম্ম সংসারে অনেক আছে, শাস্ত্র যুক্তি প্রমাণ বহুতর পুস্তকে আছে, কিন্তু জীবনে নাই। যে ধর্ম্ম জীবনে সেই ধর্ম্ম জীবন্ত। জীবনের পরিবর্ত্তন ভিন্ন ধর্ম্মের আর কোন প্রয়োজন দৃষ্ট হয় না। যদি ধর্ম্ম সাধন করিয়া জীবন পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুণ্য প্রেমে বিভূষিত না হয় তবে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও সাধন ভজন সমুদয় নিষ্ফল হইয়া যায়। এই জন্য জীবনশূন্য ধর্ম্মকে মৃতধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। ধর্ম্মের এই মৃতভাব, এই নির্জ্জীব অবস্থা দূর করিবার জন্যই নববিধানের প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন সাধনের জন্যই নববিধানের অভ্যুদয়। যদি ইহা সত্য হয় তবে বিধান বিশ্বাসীকে নূতনত্ব দেখাইতে হইবে। সে নূতনত্ব কিসে ? পাপে নহে পুণ্যে; বিবাদ বিদ্বেষে নহে প্রেমে; সংসারাসক্তিতে নহে বৈরাগ্যে অথবা ঈশ্বরানুরাগে; অহঙ্কার অভিমান ও কর্ত্তৃত্বপ্রিয়তাতে নহে, স্বার্থশূন্য পদমর্য্যাদাভিলাষশূন্য নিরহঙ্কৃত ভাবে; চাঞ্চল্য বা চাপল্যে নহে শান্তিতে; বিরস বিষন্নতাতে নহে সরস সুপ্রসন্নতাতে; শোক দুঃখে নহে আনন্দে ত্রুটিতে নহে শক্তিতে।

ইহার বিপরীতে যদি নূতন পাপ দুঃখ, নূতন হিংসা বিদ্বেষ, নূতন স্বার্থ অহঙ্কার অভিমান মর্য্যাদাভিলাষ, নূতন সংসারাসক্তি, নূতন চাঞ্চল্য বা উদ্বেগ, নূতন শোক মোহ, ত্রুটি দুর্ব্বলতা জন্মে; তাহা নূতন হইলেও নূতন নহে। কেন না এ সকল পুরাতন সংসারের পুরাতন বস্তু। পাপ পুরাতন, পুণ্য নূতন। অভাব পুরাতন, ভাব নূতন। ফলতঃ যাহা এ সংসারে ছিল না আসিল, তাহাই নূতন। আসিল কোথা হইতে ? পুণ্যময় ঈশ্বর হইতে। ঈশ্বর হইতে পাপ দুর্ব্বলতা, অভিমান অহঙ্কার আসিতে পারে না, হিংসা বিদ্বেষ আসিতে পারে না, কেন না ঈশ্বরেতে এ সকল নাই। কিন্তু আজ কাল যেরূপ পাণ্ডিত্যের বৃথা অহংকার দেখা যায়, তাহাতে ইহার বিপরীত অর্থ হওয়াই সম্ভব। কেন না "অভিমান অহঙ্কার ও পদমর্য্যাদার জন্য নববিধান নাম পরিত্যাগ করিয়াও নববিধান বিশ্বাসী বলিয়া পরিচিত থাকিব, প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের প্রত্যাদেশের প্রতি অনাদর

করিয়া ও প্রত্যাদিষ্টের বন্ধু বলিয়া পরিচয় প্রদান করিব," ইত্যাদি যদি নববিধান হয় তবে নূতন পাপ অহঙ্কার স্বার্থ বিদ্বেষ প্রভৃতির নাম কেন নববিধান হইবে না? তাঁহারা হয়ত বলিবেন নববিধান প্রেমের ধর্ম্ম। সংসারের সমুদয় বিভিন্নতা ও ভেদাভেদ দূর করিয়া সকলকে এক সমন্বয়সূত্রে গ্রথিত করা নববিধানের কার্য্য ও স্বভাব, ইহা সিদ্ধ হইলেই নববিধান সিদ্ধ হইল। উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত নামরূপাদি পরিত্যাগ করিলে ক্ষতি হয় না। কেন না সংসারে যত বিভিন্নতা দেখা যায় সে সমুদয় নাম ও রূপের জন্য। নাম ও রূপ না থাকিলে অতি সহজে সমুদয় এক হইয়া যায়। হরি ভিন্ন, রাম ভিন্ন, যদু ভিন্ন ও মধু ভিন্ন নামের জন্য। কৃষ্ণ, গৌর, কপিল প্রভৃ ত ভিন্ন ভিন্ন রূপের জন্য। নাম ও রূপ থাকিতে প্রকৃত একতা, প্রকৃত মিলন অসম্ভব। অতএব নববিধানের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নববিধান নামটি পরিত্যাগ করিলে ক্ষতি কি? ক্ষতি আছে। নববিধান সমন্বয় স্থাপন করিবেন কাহার সঙ্গে? পাপে পুণ্যে নহে, প্রেমে বিদ্বেষেও নহে, কিন্তু পুণ্যে পুণ্যে ও প্রেমে প্রেমে, ঈশা মুষা গৌর গৌতম প্রভৃতি ভক্তের সঙ্গেই ভক্তের মিলন, বিধানের মিলন হইতে পারে, কিন্তু অভক্তের সঙ্গে ভক্তের ও অবিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বাসের মিলন করা নববিধানের কার্য্য নহে। যাহা নববিধানের বিরোধ, তাহার সঙ্গে মিল করিবার জন্য নববিধান নাম পরিত্যাগ করা এ চতুরতা সংসারের নিকট খাটিতে পারে, কিন্তু স্বর্গে খাটিবে না। স্বয়ং ঈশ্বর ও নাম ও স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া পরিত্রাণ দিতে পারেন না। কেন না তাঁহার পরিত্রাণপ্রদ শক্তি মনুষ্যবুদ্ধির গোচর করিবার জন্যই নামের ভিতরে রাখিয়াছেন। শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ তাঁহার স্বরূপ, পুণ্য তাঁহার নাম। এ স্থলে পাপী যদি বলে যে "ঠাকুর। তুমি ঐ রূপ ও নাম লইয়া আমার নিকটে আসিও না, আমি উহা সহ্য করিতে পারি না।" তাহা হইলে ঈশ্বর পাপীর সঙ্গ প্রণয় রক্ষার জন্য, প্রেমের গৌরব রক্ষার জন্য কি আপন স্বরূপ ও নাম পরিত্যাগ করিবেন? তিনি অবশ্যই বলিবেন, "অধমতারণ পতিতপাবন আমার নাম, পুণ্য আমার স্বরূপ, আমি এ সকল পরিত্যাগ করিয়া কি লইয়া তোমার কাছে আসিব? আসিয়াই বা কি করিব? যে ব্যক্তি আমার নাম ও স্বরূপ সহ্য করিতে পারে না সে আমাকে সহ্য করিবে কি রূপে? এই জন্য বলি, নাম রূপের প্রয়োজন আছে, পাপের সঙ্গে পুণ্যের প্রভেদের প্রয়োজন আছে, সুতরাং নববিধানের সঙ্গে তাহার বিরোধীর বিভিন্নতা থাকা প্রয়োজন। নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিলেই সে বস্তুর অস্তিত্ব বিলোপ করা হয়। বিরোধী নাম পরিত্যাগ করিতে বলে কেন? সে বিধান বা বিধাতৃত্ব সহ্য করিতে পারে না, সেই জন্য। বিধান বিশ্বাসী এই নাম বিরোধীর সঙ্গে মিলন করিবেন কিরূপে? সে যখন নামটি পর্য্যন্ত সহ্য করিতে অসমর্থ, তখন বিধাতার তেজোময় পুণ্যপ্রভাব সহ্য করিবে কিরূপে? আত্মবিনাশের জন্য অবিশ্বাসের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত নহে। কেহ বলিতে পারেন "আমরা বিরোধ করি না একতা স্থাপন করি" যদি বিরোধ নাই তবে নামের প্রতি বিদ্বেষ কেন? ইহাকি বিরোধ নহে? যিনি অন্যের আশ্রয় পাইবার জন্য নিজের বিশ্বাসোচিত নাম পরিত্যাগ করেন, তিনি কিরূপ কার্য্য করেন তাহার বিচার করিবে কে? যাহা হউক এ সকল স্বয়ং স্বাধীনতা নববিধানের অঙ্গীয় নূতনত্ব নহে। যে স্থানে বিধান বিরোধীর সহিত, অবিশ্বাসের সহিত মিলনের প্রয়াসে বিশ্বাস ও সত্য বিলোপ হয় মাত্র তাহার দ্বারা অন্য কোন উপকার নাই। তাহা সংসার ব্যতীত আর কিছু নহে। স্বর্গের তাহার সম্বন্ধ অতি অল্পই অনুমিত হইবে।

অসহায় অবস্থা।

অসহায় অবস্থায় পড়িয়া লোকে অবসন্ন হইয়া পড়ে। এ সংসারে যাহার কেহ সহায় নাই, সে অতিকৃপাপাত্র দীন। সংসারিগণ যদি ধর্ম্মধনে বঞ্চিত হইয়াও সহায় সংগ্রহ করিতে পারে তাহাতে এই জন্যই কুণ্ঠিত হয় না। বহু লোক ধর্ম্মপথে কেন অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, তাহার কারণ চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্য এ পৃথিবীতে প্রবল সহায় অন্বেষণ করে, সহায় বিনা তাহারা মুহূর্ত্ত মাত্রও জীবন ধারণ করিতে পারে না, ইহা বিলক্ষণ জানে। যখন দেখিতে পায় যে, ধর্ম্মের অনুসরণ করিতে গেলে তাহারা সমাজের বিষদৃষ্টিতে নিপতিত হইবে, তখন তাহারা প্রকাশ্যে তাহার অনুসরণে সাহসী হয় না। মানুষ যত দিন অসহায়াবস্থার গৌরব বুঝিতে না পারে, ততদিন তাহাদিগের ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া একান্ত অসম্ভব।

ঈশ্বরবিশ্বাসী সংসারে দিন দিন অসহায় হইয়া পড়েন। যাঁহারা প্রথমতঃ তাঁহার সঙ্গে থাকেন তাঁহারা ক্রমে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। বিশ্বাসীর সহিত সংসারের বিরোধ দিন দিন বাড়িতে থাকে। সংসারের সহিত বিরোধবশতঃ তিনি সংসারিগণের দ্বেষ্য পাত্র হন। যত তিনি সংসারের বিদ্বেষভাজন হন, তত তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহার সঙ্গ করিতে ভয় পান, কেন না তাঁহারা এ সংসারে অসহায় অবস্থাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভয় করিয়া থাকেন। বিশ্বাসী যত অসহায় হন, তত তাঁহার বিশ্বাস প্রবল হইতে থাকে। যত দিন তাঁহার ধন বল জন বল ছিল, তত দিন তাঁহার বিশ্বাস বাড়িবার অন্তরায় ছিল, যত সে সকল তিরোহিত হইতে লাগিল, তত তাঁহার বিশ্বাস উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর বেশ ধারণ করিল।

বিশ্বাসী এবং অল্পবিশ্বাসী এ দুইয়ের পার্থক্য এই স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কে অল্পবিশ্বাসী কে বিশ্বাসী তত দিন চিনিতে পারা যায় না, যত দিন না অসহায় অবস্থা সমুপস্থিত হয়। যখন জনবল ধনবল থাকে, তখন শত শত লোক উৎসাহের সহিত আসিয়া যোগ দেয়। বিশ্বাসিগণের বিশ্বাসবর্দ্ধনের জন্য এরূপ অবস্থা চির দিন থাকে না। বিশ্বাসিগণকে প্রথমে সংসার শত্রুপক্ষ বলিয়া ভালরূপে লক্ষ্য করিতে পারে না। সুতরাং প্রথমে তাহাদিগের শত্রুতা তীব্র থাকে না। বিশ্বাসের প্রতিভায় যখন শত শত লোক আসিয়া দলবদ্ধ হয়, তখন বিশ্বাসের বল সংসার অনুভব করে, এবং বিশ্বাসীর বিপদের আশঙ্কা উপস্থিত হয়। এই সময়ে যত প্রকারের বিভীষিকা সংসার প্রদর্শন করিতে পারে তাহা লইয়া অগ্রসর হয়, এবং এই সময়ে বিশ্বাসী ও অল্পবিশ্বাসী এ দুইয়ের পার্থক্য সংঘটিত হয়।

বিশ্বাসীকে আপনার করিবার জন্যই ঈশ্বর ঈদৃশ পরীক্ষা নিয়োজিত করিয়াছেন। তিনি চান যে তাঁহার বিশ্বাসী সন্তানগণ তাঁহাকে ভিন্ন আর কিছুরই উপর আশা ভরসা না রাখে। বিশ্বাসীও দিন দিন ঈশ্বরেতে এমনই মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে, ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই তাঁহার নিকট ভাল লাগে না। তিনি ঈশ্বরকে সর্ব্বদা নিকটে দেখেন, এবং সকল অবস্থায় তাঁহার অভয় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নির্ভয়চিত্ত হন। সংসারের লোকেরা যখন দেখে যে, কোন প্রকার বিভীষিকা বিশ্বাসীকে ভীত করিতে পারিল না, তখন তাহারা আশ্চর্য্যান্বিত হয়, এবং বলিতে থাকে, এ লোক অবশ্য কোন অলৌকিক বল দ্বারা পরিচালিত, অন্যথা ইহার ঈদৃশ নির্ভীকতা কোথা হইতে উপস্থিত হইল? তাহারা জানে না কোথা হইতে তাঁহাতে বল সমুপস্থিত। অথচ না জানিয়াও তাঁহার প্রতি তাহারা গূঢ়ভাবে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

বিশ্বাসীর পক্ষে অসহায়াবস্থা কেবল ধন বল লোক বলের অভাবে উপস্থিত হয় না, ধর্ম্মরাজ্যে সময়ে সময়ে এমন সমুদয় পরীক্ষা সমু-

পস্থিত হয়, যাহাতে বিশ্বাসী আপনাকে নিতান্ত অসহায় বলিয়া অনুভব করেন। এক সময়ে ঘটনাপরম্পরায় এমন উপস্থিত হইতে পারে, যাহাতে তাঁহার সকল আশা উন্মূলিত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু বিশ্বাসী সহস্র বিপরীত ঘটনার মধ্যেও এক ঈশ্বরের প্রতি স্থিরচিত্ত হইয়া অবস্থিত জন্য, এ সকল ঘটনা অপর সহস্র ব্যক্তিকে অসহায় বোধে নিরাশ করিয়া ফেলিলেও তাঁহাকে নিরাশ করিতে পারে না। ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আলোকের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি স্থির, সুতরাং অন্ধকার তাঁহার চিত্তের স্থিরতা অপহরণ করিতে অসমর্থ।

আমাদিগের প্রতিজনের বিশ্বাসসম্বন্ধে পরীক্ষিত হইতে হইবে। আজ যদি আমাদিগের অনুকূল অবস্থা থাকে কল্য, তাহা থাকিবে কি না তৎপক্ষে সন্দেহ। বরং ইহাই যথার্থ যে বিশ্বাসবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষারম্ভ বৃদ্ধি হইবে। আমরা বলপূর্ব্বক অসহায়াবস্থায় আসিতে চাই না সত্য, কিন্তু অধ্যাত্মরাজ্যের স্থিরতর নিয়মে যখন তাহা সমুপস্থিত হইবে, তখন বিশ্বাসে সুদৃঢ় থাকিতে পারিব কি না ইহা চিন্তার বিষয়। বর্ত্তমানে যদি আমাদিগের ঈশ্বরদর্শন উজ্জ্বল হইয়া থাকে, এবং তাঁহার আবির্ভাব ইচ্ছা করিলেই আমরা অনুভব করি, তাহা হইলে আশা হয়, যে দিন পরীক্ষা সমুপস্থিত হইবে, চারিদিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইবে, আশা করিবার কিছুই থাকিবে না, সে দিনেও ভগবানের প্রেমমুখ দর্শন করিয়া আমরা সমুদায় অসহায়াবস্থার ভয় অতিক্রম করিব।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

পৃথিবীতে এমন লোক অতিবিরল যাহারা আত্মসম্বন্ধে সমুদায় ভগবানের হাতে রাখিয়া নিশ্চিন্ত। অনেকে বলেন, হিন্দুগণ ঘোর অদৃষ্টবাদী, তাহারা এই জন্য উদ্যোগ চেষ্টা ও যত্নবিহীন। আজ পর্যন্ত আমরা কিন্তু এরূপ কিছু দেখিলাম না, যাঁহারা যথার্থ অদৃষ্টবাদী বলিয়া উদ্যোগশূন্য। যখন কোন জাতি দুর্ব্বল ও অলস হইয়া পড়ে, তখন তাহারা যাহা হইবার হইবে বলিয়া নিশ্চেষ্ট থাকে, ইহা অদৃষ্টবাদের ফল নয়, দুর্ব্বলতার ফল। ভগবানের নিত্যক্রিয়ার প্রতি আরও বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তিনি যাহা করিবেন, তাহাই হইবে, তাহার অন্যথা কখন হইতে পারে না, ইহা বলিয়া নিশ্চেষ্ট ও নিরুদ্যম থাকা অসম্ভব। কেন না যাঁহারা তাঁহার ক্রিয়াধীন হইবেন, তাঁহারা নিত্যক্রিয়াশীল না হইয়া থাকিতে পারেন না, তাঁহার প্রেরণার অন্যথা করা তাঁহাদিগের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। সেই ব্যক্তি আত্মসম্বন্ধে সমুদায় ভার ভগবানের হাতে দিতে পারেন, তিনি অদৃষ্টবাদের যাহা প্রকৃত সত্য তৎপ্রতি একান্ত আস্থাবান্। আমার ভাল হইবেই হইবে, ইহাই নিয়তি, ইহাই অদৃষ্ট। যিনি ঈদৃশ অদৃষ্টবাদী তিনি ঈশ্বরেতে সদা নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত, নিরুদ্যম নিশ্চেষ্টতা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। আবার সে সকল বিষয়ে উদ্যোগ চেষ্টাও তাঁহা হইতে অসম্ভব, যাহা ভগবান্ তাঁহার সম্বন্ধে ইচ্ছা করেন না। মানুষ মনে করে, আমি যদি আমার মান সম্মাননা গৌরব স্বয়ং উদ্যোগ চেষ্টা যত্ন দ্বারা রক্ষা ও বৃদ্ধি না করি, তাহা হইলে সে সকল লাভের সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বর বিশ্বাসীর এ সকল সম্বন্ধে বিপরীত ভাব। তিনি জানেন, কেবল ভগবানের ইচ্ছা প্রতিপালন। তাহা হইতে যাহা আসিবে তাহাই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃ। তিনি মানও বোঝেন না গৌরবও বোঝেন না, ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রতিপালন করিতে গিয়া যদি বহুল ঘৃণা অবমাননা সহ্য করিতে হয়, তবে তদপেক্ষা আর কিছু তিনি সমধিক সম্মাননার বিষয় দেখেন না। ঈশ্বরের হাতে যাঁহার সমুদায় জীবন, তিনি আপনার বিষয় আপনি কিছু ভাবেন না। কেবল দাসের (ভার) কার্য্য করিয়া চলিয়া যাওয়া, তাহা হইতে যাহা আসিবার আইসে। ধন্য সেই ব্যক্তি যিনি এরূপে জীবন অতিপাত করেন। গৌরব, সম্মান, পৃথিবী ও স্বর্গে তাঁহারই চির অমরত্ব।

আচার্য্যের উপদেশ।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ২০এ অগ্রহায়ণ রবিবার, ১৮০১ শক।

আত্মার ভিতরে আত্মা; আমার ভিতরে আমি; ইহার অর্থ কি? আত্মা শব্দের অর্থ আমি। পরম আত্মা কি তবে পরম আমি? ঈশ্বরকে উপাসনার সময় আমরা তুমি বলি। ঈশ্বর কি পরম আমি? 'হে আত্মন্!' ইহার অর্থ হে আমি। হে পরম আত্মন্! ইহার অর্থ কি পরম আমি? আমি কয়টা? আমি কয় জন? এক ছোট আমি,

জীব আমি, আর কি বড় আমি, পরম আমি? দুই কি ভিন্ন প্রকাশ মাত্র? আমি বস্তর কি প্রকারান্তর? বস্তু কি একই? হে ঈশ্বর! তুমি আমাকে রক্ষা কর, ইহার অর্থ কি, হে আমি! আমাকে রক্ষা কর? হে অনন্ত আত্মা! তুমি আমার কাছে আসিয়া বস, ইহার অর্থ কি, হে অনন্ত আমি, আমার কাছে বস? হে পরমাত্মন্! তুমি আমাকে পাপের হস্ত হইতে মুক্ত কর, ইহার অর্থ কি হে বড় আমি, যে ছোট আমি আমার ভিতর, তাহাকে পাপ বন্ধন হইতে মুক্ত কর? কে বলিতেছে কাহাকে? বলে কে? শোনে কে? আত্মা শব্দ জটিল। আত্মা শব্দ দুর্বোধ। আত্মাকে কে বুঝিতে পারে? পরমাত্মাকেই বা কে বুঝিতে সক্ষম? পরম আত্মা কেন হইল? এক আমি স্বর্গেতে আর এক আমি কি নরকেতে? এই যে আমি বসিয়া আছি, আমার আত্মার মধ্যে সর্ব্বগত পরমাত্মাও আছেন, ইহা ত সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। উপাসনার সময় সর্ব্বদাই আমারা এই চিন্তা করিয়া থাকি। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারি না। তাঁর অনন্ত শক্তির ক্ষুদ্র শক্তি এই আমি; তাঁর অপার আনন্দের ক্ষুদ্র আনন্দ আমার; তাঁর প্রেমসিন্ধুর এক প্রেমবিন্দু আমাতে। চলিত ভাষায় বলিতে গেলে বলা যায় বড় আমি আর ছোট আমি। এক পাকা আমি আর এক কাঁচা আমি; এক স্রষ্টা আমি, আর এক সৃষ্ট আমি। অসত্য সে বলিল, যে বলিল, "আমি তিনি এক, আমিই ব্রহ্ম।" অগ্নি সমান মিথ্যা বাহির হইল, তাহার মুখ হইতে, যে বলিল "তিনি ছাড়া আমি।" আমরা যখন উপাসনা করি, তখন যে বলি, "অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে "অন্তরের ভিতরে অন্তরতম আছেন। এক আত্মার ভিতরে খুঁজিতে খুঁজিতে বড় আত্মা পাওয়া যায়। আমি স্পর্শ দ্বারা বুঝিতে পারি, এই আমার আত্মার শেষ ও এই আত্মার আরম্ভ। এই চিদাকাশ অসীম, তাহাতে উড়িতেছে এই আমার আত্মা পক্ষী। অনন্ত জ্ঞান সমুদ্রের মধ্যে ক্ষুদ্র জল বিন্দু। অনন্তের সহিত পরিমিতের যে সম্বন্ধ, তাঁহার সহিত আমার ও সেই সম্বন্ধ। এই যে পরমাত্মা আমার ভিতরে রহিয়াছেন, ছুরী দিয়া ইহাঁকে কাটিয়া ফেলা যায় না; দড়ি দিয়া ইহাঁকে টানিয়া বাহির করা যায় না। যদি কেহ তাঁহাকে পৃথক করিতে চায়, কোন ক্রমেই করিতে পারে না। স্ত্রীকে স্বামী পরিত্যাগ করিতে পারেন, স্বামীকেও স্ত্রী পরিত্যাগ করিতে পারেন; পিতা পুত্রকে দূর করিয়া দিতে পারেন, পুত্র ও প্রবলতর হইয়া পিতাকে বাটী হইতে বহিষ্কৃত করিতে পারে। বন্ধু ও বন্ধুকে বিচ্ছেদ কালে হৃদয় হইতে অন্তর্হিত করিতে সমর্থ। কিন্তু কে পারিয়াছে শরীর মনকে ঈশ্বরশূন্য করিতে? এমন জীব শরীর নাই, যাহার মধ্যে ঈশ্বর নাই। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নাস্তিককে জিজ্ঞাসা কর। তাহাদের কলম ঈশ্বরের নাম না লিখিতে পারে, রসনা ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতে পারে; কিন্তু অন্দর মহলে, হাড়ের ভিতর ঈশ্বর বিরাজিত। নাস্তিককি আপনা হইতে ঈশ্বরকে পৃথক করিতে পারে? কখনই না। যেখানে ছোট আত্মা, সেই খানেই বড় আত্মা। এক জন আর একজনের দ্বারা কখনই তাড়িত হন না। নৈকট্য আমরা বেশ অনুভব করিতে পারি। এই যে এক প্রকাণ্ড বস্তু আমার ভিতরে, ইনি কে? তুমি সৃষ্টি করিয়া তফাৎ হইয়া গিয়াছ, আমি সৃষ্টি স্বাধীন ভাবে রহিয়াছি, একথা আমরা কখনই পরমাত্মাকে বলিতে পারি না। যত পরিমাণে সৃষ্ট, তত পরিমাণে ব্রহ্মসাগরে মগ্ন। কখনই অহঙ্কারী হইয়া ব্রহ্ম ছাড়া স্বাধীন ভাবিতে পারি না। পরমাত্মা কখনই স্বতন্ত্র নহেন। ঠিক যেন ছোট জীবাত্মা আমি গলা জলে ডুবিয়া রহিয়াছি। তদপেক্ষাও অধিক। উপরে, নীচে, দক্ষিণে, বামে অনন্ত ঈশ্বর। মাঝ খানে এই ছোট আমি। এই ভাবে যদি দেখ, বুঝিতে পারিবে জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুই কেন আত্মা হইল। অর্থাৎ তুমি তোমার তুমি নও। আমি যে আমি, আমার আমি নই। আত্মা বটে, আমি বটে, কিন্তু কার আমি? এক জন পরমাধিকারী রহিয়াছেন, আমি যে তাঁহার। এক জন পরম অধিকারী থাকিলে অধিকৃত ছোট বস্তু কার হয়? আমরা কেবল অধিকারী নই। আত্মার পরমাধিকারী আছেন। তোমার তবে তুমি নও; আমার তবে আমি নই। পরমাত্মার শক্তি ও নিশ্বাস হইতে উৎপন্ন; তাঁহার তেজে আলোকিত। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের যে যোগ, তাহা অবিচ্ছেদ্য। আমি ঘুরিতেছি, আমি লিখিতেছি সত্য, অথচ এ সকল কার্য্য আমার নয়। পরমাত্মার সকলই। দৌড়িতেছি আমি, পরমাত্মা নিজ শক্তিতে দৌড় করাইতেছেন। শস্ত্র এরূপ তীক্ষ্ণ হইতে পারে না, যে ঈশ্বরের শক্তিকে কাটিয়া ফেলে। কুতর্ক এমন হইতে পারে না, যাহা তাঁহাকে ছিন্ন করিতে পারে। সহস্রবার ঈশ্বরকে ভুলিয়া যাও, জিনিষ ঠিক থাকিবে। আমার বাড়ী বল, আমার ঘর বল, মূলাধিকারী যে আছে। মূলাধিকারী ভিতরে থাকিয়া সব শুনিতেছেন। আমার আমি কি? এই হাত, এই মাংস। আসল আমি তাঁর শক্তিতে। তিনি প্রকাণ্ড সৎস্বরূপ। তাঁহার এক বিন্দু মঙ্গল সলিলে মীনস্বরূপ হইয়া বাঁচিয়া রহিয়াছি। প্রত্যেকের স্বত্বাধিকারী, মূলাধিকারী পরমাত্মা। আমার সমস্ত জীবন তাঁহাতে নিবিষ্ট। তাঁহার জ্ঞানেতে আমার জ্ঞান এমনই প্রবিষ্ট যে আমার জ্ঞান তাঁরই। চল্লিশ বৎসর দেখিতেছি, এক পাও দৌড়িতে পারিলাম না। হস্ত সঞ্চারিত করিতে গেলাম, পারিলাম না। মস্তককে বলিলাম, নিজ বুদ্ধিতে চিন্তা কর দেখি, নিজের শক্তিতে কোন বিষয় দেখ দেখি, মস্তক পারিল না। শিল্পনৈপুণ্যের অভি-

জ্ঞান আমার ছিল; হস্তকে বলিলাম, কোনরূপ নূতন রঙ্, নিজে ফলাও দেখি। হস্ত নিজে কিছুই করিতে পারে না। যাহা আগে ঈশ্বরেতে ছিল, তাহাই হইল। সকল স্থানেই কালী পূজা; এক মহাশক্তিতে সমুদয় আচ্ছন্ন। প্রত্যেক শক্তিতে, প্রত্যেক কথায়, প্রত্যেক কার্য্যে সেই মহাশক্তির সঞ্চার। জগত্ তুমি কি বলিতেছ? ও শরীর তোমার নয়. তুমিও তাঁর বাড়ীতে। ও তোমার ঘর নয়, পরের ঘরে ভাড়া দিয়া রহিয়াছ। শক্তিসমুদ্রে জলবুদ্বুদ দেখা যাইতেছে। তোমার আমার ভিতর তিনি। কিন্তু অদ্বৈতবাদী হই নাই। জ্ঞান চক্ষে দেখিতেছি, প্রকাণ্ড পরমাত্মা তিনিই আমার যথার্থ আমি। ভাড়াটে আমি কেবল নবাবী করে, গাড়ী ঘোড়া চড়ে। ভাড়াটে আমি বলে, আমি বই ছাপাই, আমি বক্তৃতা করি, আমি লাট সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি. আমি পরোপকার করি। এই যে সামান্য কীট, বাহিরে পড়িয়া রহিয়াচে, ইহার এত অহঙ্কার! অন্দরে গিয়া দেখি বাড়ীর যথার্থ মালিক। বাড়ীর বাহিরে যে পড়িয়া থাকে, তাহাকে কে মানে? গাঁয়ে কেউ তাহাকে মানে না, আপনি আপনাকে মোড়ল মনে করে, নবাব মনে করে। পৃথিবী শুদ্ধ জানে, একজন বড় অধিকারী আছেন। তিনি ভিতর হইতে কল চালাইতেছেন, ছোট ছোট পুতুল গুলি বাহিরে নৃত্য করিতেছে। এত বড় যে ইতিহাস, ইহার লেখক তিনি; ফ্রান্সের ইতিহাস, ইংলণ্ডের ইতিহাস, ভারতের ইতিহাস, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুতুল নাচের বৃত্তান্ত। তুমি কে? আত্মা যখন আর একজনের তখন তুমি কে? তুমি একটু বল ধার করিয়া তবে ত একটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কর, একটী ঘাট বাঁধাইয়া দাও। তোমার অন্ন তোমাকে ঠাট্টা করিয়া বলে, তুই আমাকে পারিস না তুলিতে। যত ক্ষণ না সেই পরম আমির বল আসে, ততক্ষণ তুমি মুখে অন্ন তুলিতে পার না। এইরূপে শরীর জব্দ করে। সমস্ত পৃথিবীটা পরিহাস করে, বিদ্রূপ করে। পৃথিবী আমাকে বলে, "কেমন কাজ কর দেখি, লেখা পড়া কর।" সকলই হয় মহাজনের পয়সাতে। নিজের কিছুই নাই। তুমি শালের দোকান কর, তুমি চালের দোকান কর, তুমি তেলের ব্যবসা কর, তুমি গাড়ী ঘোড়ার কারবার কর, তুমি তিসির কারবার কর সব তাঁর পয়সাতে। মহাজন যিনি, তিনিই জন। এই ছোটদের দয়া করিয়া জন বলি, বস্তুতঃ এরা দুর্জ্জন। এই শরীর লইয়া আমরা এক একটা কীর্ত্তি করি, কিন্তু সকলই তাঁর টাকায় করি। তাঁরই মহিমা। পুতুল হইয়া যদি নাচি, সেও তিনি নাচান বলিয়া। তুমি যদি সত্য প্রচার কর, আমি যদি সত্য প্রচার করি, তিনিই তাহার মূল। তিনিই সত্য। তাঁরই জিনিষ। আমরা বাহির করিলাম না। প্রশংসা যদি করিবে হে মনুষ্য! সর্ব্বকর্ত্তা জগৎকর্ত্তাকে প্রশংসা কর। আমাকে মহিমা দিও না, আমিও তোমাকে প্রশংসা দিব না। আমরা সকলে পরমাত্মাকেই যেন বলি, মহিমা, গৌরব, বিক্রম সমুদয় তোমারই হে রাজা! গিরি, নদী, সাগর তোমারই। আমরা তোমারই; নরনারী জীব জন্তু সকলই তোমারই। এই বলিয়া সকলে জগৎকর্ত্তাকে মহিমান্বিত কর। জীবাত্মাকে ছোট কর।

হে দয়াসিন্ধু! হে প্রেমস্বরূপ! কৃপা করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দাও, আমার আমি কে? প্রশংসা কার? জীবাত্মা আমি; আমাকে সকলে প্রশংসা করে; আমি সমস্ত গৌরব গ্রহণ করি। ভিতরে থাকিয়া তুমি বলিতেছ 'ওরে চোর! আমার সমস্ত গৌরব হরণ করিতেছিস্, আমি ভিতরে আছি বলিয়া।' বাস্তবিক আমি চুরী করিয়াছি। তুমি যে ভিতরে আছ, আমি যেন তাহা ভাবি না। এই দেহ খানি আমার, জমীদারী আমার, ক্রিয়াকর্ম্ম আমার, কেবল এইরূপ বলিতেছে। পাঁচ জনে জানে, আমি বই লিখি আমার, বক্তৃতা করি আমার জ্ঞানে। তোমার নিকটে যেন আমি অঋণী, তোমার ধার যেন কিছুই ধারি না, এইরূপ দেখাই। আমার কল চলে আমার তেলেতে, আমার রথ চলে নিজের ঘোঁড়াতে। কারও কাছে ধার করিয়া আমি কিছুই করি না, সব হৃদয় থেকে আবিষ্কার করে ও করি। জগতের সকল লোক বলে তুমিই বাস্তবিক তোমার সবের কর্ত্তা, এই আমি চাই। কিন্তু হে পরমাত্মন্! এত বই লিখিলাম, প্রশংসা লইতে পারিলাম না, আমার প্রাপ্য কিছুই নাই। সমুদয় উপহার, প্রজারা যাহা কিছু আনিল, সকলই রাজার প্রাপ্য। গ্রাম উপগ্রামে সমস্ত আসিয়া তোমারই শ্রীচরণে পড়িল। কীট পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেকে আসিয়া বলিল, "সকলই তোমার শক্তিতে হে প্রভো!" লেখক, পুস্তকরচয়িতা জ্ঞানগর্ভ পুস্তক আনিয়া বলিল, এসব তোমারই। লেখকের সুখ্যাতি যেন আজ হইতে লুপ্ত হয়। মহাজনের উপর নির্ভর আমার; আমি সামান্য দোকানদার! আমি কি করিব? এখন এই ভিক্ষা চাই ঠাকুর! এই জীবাত্মা পরমাত্মার কি সম্বন্ধ আরও খুলিয়া বল। আমি মোহিত হই। আমার পরমাত্মা তুমি, আর তুমি পরমাত্মা, তোমার আত্মা আমি। তোমা ছাড়া আমি চলিতে পারি না। যেখানে যাই, পরম আমি না গেলে ছোট আমি যাইতে পারি না পরম আমি না সেখালে আমি কিছুই শিখিতে পারি না। মানুষের মানুষ, আসল মানুষ, মনের মানুষ, তুমি। অথচ মানুষ নও। কেমন করে সোণার ভিতরে লোহা, আলোর ভিতর অন্ধকার, বলের ভিতর দৌর্ব্বল্য বুঝিতে পারিলাম না। কৃপা করিয়া হে পরমাত্মন্! ইহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও। আমরা যেন তোমাকেই পরম আমি বলিয়া বুঝিতে পারি। হে প্রেমময় হরি! তুমি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, আমাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ কর।

ধর্ম্ম-বিজ্ঞান-বীজ।

যোগ ভক্তি জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়।

ভক্ত বিশ্বাস করেন, সকল বস্তু সকল ব্যক্তি ভগবানের, সকলেতেই তাঁহার অধিষ্ঠান আছে * সুতরাং তাহারা কখন আমার অপকার করিতে পারে না। যাহারা অপকারী নহে তাহাদিগকে ত্যাগ করিব কেন? বিশেষতঃ ভগবানের লোক বা বস্তুকে আমার ত্যাগ করিবার অধিকার কি? গ্রহণ করিতে পারি, সমাদর করিতে পারি,—ভগবানের বলিয়া গৌরব করিতে পারি, কিন্তু পরিত্যাগ করিতে পারি না। এই জন্য ভক্তিতে ত্যাগ নিষিদ্ধ, ভক্ত কখন ত্যাগ করেন না।

যোগ পরিত্যাগী, ভক্তি কাহাকেও ত্যাগ করে না; বিশেষতঃ যোগ নির্গুণ পরমাত্মার বিষয়, ভক্তি সগুণ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন ভগবানের বিষয়। ভাবেতে ব্রহ্ম এবং ভগবানেতে যে পার্থক্য আছে—যোগ এবং ভক্তিতেও ভাবতঃ সেই পার্থক্য আছে। এই ভাবগত বিরোধ যোগের সঙ্গে ভক্তির চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে।

তার পর জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তির যে বিবাদ তাহা কে না জানে? জ্ঞান বলেন ভক্তি প্রেম অন্ধ, ভক্তি বলেন জ্ঞান অহঙ্কারমূলক, এই বিবাদ। বস্তুতঃ জ্ঞানী সমাজ ভক্ত-দিগকে ভাবক বলিয়া প্রমত্ত বা উন্মত্ত বলিয়া ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া থাকেন, ভক্ত ও জ্ঞানীদিগকে নাস্তিক অবিশ্বাসী ইত্যাদি উপাধি দিয়া উপেক্ষা করিতে ত্রুটি করেন না। জ্ঞানী, বস্তুর বিচার করেন, বিচার করিয়া অতি সূক্ষ্ম তত্ত্ব সকল বাহির করেন, যাহা চিন্তা করিতে বিস্ময় বোধ হয়। ভক্ত সে সকল জঞ্জাল মনে করেন, বৃথা বিষয় আলোচনায় সময় নষ্ট করা ভক্তের রুচি হয় না; কাজেই বিবাদ। ভক্তের ভক্তি রসভাবাদি মিশ্রিত, জ্ঞানী সেই রসও ভাবাদিকে নীচতা মনে করেন। জ্ঞানীর জ্ঞান, কেবল সন্দেহাত্মক, ভক্ত সে জ্ঞানকে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন। জ্ঞান সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"অবিবেকাদুপাক্রম্য চেতঃ স্বৈ র্যত্ননিশ্চয়ৈঃ।
বলাৎকারেণ সংযোজ্যং শাস্ত্রসৎপুরুষক্রমৈঃ॥"

যোগবাশিষ্ঠ। ২৩। ৮

নিজের যত্ন দ্বারা অবিবেক হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া বলপূর্ব্বক শাস্ত্র ও সাধুদিগের অনুসরণে নিযুক্ত করিবে।

"অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি॥

মনু। ৫। ১০৯

জল দ্বারা গাত্র শুদ্ধ হয়, সত্য দ্বারা হৃদয় শুদ্ধ হয়, বিদ্যা (ব্রহ্মজ্ঞান) এবং তপস্যা দ্বারা আত্মা শুদ্ধ হয়, এবং জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি শুদ্ধ হয়।

প্রথমতঃ পরামর্শ এই যে, অবিবেক (অবস্তুতে বস্তু-বোধ) হইতে চিত্তকে বলপূর্ব্বক শাস্ত্র চিন্তাতে নিযুক্ত করিবে। কেন না অবিবেক থাকিলে সদ্বস্তু (ঈশ্বর) হৃদয়ে প্রতিভাত হইতে পারে না। বিশেষতঃ জ্ঞান ব্যতীত বুদ্ধি পরিস্ফুত হয় না, বুদ্ধির শুদ্ধি ব্যতীত পবিত্র ঈশ্বরতত্ত্ব উপলব্ধি হয় না অতএব জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। যথা—

"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎস্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি॥"
শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তি মচিরেণাধি গচ্ছতি॥

গীতা। ৪। ৩৮। ৩৯

জ্ঞানের তুল্য পবিত্র বস্তু আর নাই। যোগেতে সিদ্ধ ব্যক্তি কালে আত্মাতে সেই জ্ঞান স্বয়ং লাভ করেন। শ্রদ্ধা-বান্ ব্যক্তি সংযতেন্দ্রিয় হইয়া সাধন করিলে জ্ঞান লাভ করেন, জ্ঞান লাভ করিলেই অতিশীঘ্র পরম শান্তি লাভ করিতে পারেন।

এই সকল জ্ঞানের উৎকর্ষতা বর্ণিত আছে, বিশেষতঃ জ্ঞান বলে "আমি না দেখাইলে ভক্তি কখন ভগবান্‌কে চিনিতে পারে না, অতএব শ্রেষ্ঠত্ব আমার।

ইহার প্রতিকূলে ভক্তগণ বলেন—

শ্রেয়ঃস্বতিভক্তিমুদস্য তে বিভো।
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূল তুষাবঘাতিনাম্॥

ভাগবত।

"হে বিভো! শ্রেয়ঃস্বতি (সর্ব্বকল্যাণদাত্রী) তোমার ভক্তি পরিত্যাগ করতঃ যাহারা কেবলমাত্র জ্ঞান লাভের জন্য ক্লেশ স্বীকার করেন, তণ্ডুলশূন্য চিটা ধান্যে আঘাত কারীর ন্যায় তাহাদিগের কেবল ক্লেশমাত্র সার হয়।" পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র বস্তু আর নাই, জ্ঞান লাভ করিতে পারিলে পরম শান্তি লাভ হয়। এইক্ষণে প্রদর্শিত হইল কেবল জ্ঞানমাত্র দ্বারা কোন উপকার দর্শে না, ভক্তি চাই। ভক্তির উৎকর্ষতা কেন, তাহা প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিয়াছেন যথা—

"তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং নচ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥

ভাগবত। ১১। ২০। ৩১

---

* মামেব সর্ব্বভূতেষু বহিরন্তরপাবৃতম্।
ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথাখমমলাশয়ঃ॥

ভাগবত। ১১। ২৯। ১২

"সেই জন্য আমাতে সঞ্জীবিত আমার ভক্তিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে জ্ঞানং এবং বৈরাগ্য প্রায় মঙ্গলপ্রদ নহে।"

জ্ঞান কেবল সন্দেহ করে আর প্রশ্ন করে, তাহার সংশয় কখন দূর করা যায় না—বিশেষতঃ জ্ঞান অহঙ্কারবিজৃম্ভিত। "আমি বুঝিয়াছি, আমি বুঝি, আমি অমুক সত্য আবিষ্কৃত করিয়াছি।" ইত্যাদি জ্ঞানের উক্তি থাকিতে এবং সংশয় ও প্রশ্ন থাকিতে ঈশ্বরস্ফূর্ত্তি হয় না। অতএব ভক্তের পক্ষে জ্ঞান মঙ্গলপ্রদ নহে। বিশেষতঃ—

"যৎ কর্ম্মভি র্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥ ৩২
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্যদি বাঞ্ছতি॥"

ভাগবত। ১১। ২১। ৩৩

"কর্ম্ম দ্বারা, তপস্যা দ্বারা, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য দ্বারা, যোগ দ্বারা দান ধর্ম্ম দ্বারা এবং অপর মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান দ্বারা যে ফল লাভ হয়, আমার ভক্ত আমার ভক্তিযোগ দ্বারা অতি সহজে তাহা প্রাপ্ত হয়।—তাহারা চাহে না, কিন্তু যদি কোন কারণে চায়, তবে স্বর্গ অপবর্গ (মোক্ষ) এবং আমার লোকে অবস্থিতিও প্রাপ্ত হয়।" ভক্তির গৌরব এত উচ্চ, বস্তুতই জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তি গৌরবের বস্তু বটে, তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। তার পর জ্ঞান ও কর্ম্মের বিরোধ কেন, তাহা শোন। জ্ঞান এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বকে ভ্রান্তিদৃশ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করে, কর্ম্ম সেই নশ্বর কল্পিত বিশ্বের দ্রব্যসম্ভূত, এবং নশ্বর শরীরাদি দ্বারা সাধ্য ও শরীরাদিরই হিতজনক। এই জন্য জ্ঞানীবর্গ কর্ম্মকে উপেক্ষা করেন যথা——

"প্রায়েণ মনুয়ো রাজন্ নিবৃত্তা বিধিষেধতঃ।
নৈর্গুণ্যস্থা রমন্তেস্ম গুণানুকথনে হরেঃ॥

ভাগবত। ২। ১। ৭

"মুনিগণ প্রায়শঃ বেদবিহিত বিধি এবং নিষেধ হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া নির্গুণ পরব্রহ্মে—প্রতিষ্ঠিত হইয়া হরিগুণানুকথনে রমণ করিতেন।"

বেদবিহিত বিধি নিষেধের নিন্দা আছে, যথা—

"ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগ-ক্ষেম আত্মবান্॥"

গীতা। ২। ৪৫

"বেদ কেবল ফলবাদ পূর্ণ, ফলবাদ সত্ত্বরজঃ তমো গুণের বিষয়। অতএব নিস্ত্রৈগুণ্য হও, অর্থাৎ গুণাতীত হও; ফলকথা অকামী হও। কিরূপে? ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক শীতোষ্ণ সুখ দুঃখ প্রভৃতি দ্বারা অনাক্রান্ত হইয়া। তাহা কিরূপে? নির্যোগ-ক্ষেম, অর্থাৎ যাহা পাও নাই তাহার আশা করিও না, যাহা পাইয়াছ তাহারও পোষণ করিও না এইরূপে। এই জন্য বলা হইয়াছে—

"ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্মপ্রাহুর্মনীষিণঃ।"

গীতা। ১৮। ৩

কোন কোন জ্ঞানী সম্প্রদায় বলেন যে কর্ম্মকে দোষের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। কেন পরিত্যাগ করিবে?

"সর্ব্বারম্ভাহি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।"

গীতা। ১৮। ৪৮

"সমুদয় আরম্ভই দোষ দ্বারা আবৃত। অগ্নি যেমন ধূমাবৃত সেইরূপ, অর্থাৎ অগ্নি ধূমশূন্য নাই, কর্ম্মও দোষশূন্য নাই—অতএব কর্ম্মত্যাজ্য।"

জ্ঞানীগণ কর্ম্মকে এইরূপে নিন্দার সহিত পরিত্যাগ করেন। কিন্তু কর্ম্মীরা বলেন—

"নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥"

গীতা। ১৮। ১১

"শরীরী হইয়া কখন সর্ব্বতোভাবে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি কর্ম্ম করে, কিন্তু ফল কামনা করে না, সেই যথার্থ ত্যাগী।"

"নিয়তং কুরু কর্ম্মত্বং কর্ম্মজ্যায়োহ্যকর্ম্মণঃ।
শরীর-যাত্রাপি চ তে ন প্রসিদ্ধেদকর্ম্মণঃ॥"

গীতা। ৩। ৮

"নিয়ত কর্ম্ম সকল কর, অকর্ম্ম হইতে কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ। কেন না কর্ম্মশূন্য হইলে তোমার শরীরযাত্রাও নির্ব্বাহ হইতে পারে না। যদি আপন শরীরের জন্য কর্ম্ম কর তবে অন্যের জন্য কেন করিবে না?"

যোগ ভক্তি জ্ঞান ও কর্ম্মের সঙ্গে বিবাদ কিরূপ তাহা প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে নববিধান কিরূপে এই বিবাদ দূর করিয়া পরস্পরে মিলন করাইয়া দিয়াছেন তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

বিবাদ প্রদর্শনের সময়ে যেমন ভক্তি প্রভৃতির স্বরূপ প্রদর্শন করা অগ্রে প্রয়োজন হইয়াছিল, মীমাংসার সময়েও তাহাই প্রয়োজন, অতএব আমরা যোগ স্বরূপের এখানে পুনরাবৃত্তি করিতেছি। অচেতন হইতে চেতনে, অজ্ঞান হইতে জ্ঞানে, আবির্ভাব হইতে ভাবে, অসৎ হইতে সতে, অনাত্মা হইতে আত্মাতে, মৃত্যু হইতে জীবনে উত্থিত ও মিলিত হইবার নাম যোগ।

মনঃ স্ববুদ্ধ্যা মলয়া নিয়ম্য
ক্ষেত্রজ্ঞ এতাং নিলয়েত্তমাত্মনি।
আত্মানমাত্মন্যবরুধ্য ধীরো
লব্ধোপশান্তি র্বিরমেত কৃত্যাৎ॥

ভাগবত। ২

প্রথমতঃ বুদ্ধিকে নির্ম্মল করা আবশ্যক, পরে সেই নির্ম্মল বুদ্ধি দ্বারা মনকে নিয়মিত করিয়া, সেই বুদ্ধিকে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ শরীরাভিমানী আত্মাতে নিলয় করিবেক,

আবার সেই শরীরাভিমানী ক্ষেত্রজ্ঞকে কেবলাত্মাতে (শরীরাভিমানশূন্য আত্মাতে) নিলয় করিবেক। পরে সেই কেবলাত্মাকে পরমাত্মাতে অবরুদ্ধ করিয়া উপশান্তি লাভ করিয়া কৃত্য (কর্ম্ম) হইতে বিরত হইবেক। এইটি প্রকৃত যোগের লক্ষণ।

কোচবিহারে নববিধান—মন্দিরপ্রতিষ্ঠা।

এত দিনে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। ভক্ত কেশবচন্দ্র অশ্রুপাত করিয়া কোচবিহারে যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, ঈশ্বর কৃপায় তাহা অঙ্কুরিত হইয়া বৃক্ষে পরিণত হইল, এইক্ষণ সর্ব্বসাধারণে তাহার ফল ভোগ করিতে পারিবেন। ভক্ত ঈশ্বরাদেশে তাঁহা কর্তৃক চালিত হইয়া যে সদানুষ্ঠান করিয়াছেন তাহা কখন বিফল হইবার নহে, কেবল দুঃখের বিষয় এই যে তিনি দেহাবস্থিত হইয়া কোচবিহারে ভগবানের বর্ত্তমান লীলা দেখিতে পারিলেন না।

কোচবিহারাধিপতি শ্রীমন্মহারাজা নৃপেন্দ্র নারয়ণ ভূপ বাহাদুর ইংলণ্ড গমনের কয়েক মাস পূর্ব্বে স্বহস্তে কোচবিহার রাজধানীতে ব্রহ্মমন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন। একবৎসরের মধ্যে সুরম্য মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। মন্দিরটী ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু চূড়া বিশিষ্ট অতিশয় রমণীয় হইয়াছে। এইরূপ মনোহর ব্রহ্মমন্দির কোথাও দৃষ্ট হয় না। জৈন ও হিন্দু মন্দিরের ভাব অনেক পরিমাণে তাহাতে প্রকাশ পায়। সম্মুখস্থ গাড়িবারণ্ডার উপর বৃহৎ চূড়া স্থাপিত হইয়াছে, তাহার দুইপার্শ্বে ইংরেজি ও বঙ্গভাষায় নববিধানাঙ্কিত ধাতুময়ী বিচিত্র পতাকা উড্ডীয়মান। মন্দিরের অভ্যন্তরে ঘন সন্নিবিষ্ট ভাবে তিন শতেরও অধিক লোক বসিতে পারে। বেদীর উভয় পার্শ্বে স্ত্রীলোকের বসিবার জন্য সুন্দর গ্যালারি এবং গাড়িবারাণ্ডার উপরে নির্জন সাধনের উপযোগী একটি নিভৃত প্রকোষ্ঠ স্থাপিত আছে। মহারাজের ইঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ মজুমদার কর্তৃক এই সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, এই মন্দির নির্ম্মাণে কেদার বাবুর বিশেষ নৈপুণ্য ও ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে, আমরা এ জন্য তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি।

বিগত ৭ই বৈশাখ বুধবার পূর্ব্বাহ্নে ৮ টার সময় মন্দির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। মহারাজের নিমন্ত্রণানুসারে কলিকাতা হইতে ভাই গৌরগোবিন্দ রায়, ভাই ত্রৈলক্যনাথ সান্ন্যাল, ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু, ভাই রামচন্দ্র সিংহ, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত, এই ছয় জন নববিধানপ্রচারক এবং আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন এবং তাঁহার প্রথম পুত্র ও আচার্য্যদেবের পুত্র শ্রীমান্ করুণাচন্দ্র সেন এবং শ্রীমান্ প্রফুল্লচন্দ্র সেন প্রতিষ্ঠা কার্য্যের দুই দিন পূর্ব্বে কোচবিহারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহাঁরা সকলেই মহারাজের সাদর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই উৎসব উপলক্ষে নবমন্দির ও তাহার বিস্তৃত বহিরঙ্গন পুষ্প পল্লব ও পতাকামালাতে অলঙ্কৃত হইয়াছিল। বুধবার দিন যথাসময়ে বিজ্ঞাপনানুসারে নগরস্থ ভদ্রলোক সকল মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইলেন মহারাজ দেশীয়ভাবে ধুতি চাদর পরিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে সপারিষদ পদব্রজে উপনীত হন। মহারাজ দ্বারে সমাগত হইলে পর, ভাই গৌরগোবিন্দ রায় একটি প্রার্থনা করেন, তৎপর তএত্য নববিধান সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেনের প্রার্থনা মতে মহারাজ স্বহস্তে মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করেন। তৎক্ষণাৎ সকলে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট হন। তখন সঙ্গীত প্রচারক ভাই ত্রৈলোক্য নাথ সান্যাল কর্তৃক এই নব সঙ্গীতটী গীত হয়।

রাগিণী আলেয়া, তাল কাওয়ালি।

জয় জয় দয়াময় ভবভয় বারণ, সিদ্ধিদাতা ভগবান্ আনন্দে সকলে আজি করি তব জয় গান।

ধন্য ধন্য দেব মহিমা তোমার, করি প্রণিপাত ও পদে বার বার, বিপদ আঁধার করিয়া সংহার রাখিলে ভক্তের মান।

রাজরাজেশ্বর, বিশ্ববিজয়ী প্রভু, মহান্ অনন্ত তুমি সর্ব্বশক্তিমান্; পূর্ণ হল তব মঙ্গল বিধান, উড়িল কোচবিহারে নববিধান নিশান।"

সঙ্গীতের পর মহারাজ দণ্ডায়মান হইয়া ইংরাজিভাষায় নিম্ন লিখিত প্রতিষ্ঠাপত্র পাঠ করেন।

অদ্য শতাধিক অষ্টাদশ শত শকাব্দে সপ্তম বৈশাখে, বুধবাসরে এতদ্দ্বারা আমি কোচবিহারাধিপতি শ্রীনৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাপন করিতেছি যে, এই গৃহ কোচবিহার নববিধান মন্দির নামে আখ্যাত হইল।

অদ্য ঈশ্বরপ্রসাদে নববিধান বিশ্বাসীদিগের ব্যবহারার্থ এই গৃহে সামাজিক উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রতি দিন অন্ততঃ প্রতি সপ্তাহে এই গৃহে একমাত্র অদ্বিতীয় পূর্ণ অনন্ত সর্ব্বস্রষ্টা সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বমঙ্গলময় ও পবিত্র ঈশ্বরের উপাসনা হইবে। এখানে কোন সৃষ্টবস্তুর আরাধনা হইবে না। কোন মনুষ্য বা সৃষ্টজীব বা জড় পদার্থ ঈশ্বরজ্ঞানে বা ঈশ্বরের সমানজ্ঞানে বা ঈশ্বরের অবতার জ্ঞানে এখানে পূজিত হইবে না, এবং ঈশ্বর ভিন্ন ঈশ্বরজ্ঞানে আর কাহার নিকটে অথবা কাহার নামে প্রার্থনা স্তব বা সঙ্গীত হইবে না। পৌত্তলিকতাব্যঞ্জক কোন খোদিত বা চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি অথবা কোন বাহ্যিক চিহ্ন যাহা সম্প্রদায় বিশেষে পূজার্থ বা কোন বিশেষ ঘটনা স্মরণার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইবে তাহা এখানে রক্ষিত হইবে না। এখানে আহার পান ও কোন প্রকার আমোদ হইবে না। এই গৃহে কোন জীবের প্রাণ বধ করা হইবে

না। এখানে যে উপাসনা হইবে তাহাতে কোন সৃষ্টজীব বা পদার্থ যাহা সম্প্রদায় বিশেষে পূজিত হইয়াছে বা হইবে তাহার প্রতি বিদ্রূপ বা অবমাননা করা হইবে না। কোন বিশেষ পুস্তক এখানে ঈশ্বরপ্রণীত ও অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকৃত ও সমাদৃত হইবে না। কোন সম্প্রদায়কে নিন্দা উপহাস বা বিদ্বেষ করা হইবে না। এখানকার কোন স্তোত্র প্রার্থনা সঙ্গীত উপদেশ বা ব্যাখ্যানে কোন প্রকার পৌত্তলিকতা বা পাপের অনুমোদন ও তৎপ্রতি উৎসাহদান হইবে না। যদ্দ্বারা সকল নরনারী জাতি বর্ণ ও অবস্থা নির্ব্বিশেষে এক পরিবারে আবদ্ধ হইতে পারেন এবং উদার ও পবিত্র নববিধান ধর্ম্মের সাহায্যে সকল প্রকার ভ্রম ও পাপ পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞান ভক্তি ও সাধুতাতে উন্নত হইতে পারেন এমন ভাবে ও প্রণালীতে এখানে উপাসনা হইবে। কোচবিহার নববিধান মন্দিরের উপাসকেরা আপনাদের ও সকলের মঙ্গল উদ্দেশে উল্লিখিত নিয়ম অনুসারে উপাসনা করিবেন।" শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ইংরাজিতে মহারাজ প্রতিষ্ঠাপত্র পাঠ করিলে পর ভাই গিরিশচন্দ্র সেন পারস্য ভাষায় তাহার অনুবাদ, তৎপর ভাই গৌরগোবিন্দ রায় সংস্কৃতানুবাদ, অবশেষে ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল বঙ্গভাষায় পাঠ করেন। অনন্তর ভাই গৌরগোবিন্দ রায় বেদীতে বসিয়া উপাসনা করিতে থাকেন। নববিধানের সার্ব্বভৌমিকতা বিষয়ে উপদেশ দান করেন। প্রার্থনা ও সঙ্গীতান্তে তখনকার কার্য্য সমাপ্ত হয়। মহারাজার ইউরোপীয় ও দেশীয় সমুদায় প্রধান কর্ম্মচারী উপস্থিত ছিলেন। আচার্য্যদেবের দ্বিতীয়া কন্যা এবং রাজমাতা ও অন্য কয়েকটি মহিলা গ্যালারিতে যবনিকার অন্তরালে ছিলেন। দুঃখের বিষয়, বিশেষ প্রতিবন্ধকবশতঃ মহারাণী এই আনন্দ উৎসবে কোচবিহারে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তিনি কলিকাতায় স্থিতি করিতেছেন। তাঁহার অনুপস্থিতিতে একটি বিশেষ অভাব বোধ হইল। অপরাহ্ণ ৩ টার সময় মন্দিরপ্রাঙ্গণে প্রায় ১২। ১৩ শত কাঙ্গালীকে পয়সা ও তণ্ডুল এবং পাঁচ শত লোককে বস্ত্র দান করা হইয়াছিল। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে তথা হইতে নগর সংকীর্ত্তন বাহির হয়। আচার্য্যদেবের প্রথম পুত্র আপন স্কন্ধে মৃদঙ্গ এবং মহারাজের ২। ৩ জন প্রধান কর্ম্মচারী স্বহস্তে পতাকা ধারণ করিয়া শূন্যপদে সংকীর্ত্তনদলের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া ছিলেন। নগরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে প্রমত্তভাবে কীর্ত্তন করিয়া সাগর দীঘির বাঁধা ঘাটে সকলে সমবেত হন। সেখানে ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল, ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু এবং ভাই রামচন্দ্র সিংহ ক্রমশঃ বক্তৃতা করেন। রাত্রিতে প্রাসাদে মহারাজা কলিকাতা হইতে সমাগত প্রেরিতবর্গ ও কুটুম্বগণকে সঙ্গে করিয়া ভোজনামোদ করিয়াছেন। পর দিন মধ্যাহ্নে আচার্য্যদেবের দ্বিতীয় জামাতা অত্রত্য এসিষ্টাণ্ট জজ শ্রীযুক্ত কুমার গজেন্দ্রনারায়ণের গৃহে, রাত্রিতে দেওয়ান কালিকাদাস দত্ত মহাশয়ের ভবনে নিমন্ত্রিত হইয়া প্রচারক ও আচার্য্যের ভ্রাতা ও পুত্রগণ উপাসনা ও ভোজন করেন। মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসব উপলক্ষে সোমবার রাত্রিতে সুরাপান নিবারিণী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন ইংরাজি ভাষায় অত্যুৎকৃষ্ট বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মহারাজ যুবকছাত্রদিগকে সম্মুখে ডাকিয়া আনিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করান।

সংবাদ।

ভাই গৌরগোবিন্দ রায় কোচবিহারে প্রচার ও তত্রস্থ মন্দিরের উপাসনা কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য আপাততঃ তথায় স্থিতি করিলেন।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কোচবিহার হইতে কুড়িগ্রাম গমন করেন। তথাকার কোন বন্ধুর পত্র হইতে তাঁহার কার্য্যবিবরণ দেওয়া গেল।

"শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা গিরিশচন্দ্র সেন এখানে আসিয়াছিলেন। গত শনিবার মধ্যাহ্নে এখানে পৌঁছিয়া সন্ধ্যার সময় আলোচনা করেন। রবিবার প্রাতে স্কুল গৃহে ছাত্রসভার ত্রৈমাসিক উৎসব উপলক্ষে বক্তৃতা করেন। অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকার সময় থিয়েটার গৃহে "ধর্ম্মই জীবন" এই বিষয় বক্তৃতা করেন ও সায়ংকালে সমাজে উপাসনা হয়। কল্য প্রাতে শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় সহ আসাম যাত্রা করিয়াছেন।"

ভাই রামচন্দ্র সিংহ কুচবিহার হইতে প্রত্যাগমন কালে রংপুরে দুই দিন কাল অবস্থিতি করিয়া তথাকার মন্দিরের উপাসনা কার্য্য গত রবিবারে সম্পাদন করিয়াছেন।

রংপুর পরিত্যাগ করিয়া ভাই রামচন্দ্র দিনাজপুরে গমন করেন। তথায় বন্ধুদিগের অনুরোধে দুই দিন কাল অবস্থিতি করেন। ১২ই বৈশাখ সোমবার সন্ধ্যার সময় জজ শ্রীযুক্ত বাবু বরদাপ্রসন্ন সোম মহাশয়ের ভবনে উপাসনা করেন। উপাসনা স্থলে কয়েকটি ভদ্রমহিলা উপস্থিত ছিলেন। তৎপর দিবস মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় উক্ত জজ বাবুর প্রাঙ্গণে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা স্থলে কতিপয় উকীল মহাশয়েরা এবং কোন কোন ভদ্রমহিলা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত থাকিয়া বক্তৃতা শ্রবণ করেন।

ভাই প্রতাপচন্দ্রকে শ্রীদরবার হইতে যে পত্র লেখা হইয়াছিল তাহার উত্তর তিনি তাঁহার ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, এবং শ্রীদরবারের সম্পাদকের নিকট বাঙ্গালাতে ঐ পত্রের অনুলিপি পাঠাইয়াছেন। পত্র

খানি পূর্ব্বেই প্রকাশ হইয়াছে বলিয়া আমরা আর তাহা পত্রস্থ করিলাম না। শ্রীদরবার শ্রদ্ধেয় ভাইয়ের পত্র পাঠে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, তাঁহার প্রতি অপরাপর প্রচারকদিগের অত্যন্ত ঘৃণা বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস। তিনি যে কোন কার্য্য করেন তাঁহাদের সকলের তাহাতে আপত্তি ও বিরোধ হয়। আমাদের ভ্রাতার অন্তর যে তাঁহার ভ্রাতাদিগের বিরুদ্ধে আজও এমন অন্যায় নিষ্ঠুর সন্দেহ সকল পোষণ করিতে পারে ইহাই অত্যন্ত বিস্ময়ের বা[illegible] এত দিন সাধন ভজন ও একত্র বাসের পরও তিনি কি আপনার সহোদর অপেক্ষা আত্মীয় ভাইদিগকে চিনিতে পারিলেন না? এত গুলি তাঁহার সমবিশ্বাসী ভ্রাতা যাঁহাদের মধ্যে অনেকে পবিত্র চরিত্রের জন্য লোকের নিকট শ্রদ্ধেয়, সকলে একত্র হইয়া যে, ভাই প্রতাপচন্দ্রের বিরুদ্ধে উক্তরূপ নীচভাব পোষণ করিবে তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। বিধানমণ্ডলীর এবং আমাদের সকলের মঙ্গলের জন্য ভ্রাতাদের কর্ত্তৃক অল্প একটু শক্ত কথাও কি তিনি সহ্য করা আবশ্যক মনে করেন না? এই সে দিন মঙ্গলগঞ্জে তিনি স্পষ্ট সকলের সম্মুখে বলিয়াছিলেন, "আমরা সকলে একত্র সম্মিলিত হইলে যে এক অপূর্ব্ব সুখ লাভ করা যায়, এমন আর কোথাও নয়। সকলের সম্মিলনেই আমাদের প্রকৃত সুখ। আমরা একত্র হইয়া কার্য্য করিলে কে আমাদের বিপক্ষে কোন কথা বলিতে সাহস করিবে?" আমরা আমাদের ভাইকে "কে আপন কে পর" চিনিয়া লইতে বার বার অনুরোধ করিতেছি। আমরা হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করি, আমাদের মধ্যে কেহ বিধাতা কর্ত্তৃক নিয়োজিত দল পরিত্যাগ করিয়া কি পৃথিবীতে কি স্বর্গে কোথায়ও প্রকৃত সুখ শান্তি পাইবেন না, নববিধান বিধাতার এই বিধি।

ভাই অমৃতলাল এবং ভাই নন্দলাল কাঁথি ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে গমন করিয়াছিলেন। তথা হইতে আসিবার সময় ভাই নন্দলাল এক দিবস তমলুকে নববিধান প্রচার করিয়াছেন।

বালেশ্বর ব্রাহ্মসমাজের শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণচন্দ্র পাণ্ডা প্রচারক ব্রত গ্রহণ করিবার জন্য শ্রীদরবারের আবেদন করায় শ্রীদরবার তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য করিয়া নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে তাঁহাকে প্রবেশার্থীর পদে থাকিতে পত্র লিখিয়াছেন।

মহামান্যা শ্রীশ্রীমতী কুচবিহারের মহারাণী প্রচারক পরিবারগণের ভরণপোষণ জন্য তাঁহার মাসিক দান দশ টাকা আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন। পূর্ব্বে ইহা ২০৲ টাকা ছিল, বর্ত্তমান মাস হইতে ৩০ টাকা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার এই অযাচিত দানের জন্য আমরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। পরিবারগণের বস্ত্রের জন্য মধ্যে মধ্যে বড়ই কষ্ট পাইতে হইত, ভরসা করি, শ্রীমতী মহারাণীর বদান্যতাতে সে অভাব অনেক পরিমাণে পূর্ণ হইবে। "দাতা দিতেছেন, গ্রহিতারা পরিশ্রান্ত হইতেছে।"

কুচবিহারে বিধানমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কুচবিহারাধিপতি প্রেরিত দরবারের ১৮ জন সভ্যকে প্রায় ২০০৲দুই শত টাকার মূল্যের বস্ত্র, বিনামা, ছাতি ও তৈজস প্রদান করিয়াছেন।

দয়ালু গ্রাহকগণকে আমার ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকার বর্ত্তমান শকের অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি। বিদেশস্থ গ্রাহকগণের জন্য পত্রিকার অগ্রিম বাৎসরিক মূল্য ৩৲ তিনটাকা, পত্রিকার উপরিভাগে এইরূপ লেখা আছে। দুঃখের বিষয় অধিকাংশ গ্রাহক মহোদয় সে লেখাটি না দেখিয়া মূল্য পাঠাইতে শিথিলতা করিয়া থাকেন। এই শিথিলতার দোষেই আমরা বিশেষ কষ্টের সহিত জানাইতেছি অনেক গুলি গ্রাহকের নিকট দুই তিন বৎসরেরও অধিক মূল্য বাঁকি পড়িয়াছে। ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকার গ্রাহকগণের মধ্যে এরূপ শিথিলতা নিতান্ত দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে।

আমাদিগকে ঋণ হইতে মুক্তিপ্রদান জন্য যে সকল দয়াবান বন্ধু আমাদের সংগীত পুস্তক বিক্রয় করিয়া দিয়া সাহায্য করিতেছেন, আমরা অন্তরের সহিত তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

প্রেরিত।

শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

গয়া ব্রাহ্মসমাজের দ্বাবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব নিম্নলিখিত প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

উৎসব উপলক্ষে শ্রদ্ধাস্পদ ভাই দীননাথ মজুমদার ২৯ শে মার্চ রাত্রিতে এখানে আগমন করেন।

৩০ মার্চ শুক্রবার সায়ংকালে এখানকার ব্রাহ্মগণ একটি ব্রাহ্মবন্ধুর বাটীতে সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া চক, ধামিটোলা, মুরারপুর হইয়া পিপরপাঁতি সমাজ গৃহ পর্য্যন্ত গমন করেন। পথিমধ্যে চকের চৌমাথায় ন্যূনাধিক ২ সহস্র শ্রোতার সমক্ষে পার্থিব ধনজনের অস্থায়ীত্ব বিষয়ক উপদেশ হয়। তৎপর মুরারপুরে ঈশ্বরে প্রেম স্থাপন করা বিষয়ে উপদেশ হয়। শেষে সমাজগৃহে সংক্ষেপ উপাসনা ও উপদেশ হয়।

৩১শে মার্চ শনিবার প্রাতঃকালে গয়া চাঁপ স্কুলের ছাত্রগণকে নীতিউদ্দেশ দেওয়া হয়। সায়ংকালে শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর বসুর বাসায় কীর্ত্তন হয়।

১ লা এপ্রিল রবিবার ৮ টার সময় উপাসনা হয়। "যোগের গূঢ়তত্ত্ব" বিষয় উপদেশ হইয়াছিল। তাহা উপস্থিত সকলেরই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। অপরাহ্ন ৪॥ ঘটিকার সময় যোগতত্ত্ব বিষয় আলোচনা হইয়াছিল। তৎপর উপাসকদিগের স্ব স্ব প্রার্থনা হয়, সাড়ে পাঁচটা হইতে সাড়ে ছয়টা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তন তৎপরে উপাসনা হয়।

২ রা এপ্রিল সোমবার বুদ্ধ গয়ার তীর্থ যাত্রা। বুদ্ধমন্দিরে উপাসনা ইত্যাদি হয়।

৩ রা এপ্রিল মঙ্গলবার ব্রাহ্মিকা সমাজ।

৬ ই এপ্রিল একটি ব্রাহ্ম বন্ধুর বাটীতে সাংকালে সংকীর্ত্তন হয়। তথায় স্থানীয় মুনসেফ ও সদরালাগণ উপস্থিত ছিলেন।

গত উৎসবে আমরা আশাতীত ফল পাইয়াছি, মা আনন্দময়ী অদ্ভুতরূপে আনন্দ বর্ষণ করিয়া অবাক করিয়াছেন।

গয়া—
২২ শে এপ্রিল ১৮৮৮ } নিবেদক—
শ্রীব্রজগোপাল নিয়োগী

এই পত্রিকা ৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্।
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে।

২৩ ভাগ। ১ সংখ্যা। } ১লা জ্যৈষ্ঠ, রবিবার, ১৮১০ শক। { বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৷০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে বিশ্বাসীদিগের গৌরবের ধন! বিশ্বাসীদিগের গৌরব তুমি। বিদ্যা বুদ্ধি ধন সম্পদ সহায় ও সৌভাগ্য, বিশ্বাসিগণ এ সকলের গৌরব করে না। বিশ্বাসীর বিদ্যা বুদ্ধি ধন মান সকলই তুমি, তাই তাহারা তোমার গৌরব করে। তাহারা না বুঝিলে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু পৃথিবীর পাণ্ডিত্যাভিমানীর নিকটে সংশয় ছেদনের জন্য যায় না। অন্ন বস্ত্রের অভাব হইলেও কখন তোমার দ্বার ছাড়িয়া অন্যত্র যায় না। সহায় বা বন্ধুতার প্রয়োজন হইলে বিশ্বাসীরা তোমারই মুখের দিকে কাতরচিত্তে দৃষ্টিপাত করে, অন্যের মুখাপেক্ষা করে না। এই জন্য পৃথিবীর অভিমানী লোকেরা তোমার লোকদিগের প্রতি বিধিমতে নির্য্যাতন করিতে প্রবৃত্ত হয়। বিশ্বাসীরা তাহাতে কদাচ ভীত বা বিচলিত হয় না। কেন না, তাহারা যুক্তি তর্ক অনুমান উপমানের দাসত্ব করে না, তাহারা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষরূপে তোমাকে দেখে, তোমার কথা শুনিতে পায় তাহারা যুক্তির সহায়তা গ্রহণ করিতে যাইবে কিসের দুঃখে? এবং বুদ্ধির দাসদিগের আনুগত্য স্বীকার করিয়াই বা কেন চলিবে? পৃথিবীর সামান্য লোকেরা তোমায় দেখিতে পায় না, বুঝিতে পারে না, তোমার আজ্ঞা শুনিতে পায় না, তাই তাহারা বুদ্ধিকে ভালবাসে। বুদ্ধির সাহায্যে সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে চেষ্টা করে। তোমার বিশ্বাসীদিগকেও তাহারা তাহাদের সঙ্গী করিয়া লইতে চায়, বিশ্বাসিগণ তাহাদের কথায় কর্ণপাত করে না বলিয়া তাহারা বিশ্বাসীদিগের উপরে উৎপাত করিতে প্রবৃত্ত হয়। হে সত্য সুন্দর দেব! তুমি অবিশ্বাসীদিগকে বিশ্বাস চক্ষু দেও। এবার এই জন্যই, অবিশ্বাসী বা অল্পবিশ্বাসীদিগকে পূর্ণবিশ্বাসী করিবে বলিয়াইত নববিধান প্রকাশ করিয়াছ। তবে আর ইহাদিগের হৃদয়কে অন্ধকারে থাকিতে দেও কেন? তোমাকে যাহারা দেখে নাই, তাহাদিগকে দেখা দেও। তোমাকে দর্শন করিয়া বুদ্ধির অদৃঢ় আশ্রয় পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহারা তোমার আনুগত্য করিতে সাহসী হউক। যদি হে দীনবন্ধু! এই চক্ষুহীনদিগকে চক্ষু দেও, কর্ণহীনদিগকে কর্ণ দেও, তবে আর তাহারা তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধির দাসত্ব করিতে পারিবে না। তাহা হইলে তোমার বিশ্বাসের গৌরব পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে, হরি হে এই কৃপা কর।

দোষ আপনার ভিতরে।

আমাদিগের একটি প্রধান দুর্ব্বলতা এই যে, কোন বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইলে, আমরা বাহিরে তাহার কারণ অন্বেষণ করি, আমাদিগের ভিতরে যে সেই অকৃতার্থতার কারণ আছে, তাহা কখনই মনে করিয়া দেখি না। সংসারী বিষয়ী লোকদের এরূপ ভ্রম ক্ষমার যোগ্য, কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মের জন্য জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের এ সম্বন্ধে ভ্রম থাকা অত্যন্ত মারাত্মক। আত্মদৃষ্টি ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রথম সোপান। যে ব্যক্তি এই প্রথম সোপানেই আরোহণ করে নাই তাহার উচ্চ সোপানে আরোহণ কি প্রকারে সম্ভবে? যাঁহার আত্মদৃষ্টি আছে, তিনি অকৃতার্থতার কারণ অন্যত্র অন্বেষণ না করিয়া সর্ব্বাগ্রে আপনার ভিতরেই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন।

এ কথা কে অস্বীকার করিবে যে, মনুষ্যসমাজের গভীর দুরবস্থার সময়ে বিধানের সমাগম হইয়া থাকে। যে সময়ে ধর্ম্ম, নীতি, জ্ঞান, চরিত্র প্রভৃতির অতীব হীনাবস্থা সমুপস্থিত হয়, সেই সময়ে নূতন আলোক অবতরণ করিয়া লোকদিগকে চমৎকৃত করে এবং ভগবান্ যে পৃথিবীকে ইহার পাপ অপরাধের জন্য বিস্মৃত হন নাই, সকলকে বুঝাইয়া দেয়। এ সময়ে ধর্ম্মাদিসম্বন্ধে পৃথিবীর অবস্থা যদি হীন না হইবে, তাহা হইলে কেনই বা বিধানের সমাগম হইয়াছে। এই কারণেই লোকের অনাদর অসম্ভ্রমাদি অবলোকন করিয়া আমরা কখন একথা বলিতে পারি না যে, আমরা কেন ঈদৃশ জনসমাজের সেবায় নিযুক্ত হইলাম, যাহারা এমন নীচ বিষয়ে আসক্ত যে, ধর্ম্মের কোন প্রকার উচ্চ কথা শ্রবণ করিতে প্রস্তুত নয়, বরং তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই সকল লোকের বৈমুখ্য নিবারণ করিয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মের পথে, নীতির পথে, ঈশ্বরের দিকে আনিবার জন্য যখন আমরা নবধর্ম্মে দীক্ষিত, তখন আমাদিগকে কেবল এই দেখিতে হইবে, কি হইলে লোকদিগের বৈমুখ্য নিবারণ হইতে পারে।

এ অতি প্রাচীন কথা অথচ আমরা এ কথা স্মরণ রাখি না যে, বিষয়াসক্ত পৃথিবীর বিষয়াসক্তি দূর করিবার জন্য আমাদিগকে তীব্র বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। পৃথিবীর রোগ যে প্রকার গুরুতর, তাহার উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিতে না পারিলে কখন তাহার রোগাপনয়নের সম্ভাবনা নাই। পৃথিবী যে পরিমাণে ভোগেতে আসক্তিতে ডুবিবে, সেই পরিমাণে নবধর্ম্মে দীক্ষিত লোকদিগকে ভোগাসক্তি পরিহার করিতে হইবে। আমরা যদি অণুমাত্র বিষয়ের আকর্ষণে আকৃষ্ট হই, তাহা হইলে বিষয়িগণের পূর্ব্ব আসক্তি আরও শত গুণ বাড়িবে। কেন না তাহারা বলুক আর না বলুক গূঢ় ভাবে তাহাদিগের মনে এই প্রত্যয় জন্মিবে যে, এ সংসারে এমন কেহ নাই, যে ব্যক্তি বিষয়রসে রসিক নয়। এরূপ প্রত্যয় জন্মিলে সহস্র উচ্চ ধর্ম্মের কথা বলিলেও তাহাদিগের হৃদয় স্পর্শ করিবে না; কেন না তাহারা জানে, যাঁহারা উচ্চ ধর্ম্মের কথা বলিতেছেন, তাঁহারা কথায় যাহাই কেন বলুন না, কার্য্যতঃ তাহারাও যেরূপ তাঁহারাও সেইরূপ। সুতরাং এ সকল উচ্চ কথা শ্রবণ করিয়া লোকে যখন তৎপ্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে, তখন বুঝিতে হইবে যে, আমাদিগের বিষয়বিতৃষ্ণা এরূপ তীব্র হয় নাই, যাহাতে লোকে সশ্রদ্ধ আমাদিগের কথায় কর্ণপাত করিতে পারে।

যাঁহারা পৃথিবীকে ধর্ম্ম বিতরণ করিবেন বলিয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা আত্মজীবনের দায়িত্বের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখেন না বলিয়া ঘোর অনিষ্ট সাধিত হইয়া থাকে। তাঁহারা যদি সর্ব্বদা মনে রাখিতেন, পার্শ্ববর্ত্তী লোকেরা কেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহাদিগের আচার ব্যবহার কথা প্রভৃতি প্রতি লক্ষ্য করিয়া থাকে,

তাহা হইলে তাঁহাদিগের অনবধানতা অনেক দূর নিবারিত হইতে পারে। কিন্তু লোকে সাবধান হইয়া চলিতে পারে কি না, এ বিষয়ে আমারিগের গভীর সন্দেহ আছে। যাহা কিছু আমাদিগের স্বভাবে পরিণত হয় নাই, তাহা যত্ন করিয়াও সকল অবস্থায় আমরা ঠিক রাখিতে পারি না। মনে কর ধৈর্য্য অক্রোধ আমার স্বভাবসিদ্ধ হয় নাই; আমি যদি যত্ন করিয়া ধীরতা অবলম্বন করিতে যাই, অক্রোধিত্ব প্রদর্শন করিতে প্রয়াস করি, এমন অবস্থায় আমাকে সংসারে নিপতিত হইতে হয়, যাহাতে অজ্ঞাতসারে আমার অধীরতা ক্রোধ জনসমক্ষে প্রকাশ পাইয়া পড়ে। এইরূপ যদি ভিতরে ভিতরে বিষয়ের প্রতি আমার আসক্তি থাকে আমি কখন যত্ন করিয়া সে আসক্তি চাপিয়া রাখিতে পারি না। বহু যত্নে চাপিতে গেলেও উহা অবকাশ পাইয়া বাহির হইয়া পড়ে। যাহাদিগের বিষয়াসক্তি অপ্রচ্ছন্ন, বিষয়ী বলিয়া লোকের নিকটে পরিচিত, তাহাদিগের ব্যবহার জনসমাজের অকল্যাণ বর্দ্ধক নহে, কিন্তু যাহারা জগৎকে দেখাইতে চায়, আমরা বিষয়াসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছি, আমরা বৈরাগী, তাহাদিগের যদি অল্প পরিমাণেও আসক্তি প্রকাশ পায়, জনসমাজের সুবহু অকল্যাণ হয়। বৈরাগ্যাশ্রয়ী ব্যক্তিগণের মধ্যে আবার যাঁহারা জগতে ধর্ম্মবিতরণ করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অণু পরিমাণ বিষয়াসক্তি আরও সুমহৎ অমঙ্গলসাধক। যে সকল ব্যক্তি কেবল আপনার পরিত্রাণের জন্য বৈরাগ্যপথ আশ্রয় করিলেন, তাঁহাদিগের দায়িত্ব, এবং আপনার পরিত্রাণের সঙ্গে সঙ্গে যাঁহারা জনসমাজের পরিত্রাণকে গ্রথিত করিলেন, তাঁহাদিগের দায়িত্ব কখন সমান নহে। যখন বিধান সমাগত হয়, তখন বিধানবিশ্বাসিগণের এই জন্যই গুরুতর দায়িত্ব। তাঁহাদিগের পরিত্রাণ কেবল স্ব স্ব পরিত্রাণ নহে, তাঁহাদিগের পরিত্রাণের সঙ্গে সঙ্গে বিস্তীর্ণ জনসমাজের পরিত্রাণ আবদ্ধ রহিয়াছে। লোকে ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, এই জন্য তাঁহাদিগের অণুমাত্র দোষের প্রতিও ক্ষমার দৃষ্টিতে অবলোকন করে না।

এক বৈরাগ্যসম্বন্ধে আমরা যাহা বলিলাম, যোগ ভক্তি আদি সকল বিষয়েই এইরূপ বলা যাইতে পারে। লোকের যোগের প্রতি সমাদর আমাদিগের গভীর যোগিত্বের উপরে নির্ভর করে। আমরা যদি অযোগী হই, সমুদায় দিন আমাদিগের বিনা যোগে অতিবাহিত হয়, আমরা কি প্রকারে আশা করিতে পারি যে জনসমাজের ভিতরে যোগের অনুরাগ হইবে। যোগী ও অযোগীর জীবন চরিত্র দ্বারা বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমাতে আসক্তি প্রভৃতি যেমন পূর্ব্বে ছিল, এখনও তেমনি আছে, ইহা হইলে আমার যে যোগে প্রবেশ হয় নাই, ইহা প্রকাশ পাইতে আর অবশিষ্ট থাকে না। যোগ অদৃশ্য সামগ্রী। জনসমাজ অমুক ব্যক্তি যোগী না অযোগী ইহা কেবল চরিত্র দ্বারা বুঝিয়া লয়। সেই চরিত্র যদি হীন থাকিল, তাহা হইলে আমার যোগিত্ব কি প্রকারে সাধারণের বুদ্ধিগোচর হইবে? ভক্তির নিদর্শন বাহিরে অনেক প্রকারে প্রকাশ পাইতে পারে, কিন্তু সে সকল নিদর্শন যথার্থ কি না তাহারও পরিচায়ক চরিত্র। সুতরাং কি যোগ কি ভক্তি সর্ব্বত্র চরিত্র সর্ব্বপ্রধান। এই চরিত্র বৈরাগ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত, বৈরাগ্য তত্ত্বদর্শন ভিন্ন সমুপস্থিত হয় না, তত্ত্বদর্শনের মূলে আত্মজ্ঞান অবস্থিতি করিতেছে। এ জন্যই প্রথম সোপানে আত্মদৃষ্টি নিরন্তর সাধকের অতীব আদরের সামগ্রী।

আত্মদৃষ্টি নিয়ত প্রবল থাকিলে, আপনার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষসমূহের প্রতি উপেক্ষা জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না। স্থূলদোষ সহজে চক্ষে পড়ে সুতরাং এখানে অনবধানতা এক প্রকার অসম্ভব। যাঁহারা ধর্ম্মব্রতে ব্রতী তাঁহাদিগের অনিষ্ট এবং তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে অপর শত

শত লোকের অনিষ্ট এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ হইতে হইয়া থাকে। যদিও আত্মদৃষ্টি আত্মজ্ঞান হইতে উৎপন্ন এবং তত্ত্ববোধ হইতে বৈরাগ্য সমুপস্থিত হয়, তথাপি এ সমুদায়ের পরস্পরের এমনই ঘনিষ্ঠ যোগ, যে কোন্‌টি কাহার কারণ তাহা সূক্ষ্মরূপে নির্ণয় করিয়া উঠা সুকঠিন। অনেকে বৈরাগ্যকে আদি সোপানে রাখিয়াছেন, এরূপে রাখিবার বিশিষ্ট কারণও আছে, কেন না বৈরাগ্যে আত্মশুদ্ধি হয়, আত্মশুদ্ধিতে আত্মজ্ঞান নির্ম্মল হইয়া থাকে। বিষয়কলুষিতচিত্তে তত্ত্বজ্ঞান স্ফূর্ত্তি লাভ করে না। কিন্তু বৈরাগ্যকে মূলে দর্শন, দর্শনোচিত সন্দেহ নাই। কিন্তু আর এক দিকে আবার আত্মার অবস্থা ভাল করিয়া না বুঝিলে বিষয়ের সহিত অতি তুচ্ছ সম্পর্ক হৃদয়ে প্রতিভাত হয় না। তুচ্ছত্ব বোধ না জন্মিলেও বৈরাগ্য আসিতে পারে না। বৈরাগ্য ভিন্ন যোগাদির দাঁড়াইবার ভূমি হয় না। সুতরাং বৈরাগ্য ও আত্মজ্ঞান নিরন্তর প্রবল রাখিয়া আমরা নিত্য আত্মদোষানুসন্ধানে নিরত থাকিব এবং আমাদিগের অকৃতার্থতা দর্শন করিয়া বৈরাগ্য ও আত্মজ্ঞান ক্রমে বাড়াইতে থাকিব, ইহা আমাদিগের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

বিশ্বাস-দুর্জ্জয়।

বিশ্বাস দুর্জ্জয় অর্থাৎ বিশ্বাসকে কেহ পরাজিত করিতে পারে না। বিশ্বাসকে কেহ পরাজিত করিতে পারে না কেন? বিশ্বাসের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে সত্য সত্যই বিশ্বাসকে অপরাজিত বলিয়া বোধ হয়। কুমন্ত্রণাপরায়ণ লোকেরা যখন সক্রেটিসকে বিষ দেখাইয়া বিশ্বাসভ্রষ্ট করিতে চাহিয়াছিল তখন তিনি বলিয়াছিলেন "তোমরা যাও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে, আর আমি যাই জীবন বিসর্জ্জন করিতে, ইহার মধ্যে কাহার ভাগ্য ভাল তাহা ঈশ্বর জানেন"। যখন গালিলিও প্রচলিত তত্ত্ব সকলের বিরুদ্ধে নূতন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন রক্ষণশীল পুরাতন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইল, এবং রাজার সাহায্যে বৃদ্ধ গালিলিওকে কারারুদ্ধ করিয়া নানা প্রকারে নির্যাতন করিতে লাগিল। আর বলিল "তুমি এতকাল যে সকল মত প্রচার করিয়াছ সে সকল মিথ্যা এই কথা যদি স্বীকার কর মুক্তি পাইবে, নতুবা যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মৃত্যুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে।" বৃদ্ধ গালিলিও অনেক যন্ত্রণা সহ্য করিয়া পরিশেষে ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন এবং বলিলেন "ভাল আমি তোমাদিগের কথায় বলিতেছি আমার প্রচারিত মত সকল মিথ্যা" এই কথা বলিয়াই আবার বলিলেন "উঃ আমি কি করিলাম!! তুচ্ছ জীবনের জন্য সত্যের অপলাপ করিলাম? এই যে এখনও পৃথিবী ঘুরিতেছে আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি!! "এই বলিয়া তিন বলদর্পে মৃত্তিকাতে পদাঘাত করিলেন। মহাপুরুষ মুষা দেশভ্রষ্ট আশ্রয়ভ্রষ্ট হইয়া পথে পথে সমস্ত জীবন কাটাইলেন কেবল বিশ্বাসের জন্য। মহাপুরুষ ঈশা ভয়ানক যন্ত্রণাপ্রদ ক্রুশ যন্ত্রে আত্মদান করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন তথাপি বিশ্বাস হইতে বিচ্যুত হইলেন না। বিশ্বাস পরিত্যাগ করা সহজ হইলে ঈশা কিছু মৃদুভাবে ও পাপের সঙ্গে সন্ধি করিয়া কথা বলিতেন এবং আত্মরক্ষা, সম্মান ও সম্পদ রক্ষা করিতেন। মহাপুরুষ শাক্য যদি কিছু এদিক ওদিক করিয়া চলিতে পারিতেন, প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য তাঁহার হাতে থাকিত। সুখ সৌভাগ্যও থাকিত, এবং যেরূপ ইচ্ছা কাজও সেইরূপ করিতে পারিতেন। কিন্তু সরল বিশ্বাসীর পক্ষে প্রাণ দেওয়া যেমন সহজ, এক বিন্দু পরিমাণে বিশ্বাসের রেখা অতিক্রম করা সেরূপ সহজসাধ্য নহে।

বিশ্বাসী একদিন যাহা করেন, চিরজীবন তাহা করিতে বাধ্য। দুইদিন পাঁচদিন একরূপ,

তারপর অন্যরূপ করা কিম্বা বলা বিশ্বাসীর লক্ষণ নহে। বিশ্বাসীর বিশ্বাস সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল সুস্পষ্ট দৃশ্য। ইহা আপনি প্রকাশিত হইয়া অন্যকে প্রকাশ করে। বিশ্বাসের প্রদর্শন অতীব সত্য তাহাতে এক বিন্দুও ভ্রম প্রমাদ স্থান পায় না! তাই বিশ্বাসী এখন একরূপ তখন আর একরূপ করিতে পারে না। কেননা বিশ্বাসী স্বয়ং স্বচক্ষে যাহা দেখেন স্বকর্ণে যাহা শুনেন তাহাই তাহার বিশ্বাসের বিষয় সুতরাং সে আর তাহার অন্যথা করিতে পারে না কিন্তু প্রাণ দিতে পারে। সক্রেটিস যদি বিশ্বাস অপেক্ষা প্রাণের মমতা অধিক বুঝিতেন, প্রাণ রাখিয়া বিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে পারিতেন কিন্তু বিশ্বাসীর পক্ষে তাহা অসম্ভব ও অসাধ্য। বিশ্বাস নাই অথচ ধাৰ্ম্মিক ও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক এরূপ বস্তু অদ্ভুত ও নূতন। এর মত নূতন বস্তু পূর্ব্বে কখন শোনা যায় নাই। যে স্থলে কার্য্য সাধনের জন্য আজ একরূপ বাক্য, কাল আর একরূপ বাক্য প্রকাশ পায়, আজ একরূপ কার্য্য, কাল অন্য রূপ কার্য্য করা হয় সেই স্থানে বিশ্বাসের অভাব। অবিশ্বাসী যখন যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। বুদ্ধিমান্ লোকেরা বুদ্ধির প্রভাব গৌরব দেখাইতে পারে কিন্তু বিশ্বাসের গৌরব রক্ষা করিতে পারে না। কেন না সে যাহা বলে ও করে তাহা তাহার নিজের চেষ্টাকৃত ব্যাপার। ঈশ্বরের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক আছে ইহা সে মানে না। মানিলে অন্যথা করিতে পারিত না। ঈশ্বরের বল অনতিক্রমণীয়, ইহা বিশ্বাস করিলে তাহার অন্যথা করিবে কিরূপে? "ঈশ্বর বস্তু নিরাকার, আছেন বলিলেও বলিতে পারি, নাই বলিলেও বড় অধিক ক্ষতি হয় না" যে স্থলে এইরূপ ধারণা, সে স্থলে অনায়াসেই ব্যতিক্রম ঘটিতে দেখা যায়। যাহাদের ধারণা ইহার বিপরীত, কার্য্যও তাহাদের বিপরীত। তাঁহারা একদিন যাহা বলেন ও করেন, চিরকাল তাহাই বলেন ও করেন অন্যথা করিতে পারেন না। যে স্থলে বিশ্বাস আছে তাহার এই লক্ষণ, যে স্থলে বিশ্বাস নাই তাহার ঐ লক্ষণ, বিশ্বাসী চক্ষুষ্মান্ অবিশ্বাসী অন্ধ। বিশ্বাস দেখে শোনে ও বোঝে, স্বয়ং দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়া কার্য্য করে, তাই তাহার পরাজয় অসম্ভব। যেখানে লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য রাজত্ব করে সেখানে বিশ্বাস নাই।

কেহ বলিতে পারেন, যে বিশ্বাসী নহে, সে আর ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ে থাকিবে কেন? থাকিবে কেন তাহা ভগবান্ (আমরাও কিছু কিছু জানি কিন্তু প্রকাশ করিতে পারি না) জানেন কিন্তু ধার্ম্মিকদিগের মধ্যে, বিশ্বাসীদিগের মধ্যে অবিশ্বাসী মিথ্যাদৃষ্টিপরায়ণ লোকের অভ্যুদয় সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়। যদি তাহা না হইত, বিশ্বাসীদিগের মধ্যে অবিশ্বাসীর প্রবেশাধিকার যদি না থাকিত তবে ধর্ম্মরাজ্যে এত বিবাদ বিসংবাদ সংঘটিত হইতে পারিত না। কেন না বিশ্বাসে বিশ্বাসে বিবাদ নাই, বিবাদ হয় বিশ্বাসে আর অবিশ্বাসে। বিশ্বাসী বিশ্বাসকর্ত্তৃক পরিচালিত হন, বিশ্বাস কাহারও কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া কার্য্য করে না, বিশ্বাস স্বয়ং কর্ত্রী ও স্বাধীন। যে স্থানে বিশ্বাসকে মানুষের অধীনতা করিতে দেখা যায়, সে স্থানে বিশ্বাস নাই গিল্টী। মানুষ বিশ্বাসের অন্যথাচরণ করিতে না পারিয়া প্রাণ দিল সে মানুষ বিশ্বাসকে পরিচালিত করিবে কিরূপে? আমরা বলিতেছি বলিয়া নহে, জগৎ ইহার প্রমাণ, ইতিহাস ইহার প্রমাণ। একটি নহে দুইটি নহে, শত শত সহস্র সহস্র ঘটনা ইহা সপ্রমাণ করিতেছে। সুতরাং ছদ্মবেশ বিশ্বাসের নিকটে টিকিবে না, বিশ্বাস আত্মগোপন করিতে পারে না। বিশ্বাস সাহসী দুর্জ্জয় পরাক্রমী বীর। সে আত্মগোপন করিবে কেন? যাহার বিক্রম নাই, সাহস নাই, ভয়ে হৃদয় গুর্ গুর্ করে, সেই আত্মগোপন করে। বিশ্বাসের মৃত্যুভয় নাই বিশ্বাস দেবপ্রসাদে অমর। তবে কেন সে প্রচ্ছন্ন থাকিবে, তবে

কেন সে একরূপ হইয়া অন্যরূপ দেখাইবে? সে ভাণ করিবে কি জন্য? ভাণ করে কপটী, একরূপ হইয়া অন্যরূপ দেখায় ভীরু দুর্ব্বলেরা। বিশ্বব্যাপী বিষ্ণুর বিশ্বদর্শী সুদর্শন বিশ্বাসীর রক্ষক। তাঁহার আর ভয় কি? তাহাকে মারে কাহার সাধ্য?

সুদর্শনের দর্শনে যে রক্ষিত, সুদর্শনের বলে যে বলী, সুদর্শন প্রতিনিয়ত যাহাতে বলাধান করে, যাহাকে সমুদয় বিশ্বতত্ত্ব দেখাইয়া দেয় বুঝাইয়া দেয়, সে কেন ভয়ে পরাজয় স্বীকার করিবে? সে কেন ভ্রম প্রমাদে পতিত হইয়া বহুরূপী সাজিবে। সে ভীমের ন্যায় সবল ও দুর্জ্জয় পরাক্রমী। মৃত্যুর ভ্রূকুটি দেখিয়া বিশ্বাস ভীত হয় না। বিশ্বাস মৃত্যুকে পতঙ্গতুল্য মনে করিয়া স্থির ভাবে অবস্থিতি করে, কখন বিচলিত হয় না। যাঁহারা দিব্যরূপী বিশ্বাসকে চেনেন জানেন, তাঁহারা এই ভাবেই তাহাকে চেনেন ও জানেন, কিন্তু কখন বলহীন ভীরু বলিয়া জানেন না। বিশ্বাসকর্ত্তৃক রক্ষিত যে ব্যক্তি তাহারও বিনাশ নাই।

"প্রতি জানাসি কৌন্তেয়! ন মে ভক্তঃপ্রণশ্যতি।"

হে কৌন্তেয়! শত্রু সভাতে গমন করিয়া বাহ্বাস্ফোট করিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বল "আমার ভক্ত কখন বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।"

আমরাও বিশ্বাস করি, বিশ্বাসী কখন মরে না। যে মরে সে বিশ্বাসী নহে। কেন না বিশ্বাসী স্বর্গের সঙ্গে সংযুক্ত, স্বর্গের সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। স্বর্গই বিশ্বাসীর বল, স্বর্গ সহায়, স্বর্গে তাহার বাস, স্বর্গ হইতে অমৃত নিষ্যন্দিত হইয়া বিশ্বাসীকে সর্ব্বদা সিক্ত করিয়া রাখে, সে বিশ্বাসী মরিবে কিরূপে? তাই বলি বিশ্বাস দুর্জ্জয়।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

কোন একটি বিশেষ পুরুষকারের কার্য্যে প্রণতভাবে ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, তিনি এই উত্তর দেন, "আমি তোমার প্রার্থনা শ্রবণ করিলাম, আমি সাহায্যদানে কোন কালে বিমুখ নহি, কিন্তু তুমি আমার সাহায্যের কথা গণনায় আনিও না। যাও তোমার যত দূর করিবার কর, যখন কৃতকার্য্য হইবে, তখন দেখিতে পাইবে, আমি ভিতরে ভিতরে তোমায় কত সাহায্য দান করিয়াছি। আমি চাই আমার সন্তানগণ মুহূর্ত্তের জন্য শিথিলযত্ন না হয়। তুমি যত্ন কর বা না কর আমি সাহায্য করিব, এইরূপ আশ্বাস দিয়া আমি যে সন্তানকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিব, ইহা আমার মঙ্গলসঙ্কল্পে কখন সম্ভব নহে। আমার সাহায্য বিনা একটি তৃণও তুমি তুলিতে পার না, কিন্তু তৃণগাছটি তুলিবার জন্য তোমার ইচ্ছা চাই, তবে আমি তুলিতে সাহায্য করি।" সাধকের প্রতি ভগবানের এ উত্তর অতি-গভীর। এ উত্তর শুনিয়া আমরা সাহসী হইব, না নিরুৎ-সাহ হইব? আমরা বলি অত্যন্ত সাহসী হইব, এবং আমরা ঈশ্বরের পুত্রকন্যা ইহা এই উত্তরে ভাল করিয়া বুঝিয়া লইব। আমার প্রত্যেক অঙ্গচালনে আমার পিতা যেমন আমার সঙ্গে কার্য্য করেন, তেমনি তিনি আমার প্রত্যেক হৃদয় ও মানস পরিচালনে তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করেন, ইহা একান্ত আহ্লাদের সংবাদ। মাতা যেমন সন্তান হাঁটা শিখিতে পারে এ জন্য কেবল অঙ্গুলী সংস্পর্শ করিয়া থাকেন, অথচ সেই অঙ্গুলিস্পর্শই হাঁটার মূল তেমনি পরমমাতা আমাদিগকে আধ্যাত্মরাজ্যে পদ-নিক্ষেপ করিতে শিখাইবার জন্য আত্মার অঙ্গুলিস্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন, ইহা যখন জানিতে পাই, তখন সাহস উদ্যম, বল শত গুণ বর্দ্ধিত হয়। এই সময়ে আমরা বীরত্বের সহিত মহাত্মা বুদ্ধের সঙ্গে মিলিত হইয়া বলিতে পারি,

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ং প্রযাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্ল্লভাং
নৈবাসনাৎ কায় মতশ্চলিষ্যতি॥"

ঈশ্বরের আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়া, তিনি সর্ব্বদা আমা-দিগকে সাহায্য দান করিবেন, এবিষয়ে স্থির আস্থাবান্ হইয়া, আমরা ক্রমাম্বয়ে অগ্রসর হইতে থাকি, মুহূর্ত্তের জন্য যত্নে শৈথিল্য প্রকাশ না করি, ইহাই আমাদিগের সন্তানত্বের সমুচিত কার্য্য। আমরা জড়বৎ চেষ্টাশূন্য কোথায়, যেখানে ভগবানের অনুমোদন পাই নাই। আর যে কার্য্যে তিনি বলিলেন, "ইহাতে আমার অনুমোদন আছে, শিথিলযত্ন হইও না, তাহা হইলে দেখিবে, আমি তোমায় কেমন প্রতিপদে সাহায্য দান করিয়াছি," সে কার্য্যে বিন্দুমাত্র শিথিলযত্ন হওয়া ভয়ঙ্কর অপরাধ। বিশ্বাসীর পক্ষে এত-দপেক্ষা গুরুতর অপরাধ আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা ভগবানের নিজমুখের উত্তরে মানুষের ক্রিয়া ও তাঁহার করুণার সামঞ্জস্য বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি, জীবনে যেন এই সামঞ্জস্যের কার্য্য নিত্য প্রকাশ পায়।

জ্ঞানী আর বিশ্বাসীদিগের মধ্যে বিবাদ চিরপ্রসিদ্ধ। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা বিশ্বাসীদিগকে "অজ্ঞ মূর্খ কুসংস্কারী ও পৌত্তলিক ইত্যাদি" উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন, বিশ্বাসীরাও জ্ঞানীদিগকে নাস্তিক, সন্দিগ্ধাত্মা ইত্যাদি উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিতে ভুলিয়া যান না। নববিধান ইহার মীমাংসা করিয়া দিবার নিমিত্ত অভ্যুদিত হইয়া যে মীমাংসা করিয়াছেন তাহা এই—জ্ঞান, অসত্য হইতে সত্যবস্তু, সারবস্তু বাহির করিয়া দেখাইয়া দেয় অর্থাৎ মিথ্যা অসার জগৎ হইতে পৃথক্ করিয়া সার সত্যধন ঈশ্বরকে দেখাইয়া দেয়, আর অন্ধবিশ্বাস অবিশ্বাস বা সন্দেহ হইতে যে ঈশ্বরবস্তুকে নিশ্চয় করিয়া নিঃসংশয়রূপে দেখাইয়া দেয় তাহা বিশ্বাস, সুতরাং জ্ঞানও যাহা করে বিশ্বাসও তাহাই করে। অতএব জ্ঞান ও যাঁর আলোক, বিশ্বাসও তাঁহারই নিশ্চয়তা। কাজেই বিশ্বাসে ও জ্ঞানে আর কোন বিবাদ থাকিতে পারিল না। এইরূপে নববিধান কর্ত্তৃক মীমাংসিত বিবাদ পুনর্ব্বার অবিশ্বাসের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া নূতন বেশে অভ্যুদিত হইয়াছে। নববিধানের মীমাংসাতে ভুল আছে বলিয়া সে সাহসপূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছে। সে বলে যে জ্ঞান কেবল সন্দেহ করিবে, কেবল প্রশ্ন করিবে, অবিশ্বাস করিবে, আর বিচার করিবে, নতুবা তাহার পুষ্টি নাই উন্নতি নাই। সংশয় হইতে জ্ঞানের জন্ম, সে সংশয় ছাড়িলে, জ্ঞানের দাঁড়াইবার স্থান থাকে না। অতএব বিশ্বাসের সঙ্গে জ্ঞানের মিলন হইতে পারে না। কেন না বিশ্বাস অর্থে একটী বিষয়কে অবিচারিত ভাবে মানিয়া লওয়া,—বিচার স্থলে এ বিশ্বাসকে কোনক্রমে স্থির রাখা যায় না, সুতরাং জানা যাইতেছে যে বিশ্বাস অন্ধতমিশ্রসম্ভূত। এই তিমিরাত্মক বিশ্বাসের সঙ্গে চক্ষুষ্মান্ জ্ঞানকে মিলাইতে চেষ্টা করা একপ্রকার উন্মত্তচেষ্টা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এইরূপ সিদ্ধান্তের উপরেও নববিধান বলিতেছেন, বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ বস্তু বলিয়া তাহাকে সপ্রমাণ করা যায় না, কিন্তু মানিয়া লইতে হয়, তাই বলিয়া বিশ্বাস অবস্তু নহে। পণ্ডিত! তুমি ক্ষেত্রতত্ত্ব কসিয়াছ—তাই তুমি মনে করিতেছ রেখা ও বিন্দু যেমন কোন বস্তু নয়, ওটা কল্পনা, সেই প্রকার বিশ্বাসও কল্পিত বস্তু। যদি এই দৃষ্টান্তই প্রবল রাখিতে চাও ক্ষতি নাই। মনে কর, রেখা ও বিন্দু না মানিলে তুমি ক্ষেত্রতত্ত্বের ভিতরে এক পদও অগ্রসর হইতে পার না। সুতরাং রেখা ও বিন্দু না মানিলে চলে না বলিয়া রেখা ও বিন্দু মানিতে বাধ্য হইতেছ—সেই প্রকার বিশ্বাস না মানিলে আশ্বাস নাই—ধর্ম্মজগতে একপদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই। অতএব বিন্দু ও রেখার ন্যায় বিশ্বাস ও বস্তু, অবস্তু নহে। তুমি মানিলেও পার, না মানিলেও পার, কেবল অনুগ্রহ করিয়া মানিতেছ এরূপ নহে, কিন্তু না মানিলে চলে না তাই মানিতে হইবে। আর জ্ঞান যতক্ষণ সংশয়ী থাকিবে ততক্ষণ তাহার নাম জ্ঞান নহে, সংশয়। যত ক্ষণ নিঃসংশয় না হইতে পারিবে, ততক্ষণ জ্ঞান, জ্ঞান নামে পরিচিত হইতে পারিবে না, নিঃসংশয় হইলেই জ্ঞানের সঙ্গে বিশ্বাস মিলিয়া যাইবে। তোমার সন্দেহ তোমারই থাকিবে।

আচার্য্যের উপদেশ।

রবিবার, ৬ই আশ্বিন, ১৮০১ শক।

[অঙ্গীকৃত দেশ।]

প্রাচীন কালের ইতিহাসে কথিত আছে স্বয়ং ভগবান্ পরমেশ্বর য়িহুদী জাতির হস্ত ধারণ করিয়া অনেক অন্ধকার উত্তীর্ণ করিয়া অবশেষে তাহাদিগকে তাঁহার অঙ্গীকৃত দেশে স্থান দান করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও আমরা দেখিতেছি ঈশ্বর চিহ্নিত আর্য্যজাতি স্বয়ং ভগবানের প্রসাদে নূতন ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিতে যাত্রা করিয়াছেন, সেই নূতন দেশে বাস করিয়া তাঁহারা মনের সকলপ্রকার পাপ দুঃখ ভুলিয়া নিত্য নূতন পুণ্য শান্তি ভোগ করিবেন এই তাঁহাদের আশা। জগতের পরিত্রাতা ঈশ্বর যেমন যুগে যুগে অন্যান্য দেশকে উদ্ধার করিয়াছেন তেমনি তিনি আর্য্যজাতিকে ও বিশেষরূপ চিহ্নিত করিয়া আপনার বিধানভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। প্রাচীনকালের কত অলৌকিক ক্রিয়ার কথা শুনিতে পাই। বর্ত্তমান বিধানে সকলপ্রকার মধ্যবর্ত্তী চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু ঈশ্বর যে এক এক জাতিকে অসত্য হইতে সত্যেতে, অন্ধকার হইতে জ্যোতিতে এবং মৃত্যু হইতে অমৃতেতে লইয়া যান এখন আমরা তাহার স্পষ্টতর প্রমাণ পাইতেছি। মুক্তিদাতা ঈশ্বর আমাদিগকে কুসংস্কার অন্ধকার এবং পাপ মৃত্যু হইতে প্রমুক্ত করিবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। এই ব্রাহ্মসমাজের নেতা হইয়া, ঈশ্বর আর্য্যজাতিকে তাঁহার অঙ্গীকৃত সত্যরাজ্যে লইয়া যাইতেছেন। স্থিরচিত্ত হইয়া দর্শন কর এই বর্ত্তমান ব্রাহ্মধর্ম্ম বিধানের মধ্যে নববেদ নব বেদান্ত দেখিবে। আর্য্যজাতি মহৎ। আর্য্যজাতির প্রাচীন ইতিহাস পাঠ করিলে মনে মহত্ত্বের সঞ্চার হয়। সেই আর্য্যজাতি অনেক শতাব্দী অজ্ঞান এবং অধর্ম্মের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। পরে ঈশ্বরের অনুগ্রহে আবার সেই আর্য্যজাতির মস্তকের উপরে ব্রাহ্মধর্ম্ম চন্দ্রোদয় হইয়াছে। এখন বিশেষ সময় আসিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রসাদে এখন আমরা ঈশ্বরের অঙ্গীকৃত নূতন রাজ্যের দিকে যাইতেছি। কএক বৎসর পূর্ব্বে এই নূতন রাজ্যের প্রতি আমাদিগের তেমন উজ্জ্বল বিশ্বাস ছিল না। পথিকেরা যতই গম্যস্থানের

ছেন, তোমরা সে সকল তত্ত্ব তোমাদিগের বন্ধুদিগের নিকট প্রচার কর এইরূপে দেখিবে অবিলম্বে এই দেশে ধর্ম্মের ভয়ানক দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠিবে। ঘোর রজনীর মধ্যে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। শীঘ্রই আর্য্যজাতির নিদ্রাভঙ্গ হইবে। আর্য্যজাতি, তোমার সুখের দিন আসিয়াছে। তোমার জন্য ব্রহ্মলোক সংস্থাপিত হইয়াছে। অসত্য, চলিয়া যাইতেছে, ধ্রুব সত্যরাজ্য আসিতেছে। আমরা তন্ত্র মন্ত্র মানি না, কল্পিত দেব দেবীর পূজা করি না। হরি স্বয়ং পুরোহিত হইয়া যদি কোন মন্ত্র তন্ত্র দেন তাহাই কেবল গ্রহণ করিব। এই সময় নিরাকার ব্রহ্মসাধনের সময়। ঘটে ঘটে স্বয়ং ঈশ্বর অবতীর্ণ। প্রত্যেক ভ্রাতা, প্রত্যেক আর্য্যসন্তান স্বীয় অন্তরের মধ্যে ঈশ্বরকে দর্শন করুন, ঈশ্বরের আদেশ শ্রবণ করুন। কেবল দুইটী প্রতিজ্ঞা চাই। যাহা দেখিব তাহাই মানিব, যাহা শুনিব তাহাই মানিব। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা সেই রাজ্যের দিকে চলিয়াছেন!! সেই রাজ্য ভক্তিরাজ্য, সেই রাজ্য আনন্দরাজ্য, শান্তিরাজ্য। সেখানে নিয়ত ঈশ্বরকে দেখিয়া, ঈশ্বরের কথা শুনিয়া ধন্য হইবে। ব্রাহ্মগণ, সকলে উৎসাহী হইয়া বল, আর্য্যসন্তানগণ, ঈশ্বর তোমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন।

ধর্ম্ম-বিজ্ঞান-বীজ।

যোগ ভক্তি জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়।

বুদ্ধি নির্ম্মল না হইলে মনকে আয়ত্ত করা যায় না—মন নিয়মিত না হইলে আত্মার সঙ্গে মিলন হয় না—আত্মাতে শরীরাভিমান (আমি আছি আমার শরীরও আছে, স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি সংসারও আছে) ইত্যাদি বোধ থাকিতে পরমাত্মার সঙ্গে মিলিত হওয়া যায় না। অতএব সাধন দ্বারা ক্রমে ক্রমে এই সকল আয়ত্ত করিয়া পরমাত্মাতে আত্মসমাধান করিতে পারিলে যোগী হওয়া যায়। এই যোগ সাধনের উপায় প্রদর্শিত হইতেছে—

> 'শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
> নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরম্॥'
> তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
> উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ১২
> সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
> সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥ ১৩
> গীতা। ৬ অধ্যায়।

পবিত্র স্থানে, অধিক উচ্চ নহে, অধিক নীচ নহে, এমত করিয়া আপনার আসন স্থাপন করিবে। প্রথম কুশ, তদুপরি চর্ম্ম, তদুপরি বস্ত্র পাতিয়া আসন প্রস্তুত করিবে। সেই আসনে বসিয়া, মনকে একাগ্র করিয়া—চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ক্রিয়া সকলকে সংযত করিয়া আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত যোগ (সাধনা) করিবে। তাহাতে শরীর মস্তক ও গ্রীবা সমান ভাবে (কোন দিকে না হেলাইয়া) অচলের ন্যায় স্থির রাখিবে, এবং নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি রাখিয়া—কোন দিকে না তাকাইয়া স্থির ভাবে যোগে যুক্ত হইবে।

> যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
> সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে॥ ২৮
> যংলব্ধ্বাচাপরং লাভং মন্যতেনাধিকং ততঃ।
> যস্মিং স্থিতো নদুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ ২২
> গীতা ৬ অধ্যায়।

যোগী ব্যক্তি বিগত কল্মষ (পাপশূন্য) হইয়া এই প্রকারে আপনাকে (আত্মাকে) সর্ব্বদা যোগে যুক্ত করিয়া সুখেতে ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ অতিশয় সুখ ভোগ করেন যে সুখ লাভ হইলে অন্য কোন সুখকে আর অধিক বলিয়া বোধ হয় না, এবং যে সুখে প্রতিষ্ঠিত হইলে গুরুতর দুঃখ দ্বারাও আর বিচালিত হয় না। ইহার নাম যোগ, এ যোগ করে কি? সকল বাধা বিঘ্ন বিনাশ করিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত করে।

তার পর ভক্তি। ভক্তি কি করে? ভক্তির স্বভাব কি? ভক্তি ভক্তের হৃদয়, মন, বুদ্ধি, বল, দেহ, ইন্দ্রিয় এবং আর আর সমুদয় আপনার বস্তু বা ব্যক্তিকে ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করে তাই ইহার নাম ভক্তি।

> স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
> যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণাং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥
> ভাগবত। ৩। ২৯ ১২

ভক্তিযোগ ত্রিগুণমায়াকে অতিক্রম করিয়া আমার দিকে আকর্ষণ করে, এই জন্য তাহাকে প্রধান বলা হইয়াছে।

> "তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া।
> পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥"
> ভাগবত। ১। ২। ১২

শ্রদ্ধাশীল মুনিগণ সেই তত্ত্ব স্বরূপ পরমাত্মাকে জ্ঞান এবং বৈরাগ্যযুক্ত শ্রুতগৃহীতভক্তি (গুরূপদেশ দ্বারা পরিগৃহীত ভক্তি) দ্বারা আত্মাতে অবলোকন করেন।

যোগ বাধা দূর করিয়া যে পরমাত্মাকে আনিয়া দেয় ভক্তিও তাহাই করে, সুতরাং বিবাদের বিষয় আর রহিল না। যোগের দুইটি গতি আছে। একটি বাহির হইতে ভিতরে যাওয়া, অন্যটি ভিতর হইতে বাহিরে আসা। বাহির হইতে ভিতরে যাইবার সময় সমুদয় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হয়, কিন্তু প্রার্থিত বস্তু লাভ করিয়া আবার ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে হয়। যখন ব্রহ্মবস্তু হৃদয়ে লাভ করা

যায়, সেইটি ভক্তির অবস্থা, তখন আর ত্যাগ নাই, কেন না পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, ভক্তিতে সমুদয় বিশ্বসংসার ঈশ্বরের হইয়া যায়। ভক্তিতে বিশ্বসংসার ঈশ্বরের হইয়া যায় এবং যোগেতে ঈশ্বর সঙ্গে সঙ্গে আছেন। সুতরাং ভক্তির সঙ্গে যোগের কোন বিরোধ রহিল না।

তৎপর জ্ঞান ও ভক্তি। আগে স্মরণ কর, জ্ঞান কি করে। জ্ঞান অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যায়। এটি ঠিক হইল না, জ্ঞান অসত্য হইতে সত্যে লইয়া যায় না, কিন্তু অসত্যের ভিতর হইতে বাহির করিয়া সত্য প্রদর্শন করে।

ধর্ম্মের দুইটি অবস্থা আছে। একটি সত্যকে জ্ঞানেতে ধারণ করা—দ্বিতীয়টি অভ্যাস দ্বারা সত্যকে জীবনে আয়ত্ত করা। জ্ঞান, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় তত্ত্ব সকল উপলব্ধি করে—ভক্তি অভ্যাস দ্বারা সেইগুলি কার্য্যে পরিণত করে। বলিবার সময়ে জ্ঞান বড়ই প্রবল, করিবার সময়ে ভক্তি প্রবলা। জ্ঞান কেবল কথায় পটু, ভক্তি কার্য্যে পটীয়সী। বিশেষতঃ—

"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্॥"

ভাগবত। ১১। ২। ৪২

ঈশ্বরে শরণাগত ব্যক্তির ভক্তি (আনুগত্য) ঈশ্বরানুভূতি এবং বৈরাগ্য এই তিনটি সমকালে উদিত হয়, যেমন ভোজন করিতে করিতে তুষ্টি পুষ্টি এবং ক্ষুধা নিবৃত্তি প্রতিগ্রাসে হয় (সমকালে হয়) সেইরূপ।

খাদ্য বস্তু রসনাতে যুক্ত হইলেই তাহার মিষ্ট স্বাদের জন্য তুষ্টি, উদরে প্রবিষ্ট হইলে শূন্য উদর পূর্ণ হয় বলিয়া পুষ্টি, উদরে খাদ্য প্রবিষ্ট হইলে ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়। প্রতি গ্রাসে অন্নভোজনের সঙ্গে সঙ্গেই এই সকল হয়। ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরার্চ্চনা করিবার কালে এইরূপ যত স্মরণ মনন করা যায় ততই তাহার স্বরূপবিষয়ে বোধ জন্মে, ততই তাঁহার মিষ্টতা গাঢ়রূপে হৃদয়কে অধিকার করে ততই শান্তি ও তৃপ্তি অনুভূত হয়। এই জন্য লিখিত হইয়াছে।

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥"

গীতা। ১৮। ৫৫

তত্ত্বতঃ আমি যেরূপ এবং যদাভূত, জ্ঞানিগণ ভক্তি দ্বারা আমাকে সেইরূপে অবগত হয়। স্বরূপতঃ আমাকে জানিয়া তার পরে আমাতে প্রবেশ করে।

ইহা দ্বারা জ্ঞান আর ভক্তিকে তুল্যমর্য্যাদা বলিয়া প্রমাণ করা হইতেছে, কিন্তু তুল্যই হউক আর কিছু ছোট বড়ই হউক কাহাকেও পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই। ফলতঃ ভক্তির সঙ্গে যে জ্ঞানের মিলন আছে, তাহার ফলাফল প্রদর্শক লৌকিক জ্ঞান নহে যাহা হইতে অহঙ্কার সূচিত হয়, সংশয় এবং ভ্রম হয় সে জ্ঞান নহে, ইহা আমাদিগের পূর্ব্বপ্রদর্শিত প্রজ্ঞা। প্রজ্ঞা আপনাকে দেখেনা ও দেখায়না। কিন্তু ঈশ্বরকে দেখায়। এই জন্য ফলবাদ শূন্য, নিত্যতৃপ্ত ও নিঃসংশয় ও নিশ্চিন্ত, সুতরাং ভক্তির সঙ্গে ইহার আর কোন বিবাদ বিসংবাদ থাকিতে পারে না। তার পর জ্ঞান ও কর্ম্ম। কর্ম্ম কি করে, কর্ম্মের স্বরূপ কি? জ্ঞানে যে চিন্তা ও ভাবাদি উদিত হয় কর্ম্ম তাহা নির্ব্বাহ করে। হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় আছে—শব্দ স্পর্শ রূপ রস প্রভৃতি বিষয় আছে—আকাশ বায়ু অগ্নি জল প্রভৃতি ভৌতিক বস্তু আছে, ইহা দ্বারা বোধ হইতেছে কার্য্য করা উচিত। মানুষের যদি কর্ম্ম না থাকিত, তবে তাহাকে ইন্দ্রিয়বল ও বাহ্য উপকরণ প্রদত্ত হইত না—তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণাদি থাকিত না—যখন এ সকল আছে তখন কর্ম্ম করা আবশ্যক। সেই কর্ম্ম কি জ্ঞানের বিরোধী। জ্ঞানিগণ বলেন—

কর্ম্ম প্রবৃত্তঞ্চ নিবৃত্তমপ্যৃতং
বেদে বিবিচ্যোভয়লিঙ্গমাশ্রিতম্।
বিরোধি তদ্যৌগপদৈক কর্ত্তরি
দ্বয়ং তথা ব্রহ্মণি কর্ম্ম নৈচ্ছ্‌তি॥

ভাগবত। ৪। ৪

প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি উভয় লক্ষণ বিচার পূর্ব্বক বেদে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু সেই নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি একদা এক কর্ত্তাতে অসম্ভব। কেননা করা আর না করা পরস্পর বিরোধী। সুতরাং একই ব্যক্তি কর্ম্মী এবং অকর্ম্মী কিরূপে হইবে? আমরা বলি একই ব্যক্তি কর্ম্মী এবং অকর্ম্মী হইতে পারে।

"নিয়তস্যতু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণোনোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

গীতা। ১৮। ৭

নিয়ত কর্ম্মের সন্ন্যাস হইতে পারে না—কেন না আহার নিদ্রা নিত্যোপাসনা ইত্যাদি পরিত্যাগ করিলে জীবিত থাকা অসম্ভব। মোহবশতঃ এ সকল ত্যাগ করাকে তামস বলা হইয়াছে অতএব—

"যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥
ত্যক্ত্বা কর্ম্ম ফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ॥
নিরাশী র্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥

গীতা। ৪—১৯। ২০। ২১

যাঁহার সমুদয় আরম্ভ, কামনা এবং সংকল্প বর্জ্জিত, জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধকর্ম্মা সেই ব্যক্তিকে পণ্ডিতেরা পণ্ডিত বলেন।

যে ব্যক্তি নিত্যতৃপ্ত হইয়া কর্ম্মফলের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছে, কর্ম্মেতে প্রবৃত্ত হইয়াও সে কিছু করে না।

যে ব্যক্তি কোন আশা রাখে না, এবং চিত্ত ও শরীরকে বশীভূত করিয়া সমুদয় পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়াছে, কেবলমাত্র শারীরিক কর্ম্ম (পান ভোজনাদি) করিয়া সে ব্যক্তি পাপলিপ্ত হয় না। শরীরসম্বন্ধীয় কর্ম্ম কর্ম্ম নহে, কেন না তাহাতে স্বর্গাদি ফলের লোভ নাই।

প্রচার বৃত্তান্ত।

(ভাই গিরিশচন্দ্র সেন হইতে প্রাপ্ত।)

আমি কোচবিহার পরিত্যাগ করিয়া বিগত ১০ই বৈশাখ পূর্ব্বাহ্ণে কুড়িগ্রামে উপস্থিত হই। ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত ইটুনা গ্রাম নিবাসী ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আমার সঙ্গে আসাম ভ্রমণার্থ যাইবার জন্ত এখানে প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কুড়িগ্রাম রংপুর জেলার অন্তর্গত, উক্ত জেলার পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত একটি সবডিবিজন। আমি এখানে বিধানবাদী বন্ধু তত্রত্য সবরেজিষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু বিপিনমোহন সেহানবিশের আবাসে তাঁহার সাদর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া দুই দিবস স্থিতি করি। ১০ই বৈশাখ শনিবার মধ্যাহ্ণে বিপিন বাবুর বাসাতে উপাসনা, রাত্রিতে ধর্ম্মালোচনা ও সঙ্গীত প্রার্থনাদি হয়। ধর্ম্মালোচনায় স্থানীয় প্রথম মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ সেন, এবং কয়েকটি ব্রাহ্মবন্ধু ও একটি মোসলমান মুন্সি উপস্থিত ছিলেন। ১১ই বৈশাখ রবিবার পূর্ব্বাহ্ণে স্কুলগৃহে ছাত্রসভায় প্রকৃত শিক্ষাবিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। সবরেজিষ্টার বিপিন বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। অপরাহ্ণে নাটক গৃহে "ধর্ম্মজীবন" এই বিষয়ে বক্তৃতা হয়। ৪০।৪৫ জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। শ্রোতাদিগের মধ্যে প্রথম মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ সেন এবং দ্বিতীয় মুন্সেফ শ্রীযুক্ত মন্মথ বাবু ছিলেন। রাত্রিতে সমাজগৃহে সামাজিক উপাসনা হয়। "ত্রিবিধ জীবন" বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। ১২ই বৈশাখ পূর্ব্বাহ্ণে উপাসনা ও আহারান্তে নিম্ন আসামের অন্তর্গত গোওয়ালপাড়ায় যাত্রা করি। রজনী প্রায় দ্বিতীয় প্রহরের সময় গোওয়াল পাড়ায় জাহাজ উপস্থিত হয়। পর দিন প্রত্যুষে জাহাজ হইতে অবতরণ করি। গোওয়ালপাড়া ধুবড়ি জেলার একটি সবডিবিজন। ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে গোওয়ালপাড়া ধুবড়ির সবডিবিজন ছিল। গোওয়ালপাড়ার সন্নিহিত ব্রহ্মপুত্র নদের উত্তর কূলে স্থিত, ইতস্ততঃ নাতি উচ্চ পর্ব্বত শ্রেণীর শোভা অতি চমৎকার। গোওয়ালপাড়া নগরটী উক্ত নদের তীরে গিরিমূলে স্থাপিত। এখানে এক জন বন্ধুর আবাসে আমি দুই দিন স্থিতি করিয়াছিলাম। এই স্থানে বহুকাল পূর্ব্বে একটি ব্রাহ্মসমাজ ছিল, জেলা উঠিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহা তিরোহিত হইয়াছে। এইক্ষণে একটি ব্রাহ্মও এখানে নাই বলা যাইতে পারে। ১৪ই বৈশাখ অপরাহ্ণে বিজনিরাজের কাছারিবাড়ীতে, বিজনি ষ্টেটের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসন্ন দত্ত এবং ফৌজদারীর নাজির শ্রীযুক্ত বাবু রামকুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উদ্যোগে এক সভা আহূত হইয়াছিল। সেই সভায় "কলিযুগে ভগবানের লীলা" বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। ৪০।৫০ জন শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। ১৩ই বৈশাখ প্রাতে বাষ্পীয় পোত যোগে গোওয়ালপাড়া পরিত্যাগ করিয়া সেই দিন অপরাহ্ণে গোহাটী নগরে উপস্থিত হই। গোহাটী আসাম প্রদেশের মধ্যে অতি সুন্দর ও বড় সহর। এই নগরের উত্তর প্রান্ত দিয়া প্রবল ব্রহ্মপুত্র নদ প্রবাহিত, পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিমে পর্ব্বতশ্রেণী। এখানকার কামাখ্যা পর্ব্বত হিন্দুদিগের মহাতীর্থ। তজ্জন্য নানা স্থান হইতে শত সহস্র যাত্রী এই স্থানে আগমন করিয়া থাকে। আমি এখানে অনন্য হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু অভয়াচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আবাসে তাঁহার এবং উক্ত স্কুলে প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের, সাদর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া স্থিতি করি। ১৩ই বৈশাখ রাত্রিতে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের গৃহে উপাসনা হয়। ১৪ই বৈশাখ প্রাতে পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহে মধ্যাহ্ণিক উপাসনা ও রাত্রিতে শিক্ষক মহাশয়ের গৃহে সঙ্গীত সংকীর্ত্তন ও প্রার্থনা হয়। ১৫ই শনিবার অপরাহ্ণে হাইস্কুল গৃহে "নবধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। প্রায় দেড় শত দুই শত লোক উপস্থিত ছিল। সেই দিন রাত্রিতে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের গৃহে, পাঠ কীর্ত্তন ও প্রার্থনাদি হয়। পরিণত বয়স্ক প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে উৎসাহের সহিত খোল বাজাইয়া সংকীর্ত্তন করিতে দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ হইল। আমার সঙ্গের বন্ধুটী সঙ্গীতাদি দ্বারা প্রচারের বিশেষ সাহায্য করিতেছেন। ১৫ই রবিবার সামাজিক উপাসনা হয়। "জীবন উপত্যকা" বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। উপাসনা ও ভোজনান্তে রাত্রি ১২ টার সময় তেজপুরে যাত্রা করিয়া বাষ্পীয় পোতে আরোহণ করি। প্রতি দিন প্রাতে পণ্ডিত মহাশয়ের গৃহে উপাসনা হইয়াছে। গোহাটী নগরে অনেক কাল ব্রাহ্মসমাজ ছিল না। বৎসরাধিক হইল শ্রীযুক্ত বাবু অভয়াচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া এখানে আগমনপূর্ব্বক সমাজ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এইক্ষণ পর্য্যন্ত সমাজের জন্য কোন গৃহ স্থাপিত হয় নাই। অভয়াবাবুর গৃহেই সামাজিক উপাসনার কার্য্য হইয়া থাকে। উপাসকের সংখ্যা অতি অল্প। এখানে একটিও আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম নাই। দুই জন লোক রীতিমত দৈনিক উপাসনাদি করিয়া থাকেন। ১৭ই বৈশাখ সোমবার অপরাহ্ণে তেজপুরে

উপনীত হইয়াছি। এই নগর, মধ্য আসামের অন্তর্গত ব্রহ্মপুত্র নদের কূলে স্থাপিত। এখানে অত্রত্য হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ দত্ত মহাশয়ের আবাসে তাঁহার সাদর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া স্থিতি করিতেছি। কল্য এখানকার টাউন হলে "আমাদের বর্ত্তমান ধর্ম্মজীবনের অবস্থা" বিষয়ে ধর্ম্মালোচনা হইয়াছে। এখানকার প্রায় সমুদয় সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারী ও বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ উপস্থিত ছিলেন. আলোচনান্তে সঙ্গীত ও প্রার্থনা হইয়াছিলেন। অদ্য সামাজিক উপাসনার পর নিব্রুগড় যাত্রা করিতে মনস্থ করিয়াছি।

ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত হইতে প্রাপ্ত।

গত ১৮ই বৈশাখ রবিবার আমি চন্দননগর ব্রাহ্মসমাজে গমন করিয়াছিলাম। নূতন মন্দির হওয়া পর্য্যন্ত তথাকার ব্রাহ্মদিগের বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইতেছে। উক্ত দিবস সন্ধ্যাকালে অত্যন্ত ঝড় বৃষ্টি ভোগ করিয়াও ব্রাহ্মগণ অনেকেই মন্দিরে সমাগত হইয়াছিলেন। পর দিন সোমবারে চুঁচড়ার ভ্রাতা বিপিনবিহারী দত্তের ভবনে উপস্থিত হওয়া যায়, এবং তাঁহার বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করি। একশতের অধিক বালিকা এখানে অধ্যয়ন করিতেছে ও একটী বালিকা গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক দুই টাকা বৃত্তি পাইতেছে। মধ্যাহ্ন কালে ভ্রাতার সহিত উপাসনা আলোচনা এবং অপরাহ্নে তথাকার কোন কোন শিক্ষিত ভদ্রলোকের সহিত ব্রাহ্মসমাজ ও আচার্য্যদেব সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া রাত্রিতে সঙ্গীতাদি হইল। পর দিন প্রাতঃকালে তথা হইতে অমরপুর গমন করিলাম ও শুক্রবার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত তথায় ছিলাম। এখানকার বিদ্যালয়ের বালকদিগের বাৎসরিক পরীক্ষা গ্রহণ করিলাম। প্রতি দিন প্রত্যূষে ব্রাহ্মগণ একত্র উপাসনা করিতে আসিতেন, এবং সন্ধ্যার পর একত্র বিশেষ ব্যাকুলতার সহিত সঙ্কীর্ত্তন ও প্রার্থনা করিতেন। কিছু দিন পূর্ব্ব হইতে ইহাঁরা এই প্রকারের সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তদ্ভিন্ন অপরাহ্নে নদীতীর ইত্যাদি প্রাকৃতিক রমণীয় স্থানে ধ্যান ও আত্মচিন্তাদি হইয়াছিল। শুক্রবার মধ্যাহ্নে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়াছি।

সমালোচনা।

আধ্যাত্মিক জ্ঞানোপদেশ সার শ্রীশ্রীনাথ ঘোষ প্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ। এই গ্রন্থখানি যখন প্রথমবারে মুদ্রিত হয়, এ সম্বন্ধে আমরা তৎকালে ধর্ম্মতত্ত্বে (১৮০২ শক ১৬ই ফাল্গুন) যাহা বলিয়াছিলাম, মূলতঃ এখনও সেই সকল কথা বলা যাইতে পারে। প্রথমবার অপেক্ষা এবার গ্রন্থখানির আকার দ্বিগুণ হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল বিষয় লিখিত হইয়াছিল, এবার সেই সকল বিষয় বিস্তৃতরূপে বিবৃত করাতে এবং কিছু কিছু নূতন বিষয়ের সমাবেশ হওয়াতে গ্রন্থখানি পূর্ব্বাপেক্ষা এত বৃহৎ হইয়াছে। গ্রন্থকারের মত এবার বিলক্ষণ পরিষ্কার আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্ববারে লিখিত হইয়াছিল "যাহারা পাপকে পরিত্যাগ এবং মন ও চিত্তকে বশীভূত, এবং স্থির করিয়া নিয়ত তাঁহার আরাধনা ও সাধনা করিবেন তাঁহারাই অক্লেশে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবেন" এবার এই কথা বিশেষরূপে বিবৃত করিয়া বিষয়টি এই বলিয়া উপসংহার করা হইয়াছে যে "এই কলিযুগে শ্রীহরিনাম সাধন বিনা (বই) আর কিছুই নাই, এই হরিনামের মাহাত্ম্য ও মহিমাতে যত সব মহাপাপীরা উদ্ধার হইবেন। ধন্য কলিযুগ, যাহা কত যোগ সাধন করিয়া হয় নাই, তাহাই এক্ষণে অনায়াসে সহজে সুলভে হইতেছে। এই নাম "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে, হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে।" হরের্নামৈব কেবলম্। হরি সর্ব্ব অমঙ্গল হরেন, কৃষ্ণ মনকে আকর্ষণ করেন, রাম আত্মরমণ।"

সংবাদ।

কুচবিহার ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা উপল. আমাদের পুরাতন ঋণ শোধ দিবার জন্য ১০০৲ এক শত টাকা সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। আমরা এই সাহায্যের জন্য বিশেষ রূপে উপকৃত হইয়াছি। সকল দায়ের মধ্যে ঋণদায় বিষম দায়। যে সকল মহাত্মা এই দায় হইতে মুক্তিপ্রদান জন্য সাহায্য করেন, তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট হইতে পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন।

বিগত ২৭এ বৈশাখ সোমবার কলিকাতা গোয়াবাগান নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু উমাচরণ মিত্রের প্রথমা কন্যা শ্রীমতী সুবোধবালার সহিত সিমলা নিবাসী স্বর্গীয় গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের প্রথম পুত্র শ্রীমান্ কিরণচন্দ্র ঘোষের শুভ বিবাহ নবসংহিতার ব্যবস্থামতে সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রের বয়স ১১ বৎসর এবং পাত্রীর ১৫ বৎসর। ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল আচার্য্যের কার্য্য করিয়াছেন। দয়াময় ঈশ্বর নবদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করুন।

কুচবিহার নব মন্দিরে প্রতি রবিবারে বেস লোক হইতেছে। শ্রদ্ধাস্পদ গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয়ের উপদেশাদিতে সকলেই বিশেষ অনুরাগী হইতেছেন। প্রতি বুধবার সন্ধ্যার সময় সংগত সভার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

আমরা দুঃখের সহিত পত্রপ্রেরক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রশেখর সেন ও জগবন্ধু মৈত্রেয় মহোদয়দ্বয়কে জানাইতেছি যে, আমাদের পত্রিকার স্থান অভাব হওয়ায় তাঁহাদের পত্র এবার প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলাম।

ভাই দীননাথ মজুমদার আপাততঃ ছাপরায় প্রচার করিতেছেন। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন গোলাঘাট পৌঁছিয়াছেন। ভাই নন্দলাল কটক গিয়াছেন।

☞ এই পত্রিকা ৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২৩ ভাগ। ১০ সংখ্যা। } ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, সোমবার, ১৮১০ শক। { বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে বিধানপতি, তুমি তোমার বর্ত্তমান বিধানে কতকগুলি সংন্যাসী সংসারত্যাগী বৈরাগীকে একত্র কর নাই, যাঁহারা তোমার বিধানবাহক তাঁহারা সকলেই সংসারাশ্রমে অবস্থিত। সংসারী ও অসংসারী এ দুইয়ের কেমন একত্র মিলন হইতে পারে, ইহা দেখাইবার জন্যই তুমি এ প্রকার বিধান করিয়াছ। তোমার এ বিধান আমাদিগের জীবনে কত দূর সিদ্ধ হইতেছে, হে বিধানের ঈশ্বর, ইহার বিচার কেবল তুমিই করিতে পার। প্রভো, সংসারাশ্রমী তোমার বিধানবাহকগণ সংসারী হইয়াও অসংসারী কি না, আমরা তাঁহাদিগের আচরণ দেখিয়া অনেকটা বুঝিতে পারি, আমরা যত দূর বুঝিতে পারি বুঝিয়া তোমার নিকটে আজ কাতর ভাবে উপস্থিত হইতেছি, এবং অপরাধ স্বীকার করিতেছি যে, আমাদিগের জীবনে সংসারী ও অসংসারী এ দুইয়ের আজও মিলন হয় নাই। তোমার বিধানে এ সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট উপায় অবতরণ করে নাই, অথবা এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তের অভাব আছে, এ কথা আমরা বলিতে পারি না, আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক উপায় গ্রহণে বিমুখ হইয়াছি দৃষ্টান্তের প্রতি অবহেলা করিয়াছি। হে শ্রীহরি, তোমার চরণসুধাপান করিয়া যাহাদিগের প্রাণ প্রমত্ত হয় নাই, সে সুধা বিনা আর সমুদায় যাহাদিগের নিকটে তুচ্ছ হইয়া পড়ে নাই, স্বজন, বান্ধব, স্ত্রী পুত্র পরীবার সকলে সেই রস পান করিয়া কৃতার্থ হয় এ জন্য যাহাদিগের চিত্ত আকুল নহে, বিষয়ের প্রতি আসক্তি বাড়িয়া তাহাদিগের ঈশ্বরবৈমুখ্য না জন্মে এ জন্য যাহারা নিয়ত যত্নশীল নহে, হে নাথ, বল তাহারা সংসারী হইয়াও অসংসারী হইবে কি প্রকারে? আমরা এই সকল লক্ষণ লইয়া বিচার করিয়া দেখিতেছি, আমরা এ লক্ষণ হইতে আজও দূরে পড়িয়া রহিয়াছি, এ সকল লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত না হইলে কেবল যে আমাদিগের জীবনে বিধান অসিদ্ধ রহিল তাহা নহে, আমাদিগের পরিত্রাণ পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ হইয়া থাকিবে। হে জীবিতেশ্বর, আমাদিগের জীবন সম্বন্ধে যাহা তোমার অভিপ্রায় তাহা যদি আমরা জীবনে পূর্ণ না করি, বল তবে আমাদিগের কি প্রকারে পরিত্রাণ হইবে? পরিত্রাণবিষয়ে অন্য লোকসম্বন্ধে অন্য ব্যবস্থা, আমাদিগের সম্বন্ধে ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। আমাদিগের সম্বন্ধে তোমার বিচার অতীব কঠোর হইবে, কেন না আমরা তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য বিশেষ করুণা সম্ভোগ করিয়া আসিতেছি।

হে দীনবন্ধো হরি, আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন বিচারে তোমার নিকটে অধোমুখে দাঁড়াইয়া না থাকি, এবং আমাদিগের অপরাধের জন্য গুরুতর শাস্তিভোগ না করি। দিন থাকিতে অসংসারী সংসারী হইয়া আমরা কৃতার্থ হইব, এই তোমার শ্রীচরণে বিনীত ভিক্ষা।

আমাদিগের সন্ততিগণ।

বিধানবিশ্বাসিগণ আপনার বিধানে বিশ্বাস করিয়া চলিয়া গেলেন, ইহাতেই তাঁহাদিগের জীবনের কার্য্য শেষ হইল কোন বিধানবিশ্বাসী এ কথা মনে করিতে পারেন না। ঈশ্বরের পরীবার সংগঠন, তাঁহাদিগের একটি বিশেষ কর্ত্তব্য, এ সম্বন্ধে তাঁহারা ঈশ্বরের নিকটে উত্তরদানে বাধ্য। একাকী বিধানের পথে অগ্রসর হওয়া আমাদিগের ধর্ম্ম নহে, আমরা দশ জনে মিলিয়া অগ্রসর হইব ইহাই আমাদিগের ধর্ম্ম। এই দশ জনে মিলিত হইয়া চলিলেও বিধানের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল না, এরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিধানেও হইয়া গিয়াছে, আমাদিগের বিধানে ইহা অপেক্ষা আরও কিছু বিশেষ আছে। সে বিশেষ এই যে, যে দশ জন একত্র মিলিত হইলেন, তাঁহারা একাকী মিলিত হইলেন না, কিন্তু সপরিবারে মিলিত হইলেন। কেন মিলিত হইলেন? এই জন্য যে দল গঠনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা পরীবার সঙ্গঠন করিবেন। কেবল দলবন্ধনে এ বিধানে কৃতার্থতা নাই, দল ও পরীবার এ দুই এখানে একত্র বদ্ধ থাকিবে।

চিরকাল দলের দ্বারাই বিধানের কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া আসিয়াছে, আজ পরীবারবন্ধনে এত প্রয়াস কেন এবং এ প্রয়াস ভগবানের অভিপ্রায়সঙ্গত বলিয়া স্থিরবিশ্বাসই বা কেন? অন্যান্য বিধান যদি দলের দ্বারা বিস্তার লাভ করিয়াছে তবে এবারও তাহাই হইবে তাহার সঙ্গে পরীবারকে সংযুক্ত করিবার কোন প্রয়োজনই দেখিতে পাওয়া যায় না। এবার ঈদৃশ প্রয়োজন বিধানের লক্ষ্য অনুসারে সমুপস্থিত হইয়াছে। এ বিধান যে কার্য্য সাধন করিতে আসিয়াছেন, তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বিষয় এই যে, ঈশ্বরের যে সমুদায় ভিন্ন ভিন্ন স্বরূপ এক এক বিধানে পূজিত হইয়াছে, এ বিধানে সেই সমুদয় স্বরূপগুলি পরব্রহ্মে নিবিষ্টরূপে সাধককে গ্রহণ করিতে হইবে। এই সমুদয় স্বরূপ একত্র নিবিষ্ট করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, ঈশ্বর কেবল সন্ন্যাসী বৈরাগিগণের ঈশ্বর নহেন, কিন্তু তিনি সন্তানবৎসলা জননী, গৃহস্থের গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, সন্তান সন্ততি প্রভৃতির সাক্ষাৎসম্বন্ধে ধাত্রী ও পালয়িত্রী। গৃহস্থ ও গৃহিণী জননীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া গৃহের সমস্ত ভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিবেন, এবং সন্তান সন্ততিগণকে তাঁহার রক্ষণাধীনে নিয়ত রক্ষা করিবেন। সন্তানসন্ততিগণ এমনই ভাবে সংসারে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে যে, পৃথিবীর পিতা মাতার অতীত স্বর্গের পিতা মাতা কর্ত্তৃক প্রতি পালিত হইতেছে, ইহাই যে বুঝিবে তাহা নহে, কিন্তু তিনিই আবার বুদ্ধিদাত্রী এবং জ্ঞানদাত্রী হইয়া তাহাদিগকে জ্ঞান বুদ্ধি দান করিতেছেন ইহাও বুঝিবে। এই বিষয়টি ভাল করিয়া সন্তানসন্ততিগণের হৃদয়ঙ্গম হওয়াতে এ বিধানের আর এক সুমহৎ বিশেষত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে।

আমাদিগের বর্ত্তমান বিধানের একটি অসাধারণ লক্ষণ এই যে, ইহাতে ভগবানের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধ বা দর্শন ও তাঁহার আদেশ শ্রবণ বংশানুক্রমে অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকিবে। স্বর্গের যে দ্বার একবার খুলিয়াছে আর তাহা অবরুদ্ধ হইবে না, ইহাই সমধিক বিশেষত্ব। বিধানবিশ্বাসিগণের সংসারে সন্তানসন্ততিগণ এমনই ভাবে পরিবর্দ্ধিত হইবে যে, তাহারা প্রথম হইতে সকল বিষয়ে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর

করিতে শিক্ষা করিবে। যখন দেখিবে যে, তাহাদিগের পিতা মাতা সর্ব্ববিষয়ে পরম পিতা মাতার উপরে নির্ভর করিয়া চলেন, কোন গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইলে তাঁহারা তর্ক করিতে ভালবাসেন না, কিন্তু প্রার্থনা করিয়া তদুত্তরে মীমাংসা লাভ করিবার জন্য দেবালয়ে প্রবেশ করেন, তাঁহাদিগের সকল বিষয়ের সিদ্ধান্ত দেবগৃহে নিষ্পন্ন হয়, সংসারের এমন কোন বিষয় নাই, যাহা তাঁহারা ভগবানের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়া সম্পন্ন করেন, অধ্যয়নাদি সমুদায় বিষয়ে দেবপ্রেরণায় তাঁহারা প্রবৃত্ত হন, এবং এইরূপে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদিগের প্রতিভা দিন দিন উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে থাকে, তখন শিশুগণ এ দৃষ্টান্ত কখন অতিক্রম করিতে পারিবে না, শৈশবকাল হইতে তাঁহারা সর্ব্ববিষয়ে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিতে শিখিবে। তাহাদিগের জীবন প্রার্থনাশীল হইবে, এবং যদি প্রার্থনাশীল হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে আর যাহা কিছু অধ্যাত্মজীবন সংগঠিত হইবার উপযোগী তাহা সকলই সমুপস্থিত হইবে।

সন্তানগণ দেখিবে যে, তাহাদিগের পিতা মাতা ভোগবিলাসে একান্ত নিস্পৃহ। তাঁহাদিগের আহার বিহার পরিচ্ছদ অতি সহজ এবং স্বাভাবিক, তাঁহাদিগের ব্যবহার অতি সুমধুর ও সুকোমল, গুরুতর কারণ উপস্থিত হইলেও তাঁহারা ক্রোধ মোহাদির অধীন হন না, হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি কখন তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্থান পায় না; এই সমুদায় দেখিয়া প্রার্থনাশীলতার সঙ্গে সঙ্গে এ সকলের যে একান্ত প্রয়োজন তাহা তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হইবে। তাহারা বুঝিবে যে, ঈশ্বরের নিকটে যাইতে হইলে, প্রার্থনার ফললাভ করিতে হইলে, এরূপ স্বভাব হওয়া একান্ত প্রয়োজন। নির্দ্দোষ শিশুগণের চিত্তের উপরে ঈদৃশ চরিত্রের প্রতিভা পড়িয়া এই একটি বিশেষ লাভ হইবে যে, তাহাদিগের নির্দ্দোষ ভাব বিকারগ্রস্ত হইবে না, এবং তাহারা অতি সত্বর অধ্যাত্মজীবনের ফল লাভে সমর্থ হইবে। আমরা যখন দেখি, কুসঙ্গ কুদৃষ্টান্ত প্রভৃতি আমাদিগের জীবনকে কি ভয়ানকরূপে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছিল, এবং উহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে আমাদিগকে কত গুরুতর প্রয়াস পাইতে হইয়াছে; তখন [illegible]ভাবতঃ স্বচ্ছ চরিত্রের উপরে সচ্চরিত্রের প্রভাব নিপতিত হওয়া যে, কত দূর প্রয়োজন আমরা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। দল বাঁধিয়া প্রচার সাধারণ জনগণের হিত সাধন করে, এবং তাহাতে বহু পাপী সৎপথে আগমন করে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি বিধানগুণে উদ্ধার পাইল তাহারা যদি সন্তানসন্ততিগণেতে তাহাদিগের জ্ঞান বৈরাগ্য সচ্চরিত্রাদি প্রতিফলিত করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে জনসমাজ তদ্দ্বারা প্রচুরপরিমাণে উপকৃত হয়। কেন না যাহারা আজ শিশু তাহাদিগের উপরে ভবিষ্যৎ সমাজের সমুদায় আশা ন্যস্ত রহিয়াছে।

সমস্ত সমাজের আশা কেন বলি, ধর্ম্মবিধানের গৌরব ও মহত্ত্ব এই সকলের উপরে অবস্থিত এ কথা কে অস্বীকার করিবে। যদি আমাদিগের সন্তানগণ উত্তরাধিকারিত্ব স্বরূপে আমাদিগের যোগ ভক্তি বৈরাগ্য প্রভৃতি লাভ না করিল, তাহা হইলে, সংসারের কোন ছার নীচ উচ্চাধিকারিত্ব দিয়া চলিয়া যাইব। ধন্য শাক্য, যিনি আপনার কিশোর বয়স্ক বালকের মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাহাকে পৃথিবীর রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিলেন; কিন্তু নিত্যকালের অমররাজ্য উত্তরাধিকারিত্বস্বরূপে দান করিয়া গেলেন। প্রত্যেক বিধানবিশ্বাসী যদি এ বিষয়ে তাঁহার পদবী অনুসরণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের এমন উচ্চ বিধানের সঙ্গে সংযুক্ত না হওয়া বরং ভাল ছিল।

আমরা পিতা মাতার পক্ষের কথা বলিলাম, কিন্তু সন্তানগণের কর্ত্তব্য কিছু বলিলাম না। তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য অতি সংক্ষিপ্ত, তাঁহারা যাহাতে পিতা মাতার উপযুক্ত সন্তান হন, ইহাই

তাঁহাদিগের প্রাণ গত যত্ন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। পুত্র কন্যার কর্ত্তব্য এই তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক পিতা মাতার নাম কলঙ্কিত না নয়। যাহা তাঁহাদিগের পিতা মাতার অনভিমত তাহার কথন তাঁহারা অনুসরণ করিবেন না, কেন না তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, ইহা কেবল আমাদিগের পিতা মাতার অনভিমত নহে কিন্তু পরম পিতা পরম মাতার ও অনভিমত।

আমরা সংক্ষেপে যাহা বলিলাম তাহাতে প্রতীত হয়, পাঠকগণের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে এ বিধান পরিবার গঠনে কেন ব্যস্ত? এক দিকে ঈশ্বরের স্বরূপনিচয়ের সামঞ্জস্য করিতে ইহা একান্ত প্রয়োজন অন্যদিকে বিধানের গৌরব ও তাহার যথার্থ প্রচার এরূপে যেমন নিষ্পন্ন আর কিছুতে তেমন হয় না, তাহার জন্য।

বিধান চির বিজয়ী।

যখনই কোন বিধান পৃথিবীতে অবতরণ করিয়াছে, তখনই যেন উহার বল পরীক্ষার জন্যই বিবিধ প্রতিকূল ঘটনায় উহা পরিবৃত হইয়াছে। সমাগত বিধান চিরকালই নূতন, কেন না পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহার প্রাচীনত্ব ও সময়ের অনুপযোগিত্ব জন্যই বিধানের সমাগম প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রাচীনত্ব ও অনুপযোগিত্ব সে সময়ের সকল লোকে যেন বোঝে না, এইরূপ দেখায় বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সকলেই যে বুঝিতে পারে, তাহার লক্ষণ বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। নূতন বিধান যখন প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন প্রাচীন বিধানের লোক সকল তাহার বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, এবং যাহাতে উহা প্রচারিত না হইয়া সমূলে বিনষ্ট হয় তাহার জন্য বিশেষ যত্ন করে। কিন্তু যখন দেখিতে পায়, বিরোধাচরণ ও যত্ন নূতন বিধানের অপ্রতিহত গতি নিবারণ করিতে অক্ষম হইল, তখন প্রাচীন বিধান আপনার বেশ পরিবর্ত্তন করিতে থাকে। উহা প্রাচীন বিধি ব্যবস্থা রীতি নীতি, পূজাপ্রণালী প্রভৃতির অর্থান্তর করিতে থাকে, এবং ব্যাখ্যানযোগে উহাকে সময়ের উপযোগী করিয়া তুলিতে প্রয়াস পায়। কিন্তু এইরূপ অর্থান্তর ও ব্যাখ্যান প্রাচীন বিধানের স্থায়িত্বের হেতু না হইয়া উহার তিরোধানের পথ পরিষ্কার করিতে থাকে।

খ্রীষ্টিয় বিধানের ইতিহাস পাঠ করিলে দেখিয়া আশ্চর্য্য হওয়া যায় যে, বিধানের প্রথমাবস্থা কেমন ঘোরতর প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া চলিতে থাকে। এখন কালের পরিবর্ত্তনবশতঃ সে প্রকার বধ বন্ধনাদির ব্যাপার নাই, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে সে কালেও যেপ্রকার ছিল, একালেও প্রায় তাহাই আছে। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিগণ প্রথমে কালের বিষম প্রতিকূলতাবশতঃ পাঁচ জন একত্র হইয়া প্রকাশ্যে উপাসনাদি করিতে পারিতেন না। তাঁহারা গোপনে একত্র হইয়া উপাসনাদি করিতেন, এবং লোকে তজ্জন্য তাঁহাদিগের নামে অনেক প্রকার দুরপনেয় কলঙ্ক আরোপ করিত। এ সময়ের বিধানকে কোন কালে এরূপ বিপাকে পতিত হইতে হয় নাই, রাজপ্রসাদে ইহা স্বাধীন ভাবে বিকসিত হইয়াছে, এবং মহোৎসবাদি করিয়াছে। কিন্তু তাদৃশ কলঙ্কারোপ শত্রুপক্ষীয়েরা ইহার উপর করে নাই, এ কথা বলা যাইতে পারে না। সে সকল কুৎসা নিন্দার দিন প্রাচীন ইতিহাসের ব্যাপার হয় নাই, আমাদিগের সকলেরই স্মরণে আছে, এবং থাকিবে।

খ্রীষ্টিয় বিধান ক্রমে যখন আপনার অপ্রতিহত প্রভাব প্রদর্শন করিতে লাগিল, তখন প্রাচীন ধর্ম্ম আপনার নূতন প্রকারের সংস্করণ দ্বারা জনসাধারণের চিত্ত হরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। পৌত্তলিকপূজাবিধি যেমন তেমনই রাখিয়া তাহার আধ্যাত্মিক অর্থ ও ব্যাখ্যা চলিতে লাগিল। যখন ইহাতে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব হইল, তখন খ্রীষ্টধর্ম্মের মতাদি প্রচলিত

ধর্ম্মের সঙ্গে মিশাইয়া প্রাচীন ধর্ম্মকে জীবিত রাখিতে যত্ন উপস্থিত হইল। আশ্চর্য্য এই যে, এই সকল ব্যাপার এ সময়েও ঠিক প্রায় তেমনই হইতেছে। এ দেশের প্রচলিত পৌত্তলিক ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ভাব নিষ্পন্ন করিয়া পৌত্তলিকতা বজায় রাখিবার জন্য বিলক্ষণ যত্ন উপস্থিত। কোথায় পৌত্তলিকতার মূলে যে সত্য ও ভাব আছে তাহা রাখিয়া পৌত্তলিকাংশ উড়াইয়া দেওয়া হইবে, তাহা না করিয়া তদ্বিপরীত যত্ন হইতেছে। এ যত্ন কখন সফল হইতে পারে না, এখনও এ বোধ প্রাচীন মতাবলম্বিগণের মনে উদিত হয় নাই। উপাসনা বক্তৃতা সভা প্রভৃতি সমুদায় বর্ত্তমান বিধানের অনুকরণে নিষ্পন্ন হইতেছে।

খ্রীষ্টিয় বিধানের সময়ে প্রথমে রাজবল পৌত্তলিকদের পক্ষে ছিল, দ্বিতীয়াবস্থায় খ্রীষ্ট বিধানের পুষ্টিপোষক হইয়াছিল। রাজবল ধর্ম্মবলের সঙ্গে মিশিলে যে সকল অনিষ্ট হইতে পারে, তাহা উভয় সময়েতেই ঘটিয়াছিল। প্রথমতঃ খ্রীষ্টানদের উপর অত্যাচার, পরিশেষে পৌত্তলিকগণের উপরে অত্যাচার। এ অত্যাচার সামান্য নহে। দেশবহিষ্কার, প্রাণবধ, মন্দিরভঙ্গ ইত্যাদি। রাজবল যখন খ্রীষ্টধর্ম্মের সঙ্গে মিলিত হইল তখন পৌত্তলিকগণ নিস্তেজ হইয়া পড়িল। খ্রীষ্টানগণ মত বিষয়ে ঘরে ঘরে বিবাদ উপস্থিত করিলেন। রাজা বলপূর্ব্বক নিজপক্ষের মতে সকলকে আনয়ন করিতে প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু খ্রীষ্টবিধান প্রাচীন মৃত পৌত্তলিকধর্ম্ম নহে; যে, রাজার ভ্রূকুটিতে ভয়ে মতভেদ পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর মিলিত হইবে, সুতরাং এখানেও অমিলের মধ্যে বিধানের অপরাজেয়ত্ব প্রকাশ পাইল। সৌভাগ্যক্রমে বর্ত্তমান বিধানে বিধানের বলের সঙ্গে রাজবল মিশ্রিত হয় নাই, ইহাতে শোণিতপাতাদি অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে, এবং স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে গিয়া যে অত্যাচারের সম্ভাবনা তাহা নাই। এসময়ে বিধানের ভিতরে ও বাহিরে যে স্বাধীন মতবিরোধ চলিতেছে, ইহা হইতে শোণিতপাত হইতেছে না; কিন্তু বিধান ও সত্য দৃঢ়মূল হইতেছে।

আমরা প্রাচীনবিধানের ইতিহাসনিচয় পাঠ করিয়া ইহাই দেখিতেছি যে, স্বর্গ হইতে যে বিধান অবতরণ করে, তাহা আরম্ভে সকলের নিকটে দুর্ব্বল ও তুচ্ছ বলিয়া প্রতীত হয়, অনেকে মনে করে যে, এই মিটমিটে দীপ একটি ফুঁ দিলেই নিবিয়া যাইবে, কিন্তু কালে যখন তাহার অন্তর্নিহিত বলক্রমে স্ফূর্ত্তি লাভ করিয়া সমুদায় পৃথিবীকে আপনার আয়ত্তাধীন করিয়া ফেলে তখন সকলে অবাক্ হইয়া পড়ে। সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না যে, ভগবান্ কি একটি ক্ষুদ্রবীজ হইতে অসাধারণ কাণ্ড করিয়া থাকেন। তাঁহার প্রেরিত বিধানের এমনই একটী আশ্চর্য্য শক্তি যে, উহা গূঢ়ভাবে বিরোধিগণের হৃদয় পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসে। খ্রীষ্টবিধানের সময় পৌত্তলিকগণ তাহাদিগের ধর্ম্ম যে ক্রমান্বয়ে ব্যাখ্যান ও অর্থান্তর দ্বারা খ্রীষ্টবিধানের অনুরূপ করিয়া তুলিবার যত্ন করিয়াছিল, তাহার মূলে এই সত্য ছিল যে, পৌত্তলিকতার উপরে তাহাদিগের শ্রদ্ধা তিরোহিত হইয়াছে, প্রচ্ছন্নভাবে নূতন আলোকের রেখা তাহাদিগের হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এ সময়ে যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র এই সত্য আমরা দেখিতে পাইতেছি তাহা আর কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না।

বিধানের চিরবিজয়িত্ব আর একটি বিষয়ে স্পষ্ট প্রকাশ পায়। ইহা আত্মবলে অধিকার বিস্তার করে, জনবল বা রাজবলে নহে। খ্রীষ্ট সমাজে যখন জনবল ছিল না, তখন উহা আপন বলে জনসাধারণের চিত্ত হরণ করিল, আবার যখন রাজবল আসিয়া উহার সঙ্গে মিলিত হইল, তখন মতভেদ উৎপন্ন হইয়া পক্ষদ্বয়ে পরিণত হইল। যে পক্ষে রাজবল ছিল, সে পক্ষকে উপেক্ষা করিয়া পক্ষান্তর ক্রমে বিধানের আত্মবলের দৃঢ় প্রমাণ দেখাইতে

লাগিল। বিধান যখন জনবল রাজবল নিরপেক্ষ হইয়া আত্মসাম্রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ, তখন ইহার বিজয় প্রতিরোধ করে, কাহার সাধ্য আছে। বিধানের চিরবিজয়িত্বে স্থির বিশ্বাসী হইয়া বিধানবিশ্বাসিগণ বিশ্বাসের পথে অগ্রসর হউন, বিধানের জয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের জয় নিশ্চয়।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

মনুষ্যেতে ধর্ম্মের প্রকাশ দুই প্রকার। এক জ্ঞানগত, দ্বিতীয় কার্য্যগত। এক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা কথার ধর্ম্ম ভালবাসেন। লোকের নিকট ধর্ম্মের তত্ত্ব সকল ব্যাখ্যা করিয়া শ্রবণ করান, এবং তজ্জনিত দুই চারিটি প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া সুখানুভব করা তাঁহার ধর্ম্ম বা স্বভাব। অপর এক শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহারা লোকের নিকট তত্ত্ব কথা প্রকাশ করিয়া বলা উচিত মনে করেন না; জীবনে ধর্ম্মাঙ্গ সকল সাধন করিয়া আয়ত্ত করাই তাঁহাদের কার্য্য। ইহার প্রথম শ্রেণীর লোকেরা জ্ঞানী নামে পরিচিত। কেন না ধর্ম্মতত্ত্ব সকল জানা ও জানিয়া বলা এ দুইটী জ্ঞানের কার্য্য। জ্ঞান বুঝিতে ও বুঝাইতে পটু। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা ভক্ত নামে পরিচিত। কেন না ধর্ম্মাঙ্গ সকল জীবনে সাধন করা ও ভোগ করা ভক্তির কার্য্য। ভক্তি করিতে ও করাইতে পটু। এই দুই শ্রেণীকে একত্র মিলিত করিবার জন্য নববিধানের অভ্যুদয়। ধর্ম্ম না বুঝিলে তাহার প্রতি অব্যাহত উদ্যম অধ্যবসায় রাখিতে পারা যায় না, সুতরাং কোন ধর্ম্মাঙ্গ সাধন করিতে হইলে পূর্ব্বে জ্ঞানযোগে তাহার ভাবাভাব প্রয়োজন প্রণালী অবগত হওয়া আবশ্যক। করিবার পূর্ব্বে বুঝা একান্ত আবশ্যক, কেননা না বুঝিলে করা যায় না। আবার কোন ধর্ম্মাঙ্গ কেবলমাত্র বুঝিয়া মনে মনে রাখিলে, তাহা জীবনশূন্য মৃতধর্ম্ম নামে পরিচিত হয়, সুতরাং ধর্ম্মতত্ত্ব সকল কেবলমাত্র বুঝিলেও চলিবে না—অনুষ্ঠান দ্বারা তাহা জীবনে পরিপাক করিয়া ভোগ করিতে হইবে। নববিধানের এই সমন্বিত ভাব কেবল কথায় রহিয়াছে, কার্য্যে কুত্রাপি ইহার সদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায় না। কেন না যাঁহারা নববিধানবিশ্বাসী বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করেন, তাঁহারাও জীবন দিয়া এই সমন্বয়ের সমাদর করেন না। অনেকেই আপনাকে প্রায় সিদ্ধপুরুষ মনে করেন, সুতরাং নূতন জ্ঞান অভ্যাস করা কিম্বা সাধন ভজন দ্বারা জীবনকে সজীব রাখা আবশ্যক মনে করেন না। অনেকেই এক পক্ষ পরে বাহির হয় যে একখানি ধর্ম্মতত্ত্ব তাহাও পাঠ করা উচিত মনে করেন না। অনেকে উপাসনা প্রায় শেষ হইলে উপাসনাতে উপস্থিত হন। ধর্ম্মতত্ত্ব যেমন একজন সামান্য লোকের লেখা বলিয়া তাহা পাঠের প্রতি মনোযোগ নাই, উপাসনাতে ও সেইরূপ আপনার উপাসনা ব্যতীত অন্যের উপাসনার প্রতি অনুরাগ নাই। আপনার উপাসনাতেও যে অনুরাগ, মিষ্টতা বোধ আছে তাহাও প্রায় দেখা যায় না। কেন না তাহা হইলে একাকীও ত দুই ঘণ্টা বসিয়া নির্জ্জনে সাধন ভজন করিতে দেখা যাইত। বাস্তবিক তাহা নহে। কেবল পরের প্রতি উপদেষ্টৃত্ব করিতেই অনেকের রুচি, নিজে উপদেশ গ্রহণ করিতে কাহার বড় রুচি দেখা যায় না। বিধানবিষয়ক যে সকল শাসন ঈশ্বরকৃপায় বিধানপ্রবর্ত্তক প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, সে সকলের সাধন করা শিক্ষা করা কাহারও আবশ্যক বোধ নাই। কাহাকেও যদি বিধানের কোন প্রয়োজনীয় তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা যায়, তিনি সেবকের নিবেদন খুলিয়া খুঁজিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িবেন, কিন্তু মর্ম্ম বলিতে পারিবেন না। এ বিষয়ে খ্রীষ্টান সমাজ অতি সম্মাননীয়, কেন না অতি সামান্য একজন খ্রীষ্টানও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রায় অধিকাংশ তত্ত্ব অবগত আছে। এই অশিক্ষা ও সাধনাভাব হইতেই হিন্দুসমাজ ধর্ম্মহীন হইয়াছে, নববিধানেও সেই নিদ্রার আবির্ভাব দেখা যাইতেছে।

আচার্য্যের উপদেশ।

ব্রহ্মখণ্ডের সংযোগ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ২৩ চৈত্র ১৮০১ শক।

যোগ বিয়োগের উপনিষদ্ শ্রবণকর। ধর্ম্মরাজ্যে কখনও যোগ বিয়োগ হয়। কখনও সহস্র একত্ব প্রাপ্ত হয়, কখনও এক সহস্র হয়; কখনও চারিটি বস্তু সংযুক্ত হইয়া এক হয়, কখন আবার বিযুক্ত হইয়া খণ্ড খণ্ড হয়। কখনও এক হইতে লক্ষ, কখনও লক্ষ হইতে এক হয়; ইহার একটির নাম যোগ আর একটির নাম বিয়োগ। সকল বস্তুর যেমন যোগ বিয়োগ হয়, ব্রহ্ম বস্তুরও সেইরূপ যোগবিয়োগ হয়। যিনি অবিভক্ত, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডপতি সময়ে সময়ে তিনি সাধকের নিকট বিভক্ত হয়েন। ঈশ্বর স্বয়ং অখণ্ড; কিন্তু সাধকেরা আপন আপন ক্ষুদ্রতানুসারে তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ধারণ করে। তিনি নিজে অখণ্ড থাকিলেও ব্রহ্ম জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা তাঁহাকে খণ্ড খণ্ড করে।

তোমরা বলিতে পার, অনিত্য বস্তুর বিয়োগ হইতে পারে; কিন্তু নিত্য বস্তুর কিরূপে বিয়োগ হয়। ঈশ্বর স্বয়ং নিত্য পূর্ণ পুরুষ; কিন্তু ক্ষুদ্র বুদ্ধি বিশিষ্ট মনুষ্য তাঁহার স্বরূপ ও গুণ খণ্ড খণ্ড করিয়া না ভাবিলে তাঁহাকে বুঝিতে পারে না। বুদ্ধি দ্বারা বুঝিবার জন্য মনুষ্য ব্রহ্মাকে বিচারের ভিতরে আনিল। ব্রহ্ম কি পদার্থ ইহা জানিবার জন্য বুদ্ধি খড়্গ লইয়া ব্রহ্মকে কাটিল। ক্ষুদ্র বুদ্ধি তন্ন তন্ন করিয়া ব্রহ্মনিরূপণ করিতে চেষ্টা করিল। যখন বেদ বেদান্তের সময় ছিল, যখন যোগীরা ধ্যান যোগে সেই অখণ্ড ব্রহ্মকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেন, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতেন না ব্রহ্ম কি পদার্থ। তাঁহারা ব্রহ্মকে অজ্ঞাত অজ্ঞেয় রাখিলেন; তাঁহারা বলিলেন ব্রহ্মকে জানা যায় না, ব্রহ্ম বুদ্ধির অগম্য। "ব্রহ্মকে যে আমি জানি ইহা নহে এবং ব্রহ্মকে যে আমি না জানি ইহাও নহে।" বেদান্ত উপনিষদের সারতত্ত্ব এই। যে অবস্থায় ব্রহ্মকে অখণ্ড অজ্ঞেয়, অচিন্ত্য বলিয়া স্বীকার করা হয় তাহা যোগের অবস্থা। যোগেশ্বর বুদ্ধি মনের অতীত। যোগের অবস্থায় বুদ্ধিখড়্গ লইয়া সেই পূর্ণ পুরুষকে কাটিতে সাহস করে না। যোগী ঋষির অবস্থায় বুদ্ধি নাই কেবল যোগ। যোগী একাগ্রচিত্তে একেরই মধ্যে মগ্ন, দুই তিনের কাছে যোগী বসেন না। যোগী একেরই কাছে থাকেন। যোগের সময় কেহই ঈশ্বরকে বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করে না। যোগেতে জীবাত্মা পরমাত্মার মধ্যে মগ্ন হইয়া যায়। যেমন যে চিনি জলকে জানিতে আসিয়াছিল, সেই চিনি জলময় হইল সেইরূপ যে যোগী ব্রহ্মকে ধারণ করিতে আসিয়াছিল সে আপনাকে ব্রহ্মজলে বিসর্জ্জন দিল। এইরূপ যোগের অবস্থায় প্রাচীন আর্য্যগণ অনেক শতাব্দী অতীত করিয়াছেন।

আবার এই বেদ বেদান্ত অথবা যোগের অবস্থার পর যখন পুরাণের সময় আসিল তখন তত্ত্ব জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা বলিল কে এই ব্রহ্মবস্তু? যিনি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করেন পালন করেন তিনি কে? তিনি কেমন? তিনি কি পদার্থ? তিনি কি পিতা? তিনি কি রাজা? তিনি কি প্রভু? যখন মনুষ্য এসকল প্রশ্নের উত্তর পাইল না, তখন সে আপনার বুদ্ধিখড়্গ লইয়া ব্রহ্মকে কাটিল। সে আপন আপন রুচি অনুসারে খণ্ড খণ্ড ব্রহ্মরূপ কল্পনা করিতে লাগিল। সে বলিল "আমি প্রেম ভাল বাসি" অতএব যে ঠাকুর প্রেমে গঠিত এবং প্রেমার্দ্র তিনিই আমার উপাস্য। এইরূপে তাহার কোমল হৃদয়ের উত্তেজনায় সে মনে করিল ঈশ্বর কেবল একটি প্রেম পদার্থ। সে সেই পদার্থের এমন নাম রাখিল যাহাতে তাহার প্রেমোদয় হয়। সেই পদার্থকে দয়ার ঠাকুর, প্রেম চন্দ্র, প্রেমসিন্ধু, দয়াময়, প্রেমময়, স্নেহময় প্রভৃতি অনেক নাম দিল এবং নানামতে দয়াগণের সুখ্যাতি করিতে লাগিল, এবং যতই সে দয়ার ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল। ততই আবার দয়ার ভিন্ন রূপ কল্পনা করিতে লাগিল। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ঘটনার মধ্যে দয়ার ব্যাপার দেখিয়া মনুষ্য দয়ার বিবিধ নাম রাখিতে লাগিল। মনুষ্য একেবারে অনন্ত দয়ার পূজা করিতে অসমর্থ হইয়া দয়াকেও খণ্ড খণ্ড করিল। মনুষ্য দেখিল যিনি ক্ষুধার সময় আহার দেন তিনি অবশ্যই দয়ার আধার। যে দয়া ক্ষুধিত জীবদিগকে অন্ন দান করে মনুষ্য সেই দয়ার নাম রাখিল অন্নপূর্ণা। অন্নপূর্ণা পৃথিবীর সমস্ত লোককে কেবলই অন্ন প্রস্তুত করিয়া দিতেছেন। তাঁহার এত দয়া যে তিনি ক্ষুধিতকে অন্ন না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। এইরূপে ঈশ্বরের অনন্তদয়াকে খণ্ড খণ্ড করিয়া মনুষ্য এক অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিরচনা করিল। এবং এইরূপে দয়ার এক এক প্রকার প্রকাশ দেখিয়া মনুষ্য এক এক অবতার পূজা করিতে আরম্ভ করিল। কেহ মনে করিল যুদ্ধের সময় যিনি পরামর্শ এবং উৎসাহ দিয়া আপনার শরণাগতদিগকে শত্রুকুলের হস্ত হইতে রক্ষা করেন তিনিও দয়ার অবতার। কেহ বলিল যিনি সংসারের নানা প্রকার বিঘ্ন বিপদ হইতে রক্ষা করেন সেই বিঘ্নবিনাশন নিশ্চয়ই দয়ার অবতার। এইরূপে পৃথিবী কেবল দয়ার পক্ষপাতী হইয়া অখণ্ড অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপ হইতে কেবল দয়াটী বাহির করিয়া এক একটি দয়ার অবতার পূজা করে। ক্ষুদ্র বুদ্ধি বিশিষ্ট মনুষ্য এইরূপে এক এক সময় ঈশ্বরের এক এক ভাব দেখিয়া কেবল তাহার পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইল, সুতরাং পৃথিবীতে ক্রমে ক্রমে নানা প্রকার পৌত্তলিক পূজা প্রচার হইল।

কেহ বলিল "আমি দয়া বুঝিতে পারি না; কিন্তু চারি দিকে একটী মহাশক্তির কার্য্য দেখিতেছি।" যিনি এই ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিলেন তিনি শক্তি, আদ্যাশক্তি, মহাশক্তি। তাঁহার শক্তি ভিন্ন কিছুই জন্মে না, কিছুই থাকে না, সমস্ত সৃষ্টি তাঁহার শক্তির লীলা। এইরূপে কেহ কেহ স্থির করিল দয়া অপেক্ষা শক্তি বড়। শক্তি ভাবিতে ভাবিতে প্রকৃতির উপরে মনুষ্যের দৃষ্টি পড়িল। প্রকৃতির সঙ্গে নারী প্রকৃতি, দেবীমূর্ত্তি প্রকাশিত হইল। যাহারা এই শক্তি পূজা করিতে লাগিল। তাহারা পৃথিবীতে শাক্তরূপে পরিচিত হইল। শাক্তেরা কেবল ব্রহ্মের শক্তি পূজা করে। ব্রহ্মেতে যে জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য ও শান্তি প্রভৃতি অন্যান্য ভাব আছে তৎসমুদায় তাহারা ভাবে না। তাহারা দেখিতে পায় এক প্রকাণ্ড শক্তি পাপাসুর সকল নিপাত করিয়া পৃথিবী রক্ষা করিতেছেন।

কেহ কেহ বলিলেন কেবল শক্তিপূজা প্রবর্ত্তিত করিলে কি হইবে? ঈশ্বর শুদ্ধ, নিজে শুদ্ধ হইয়া তাঁহার

শুদ্ধতার আরাধনা করিতে হইবে। তাঁহার শুদ্ধতার অংশ, পুণ্যের অংশ লইয়া পাপ ত্যাগ করিতে হইবে, তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে। যাহা কিছু তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধ তাহা অশুদ্ধ। এইরূপে যাহারা ঈশ্বরকে কেবল পুণ্যের আধার বলিয়া তাঁহার পূজা করিতে প্রবৃত্ত হইল, তাহাদিগের মনে অনেক প্রকার পবিত্রতার ভাব উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। তাহারা এই প্রচার করিল যে ঈশ্বর খাটী শুদ্ধতার আধার, ধর্ম্মের অবতার পবিত্র ইচ্ছার অবতার। তিনি অধর্ম্ম পাপকে ঘৃণা করেন, পাপীকে দণ্ড দেন, মনুষ্যের পাপ দেখিলে বিরক্ত হন। তিনি মনুষ্যজাতিকে পুণ্যপথ দেখাইয়া দেন, আপনি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হইয়া লোকের মনে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি উদ্দীপন করেন। এইরূপে পৃথিবীতে পুণ্যাবতার অথবা সাধু মনুষ্যের পূজা প্রবর্ত্তিত হইল।

কেহ কেহ এ সকল পথ পরিত্যাগ করিয়া কেবল জ্ঞান পথ অবলম্বন করিল। তাহারা বলিল কেবল দয়া, পুণ্য, অথবা শক্তি পূজা করিলে প্রকৃত ঈশ্বর পূজা হয় না, জ্ঞানের সাধন সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাধন। নানাপ্রকার শাস্ত্র চর্চ্চা দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপণ করা আবশ্যক। যে যথার্থ জ্ঞানী সে দিব্যজ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে লাভ করে। ঈশ্বরের জ্ঞানকে সাধকের বুদ্ধির সঙ্গে সংযুক্ত করিতে হইবে। এইরূপে এক নূতন জ্ঞানী সম্প্রদায় গঠিত হইল। বুদ্ধি দ্বারা ঈশ্বরকে জানিতে চেষ্টা করা অথবা বৌদ্ধভাব প্রবর্ত্তিত হইল। এইরূপে সাধকেরা আপন আপন ভাবানুসারে ঈশ্বরকে খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিল। সেই যোগীদের সময় এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ছিলেন, এখন পৌরাণিক সময়ে তেত্রিশ কোটি দেবতা কল্পিত হইল। পৌত্তলিকতা ঈশ্বরের অবজ্ঞা নহে। জানিয়া শুনিয়া ঈশ্বরের অবমাননা করা পৌত্তলিকতার উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু পৌত্তলিকতা ঈশ্বরের ভগ্নাংশের পূজা। পৌত্তলিকতা বিভক্ত ব্রহ্মভাব, অথবা ব্রহ্মখণ্ডের অর্চ্চনা।—দয়ালু ব্যক্তি ঈশ্বরের দয়া গ্রহণ করিয়া কেবল দয়াবতারের পূজা আরম্ভ করিল; জ্ঞানী কেবল ঈশ্বরের জ্ঞান; শুদ্ধচিত্ত সাধু কেবল ঈশ্বরের শুদ্ধতার আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। প্রকাণ্ড ভূমা ব্রহ্মকে ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া ক্ষীণ মনুষ্য ব্রহ্মের এক একটি অংশ পূজা করিতে লাগিল। এই জন্যই পৃথিবী পৌত্তলিক হইল। ব্রহ্মের এক এক অংশ লইয়া কেহ ইংলণ্ডে, কেহ চিনরাজ্যে, এবং কেহ স্থানান্তরে চলিয়া গেল। কি চমৎকার শোভা দেখ। সকলেই এক ব্রহ্মের সাধক; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন রূপ। লাল, নীল, সবুজ, হরিৎ প্রভৃতি নানা বর্ণ। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই আপন আপন ধর্ম্মকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিতেছে, এবং আপনার অবতারকে শ্রদ্ধা করিয়া অপর অবতারকে উপহাস করিতেছে। এক ব্রহ্মখণ্ডের সঙ্গে অপর ব্রহ্মখণ্ডের সংগ্রাম, দেখ ব্রহ্মের সঙ্গে ব্রহ্মের যুদ্ধ। এই যে পৃথিবীতে কালীর সঙ্গে কৃষ্ণের, শাক্তের সঙ্গে বৈষ্ণবের, হিন্দুর সঙ্গে বৌদ্ধের, এবং খীষ্টানের সঙ্গে মুসলমানের যুদ্ধ দেখিতেছ, ইহার মূলে ব্রহ্মখণ্ডের বিয়োগ দেখিতে পাইবে। এ সকল অংশের আবার যখন যোগ হইবে তখন আবার সেই এক পূর্ণ ব্রহ্মপূজা প্রবর্ত্তিত হইবে। সকলের হাতেই ব্রহ্মখণ্ড আছে; কেহ ব্রহ্মের জ্ঞানখণ্ড, কেহ তাঁহার প্রেমখণ্ড, কেহ তাঁহার দয়াখণ্ড, কেহ তাঁহার পুণ্যখণ্ড লইয়া পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে। বাস্তবিক ব্রহ্মেতে যুদ্ধ নাই। ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং নববিধান এই সমস্ত খণ্ড একত্র করিয়া পুনরায় পূর্ণাবয়ব ব্রহ্মপূজা প্রবর্ত্তিত করিবে। নববিধান সমস্ত শত্রুদলের মধ্যে বন্ধুতা স্থাপন করিবে। এই নববিধানে আমরা ব্রহ্মের শক্তির পার্শ্বে প্রেমকে, জ্ঞানের পার্শ্বে শুদ্ধতাকে বসাইয়া একমেবাদ্বিতীয়মের নিশান উড়াইব। নববিধানে বিয়োগের পরিবর্ত্তে যোগ, খণ্ড খণ্ড ব্রহ্মের পরিবর্ত্তে অখণ্ড ব্রহ্মকে লাভ করিব। এত দিন ব্রহ্ম যেন মৃতাবস্থায় ছিলেন, এখন ব্রাহ্মধর্ম্ম সকলের হস্ত হইতে ছোট ছোট ব্রহ্মখণ্ড গ্রহণ করিয়া সে সমস্ত একত্র করিয়া আশ্চর্য্য এক মহা বিরাট পুরুষ রচনা করিল। ব্রাহ্মধর্ম্ম কাহারও হস্ত হইতে মস্তক অর্থাৎ জ্ঞান, কাহারও হস্ত হইতে হৃদয় অর্থাৎ ভক্তি, কাহারও হইতে হস্ত অর্থাৎ সেবা বা দাস্য ভাব গ্রহণ করিয়া পূর্ণ ধর্ম্মের আদর্শ গঠন করিল। অতএব ভাই, বিয়োগ ছাড়, যোগ ধর্ম্ম গ্রহণ কর। ব্রহ্ম এক অখণ্ড পূর্ণ পুরুষ। এক রাজাধিরাজের রাজ্যভুক্ত হও, তোমাদের এক জমিদার, তাঁহার কুশলের রাজ্য বিস্তার কর। এই নববিধানের কার্য্য, এই জন্য নববিধান পৃথিবীতে আসিয়াছেন।

ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজ।

প্রকৃত সংন্যাস এবং ত্যাগ কাহাকে বলে জানিলে, আর মোহ থাকে না—

"কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥"

গীতা ১৮। ২

পণ্ডিতগণ বলেন, ফল কামনা করিয়া যে সকল বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান হয় কেবল সেইগুলিমাত্র ত্যাগের নাম সন্ন্যাস। আর সমুদয় কর্ম্মের ফল ত্যাগের নাম ত্যাগ—

এই সকল প্রমাণ বলিতেছে যে একই ব্যক্তি অকর্ম্মী ও কর্ম্মী হইতে পারে। কেন না কর্ম্মের ফলই তাহার দোষ, সেই ফল পরিত্যাগ করিলেই কর্ম্ম পরিত্যাগ করা হইল। সুতরাং কর্ম্ম করিয়াও অকর্ম্মী হওয়া সহজ হইল। বিশেষতঃ—

"তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়োহি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং সচ মমপ্রিয়ঃ॥

গীতা। ৭। ১৭

যে ব্যক্তি জ্ঞানী হয় সেই যোগী হইতে পারে, জ্ঞান ব্যতীত যোগ সিদ্ধ হয় না। কেন না জ্ঞানই অসৎ হইতে সৎস্বরূপ পরব্রহ্মকে বাহির করিয়া দেখাইয়া দেয়। নিত্য জ্ঞানী হইলে একনিষ্ঠ ভক্ত হইতে হইবে। কেন না যোগী যত ধ্যান মনন করিতে থাকেন ততই তাঁহার মনে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য প্রকাশ পাইয়া তাঁহাকে বিমোহিত করে, সুতরাং যোগীকে বাধ্য হইয়া ভক্ত হইতে হয়। এই প্রকার যে জ্ঞানী যোগী এবং ভক্ত, সেই আমার অত্যন্ত প্রিয় আমিও তাহার অত্যন্ত প্রিয়।

জ্ঞানী যদি যোগী হইলেন, যোগী যদি ভক্ত হইলেন, তবে ভক্তকে কর্ম্মী হইতে হইবে। কেন না—

"কুর্য্যাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মদর্থংশনকৈঃ স্মরন্।
ময্যর্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ধর্ম্মাত্মমনোরতিঃ॥"

ভাগবত। ১১। ২৯। ৯

আমাতে মন চিত্ত অর্পণ করিয়া আমার ধর্ম্মে (ভক্তিতে) আত্মা মন ও রতি (নিষ্ঠা) রাখিয়া ক্রমে ক্রমে সমুদয় কর্ম্ম করিবে, কিন্তু আপনার জন্য নহে, আমার জন্য।

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাত্তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ॥"

মহানির্ব্বাণতন্ত্র। ৮। ২২

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ হইয়া যে যে কর্ম্ম করিবে তাহা ব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবে।

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥

গীতা। ৯। ২৭

যাহা কর্ত্তব্য জানিয়া কর, যাহা খাদ্য জানিয়া খাও, যাহা হব্য জানিয়া হোম কর, যাহা দেয় জানিয়া দান কর, এবং তপস্যা কর হে কৌন্তেয়, সে সমুদয় আমাকে অর্পণ কর।

এই সকল কথা দ্বারা জানা যাইতেছে যে ভক্ত যিনি তিনি যাহা কিছু করিবেন সমুদয় ভগবানের জন্য, আপনার জন্য নহে। বস্তুতঃ ভক্ত আপনার বলিয়া কিছু রাখিলে তাঁহার ভক্ত নাম বিনষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং তাঁহার যাহা কিছু কার্য্য তাহা ভগবানের। তিনি আহার করেন, নিদ্রা যান, রোগ হইলে ঔষধ পথ্য ব্যবহার করেন, স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি পরিবারের সেবা করেন, সব করেন; কিন্তু আপনার জন্য নহে। দেহ হরির, আহার না করিলে, নিদ্রা না গেলে, ঔষধ পথ্য ব্যবহার না করিলে হরির দেহ বিনষ্ট হইবে, হরির কার্য্য ক্ষতি হইবে এই জন্য এ সকল করেন। স্ত্রীপুত্রাদি পরিবার হরির, ইহাদিগের সেবাতে ত্রুটি হইলে হরির কার্য্যে ত্রুটি করা হইবে, সুতরাং ভক্ত পরিবার প্রতিপালন করিতে বাধ্য হন।

এইরূপে যোগের সঙ্গে ভক্তির, ভক্তির সঙ্গে জ্ঞানের, জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম্মের এবং অপরের সঙ্গে অপরের পরস্পর যোগ সংস্থাপিত আছে—ভগবান্ যখন এই সকল সত্য-জগতে প্রেরণ করেন, তখন পরস্পরের সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াই প্রেরণ করেন। মানুষেরা না বুঝিতে পারিয়া ভেদাভেদ কল্পনা করে। নব বিধান আসিয়া এই যোড়জাল ছেদন করতঃ পরস্পরের গূঢ় মিলন দেখাইয়া দিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রিয়ব্যক্তির পক্ষে ইহার একটিও উপেক্ষা করিবার বস্তু নহে।

প্রচার বিবরণ।

ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত হইতে প্রাপ্ত।

শ্রীদরবারের আশীর্ব্বাদ সহ অনুমতি লাভ করিয়া গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ সন্ধ্যাকালে মালদহ ব্রাহ্মসমাজে উপস্থিত হইয়াছি। পর দিন প্রাতে অধিবাসীদিগের দ্বারে দ্বারে সঙ্গীত করিয়া মধ্যাহ্নে ভ্রাতা নীলমণি কুমারের বাসায় পারিবারিক উপাসনা হইল। বৈকালে এখানকার জনৈক জমীদার বাবু হরিশচন্দ্র চৌধুরীর গৃহে নববিধান বিষয়ে কথা-বার্ত্তা হইল, তিনি বিশেষ উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তৎপরে সন্ধ্যাকালে পুলিস ইনেস্পেক্টর, সব-ইনেস্পেক্টর, মুনসেফ, উকীল মোক্তারগণ, সব ডেপুটী, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, ডেপুটী ইনেস্পেক্টর প্রভৃতি উচ্চতম কর্ম্মচারীগণ সহ সদালাপে বুঝিলাম প্রভুর কার্য্যে ইঁহাদিগের বিশেষ সহানুভূতি আছে। প্রভাতে তাঁহাদের দ্বারে দ্বারে যে সঙ্গীত হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহারা বিশেষ আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া নববিধানের বিষয় শ্রবণার্থ বিশেষ সভা আহ্বান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তৎপরে ভ্রাতা নীলমণি বাবুর গৃহে সঙ্গীত ও প্রার্থনা হয়। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু তারিণীচরণ চৌধুরী মহাশয় বিশেষরূপে যোগ দান করিলেন, পরে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি ধর্ম্মালোচনা করিয়া আনন্দের সহিত গৃহে গমন করেন।

৫ই প্রাতে অত্যন্ত বৃষ্টিপ্রযুক্ত পথে কীর্ত্তন হয় নাই, অধিবাসীদিগের গৃহে এবং বাজারে ও প্রধান প্রধান দোকানের ভিতর ব্রহ্মনাম গীত হয়। দোকানদারেরা বিশেষ ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিয়াছিল, মধ্যাহ্নে পারিবারিক উপাসনা এবং বৈকালে হাটে প্রকাশ্য বক্তৃতা, বিষয় ভগবানের বিশ্বাসী দাস হওয়া ও সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়। অনেক লোকের সমাগম হইয়াছিল, অনেকগুলি ভদ্রলোক ছিলেন, তন্মধ্যে

মহান্ত জমীদার লছমী নারায়ণ গিরী বিশেষ আগ্রহসহকারে আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর ধর্ম্মালোচনা হয়। প্রতি দিন প্রাতে পথে কীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে পারিবারিক উপাসনা এবং সন্ধ্যার পর ধর্ম্মালোচনা হইয়াছিল।

৬ই জ্যৈষ্ঠ গোবিন্দপুরে শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা রামতারণ রায় মহাশয়ের গৃহে উপনীত হই, ইঁহার গৃহটী একটি তপস্বীর আশ্রমের ন্যায় সুন্দর,গৃহিণী বিশেষ ভক্তিমতী ও নিষ্ঠাবতী নববিধানে ইঁহার অটল বিশ্বাস, রায় মহাশয় শ্রদ্ধেয় ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয়ের বাল্যবন্ধু, ইঁহার বাসায় উপাসনা অতীব মধুর হইল, মধ্যাহ্নে তথাকার জমীদারী কাছারীতে ধর্ম্মালোচনা হইল। বৈকালে নিকটস্থ রায়পুর বঙ্গবিদ্যালয়ে "ভগবানের লীলা ও সর্ব্বধর্ম্ম ভগবানের প্রেরিত এবং কিরূপে সকল ধর্ম্ম নববিধানে সমন্বিত হইয়াছে।" তদ্বিষয়ে বক্তৃতা হইল। সন্ধ্যার পর তথা হইতে কাছারী পর্যন্ত পথে নগরবাসিগণ সহ সংকীর্ত্তন, মালদহ হইতে কয়টী উৎসাহী ভ্রাতা আমার সহিত গিয়াছিলেন। কীর্ত্তনে তাঁহাদিগের বিশেষ উৎসাহ প্রকাশিত হইল অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত নায়েব বাবু গোবিন্দচন্দ্র ঘোষের বাসায় সংকীর্ত্তন ও সঙ্গীত হইল। ক্রমশঃ

সংবাদ।

বিগত ২১এ মে সোমবার কুচবিহার মহারাজার আলীপুরের ভবনে তৃতীয় রাজকুমারের জন্ম উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হইয়াছিল, ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল উপাসনা করেন।

ভাই কালীশঙ্কর দাস কবিরাজ মহাশয়ের শারীরিক অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা কিছুই বিশেষ নহে, বরং পদদ্বয় ক্রমেই আরও অকর্ম্মণ্য হইয়া আসিতেছে। এতাধিক সাড়হীন যে রাত্রিতে আরশুলা পায়ের মাংস কাটিয়া লইয়া গেলেও তিনি কিছুই জানিতে পারেন না। তাঁহার বাহিরের অবস্থা দেখিলে নিতান্তই কষ্ট বোধ হয়। কিন্তু দয়াময় হরির কি বিচিত্র মহিমা, তিনি তাঁহার এই দুর্ব্বল রুগ্ন সন্তানের মনে আশ্চর্য্য বল বিধান করিয়া তাঁহাকে অনেক পরিমাণে সুখী রাখিয়াছেন। আমাদের ভ্রাতা এ অবস্থাতেও প্রবন্ধ লেখা এবং প্রুফ প্রভৃতি দেখিয়া দেওয়ায় পত্রিকাদী প্রকাশের পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিতেছেন।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের পত্র হইতে উদ্ধৃত।

"৮০ আশি মাইল গরুর গাড়ীতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঈশ্বর প্রসাদে কল্য অপরাহ্ন শিবসাগর নগরে পৌছিয়াছি। কাল ২০ বিশ মাইল গরুর গাড়ীতে চিবক চা-বাগিচা হইতে আসিতে হইয়াছে। নিগ্রিটিং হইতে জোড়হাট, জোড়হাট হইতে চিবকে আসিয়াছিলাম। আগামী রবিবার পর্য্যন্ত এই শিবসাগরে থাকিতে একান্ত বাধ্য হইয়াছি। শিবসাগর হইতে আরও ১০ মাইল গরুর গাড়ীতে চলিলে জাহাজ ধরিতে পারিব। আসামের ডাঙ্গার পথ বড় কষ্টকর। কোথায়ও কিছু খাবার পাওয়া যায় না, এমন কি মুখে দেওয়ার উপযুক্ত জল পাওয়া যায় না। পথে কদাচিৎ কোথাও মহিষে-দৈ ও বাঁচে কলা পাওয়া যায়। কাল তাহাই কিনিয়া ফলার করিয়াছি। অধিকাংশ রাস্তাই জঙ্গলময়, বৃষ্টি হওয়াতে কাদা হইয়া অনেক স্থানে পথ দুর্গম হইয়াছে। কোন কোন দিন যথাসময়ে স্নানাহার না হওয়াতে দিবারাত্রি মাথা ধরা থাকে, জ্বর জ্বর বোধ হয়। কিন্তু ঈশ্বর কৃপায় শরীর তেমন অসুস্থ হয় নাই। সকল স্থানে প্রেমময়ী জননীর প্রেম ও করুণা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি। ডিব্রু হইতে আগামী সপ্তাহের মধ্যে তেজপুরে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ তথায় উৎসব হইবার কথা আছে। আমার সঙ্গের বন্ধুটী গরুর গাড়ীতে চলিয়া বড় কষ্ট বোধ করিতেছেন।

প্রেরিত।

পূজনীয় ভাই শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয়
শ্রদ্ধাস্পদেষু—

সবিনয় প্রণামানন্তর নিবেদনমেতৎ—

মহাশয়! প্রেরিতবর্গের কি শেষ এই পরিণাম! আচার্য্যদেব দেহে নাই বলিয়া কি আমাদিগকে বাস্তবিক রাখালহীন মেষদলের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া অবশেষে বৃকের হাতে প্রাণ দিতে হইবে? দারুণ ভয়ের কারণ, ভাবিতে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, তাই নিতান্ত প্রাণের দায়ে আজ আপনাদের ন্যায় গুরুজনের কার্য্যকলাপের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিতে সাহসী হইলাম। আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণে আমাদের মনে যারপর নাই ভাবনা হইয়াছিল, অশেষ প্রকারের আশঙ্কা চিত্তকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল, এবং সয়তানের খেলাতে প্রাণ হারাইতে হইবে বলিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়াছিলাম। কিন্তু শেষে মনে একটা বড় ভরসা হইয়াছিল যে, তিনি পশ্চাতে যাঁহাদিগকে রাখিয়া গেলেন, অন্ততঃ তাঁহাদের জীবিতকাল পর্য্যন্ত আমাদিগকে কোন প্রকার অভাব বোধ করিতে হইবে না। তাহারা আচার্য্যদেবের অভাব সম্পূর্ণ বোধ করিবেন সন্দেহ নাই, কিন্তু আমাদের সকল প্রকারের অভাব ইহাঁদের দ্বারাই মোচন হইবে, আমাদের

শিক্ষার জন্য আচার্য্যদেবের হস্তগঠিত প্রেরিত বর্গই যথেষ্ট আমাদের ভয় ভাবনার কোনই কারণ নাই। কিন্তু আমাদের ভাগ্য এতই মন্দ যে, আচার্য্যদেব ইহলোক হইতে যাত্রা করিয়া বৈকুণ্ঠধামে উপনীত না হইতেই এখানে এমনই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল যে সে হুলস্থূল ব্যাপারে কাহারও রক্ষার আর সম্ভাবনা রহিল না। অতবড় একটা প্রকাণ্ড শোকের ব্যাপার অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার উচ্চপদে সেই উজ্জ্বল রত্নসিংহাসনে কে বসিবে, তাঁহার পদমর্য্যাদার কে উত্তরাধিকারী হইবে, এই বিষয় লইয়া ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। শেষ তাঁহার বেদী লইয়া কাড়াকাড়ী, পুলিস পর্য্যন্ত ডাকাডাকি করিতেও ত্রুটি হইল না। সেই তুমুল সংগ্রামে যে সকল ঘটনা সমুপস্থিত হইল তাহার বিবরণ দ্বারা ধর্ম্মতত্ত্বের পবিত্র স্তম্ভ কলঙ্কিত করিতে ইচ্ছা করি না। বেদীর বিষয়ে নানাস্থান হইতে যেরূপ নানাপ্রকারের সমালোচনা হইয়া গিয়াছে তাহাতে ঐ সম্বন্ধে আর কিছু বলা অনাবশ্যক। এখন আমরা যাহা বুঝিবার যোগ্য এবং যেসকল বিষয়ে অনিয়ম ঘটাতে আমাদের হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিয়াছে ও আমাদের আত্মার কল্যাণের ব্যাঘাত জন্মিয়াছে, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তাহারই আলোচনা করিব।

প্রথম দরবার। আচার্য্যদেবের প্রতিষ্ঠিত যে সকল মহদনুষ্ঠান পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে তন্মধ্যে শ্রীদরবার যে সর্ব্বপ্রধান এবং সকল বিষয়ে সর্ব্বোচ্চ, একথা বোধ হয় সর্ব্ববাদীসম্মত। কোন সাধক বা উপাসক যে ইহাতে আপত্তি করিতে পারেন ইহা বিশ্বাসই করা যায় না। যদিও কোন কোন প্রেরিত প্রকাশ্য বা পরোক্ষে দরবারকে অবজ্ঞা করিয়া নিজের উদ্ধত ভাব বা অবনতির পরিচয় দিয়াছেন সত্য তথাপি দরবারের ক্ষমতা যে এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে, এবং সহস্র উৎপাত অত্যাচার অতিক্রম করিয়া চিরকাল থাকিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কাহারও অধিকার নাই। শ্রীদরবার আচার্য্যদেবের প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং দরবার স্বর্গের সামগ্রী, সাক্ষাৎভাবে ঈশ্বরের নিজ হস্তগঠিত অনুষ্ঠান। এইরূপে ভিন্ন অন্য যে কোন প্রকারে দরবারের ব্যাখ্যা করা হইবে তাহাতে যে দরবারের ঠিক ভাব বুঝান হইবে না এমত নহে, উহা দ্বারা দরবারকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করা হইবে। দরবারের প্রত্যেক সভ্য যে সমান ভাবে বিদ্বান, পণ্ডিত জ্ঞানী ভক্তযোগী, এমন কথা নয়, কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়? স্বয়ং আচার্য্যদেব দরবারকে সমুচিত সম্মান দিয়া গিয়াছেন, আমরা কে যে সেই দরবারকে আজ অল্প সম্মান দিতে অগ্রসর হই? এই দরবারের অন্তর্ভূত যিনি থাকিবেন তিনিই কেবল প্রকৃত প্রেরিত নামের যোগ্য তৎপদোচিত ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। যেমন হিন্দুসমাজে নিয়ম আছে গ্রহাচার্য্যের সম্মুখে জ্যোতিষের পুঁথি না থাকিলে শুদ্ধ তাঁহাকে প্রণাম করা যায় না, এখানেও তাই; বরং আরও বেশী। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি যেমন কোন কারণে বিচ্ছিন্ন হইলে নিতান্ত মূল্যহীন, অস্পৃশ্য, ঘৃণার সামগ্রী হয়, শ্রীদরবার রূপ দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রেরিতগণের বিচ্ছিন্নাবস্থায় কি সেই দশা ঘটিবে না? ঐরূপ প্রেরিত অন্যান্যদিকে মহাসাধু হইলেও কেবল ঐ কারণে বিষম অপরাধী। যিনি প্রেরিত নাম পাইয়া নানা প্রকারে দরবারের বিরুদ্ধাচরণ করত তাহাকে অবজ্ঞা করিলেন, তিনি প্রকারান্তরে আচার্য্যদেবকে অস্বীকার করিলেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের বিদ্রোহাচরণেও বাকি রহিল না। আচার্য্যদেব অনেক স্থলে এরূপ বলিয়াছেন যে ব্যক্তিগত প্রত্যাদেশ বাস্তবিক ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিল কি না, সে বিষয়ে সংশয় হইতে পারে, কিন্তু দরবারের পবিত্র ভূমিতে যে প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হইবে তাহা যে প্রত্যক্ষ ঈশ্বরের বাণী ইহা সন্দেহ করিবার মর্ত্ত্যলোকে কাহারও অধিকার নাই। শ্রীদরবার ঈশ্বরের এত নিকটে অবস্থিত।

আচার্য্যদেব দেহত্যাগ করিয়া আমাদিগকেও জন্মের-মত পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, ইহা যাঁহার বিশ্বাস, তিনিই কেবল দরবারকে অবহেলা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, অন্যের সাধ্য কোথায়? মুখে বলি, আচার্য্যদেবের সহিত আমাদের অনন্তকালের সম্বন্ধ, তিনি কোন কালে আমাদিগকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না, কিন্তু কার্য্যে স্পষ্ট তাঁহার অস্তিত্ব বিশ্বসংসার হইতে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করি, তাঁহার ব্যবস্থা ও কার্য্যপ্রণালীতে দোষ অনুসন্ধান করিয়া বাহাদুরী লইতে বিশেষ যত্ন পাই; অথচ আমি একজন তাঁহার প্রধান শিষ্য ও প্রেরিতবর্গের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহা জগতের সমক্ষে প্রতিপন্ন ও ঘোষণা করিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছা রাখি ও বহু প্রয়াস পাই, এ কেমন কথা? যিনি আচার্য্যদেবকে ধর্ম্মপথের সহায় বলিয়া মানেন, তাঁহার পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য, তিনি দেহ থাকিতে তাঁহার সম্মুখে ও অনুমোদনে যাহা যাহা করিতে পারিতেন এখনও ঠিক তাহাই করেন, একচুলও কম বেশী না হয়; যেন তিনি জীবিতই আছেন। তিনি দেহে থাকিতে কি কাহারও সাধ্য হইতে আপনার মধ্যে এরূপ বিসম্বাদ করিত বা পরস্পরের প্রতি এরূপ বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিয়া অযথা নিন্দা কুৎসা করিতে? সেই প্রেমিক ভক্ত কি এসব ব্যাপার সহ্য করিতেন? আর এক কথা বড় ভয়ানক, আচার্য্যদেবকে আমরা সাক্ষাৎ ঈশ্বরের প্রেরিত প্রত্যাদিষ্ট বিধানবাহক মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করি,

অথচ তাঁহার ব্যবস্থাপিত উপাসনা প্রণালী অসঙ্গত, বলিয়া পরিবর্ত্তন করিতে দাঁড়াই, ইহাই বা কিরূপ ভক্তি, নিষ্ঠা উদারতা? প্রত্যেক বিধানবাদী স্বীকার করিতে বাধ্য যে আচার্য্যদেব দেহে থাকা কালীন যতখানি ঈশ্বরের নিকটে ছিলেন এবং জীবনের প্রত্যেক কাজ, বিশেষ বিধান সম্পর্কীয় প্রত্যেক বিষয়, যে ভাবে ভগবানের প্রত্যক্ষ আদেশ গ্রহণ করিয়া ব্যবস্থা করিতেন, সেরূপ তাঁহার সময়ে বা এখন আর কাহারও দ্বারা সম্ভবে না, এ বিষয়ে সমান হওয়াত বহুদূরের কথা এক দশমাংশ কাহাতেও আছে কি না সন্দেহ। এমন স্থলে তাঁহার কোন ব্যবস্থা কি প্রকারে আমরা উল্টাইতে সাহস করি? এরূপ পরিবর্ত্তন প্রস্তাব দ্বারা কি বুঝায় না যে তিনি আমাদের অপেক্ষা খুব কম বুঝিয়াছিলেন, বা ঈশ্বর তাঁহাকে এমন গুরুতর বিষয় ভালরূপে বুঝাইতে চাহেন নাই, তাঁহাকে উপযুক্ত বোধ করেন নাই, এত দিন পরে আমাদিগকে যোগ্যপাত্র স্থির করিয়া তাঁহার ভুল দেখাইয়া দিতেছেন? আচার্য্যদেবের উপাসনাপ্রণালী সংশোধন যোগ্য, আমরা এতকাল পরে ইহা ঠিক করিলাম, ইহা ভাবিতেও প্রাণ কাঁপে! আমাদের অহঙ্কার কি শেষ আচার্য্যদেবের মস্তক পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে প্রস্তুত? তবে আর বাকি রহিল কি? আমাদের দ্বারা ত সকলই সম্ভবে। এখন আমরা কোথায় গিয়া পড়িলাম, একেবারে কি অন্ধ হইয়াছি? সর্ব্বনাশ,' একথা সকলেই জানে যে নববিধানে চিরকাল নূতন নূতন ব্যাপার প্রকাশ হইবে, এবং আচার্য্যদেবের প্রচারকপরিবার অনেক বাকি ছিল, উপযুক্ত সময়ে তাহা পৃথিবী পাইবে। আর ইহাও নিশ্চয় যে ভবিষ্যতে বহু মহাজন আবির্ভূত হইয়া নববিধান সমাচার অনেক শুনাইবেন, এবং কালের উপযোগী পরিবর্ত্তন ও সম্ভব; কিন্তু তাই বলিয়া কি আমরা আচার্য্যদেবের ব্যবস্থা প্রণালী ওলট্ পালট্ করিবার যোগ্য? এরূপ কাজের জন্য যিনি আসিবেন তাঁহাকে জগৎ চিনিয়া লইবে। এখন কেহ সেরূপ নাই, ইহা ধ্রুব। এই কয় বৎসরের মধ্যে যদি কোন বিষয়ে কোনরূপ পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়া থাকে তাহা দরবারে প্রত্যাদেশ দ্বারা সর্ব্ববাদী সম্মত ভাবে আসিবে, যে আলোক সবাই পাইবে; দুই এক জনের ব্যক্তিগত মতে হইতে পারে না।

ক্রমশঃ

জিয়াগঞ্জ
১৮ ই বৈশাখ।

নিবেদক—
শ্রীচন্দ্রশেখর সেন—

মান্যবর শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয়
করকমলেষু।

মহাশয়,

বালেশ্বর জেলার পশ্চিমবাড় নামে একটী গ্রাম আছে। তথায় গ্রামবাসীগণের বিশেষ উৎসাহে ১৮৮৮ সালের ৭ই এপ্রিল তারিখে "সংস্কারক" নামে একটী সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত, এমন কি মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বেও এখানে কোন প্রচারক আসেন নাই। সম্প্রতি বালেশ্বর ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষণ চন্দ্রপাণ্ডা উক্ত জেলার নানা স্থানে সত্যস্বরূপের সত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া ৩০ শে এপ্রিল সোমবার আমাদের পশ্চিম বাড়গ্রামে উপস্থিত হন, এবং সেই দিবস সন্ধ্যার সময়ে বেদী গ্রহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মোপাসনা করেন। তাহাতে সমাজের সভ্যগণ উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। উপাসনান্তে সমাগত ব্যক্তিবর্গের সহিত ধর্ম্মালোচনা হয়। তৎপর দিবস প্রচারক মহাশয় সমাজগৃহে প্রহ্লাদ চরিত্র সম্বন্ধে কথকতা করেন; মধ্যে মধ্যে রাগরাগিণী সংযুক্ত সঙ্গীতাদিও হইয়াছিল। গ্রামস্থ প্রায় শতাধিক লোক উপস্থিত ছিলেন। আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলে নিঃশব্দভাবে বসিয়া তাঁহার কথোপকথন শ্রবণ করিয়া বিমুগ্ধ হইলেন। পর দিবস অপরাহ্ণ ৫টার সময় নগরকীর্ত্তন আরম্ভ হয়। গ্রামস্থ অনেকেই একত্রিত হইয়া পথে পথে হরিগুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে উন্মত্তপ্রায় হইয়া গ্রাম প্রদক্ষিণপূর্ব্বক রাত্রি ৯টার সময় প্রত্যাগত হইলেন। পরিশেষে হৃদয়গ্রাহী উপাসনা দ্বারা এই গ্রামে প্রচারক মহাশয়ের কার্য্য শেষ হয়।

উপসংহার কালে আমাদের সবিনয় প্রার্থনা এই যে, প্রচারক মহাশয় আজ আমাদিগকে যে ভাবে উৎসাহিত করিলেন, মধ্যে মধ্যে এই প্রকার কোন প্রচারক মহাশয় আসিয়া আমাদের উৎসাহবর্দ্ধন করিলে উপকৃত হইব। মঙ্গলময় বিধাতা আমাদের আশা পূর্ণ করত প্রচারক মহাশয়ের মঙ্গল বিধান করুন।

৪ঠা মে, ১৮৮৮।
বালিয়াপাল পোঃ অঃ
জেলা বালেশ্বর।

নিবেদক—
শ্রীরমানাথ মাইতি।
হেডমাষ্টার, পশ্চিমবাড় মাইনর স্কুল।

এই পত্রিকা ৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্।
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে।

২৩ ভাগ। ১১ সংখ্যা। } ১ লা আষাঢ়, বৃহস্পতিবার, ১৮১০ শক। { বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৹ মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে শ্রীহরি, তুমি অতি পুরাতন, তোমার সঙ্গে আমাদিগের সম্বন্ধ আজকার নয়। পূর্ব্বে ছিল, এখন আছে, চিরকাল থাকিবে। যদি সম্বন্ধ পুরাতন হয়, তবে কি প্রকারে বলিব, তোমার সঙ্গে আমাদিগের, প্রভু পরিচয় নাই, বল আমরা কেমন করিয়া তোমার হই? এই সকল সংসারের বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন; বিষয় বিভব, প্রাকৃতিক পদার্থ সমূহ, এ সকলের সঙ্গে জন্ম হইতে সম্বন্ধ আছে। কৈ, হরি, তোমার সঙ্গে তো আমাদিগের এক দিনের জন্যও দেখা সাক্ষাৎ নাই, তবে বল কি প্রকারে এ সকল ছাড়িয়া আমরা তোমার হই? কেহ কি পরিচিত ছাড়িয়া অপরিচিতের পশ্চাতে গমন করিয়া থাকে? মেষযূথ পরিচিত পালকের কণ্ঠধ্বনি দূর হইতে শুনিয়া দৌড়িয়া যায়, কিন্তু অপরিচিত কণ্ঠরব শুনিলে নিকটে যাওয়া দূরে থাক, বরং ভয়ে পলায়ন করে। বল নাথ, তোমার সুমধুর কণ্ঠস্বর আমরা কি কখনও শুনি নাই? যদি একবারমাত্র শুনিয়া থাকি, তবুও তো তোমাকে অস্বীকার করিতে পারি না। পাপী মানবকে তোমার কণ্ঠধ্বনি শ্রবণ করাইলে, এ তাহার কত সৌভাগ্য। দীনবন্ধো, একবার নয় দুবার নয় সহস্রবার তোমার কলকণ্ঠের মধুর স্বর যাহারা শুনিয়াছে, বল আজ তাহারা অপরিচিত বলিয়া তোমায় ছাড়িয়া সংসারের কথায় কর্ণপাত করে কি প্রকারে? তোমার সুপরিচিত স্বরে তোমার মেষযূথ, তোমার অনুসরণ না করিয়া বিশ্বাসঘাতক সংসারের অনুসরণ করিবে, ইহার তুল্য আর অসহ্য ব্যাপার কি আছে? হে দীনজনগতি, তুমি আমাদিগের এই দুর্গতি নিবারণ কর। আমরা যেন, কখন তোমার মধুর কণ্ঠস্বর না ভুলি, এবং সেই স্বরের অনুবর্ত্তন করিয়া সকল প্রকারের পাপ মোহ হইতে উত্তীর্ণ হই। হে আমাদিগের চিরপরিচিত ঈশ্বর, আমরা তোমার চিরপরিচিত জানিয়া তোমার চরণে যাহাতে একান্ত আবদ্ধ হইয়া পড়ি তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর, এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

দ্বিবিধ চেষ্টা।

ঈশ্বর চেষ্টার সহিত মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন এই জন্য মানুষ চেষ্টাবান্‌রূপে প্রকাশ পায়। মানুষের এই চেষ্টাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক ঈশ্বরের আনুগত্যের দিকে, দ্বিতীয় বিরোধের দিকে। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য, ঈশ্বরের আশ্রয়ত্ব, ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি বুঝিতে

মানুষকে অধিকারী করিয়াছেন, এবং নিজের অসামর্থ্য, নিজের আশ্রিতত্ব ও অজ্ঞতা প্রভৃতি বুঝিবার শক্তিও মানুষকে প্রদান করিয়াছেন। তার উপর এই উভয় অবস্থা বুঝিয়া ঈশ্বর আশ্রয় মানুষ আশ্রিত, ঈশ্বর সমর্থ মানুষ অসমর্থ, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ পূর্ণপ্রজ্ঞ, মানুষ অজ্ঞ, ঈশ্বর বস্তু মানুষ ছায়া ইহা জানিয়া ঈশ্বরের আনুগত্য করিতে অধিকার প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং এইটি মানুষের মনুষ্যত্ব। সে যদি চেষ্টা না করে—চেষ্টা করিবার, ঈশ্বরের অনুগত হইয়া চলিবার ক্ষমতা আছে তবু যদি সে তাহা না করে, যদি উপেক্ষা বা আলস্য করে তবে মনুষ্যত্বের অনুরূপ কার্য্য করা হইবে না।

দ্বিতীয় প্রকার চেষ্টা ইহার বিপরীত। মানুষকে এক দিকে যেমন ঈশ্বরজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়া তাহাকে ঈশ্বরের আনুগত্য করিতে বিধাতা বাধ্য করিয়াছেন ও শিক্ষা দিয়াছেন, অন্য দিকে তেমনি ঈশ্বরকে জানিয়াও তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। ঈশ্বরের বিরোধী হইয়া পাপ করা, কিম্বা ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ হইয়া প্রতি কথায় প্রতি কাজে তাঁহার মুখাপেক্ষা করা, এ দুইটি বিষয়ে ঈশ্বর মানুষকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং সে ইচ্ছা করিলে বিরুদ্ধ পথে চেষ্টা করিতে পারে, ইচ্ছা করিলে আনুগত্যের পথেও চেষ্টা করিতে পারে। এই জন্য মানুষের চেষ্টা দ্বিবিধ। যদিও মনুষ্য ইচ্ছা করিলেই পাপী, ইচ্ছা করিলেই সাধু ভক্ত হইতে পারে এ ক্ষমতা মানুষকে তিনি অর্পণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার সঙ্গে তাঁহার পরিত্রাণদাতৃত্ব বিসর্জ্জন করেন নাই, সেটি তিনি আপনার হস্তে রাখিয়াছেন।

স্তন্য দান করা জননীর অধিকার, আর ক্রন্দন করা শিশুর অধিকার। এ স্থলে এমন কৌশল সংযোজিত হইয়াছে যে ক্ষুধা হইলে শিশুর পক্ষে ক্রন্দন না করিয়া থাকিতে পারা অসম্ভব, এবং শিশুর ক্রন্দন শুনিয়াও স্তন্য দিতে উপেক্ষা করা জননীর পক্ষে অসম্ভব। যদিও ইচ্ছা হইলে শিশু কাঁদিতেও পারে ইচ্ছা হইলে নাও কাঁদিতে পারে, জননী যদিও ইচ্ছা করিলে স্তন্য দিতে পারেন, এবং নাও দিতে পারেন, তত্রাচ ইহা অপ্রাকৃতিক এবং অসম্ভব। শিশুর যখন ক্ষুধা হয়, সেই ক্ষুধার উত্তেজনাকে উপেক্ষা করিবার ক্ষমতা শিশুর থাকিলেও তাহা সে করিতে পারে না। সেইরূপ শিশুর ক্রন্দনকে উপেক্ষা করিবার ক্ষমতা থাকিলেও জননী তাহা করেন না। ক্ষুধা শিশুকে কাঁদায়, ক্রন্দন জননীর হৃদয় নিহিত দয়াকে উত্তেজিত করিয়া তোলে। ক্ষুধার উত্তেজনায় শিশু ক্রন্দন করিতে বাধ্য, দয়ার উত্তেজনায় জননী স্তন্য দান করিতে বাধ্য। এই ব্যাপারটি অতিশয় সহজ ও স্বাভাবিক। এইরূপ মনুষ্য আত্মদৃষ্টির সহজ আলোকে যখন আপনার অভাব দুর্ব্বলতা প্রভৃতি দর্শন করিতে পায় তখন ক্রন্দন না করিয়া থাকা তাহার পক্ষে অসম্ভব, এবং দুঃখেপতিত দুর্ব্বল অসহায় মানবাত্মা ক্রন্দন করিতেছে ইহা শুনিয়া ঈশ্বরের দয়া উত্তেজিত না হওয়া ও পরিত্রাণ না দেওয়া অসম্ভব। কিন্তু সংসারে সর্ব্বদাই ইহার বিপরীত লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। কত শত শত সহস্র সহস্র লোক সংসারে আছে এবং প্রতি দিন আসিতেছে, তাহার মধ্যে অধিকাংশ লোক আপনার দুরবস্থা ও ঈশ্বরের শক্তিমত্তার কথা স্মরণ করে না। কেহ ঈশ্বর যে এক বস্তু আছেন তাহাও চিন্তা করে না। কেহ বা ঈশ্বরকে জানে তাঁহার নামও শুনিয়াছে তত্রাচ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকে। দেখিলে বোধ হয় তাহারা যেন প্রতিকূলাচরণ করিবার জন্যই জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। জন্ম হইতে মৃত্যু, বাল্য হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত ক্রমাগত তাহারা পাপ দুঃখ সঞ্চয় করিতেছে ভোগ করিতেছে, কিন্তু চেতনা নাই। ইহা দেখিয়া মানুষ যে আত্মজ্ঞ হইয়া অর্থাৎ আপনার অভাব

দৌর্ব্বল্য ও দুঃখ সঙ্কুল অবস্থা জানিয়া, ঈশ্বরের অভয়দাতৃত্ব ও শক্তিমত্তার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, সে শক্তি, সে চেতনা যে তাহার আছে—অথবা মুদ্রিতাবস্থারও যে পুনরুন্মেষ হওয়া সম্ভব ইহা মনে ধারণা করা যায় না। "মানুষের দুঃখ আছে—দুঃখ বোধ হইলেই সে নিশ্চয় কাঁদিবে, কাঁদিলেই ঈশ্বর নিশ্চয় দয়া করিবেন" এ ভাব আর মনে হয় না। মনে হয় মানুষ যেন চিরকাল নরকে পচিয়া মরিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, নরহন্তা পুনঃ পুনঃ নরহত্যা করিতে করিতে তাহার হৃদয় পাষাণতুল্য কঠিন হইয়া যায়, তাহার সে হৃদয়ে আর সহসা দয়ার সঞ্চার হয় না, তাই বলিয়া মানুষ কখন পশু নহে। মানুষের মনুষ্যত্ব আছে সে মনুষ্যত্ব নিস্তেজ হইতে পারে কিন্তু একেবারে বিনষ্ট হইতে পারে না। জগতের কোটি কোটি লোক অচেতনবৎ আত্মহারা হইয়া আছে ইহা দর্শন করিয়া যদিও মনে আশঙ্কা হয়, কিন্তু পরীক্ষা দেখিলেই সকল আশঙ্কা দূর হইয়া যাইতে পারে। এই বিশ্বসংসারে যে সকল লোক অচেতন প্রায় অবস্থিতি করিতেছে তাহাদিগকে যদি প্রশ্ন করা যায় নিশ্চয় তাহাদিগের চেতনার লক্ষণ সপ্রমাণ হইবে। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় "এই হস্তপদবিশিষ্ট দেহ কি তুমি?" সে কখন স্বীকার করিবে না। সে মহা মূর্খ হইলেও বলিবে, "এই হস্তপদাদিবিশিষ্ট দেহ আমি নহি, কিন্তু এই দেহের অতিরিক্ত এক বস্তু এই দেহ ব্যাপিয়া আছে যাহার অধিষ্ঠানে ইহা চলে বলে ও কার্য্য করে, সেই চেতন বস্তু আমি, যাহার অভাবে এই জড় দেহ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়।" আবার যদি প্রশ্ন করা যায়, "তুমি আছ কিরূপে? তোমার উদরের অন্ন রক্ত হয় কিরূপে? তোমার সমুদায় শরীরে রক্ত সকল চলাচল করে কিরূপে?" ইহার উত্তর দিবার সময় সে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে ভুলিবে না। অতএব মানুষের ভিতরে এমন বস্তু ও শক্তি আছে যাহার বলে সে আপনার অভাব ও ঈশ্বরের পূর্ণতা অনুভব করিতে সমর্থ। ঈশ্বর মানুষকে স্বতন্ত্র ইচ্ছা, স্বতন্ত্র রুচি, স্বতন্ত্র ভাব, দিয়া, সত্য মিথ্যা ইত্যাদির বিচার করিবার অধিকার দিয়া সম্পূর্ণ স্বাধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এবং তাহার সঙ্গে উদ্যম অধ্যবসায় ও চেষ্টা প্রভৃতি দিয়া তাহাকে অবস্থার উপরে জয়লাভ করিতে সম্পূর্ণ অধিকার প্রদান করিয়াছেন। এই জন্য তিনি মানুষের নিকট বলপূর্ব্বক আনুগত্য চাহেন না, তিনি চাহেন, যে মানুষ আমার সাহায্য ভিন্ন একটি নিঃশ্বাসও ছাড়িতে পারে না, সে আমাকে সেই ভাবে (জীবনের জীবনরূপে) জানিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক আমার আনুগত্য করিবে, আমি তাহার প্রতি বলপ্রয়োগ করিব না। "সে আমার আমি তার" ইহা বুঝিতে তাহাকে সামর্থ্য দিয়াছি তবে আর বলপ্রয়োগ করিব কেন?" এই জন্য না কাঁদিলে তাঁহার দয়া আইসে না, এবং প্রকৃত রূপে কাঁদিতে পারিলে দয়া আসিবেই আসিবে তৎপক্ষে কোন সংশয় নাই।

অনেক লোক আছেন যাঁহারা ঈশ্বরের দয়ার কথা মুখে বলিয়া অতিউচ্চ শ্রেণীর আস্তিকদিগের মধ্যে আপনাকে নিবিষ্ট করেন কিন্তু তাঁহার দয়া পাইবার জন্য প্রকৃত চেষ্টা যাহা নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা করেন না। যদি বলা যায় পাপ ছাড়, কুবাসনা ও বিলাসপ্রিয়তা ছাড়, মন্দরুচি মন্দ অভ্যাস ছাড়" সে বলে "এ কি কথা? আমি কি আপনি আপনার পরিত্রাতা হইব? এ সকল ঈশ্বর না ছাড়াইলে আমি কি প্রকারে ছাড়িব?" এই কথা গুলি শুনিতে অতিশয় মিষ্ট, এক দিকে ইহা অতি নম্রতা ও সুশীলতার পরিচয় প্রদান করে অন্য দিকে ইহা ঘোরতর নাস্তিকতা পোষণ করে। সাধক সাধন ভজন না করিয়াই ঈশ্বরের দয়ার প্রত্যাশা করিবে এবং আপনাকে আলস্য ও ঔদাস্যের

ভিতরে বদ্ধ করিয়া রাখিবে ইহা নাস্তিকতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমি কিছুই চেষ্টা যত্ন করিব না ঈশ্বর স্বয়ং চেষ্টা করিয়া আমাকে ভাল করিবেন, ইহা প্রণালী অনুসারে সিদ্ধ হয় না, হইতে পারে না।

বড় বড় সাধু ভক্তেরা ইহা বলেন সত্য যে ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই, কিন্তু একথা বলিয়াও তাঁহারা চেষ্টা করিতে বিরত হন না। পরিত্রাণপ্রদ ঈশ্বর থাকিতে আমি নিজের চেষ্টায় পরিত্রাণ পাইলাম একথা উচ্চারণ করিতে তাঁহাদিগের রসনা স্ফূর্ত্তি পায় না। তাঁহারা বলেন, "আমি চেষ্টা করিব যত্ন করিব তবু আমার চেষ্টায় তাঁহাকে পাইয়াছি এ কথা মুখে আনিব না। কেন না তাহাতে তাঁহার দয়ার অবমাননা হয়। আমি সহস্র চেষ্টা করিলেও তাঁহার দয়া ভিন্ন আমি তাঁহাকে পাইতে পারি না।" আর এক শ্রেণীর সাধক আছেন তাঁহারা কি স্পর্দ্ধা করিয়া বলেন—

"হস্তমৎ ক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাৎ কৃষ্ণ কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াদ্ যদি যাতো হসি পৌরুষং কথয়ামিতে॥"

"হে কৃষ্ণ! তুমি বলপূর্ব্বক আমার হস্ত উৎক্ষিপ্ত করিয়া চলিয়া গেলে? এটা আর এমন অদ্ভুত কি? কিন্তু হৃদয় হইতে যদি বাহির হইয়া যাইতে পার তবে তোমার পৌরুষ বলিব।" এই সাধক অতি উচ্চ, অতি সরল। ইনি আপনাকে যেমন অকপট সাধক বলিয়া বিশ্বাস করেন, ঈশ্বরের দয়াতেও সেইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস করেন। সুতরাং ইহাঁরা ঈশ্বরকে ধমকাইতেও পারেন। কেন না তিনি জানেন যে "তাঁর ভক্তি বিশ্বাসের ভিতরে বিন্দুমাত্রও ফাঁক নাই। এবং ঈশ্বরের দয়াতেও কৃত্রিমতা নাই।" এ স্থলে অকৃত্রিম সরল চেষ্টাশীল জীবন গঠন করিলে তিনি অবশ্যই দয়া করিবেন, তাঁহাকে দয়া করিতেই হইবে এইরূপ বলের কথা সাধক বলিতে পারেন। দুর্ব্বল লোকেরা ইহাকে দাম্ভিক ইত্যাদি বলিতে পারে কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। সাধকের জীবনের সারল্য অনুসারে এভাব আপনি সাধকে উদিত হয়। এ স্থলে আমরা সরল চেষ্টারই গৌরব দেখিতে পাইতেছি। ঈশ্বরের দয়া পাপী পুণ্যবান্ বিচার করে না, কিন্তু আমার ধারণা শক্তি না থাকিলে আমি তাহা জীবনে গ্রহণ করিতে ও গ্রহণ করিয়া পরিপাক করিতে পারিব কেন? প্রত্যেক সাধকের পক্ষে ঈশ্বরের দয়া পাইবার বা ধারণ করিবার যোগ্যতা সঞ্চয় করা একান্ত আবশ্যক।

চিরপরিচিত ঈশ্বর।

ভগবানের ন্যায় চিরপরিচিত আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ তিনি যেমন সকলের নিকট অপরিচিত হইয়া রহিয়াছেন, এমন আর কেহ আছে কি না সন্দেহ। মানুষ মনে করে, তাহার জন্ম হইতে প্রাকৃতিক পদার্থনিচয় এবং পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে তাহার প্রথম দেখা সাক্ষাৎ ও পরিচয়, ঈশ্বর কোন সময়ে কাহারও সম্মুখে উপস্থিত হয়েন নাই, সুতরাং কেহ তাঁহাকে জানে না। তাঁহাকে জানে না বলিয়াই লোকে তাঁহাকে ভুলিয়া থাকে, ভয় বা বিপদ বা অন্য কারণে তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে ডাকিলেও সে ডাকা কেবল উদ্দেশ্যে, সেই ডাকাতেই তিনি যে আসিয়া দেখা দেন তাহা নহে। আমরা যদি ইহার বিপরীত বলি, সহজে লোকের তাহাতে বিশ্বাস হওয়া অসম্ভব, সুতরাং ঈশ্বর যে আমাদিগের চিরপরিচিত, ইহা প্রদর্শন করিতে আমরা যথাসাধ্য যত্ন করিব।

আমরা অনেকবার বলিয়াছি, যে বস্তু যেরূপ নহে, কেহ যদি সেরূপে তাহাকে জানের বিষয় করিতে চায়, কখন কৃতার্থ হইবে না। আমাদিগের "চিরপরিচিত ঈশ্বর" সম্বন্ধে এই কথা বিলক্ষণ খাটে। তিনি অপরিচিত হইয়াও

কেবল যে এই জন্যই অপরিচিতের ন্যায় রহিয়াছেন, এ সম্বন্ধে আমাদিগের অণুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি কোন দৃশ্য পদার্থের ন্যায় নহেন, যদি কেহ মনে করে যে, সে তাঁহাকে সেইরূপে দর্শন করিবে, তবে সে প্রয়াস তাহার বিফল হইবে। যদি চিন্তা ও কল্পনাযোগে কেহ মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া ফেলিয়া দৃশ্য পদার্থের ন্যায় কিছু দর্শন করে এবং তাহাকেই ঈশ্বর বলে, তবে সে যাহা ঈশ্বর নহে, তাহাকেই ঈশ্বর বলিল। যাহারা প্রকৃতিস্থ তাহাদিগের সম্বন্ধে তাদৃশ ঈশ্বরদর্শন কোন কালে সম্ভবপর হইবে না। এরূপ না হওয়া ভাল, কেন না, আমরা সকল বস্তু স্বভাবে অবস্থান করিয়া দর্শন করিব, কেবল এক ঈশ্বরকে অপ্রকৃতিস্থ না হইলে দেখিতে পাইব না, ইহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কথা। অপ্রকৃতিস্থ লোক যদি আর সমুদায় বিষয়ে পাগল বলিয়া আখ্যাত হয়, এক ঈশ্বর বিষয়ে কেন সেরূপে আখ্যাত হইবে না তাহার কোন কারণ নাই। আমরা কিন্তু অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তির কোন বিষয়ে প্রমাণ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহি।

আমরা বলি, অন্যান্য পদার্থ দর্শন যে প্রকার স্বাভাবিক, ঈশ্বর দর্শন সেই প্রকার স্বাভাবিক। আমি এবং আমার বহির্ভূত পদার্থনিচয় যে প্রণালীতে আমার জ্ঞানের বিষয় হয়, ঈশ্বরও সেই প্রণালীতে আমার জ্ঞানের বিষয় হন। আমার অব্যাহত ক্রিয়া কখনই প্রতিরুদ্ধ হইত না, যদি আমার চারি দিকে এই সমুদায় আমার অতিরিক্ত পদার্থসমূহ অবস্থিতি না করিত। আমার এই দৃষ্টি সন্নিহিত প্রাচীরে অবরুদ্ধ হইয়া আর অগ্রসর হইতে পারিল না, এই অবরোধ হইতে আমি উহার অবরোধক প্রাচীরসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিলাম। এইরূপে প্রত্যেক ইন্দ্রিয় অবরুদ্ধ হইয়া সেই সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। আমরা যদি ঈশ্বর হইতে এই প্রকার প্রতিরোধ প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে আমাদিগের তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞান উপস্থিত হইবার কি প্রতিবন্ধক আছে? এমন ব্যক্তি নাই যে, ঈশ্বর হইতে প্রতিরোধ প্রাপ্ত হয় নাই, অথচ তাঁহার সম্বন্ধে লোকের জ্ঞান কেন হয় নাই, বিচার করিয়া দেখা সমুচিত।

অতি প্রথম অবস্থায় মনুষ্যের বস্তুসম্বন্ধে সমুচিত জ্ঞান থাকে না। সে যে সকল ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ পদার্থ দর্শন করে, স্পর্শ করে, ব্যবহার করে, সে সকলের সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান অতি-যৎসামান্য। সে তাহাদিগের সম্বন্ধে যাহা ভাবে উন্নত জ্ঞান উপস্থিত হইলে বুঝিতে পারে সে সকল ভ্রম। যাহার যে স্বভাব নহে, তাহাকে সেই স্বভাব অর্পণ করা, ইহা অজ্ঞানতার কার্য্য। বহিরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ বিষয় সমূহেতে যখন অজ্ঞানতার কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ইন্দ্রিয়াতীত ঈশ্বরসম্বন্ধে যে তাহা ঘটিবে, ইহা আর অসম্ভব কি? যখন বস্তু আছে, তখন কারণ উপস্থিত হইলেই, তাহার সঙ্গে প্রতিরোধ উপস্থিত হইবে, কিন্তু প্রতিরোধ উপস্থিত হইলেই যে, তৎসম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান হইবেই হইবে, ইহা কখন বলা যাইতে পারে না। প্রতিরোধ দ্বারা বুঝিলাম একটি বস্তু আছে, কিন্তু সে বস্তুর স্বভাব ও স্বরূপ বুঝিতে না পারিয়া, সে যাহা নহে আমি তাহাই তৎসম্বন্ধে বিশ্বাস করিলাম। সুতরাং এখানে বস্তু সংস্পর্শ হইয়াও উহা যাহা নহে, তাহা মনে করাতে যে ভ্রম উপস্থিত হইল সেই ভ্রমে সে বস্তু আমার নিকটে অপরিচিত হইয়া পড়িল। কেন না অন্য লোকে যখন উহার যথার্থ স্বরূপ ও লক্ষণ উল্লেখ করিয়া আমায় উহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে, আমি বলিব কৈ আমি সে বস্তু জানি না। ঈশ্বর-জ্ঞানসম্বন্ধে নরনারীর এই প্রকার ভ্রম উপস্থিত হইয়াছে, একটু ভাবিয়া দেখিলেই সকলে বুঝিতে পারিবেন।

আদিমাবস্থার লোকদিগের প্রথম জ্ঞানের উন্মেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে দেখিতে

পাওয়া যায়, আমাদিগের প্রথম জ্ঞানের উন্মেষের যে অবস্থা তাহাদিগেরও সেই অবস্থা। আমরা সর্ব্বপ্রথমে আমি কি বস্তু তাহা চিন্তা করি না, তাহার স্বরূপ লক্ষণ কি বুঝি না, আমি বলিতে চক্ষুঃ কর্ণাদিযুক্ত কিছু বুঝিয়া থাকি, আদিমাবস্থার লোকেরাও সেই প্রকারই বুঝিয়া থাকে। আবার যখন কোন অন্যায় কার্য্য করিতে যাই তখন কে যেন সেই অন্যায় কার্য্য করিতে প্রতিরোধ করে, যদি করিয়া ফেলি ক্রমাম্বয়ে সে ভৎ'সনা করিতে থাকে। যে সকল আদিমাবস্থার লোক এখনও আছে তাহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকদিগের যে সমুদায় বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে আমাদিগের প্রথমাবস্থায় সঙ্গে বিলক্ষণ ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কে আমাদিগকে নিষেধ করিল, কে ভৎ'সনা করিল আমরা বুঝিতে না পারিয়া অপরকে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করি, সৌভাগ্যক্রমে যদি কোন ধর্ম্মপরায়ণ সাধকের নিকটে জিজ্ঞাসা উপস্থিত হয়, তাহা হইলেই 'বিবেক' বা ভগবানের বাণী, বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি, অন্যথা এ ঘটনায় কেবল আমাদিগের ভয় ও আশঙ্কা বাড়ে। আদিমাবস্থায় লোকদিগের না আছে নিজের উন্নত জ্ঞান, না আছে নিকটে এমন উন্নত লোক যে তাঁহার নিকটে যথার্থ তত্ত্ব জানিতে পারে, সুতরাং তাহাদিগের মনে ভয় উৎপন্ন হইয়াছে। এবং সেই ভয়ে তাহারা কুসংস্কারে নিপতিত হইয়াছে। আচার্য্যদেবকে জীবনবেদে এই 'বাণী' সম্বন্ধে বলিতে হইয়াছে "অন্তরে যদি কেহ কথা কয়, সাধরণ লোক তাহাকে ভুত বলিয়া মানে। যে ব্যক্তি প্রেতগ্রস্ত হইয়াছে, সে ভিতরে এবং বাহিরে বাণী শ্রবণ করে।" আদিমাবস্থায় লোকদিগের নিকটে এইরূপই ঘটিয়াছে। তাহারা অগত্যা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছে। যাহার প্রতি অন্যথাচরণ করিয়াছে তাহার দ্বিতীয় আত্মা আসিয়া ভৎ'সনা করে, ভয় দেখায়, ক্লেশ দেয়, এই তাহারা বিশ্বাস করে।

এই যে এক জনের মধ্যে দুই আত্মা, ইহা কি সত্য কি অসত্য কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। জ্ঞানী মুর্খ, ধনী, দরিদ্র, বর্ব্বর সভ্য সকলেই আপানার মধ্যে এই দুই আত্মার ক্রিয়া সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করে। কেহ যদি ভুত বলে বা প্রেত বলে বা অন্য সিদ্ধ বলে তাহাতে কিছু আইসে যায় না, কেন না দুই বস্তু যে নিরন্তর আছে, তাহা কাহার অস্বীকার করিবার সামর্থ্য নাই। বস্তু নিত্য সিদ্ধ, ভ্রম কেবল সেই বস্তুর যথার্থস্বরূপ বুঝিতে উপস্থিত হয়। নব ধর্ম্ম লোকদিগের এই ভ্রম নিবারণ করিবার জন্যই সমাগত হইয়াছেন। তিনি লোকদিগকে বলিতেছেন, "যিনি তোমাদিকে অসৎ পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া শান্তি ও পুণ্যের পথে লইয়া যাইবার জন্য সকল অস্থায় যত্ন করিয়াছেন। কুকর্ম্ম করিতে গিয়াই যাঁহার সহিত তোমাদিগের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, তিনি সেই পুরাতন ঈশ্বর, তোমাদিগের নিত্য পরিচিত পিতা মাতা সখা, তোমরা তাঁহাকে ভুত, প্রেত, বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছ কিন্তু তাহা বলিয়া তিনি তোমাদিগকে তিলার্দ্ধের জন্য ছাড়েন নাই। সহস্র অবমাননা সহ্য করিয়াও আজও তোমাদিগকে সৎপথ প্রদর্শন করিতেছেন। তোমরা তাঁহার অনুগত হও, এবং চিরপরিচিত জানিয়া নিত্য তাঁহার অনুসরণ কর।" ধন্য সেই সকল ব্যক্তি যাঁহারা এত দিন যিনি প্রকারন্তরে পরিচিত ছিলেন, তাঁহাকে নিত্য পরিচিত ঈশ্বর জানিয়া তাঁহার হস্তে সমুদয় জীবনের ভারঅর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইবেন।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

তৃষ্ণা মানুষকে পরিচালিত করে, সারল্য তৃষ্ণাকে বর্দ্ধিত করে। মন যদি সরল হয় এবং সরল ভাবে সত্য গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয়, তবে তাহার তৃষ্ণা উদ্দীপ্ত না হইয়া থাকিতে পারে না। আবার তৃষ্ণা জন্মিলে সে সম্মুখ স্থিত সত্যের প্রতি অনাদর বা উপেক্ষা করিতে পারে না। উপস্থিত সত্যের কথা বলিতেছি কেন? তৃষ্ণাই বহু দূরস্থিত

জলাশয়ের নিকট লইয়া যায়। জলাশয় কোথায়, কতদূরে জানা না থাকিলেও তৃষ্ণা সন্ধান করিয়া তাহা বাহির করে। তৃষ্ণাই তাহার দুর্গম পথকে সুগম করিয়া লয়। বাহিরের জলাশয় পাইবার পক্ষে যেমন তৃষ্ণার সহায়তা অতীব প্রয়োজনীয় তেমনি সেই প্রেম ও পুণ্যের সরোবরে অবগাহন করিয়া শীতল হইতে চাহিলে, এবং তাহার সুশীতল পানীয় পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে ইচ্ছা করিলেও তৃষ্ণার সাহায্য চাই। তৃষ্ণার অর্থ, অভাব জনিত উত্তেজনা। ভিতরে যে অভাব সঙ্ঘটিত হয় সেই অভাব পূর্ণ করিবার জন্য যদি প্রকৃতি উত্তেজনা করে, যন্ত্রণা দেয় তাহাই তৃষ্ণা নামে পরিচিত হয়। এক প্রকার রোগ আছে তাহাতে অধিক তৃষ্ণা জন্মে, আর এক প্রকার রোগ আছে তাহাতে তৃষ্ণার কারণ উপস্থিত হইলেও তৃষ্ণা জন্মে না। এই দুইটি অবস্থা অত্যন্ত পীড়াজনক সেই জন্য ইহার নাম রোগ, অধিক তৃষ্ণা হইলে জলও অধিক পান করিতে হয় কিন্তু ইহা প্রকৃতির বিরোধী বলিয়া শরীরের পোষণ করে না কিন্তু ক্ষতি করে। এই জন্য এটা তৃষ্ণা হইলেও প্রার্থনীয় নহে। ধর্ম্ম জগতেও অনেক সময় অপ্রাকৃতিক তৃষ্ণার আতিশয্য দেখা যায় কিন্তু সে তৃষ্ণা মৃত্যুকে নিকটে আনয়ন করে, জীবনকে সজীব করিতে পারে না। আর তৃষ্ণার কারণ অর্থাৎ অভাব থাকিলেও সে অভাবের জন্য যদি উত্তেজনা না থাকে তাহাও স্বভাবের বিরোধী। কেননা প্রয়োজনীয় উপাদান সংগৃহীত না হওয়াতে জীবনকে ক্রমে ক্রমে নির্জীব করিয়া ফেলে। আত্মার অভাব হইলে বিকৃত আত্মা তাহা বুঝিতে সমর্থ হয় না সুতরাং তাহার তৃষ্ণা হয় না। তৃষ্ণা হয় না বলিয়া ভিতরকার অভাবানুযায়ী উপাদান সংগৃহীত হইতে পারে না। এই উভয়বিধ অস্বাভাবিক অবস্থা হইতে বাঁচিবার উপায় সরলতা। সরলতা থাকিলে রোগ কি সুস্থতা, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এবং রোগ হইয়াছে বুঝিতে পারিলে সুচিকিৎসকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া চিকিৎসিত হইতে ইচ্ছা জন্মে। মনে মনে যদি কুপথ্য ভোজনের স্পৃহা থাকে, মানুষকে সরল হইতে বাধা জন্মায়। সে জানে এ অবস্থায় চিকিৎসক কুপথ্য ভোজন করিতে নিষেধ করিবেন, তাই জানিয়া শুনিয়াও চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হয় না—এবং চিকিৎসক পরামর্শ দিলেও তদনুসারে চলা উচিত বলিয়া বুঝিতে পারে না। এই অবস্থাতে ক্রমে ক্রমে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয় অথচ চিকিৎসকের প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক তাঁহার শাসন গ্রহণ করিতে পারে না। আমাদিগের চতুর্দ্দিকে সর্ব্বদাই এই অবস্থায় বহুলোকের মৃত্যু সংঘটিত হইতেছে ইহা দর্শন করিয়া যিনি সতর্কতার সহিত আত্মানুসন্ধান করিয়া আপনার রোগাবস্থা বুঝিতে পারিবেন এবং চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া আপনাকে কুপথ্য ভোজন হইতে বিরত রাখিতে পারিবেন তিনিই ধন্য।

আচার্য্যের উপদেশ।

[সিন্দুরিয়াপটী ব্রাহ্মসমাজের ত্রয়োদশ সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব উপলক্ষে।]

শনিবার প্রাতঃকাল, ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৭৯৮শক।

[পারিবারিক অবস্থা মুক্তি।]

মুক্তির অবস্থা পরিবারের অবস্থা। জনসমাজ যখন মুক্তি লাভ করিবে তখন জনসমাজের অবস্থা পরিবারের অবস্থা হইবে। পরিত্রাণার্থী বৈরাগ্য, কঠোর তপস্যা প্রভৃতি ধর্ম্মসাধনের যত প্রকার উপায় অবলম্বন করুক না কেন সর্ব্বশেষে তাহাকে পরিবারের অবস্থা লাভ করিতে হইবে। ধর্ম্মজীবনের আরম্ভে নানালোক নানাপথ অবলম্বন করে; কিন্তু যাঁহারা সূক্ষ্ম এবং দূরদর্শী ধর্ম্মজীবনের ভবিষ্যৎ অথবা সহস্র সহস্র বৎসর পরে কি অবস্থা হইবে আলোচনা করিলে তাঁহাদের এই প্রগাঢ় বিশ্বাস হইবে যে সকল নরনারী এমন এক স্থানে উপস্থিত হইবে যেখানে পারিবারিক সুখ সকলের মধ্যে বিরাজ করিবে। সেই অবস্থা পৃথিবীর ভাবী অবস্থা, তাহা পরলোকের অবস্থা। প্রত্যেক ধর্ম্মার্থী পরিশেষে পরিবারের সুখে সুখী হইবে। ঈশ্বর আমাদিগকে যে প্রকার স্বভাব দিয়াছেন, তাহাতে পরিবারের ভাব আমরা অতিক্রম করিতে পারি না। পারিবারিক সমাজের সাম্বৎসরিক উপলক্ষে এই বিষয় আজ বিশেষরূপে সকলের হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। নরনারীর মধ্যে বিশুদ্ধ প্রণয়ের সৌন্দর্য্য, সমস্ত সৃষ্টি কৌশল দেখাইয়া দিতেছে। বিশুদ্ধ প্রণয়ের মধ্যে ঈশ্বর আমাদের প্রকৃত সুখ নিহিত রাখিয়াছেন। তাঁহার মঙ্গলহস্ত কখন আমাদিগকে জ্ঞাতসারে কখন অজ্ঞাতসারে ঐ প্রণয়ের দিকে লইয়া যাইতেছে। ঈশ্বরের ইচ্ছাতে পুরুষ এক প্রকার প্রকৃতি পাইয়াছে, স্ত্রী আর এক প্রকার প্রকৃতি পাইয়াছে, একদিকে বীর্য্য, সাহস, আর একদিকে কোমলতা, মাধুর্য্য; একদিক জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের ন্যায় প্রখর তেজ, আর একদিকে সুশীতল চন্দ্রের ন্যায় সুন্দর জ্যোৎস্না, এক দিকে জ্ঞানের প্রখরতা, আর এক দিকে হৃদয়ের কোমলতা। ঈশ্বর এই দুই বিভিন্ন প্রকৃতি মনুষ্য সৃজন করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই, এই দুই জন একত্র হইয়া স্বর্গের উদ্যান নির্ম্মাণ করিবে। এই দুই ভাবের সংযোগে পরিবারের অবস্থা। কেবল কোমলতায় সুখ নাই, কেবল কঠোরতায়ও সুখ নাই। স্ত্রী পুরুষ যখন পবিত্র প্রেমে সম্মিলিত হয় তখনই পবিত্র পরিবার সংগঠিত হয়। যখন পুরুষের বীরত্ব এবং

স্ত্রীহৃদয়ের কোমলভাব প্রস্ফুটিত হয় এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের স্বর্গীয় উদ্যান প্রকাশিত হয়। যেখানে পুরুষ নাই, কেবল স্ত্রীলোক বিধবা হইয়া আছে সেখানে স্নিগ্ধতা আছে; কিন্তু সাহস এবং তেজ নাই। আবার যেখানে স্ত্রী নাই, কেবল পুরুষ স্ত্রী পরিবারশূন্য হইয়া বাস করিতেছে, সেখানে কঠোর তপস্যা, তীব্র পবিত্রতা থাকিতে পারে, কিন্তু সেখানে কোমলতা এবং মধুরতা নাই। যেখানে স্ত্রী পুরুষ পবিত্র প্রণয়ে একত্র হইয়া বাস করিতেছেন সেখানে পরস্পরের মিলনে আশ্চর্য্য সুখ পরিব্যাপ্ত হইতেছে। সেখানে সকলে পারিবারিক বিশুদ্ধ সুখ ভোগ করিতেছে। সন্তানেরা পিতা মাতার মুখ দেখিয়া আহ্লাদিত হইতেছে, পিতা মাতা আপনাদিগের সন্তানগণকে দেখিয়া সুখী হইতেছে। যেখানে সন্তান মাতার স্নেহে পুষ্ট হইতেছে সেখানে পিতা গুরু হইয়া সেই বিপথগামী সন্তানকে সংশোধন করিতেছেন। যেখানে পিতার কঠোর শাসনে সন্তান অত্যন্ত মনোবেদনা সহ্য করে সেখানে জননী তাঁহার মধুময় স্নেহ প্রকাশ করিয়া সেই সন্তানের তাপিত প্রাণ শীতল করেন। এইরূপে জ্ঞানের সঙ্গে কোমলতার, এবং কঠোর কর্ত্তব্যের সঙ্গে ভক্তির সম্মিলন হইতেছে। যেখানে ভাই আছেন এবং ভগ্নী আছেন, এবং তাঁহারা আপন আপন ধর্ম্মানুসারে সমুদয় কার্য্য করিতেছেন সেখানেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পরিবারের সুখ। যেখানে ভার্য্যা নাই একাকী পুরুষ কঠোর তপস্যা এবং ধ্যান সাধন করেন সেখানে যে ধর্ম্ম নাই তাহা নহে; কিন্তু সেই ধর্ম্ম তীব্র, কঠোর, সেখানে মধুরতা, সৌন্দর্য্য কোথায়? নারী হৃদয়ে ঈশ্বর তাঁহার মাতৃভাবের কোমলতা এবং মাধুর্য্য রাখিয়াছেন। তিনি যেমন দক্ষিণ হস্তে সূর্য্য এবং বাম হস্তে চন্দ্রকে রাখিয়া জড়জগৎ শাসন করিতেছেন, সেইরূপ একদিকে পুরুষপ্রকৃতি এবং অন্য দিকে নারীপ্রকৃতি এই জন্য সৃজন করিয়াছেন যে আমরা সকলে মিলিত হইয়া সুখে সংসার নির্ব্বাহ করিব। দুইয়েরই প্রয়োজন। উভয়ের মিলন না হইলে পরিবার হয় না। একদিকে জ্ঞানের ভাব, আর একদিকে প্রেমের ভাব, দুইয়েরই আবশ্যক। মিলন না হইলে শান্তি হয় না। প্রখর জ্ঞান বলে দৃঢ়ব্রত হইয়া রিপু সকল প্রশান্ত করিলাম, সচ্চিত্র এবং জিতেন্দ্রিয় হইলাম। কিন্তু সে ব্যক্তি কি সুখী যে কেবল জিতেন্দ্রিয় হইয়াছে? তাহার জীবনের এক বিভাগ সিদ্ধ হইয়াছে ইহা সত্য; কিন্তু যখন তাহার প্রাণ তাপিত হইবে তখন তাহাকে সুখ দিবে কে? ধন্য তিনি যিনি আপনার অন্তরে নরনারী উভয় প্রকৃতির সামঞ্জস্য দেখিয়াছেন!! সন্তানের প্রতি জননীর যেমন কোমল স্নেহ, স্বামীর প্রতি সতী স্ত্রীর যেমন মধুর প্রেম, সেইরূপ কোমল ভাব না হইলে মনুষ্য ঈশ্বরের মাতৃভাব অনুভব করিতে পারে না। জ্ঞান কেবল ঈশ্বরের পিতৃভাব দেখিতে পায়। সেই তেজস্বী জ্ঞানময় পুরুষ গুরুর ন্যায় উপদেশ দিতেছেন পিতার ন্যায় সন্তানকে সংশোধন করিতেছেন, জ্ঞান এইরূপে ঈশ্বরকে পিতার ন্যায়, গুরুর ন্যায় অনুভব করিতে পারে; কিন্তু ইহার সেই চক্ষু কোথায় যাহাতে জননীকে দর্শন করা যায়! প্রেমই কেবল মাতৃভাব অনুভব করিতে পারে। যখন জ্ঞান এবং প্রেমের সম্মিলন হয় তখন মনুষ্যের পরিত্রাণ হয়। যথার্থ মুক্তির অবস্থা এই। এক দিক পিতা আর এক দিকে মাতা ঈশ্বর প্রত্যেক পারিবারে পিতা, মাতা, স্বামী স্ত্রী, এবং ভাই ভগ্নীর হৃদয়ে আসন গ্রহণ করিয়াছেন এই জন্য যে আমরা তাঁহার এই ভাব অন্তরে ধারণ করিব। যখন তাঁহার মধ্যে আমরা এই দুই ভাবই দেখিতেছি, তখন প্রত্যেক হৃদয়ে পুরুষ এবং নারী উভয় প্রকৃতির স্থান পাইবে। এক দিকে পুরুষের বৈরাগ্য, কঠোর তপস্যা, তেজ এবং বীরত্ব, আর এক দিকে কোমল প্রকৃতি স্ত্রী প্রেম ভক্তিতে বিগলিত হইয়া ঈশ্বরকে জননী বলিয়া তাঁহার পদতলে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। মুক্তির জন্য এই দুই ভাব আবশ্যক। যদি পরিত্রাণ আকাঙ্ক্ষা কর এই দুই খানি ছবি অন্তরে রাখিয়া দাও। যদি কোমল অন্তরে ভক্তির সহিত কেবল মাতার পূজা করিতে শিখিয়া থাক তাহা হইলে হইবে না। দৃঢ়ব্রত, বৈরাগী হইয়া রিপু দমন করিতে হইবে। এইরূপ পুরুষ এবং নারী উভয় প্রকৃতি সাধন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে সত্য এবং প্রেম মিলিত হইয়া অন্তরে একটী প্রবল প্রবাহ উৎপন্ন হইবে, সেই প্রবাহ যথাসময়ে প্রকাণ্ড হইয়া সমস্ত পরিবারে বিনিঃসৃত হইবে এবং অবশেষে সমস্ত জনসমাজে ও পৃথিবীতে বিস্তারিত হইবে। প্রথমে অন্তরে পরিবার, দেশে এবং সর্ব্বশেষে সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইবে এই প্রবাহের সৌন্দর্য্য এবং উন্নতি মুক্তি। হে দয়াময় ঈশ্বর, প্রকৃত পরিবারের মধ্যে স্থান না পাইলে সুখ পাইব না। যেখানে তোমাকে পিতা মাতা বলিয়া নর নারী হইয়া তোমার পূজা করেন সেইখানই স্বর্গ। অন্য বৈকুণ্ঠ আমরা মানিনা। প্রেমময়ী জননি, তোমার অঙ্গুলি ঐ ছবি দেখাইয়া দিতেছে। তুমি কেবল ঐ সুখের ছবি খানি প্রকাশ কর। প্রাণ সেই দিন শীতল হইবে যে দিন তোমার পদতলে সকলে মিলিয়া বসিব জননি, আমাদের বড় দুর্গতি আমরা একবার উদ্ধত হই, আবার অত্যন্ত কোমল হই, সকল সময় সমান ভাবে বৈরাগ্যের তেজ এবং প্রেমের কোমলতা রাখিতে পারি না। পুরুষের প্রকৃতি ভাল করিয়া প্রস্ফুটিত করিতে গেলে কোমলতাবিহীন হই, আবার কোমলতাপ্রিয় হইলে পবিত্রতা রাখিতে পারিনা; কিন্তু তোমার যথার্থ ভক্তদিগের এরূপ বিড়ম্বনা হয় না। তাঁহারা যেমন এক চক্ষে তোমার মুখে সত্যের জ্যোতি এবং পৌরুষ

তেজ দেখিয়া রিপুকুল বিনাশ করেন তেমনি অন্য চক্ষে তোমার স্নেহ দৃষ্টি দেখিয়া প্রেমে বিগলিত হন। সত্যের এমন মনোহর রূপ, জ্ঞানের এমন আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য কেবল জ্ঞান চক্ষে দেখা যায় না। তোমার ভক্তেরা বলেন "এমন মনোহর রূপবান ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আর কোথায়ও যাইব না।" হে ঈশ্বর, ভক্তদিগের সঙ্গে তুমি সর্ব্বদা ক্রীড়া করিতেছ? কিন্তু ভ্রমান্ধ মনুষ্য আংশিক ভাবে কখন পুরুষ প্রকৃতির, কখন নারী প্রকৃতির হস্তে পড়িয়া মরিতেছে। তাহারা তোমার মধ্যে এই উভয় প্রকৃতির যোগ দেখিতে পায়না। তুমি যে "সত্যং শিবং সুন্দরং" তোমার মধ্যে যে পুরুষ প্রকৃতি উভয়ের মিলন হইয়াছে, তুমি যে আমাদের প্রতি জনের মনে যেমন পিতা রূপে বিরাজ করিতেছ, তেমনি আবার মাতৃরূপে বিরাজ করিতেছ তাহা বুঝিতে পারে না। তোমাকে হয় একটী প্রকাণ্ড শরীর পর্ব্বতের মত মনে করে অথবা প্রকাণ্ড সমুদ্রের জলরাশির ন্যায় মনে করে। তুমি জ্ঞানজ্যোতি এবং স্নেহজ্যোৎস্না উভয়েরই আকর। এই দুই তুমি আমাদের মস্তকে শান্তি বর্ষণ কর। একত্র সত্য প্রেম লাভ করি। এবং আনন্দ সঞ্চয় করি তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এমন শুভ বুদ্ধি দাও।

প্রচারবৃত্তান্ত।

ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন হইতে প্রাপ্ত।

২য় পত্র।

তেজপুরে প্রতিদিন দুইটি বন্ধু নিয়মিতরূপে আমাদের সঙ্গে উপাসনায় যোগ দান করিয়াছিলেন। সপ্তাহে দুই দিন রবিবার ও বুধবার অত্রত্য নববিধান সমাজের সামাজিক উপাসনা হয়। ২১শে বৈশাখ বুধবার সামাজিক উপাসনা কালে বহুসংখ্যক বঙ্গালি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। "প্রকৃত উপাসনা" বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। আমরা ২২শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার বেলা ২টার সময় শিবসাগরনামক ডেস্পাস ষ্টীমারে তেজপুর হইতে নিগরিটিং অভিমুখে যাত্রা করি। ২৩শে মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৫ টার সময় নিগরিটিং এর ৫ মাইল অন্তর শিকারী ঘাট ষ্টীমারঘাটে অবতরণ করিয়াছিলাম। তথাকার পোষ্ট মাষ্টর শ্রীযুক্ত বাবু বিহারী লাল ঘোষ এবং ষ্টীমার এজেন্‌সির ক্লার্ক শ্রীযুক্ত বাবু কালীনাথ চক্রবর্ত্তীর একান্ত আগ্রহ ও অনুরোধে তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ পূর্ব্বক সেই রাত্রি তথায় যাপন করিতে বাধ্য হই। রাত্রিতে পোষ্ট মাষ্টার বাবুর গৃহে ব্রহ্মসঙ্গীত ও প্রার্থনা হইয়াছিল। ষ্টীমার সংক্রান্ত ৩। ৪ জন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী তাহাতে যোগ দান করিয়াছিলেন। ২৪ শে প্রাতঃকালে নিগরিটিং চা-বাগিচার প্রসিদ্ধ ডাক্তর প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত বঙ্গচন্দ্র সেনের প্রেরিত হস্তিযোগে তথায় উপনীত হই। ডাক্তার বাবু পরম যত্ন ও আদরের সহিত আমাদিগকে আপন গৃহে স্থান দান করিয়া আতিথ্য সেবার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। নিগরিটিং পঁহুছিয়াই গোলাঘাটে যাইবার জন্য তথাকার একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনার ব্রাহ্মবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার ঘোষ মহাশয়ের নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হই। গোলাঘাট নিগরিটিং হইতে ১৬ মাইল দূরে, ইহা শিবসাগর জিলার একটি সবডিবিজন। ২৫শে বৈশাখ রবিবার গোশকটযোগে আমরা গোলাঘাটে যাত্রা করি। যাইবার কালে গোলাঘাটের নিকটে পথপার্শ্বে আসামদেশীয় সুবিশাল করতালপুঞ্জের ভয়ঙ্কর গম গম্ ধ্বনি শ্রবণ করিতে পাই। সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখি, একটি খোলা আটচালা ঘরে বহুলোকের ভিড় হইয়াছে, ইতস্ততঃ নিশান উড়িতেছে, এবং কদলী বৃক্ষ স্থাপিত হইয়াছে। কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া তাহা দেখিতে গেলাম। দেখিলাম যে ২০। ২৫। জন আসামী যুবা করতাল বাজাইয়া মহাউৎসাহে বিকট অঙ্গ ভঙ্গিতে নৃত্য করিতেছে। মৃদঙ্গের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। কিয়ৎক্ষণ পর করতাল বাদ্য বন্ধ করিয়া "গোপাল গোপাল গোপাল গোবিন্দ" এই কথা পুনঃপুনঃ সমস্বরে বলিতে বলিতে মত্ততার সহিত নৃত্য করিতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণ পরে সঙ্গীত বন্ধ করিয়া পুনর্ব্বার করতাল বাদ্য আরম্ভ করিল। আমাদিগকে দেখিয়া একজন বৃদ্ধ আসামী সম্মুখে আসিয়া সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক বসিতে অনুরোধ করিলেন। আমরা দণ্ডায়মান থাকিয়াই সেই অদ্ভুত নৃত্য ও বাদ্য দর্শন করিতে লাগিলাম। বৃদ্ধটি বলিলেন যে, "আমাদের গোসাঁইর পঞ্চাশ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইয়াছে, তজ্জন্য আজ জুবিলির উৎসব হইতেছে। প্রাতে ঠাকুরকে তুলসী দান হইয়াছে, মধ্যাহ্নে শ্রীহট্টনিবাসী একজন পণ্ডিত ভাগবত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, এইক্ষণ সঙ্কীর্ত্তন হইতেছে, রাত্রিতে ভাওয়ান (আসাম দেশীয় যাত্রা গান বিশেষ) হইবে।" তৎপর আমরা আমাদের গোশকটে যাইয়া আরোহণ করিলাম। গোস্বামীর পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার জন্য এইরূপ জুবিলি সেই দিন আসাম প্রদেশের সমুদয় নগরে ও প্রধান প্রধান স্থানে হইয়াছে। আসামী লোকেরা যাঁহার সম্মানার্থ এই জুবিলীর উৎসব করিয়াছেন তিনি শিবসাগর জিলার অন্তর্গত আমুগুরাহাটী নামক স্থানের গোস্বামী। শ্রীচৈতন্য দেবের সময়ে কায়স্থ কুলোদ্ভব শঙ্কর দেব নামক একজন ধর্ম্মসংস্কারক পুরুষ আসাম দেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন, অধিকাংশ আসামী লোক সেই শঙ্কর দেবের ধর্ম্মমতাবলম্বী, এইক্ষণ এদেশের অনেক লোক শঙ্করদেবকে স্বয়ং ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। আমুগুয়াহাটির বর্ত্তমান বৃদ্ধ গোস্বামী উক্ত শঙ্করদেবের বংশসম্ভূত। তিনি সুপণ্ডিত ও চরিত্রবান্ এ জন্য সকলের বিশেষ ভক্তিভাজন হইয়াছেন, এবং তাহার পঞ্চাশ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়াতে স্থানে স্থানে উৎসব হইতেছে। যাহা হউক সন্ধ্যার

প্রাক্কালে আমরা গোলাঘাটে উপস্থিত হই। গোলাঘাট নগর ধনেশ্বরী নাম্নী ক্ষুদ্র নদীর কূলে স্থাপিত। শ্রেণীবদ্ধ তুল্যাকার নাগেশ্বর তরুরাজিতে নগরবক্ষের পরম শোভা হইয়াছে, পূর্ব্ব পার্শ্বে দূরে উত্তুঙ্গ নাগা পর্ব্বত শ্রেণী স্থির মেঘমালার ন্যায় শোভা ধারণ করিয়া আছে। নগরের কিয়দ্দূর অন্তর একটি উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। সন্ধ্যার পর নবনির্ম্মিত উপাসনামণ্ডপে উপাসনা হয়, এই গৃহে এই প্রথম উপাসনা হইল। "ব্রাহ্মমন্দির ও প্রাণ মন্দির" বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। স্কুল বন্ধ থাকাতে শিক্ষক ও ছাত্রগণ প্রায়ই স্থানান্তরিত হইয়াছেন বলিয়া শ্রোতার অভাববশতঃ এখানে বক্তৃতা দান আবশ্যক হইল না। সোমবার দিন প্রাতে এক্ষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনর প্রসন্ন বাবুর গৃহে উপাসনা, সন্ধ্যার পর কয়েকটি বন্ধুকে লইয়া সঙ্কীর্ত্তন ও প্রার্থনাদি হয়। মঙ্গলবার প্রাতঃকালের উপাসনায় তথাকার ৪। ৫ জন ব্রাহ্ম বন্ধু আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। সেই দিনই গোযানযোগে নিগরিটিং প্রত্যাগমন করি। ২৯ শে বৃহস্পতিবার গোশকটযোগে যোড়হাট নগরে উপস্থিত হই। যোড়হাট নিগ্‌রিটীং হইতে ১৪ মাইল দূরে, উহা শিবসাগর জিলার অন্যতর সবডিবিজন। আসামের শেষ স্বাধীন রাজা পুরন্দর সিংহ এখানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। এই স্থানেই তাঁহার রাজলক্ষ্মী বিলুপ্ত ও জীবনসূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট পুরন্দর সিংহ হইতে রাজ্য গ্রহণ করিয়া সমগ্র আসামে আপন প্রভুতা স্থাপন করিয়াছেন। যোড়াহাটে ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণ চন্দ্র বসুর গৃহে সাদর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া দুই দিবস স্থিতি করি। পূর্ব্বে এখানে ব্রাহ্মসমাজ ছিল, কিছু দিন হইতে তাহা উঠিয়া গিয়াছে,। পুনর্ব্বার সমাজ সংস্থাপনের উদ্যোগ হইয়াছে। এইস্থানে ২০। ২৫ জন মাত্র বাঙ্গালি বাবু আছেন। ৩০ শে বৈশাখ পূর্ণ বাবুর আলয়ে আলোচনা ও সঙ্গীত হয়। ৩১ শে বৈশাখ রাত্রিতে সামাজিক উপসনা ও "আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা" বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। অত্রত্য প্রায় সমুদায় বাঙ্গালি বাবু উপস্থিত হইয়া উপাসনাদিতে যোগ দান করিয়াছিলেন। লোক জনের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ও স্কুল বন্ধ বলিয়া যোড়হাটেও প্রকাশ্য বক্তৃতা হয় নাই। ক্রমশঃ

ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত হইতে প্রাপ্ত।

(গত বারের শেষ)

৭ই প্রাতে গোশকটারোহণে বিস্তীর্ণ জলাভূমি পার হইয়া প্রাচীন গৌর নগরের ধ্বংশাবশেষ দেখিতে যাওয়া হয়, আমার সহিত মালদহের চারিটি ভ্রাতা এবং রায়মহাশয় ও উপরোক্ত নায়েব বাবুও ছিলেন, তদ্ভিন্ন কয়েক জন ভৃত্য দ্বারবান্ ও পাচক ব্রাহ্মণ প্রভৃতিতে একটী উত্তম দল হইল। এখন উক্ত জলাভূমিতে জমীদারদিগের উত্তম লভ্য হইতেছে যথেষ্ট ধান্য জন্মিতেছে। পথে কৃষকেরা বৃক্ষতলে খড় হইতে ধান্য ঝাড়িতেছিল আমরা বিশ্রামার্থে তথায় নামিলাম কৃষকদিগের সহিত কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল, আমরাও ধান্য ঝাড়িতে লাগিলাম কৃষকপত্নীগণ স্নেহপূর্ব্বক উত্তপ্ত দুগ্ধ পাঠাইলেন তাহা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়া আবার চলিলাম। মধ্যাহ্নে গৌরের মধ্যস্থ ধনপৎ সওদাগরের সাগরদীঘী নামক পুষ্করণীতীরে উপনীত হইলাম, চারিদিকে নিবীড় বন দীঘীর এক পার্শ্ব পরিষ্কার করিয়া একটি নূতন বস্তী বসিয়াছে তাহার মধ্যে জমীদারের জনশূন্য কাছারী বাঙ্গলা, তথায় উপনীত হইয়া বৃক্ষতলে উপাসনা ও আহারাদি করিয়া বৈকালে ভগ্নাবশেষ দেখিতে বাহির হইলাম। কালের বিচিত্র লীলা দেখিতে দেখিতে ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল বাসায় ফিরিলাম।

৮ই প্রাতে দলবল সহ বাহির হইয়া ভগ্নাবশেষ দেখিতে দেখিতে "কদম রসুল" নামক মসজিদে উপনীত হইলাম ইহা অদ্যাবধি ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া কোন অংশ ভূমিসাৎ হয় নাই, কারণ দেয়ালে বা গম্বুজের উপর অট্টালিকার প্রধান শত্রু বৃক্ষগুলিকে বাড়িতে দেওয়া হয় না, ইহার ভিতর একখানি শ্বেত প্রস্তরে হজরত মহম্মদ রসুলের কদম অর্থাৎ পদচিহ্ন আছে তজ্জন্য ইহার নাম "কদম রসুল" হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটী অতি চমৎকার কারুকার্য্যবিশিষ্ট বৃহৎ আবলুস কাষ্ঠের শবাধার জীর্ণাবস্থায় রহিয়াছে। আমরা তথা হইতে অন্যান্য স্থানে দেখিতে দেখিতে যে গৃহে হোসেন সা সনাতন গোস্বামীকে কারাবদ্ধ করিয়া ছিলেন তথায় গমন করি, এ ঘরটি মালখানা অর্থাৎ কোশাগার থাকায় এমন ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে যে, ভূশায়ী হইতে এখনও অনেক বিলম্ব আছে, কিন্তু ধনলোভী লোকেরা গোপনীয় ধন পাইবার আশায় স্থানে স্থানে খনন করিয়া অপকার করিতেছে। আমি এখানে সনাতনকে প্রণাম করিয়া একটী পদ্মপুষ্প রাখিয়া আসিলাম, ক্রমে অনেক ভগ্ন প্রাসাদ দেখিতে দেখিতে রামকেলী গ্রামে পঁহুছিলাম ইহা রূপসনাতনের বাসস্থান, রূপসাগর নামক এক দীর্ঘিকায় স্নান করিয়া বাঁধাঘাটের উপর উপাসনা রন্ধন ও ভোজন সমাপ্ত হইলে আখড়াধারী বৈষ্ণবদিগের সহিত কথাবার্ত্তা ও আলোচনা হইতে লাগিল, ইঁহারা নিতান্ত নিরীহ বিনয়ী ও প্রেমিক। যে তমালবৃক্ষ তলে ভগবান চৈতন্যদেব গিয়া বসিয়া ছিলেন, তাহা দর্শন করিয়া নিকটস্থ গৃহে প্রস্তর-খোদিত পদচিহ্ন দেখিলাম। ইহা কাল্পনিক না হইতে পারে গুরুর পদচিহ্ন হিন্দুরা আদরে রক্ষা করিয়া থাকে, তাঁহার পশ্চাতে এ সময় হাজার হাজার লোক সমাগত হইয়াছিল তাহারা তাঁহার পদাঙ্ক গ্রহণ করিবে ইহা কিছু বিচিত্র

মহে। আমরা সন্ধ্যার পর মালদহে ফিরিলাম রাত্রে সামাজিক উপাসনা হইল।

৯ই নিয়মিত কার্য্যান্তে সন্ধ্যাকালে মহান্ত জমীদার মহেন্দ্র গিরির সহিত দেখা করিতে গমন করিলাম, ইনি একজন বিপুল ধনশালী সন্ন্যাসী, পূর্ব্বে যে লছমীনারায়ণ গিরির কথা লিখিয়াছি, তিনিও একজন এই দলের লোক, ইহাঁরা ভগবান শঙ্করাচার্য্যের পথাবলম্বী, শিষ্য পরম্পরায় গুরুর বিষয় বৈভব ও জমীদারী ভোগ করিয়া আসিতেছেন ইহাঁরা বিবাহ করিতে পারেন না। মহেন্দ্র গিরি বৃদ্ধ হইয়াছেন এবং ইহাঁর জীবনে কেহ কোন কলঙ্কের কথা জানে না, ইনি অতি অমায়িক সদাশয় ব্যক্তি, আমাদিগকে বিশেষ স্নেহ ও আদর করিলেন, এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম নববিধান ও সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় জানিয়া লইলেন, নিজেদের বিষয়ও অনেক বলিলেন।

১০ই প্রাতে পুরাতন মালদহ যাত্রা করিলাম। উহা এখান হইতে চারি মাইল দূরে, নৌকাযোগে যাত্রা করিলাম। আনুষ্ঠানিক নববিধান বিশ্বাসী ভ্রাতা কালিদাস চক্রবর্ত্তী এখানে বাস করেন। প্রাতে তাঁহার গৃহে উপাসনা হয় ও সন্ধ্যার পর গৌর সভায় গমন করা হইল। এ সভায় কোন প্রকার পৌত্তলিক অনুষ্ঠান নাই, এমন কি শালগ্রাম শিলাপর্য্যন্তও নাই, কেবল শ্রীমদ্‌ভাগবত ও ভগবদ্‌গীতা পাঠ ও কীর্ত্তন হইয়া থাকে। সভ্যেরা বিশেষ আদরের সহিত আমাদিগকে গ্রহণ করিলেন আলোচনা কীর্ত্তন হইয়া বক্তৃতা হইল, বিষয় "ভগবান্ পৃথিবীর সর্ব্বত্র স্থান ও কালানুসারে জীব উদ্ধারার্থ বিশেষ বিশেষ বিধান প্রেরণ করিয়াছিলেন, কারণ হরি সকল মনুষ্যের উদ্ধারকর্ত্তা আমাদের উদ্ধার করিবেন, অন্য দেশের লোকদিগকে করিবেন না, তিনি এমন নিষ্ঠুর নহেন, বর্ত্তমান যুগে সকল ধর্ম্ম একসূত্রে বাঁধিয়াছেন, এবং হরি ভক্ত কোন ধর্ম্মকে ঘৃণা করিতে পারেন না, করিলে হরির কার্য্যে ঘৃণা করা হয়।" এইরূপ ভাবে বক্তৃতা হইল তাঁহারা বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিলেন, শেষে এ কথা স্বীকারও করিলেন। পরে উৎসাহের সহিত সঙ্কীর্ত্তন হইল।

১১ই প্রাতে পাণ্ডুয়ানামক স্থানে প্রাচীন ভগ্নাবশেষ দেখিবার জন্য গোশকটে রওনা হইলাম। মালদহ হইতে দিনাজপুরের পথে ১৩ মাইলে আদিনা মসজিদে উপস্থিত হইলাম। ইহা অতি প্রাচীন প্রস্তরকীর্ত্তি, পূর্ব্বে বৌদ্ধদিগের ছিল, পরে মুসলমানেরা সেই সমস্ত প্রস্তর পরিবর্ত্তন করিয়া মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তথা হইতে পাণ্ডুয়া আসিলাম, এখানেও অনেক পুরাতন কীর্ত্তি আছে। একটী জঙ্গলাকীর্ণ দীর্ঘিকায় স্নান করিয়া বৃক্ষতলে উপাসনা ও রন্ধনাদি হইল, সন্ধ্যাকালে মালদহে ফিরিলাম।

১২ই নিয়মিত কার্য্য ভিন্ন সন্ধ্যার পর কুতবপুর নামক স্থানে সঙ্কীর্ত্তন ও বক্তৃতা হয়। বক্তৃতার বিষয় "অনিত্য সংসারে বিশ্বাসীরই সুখ।" পরে প্রার্থনা ও কীর্ত্তন হইয়াছিল।

১৩ই নিয়মিত কার্য্য ভিন্ন সন্ধ্যার পর মুসলমানদিগকে লইয়া একটি সভা হয়। তাহাতে অনেকগুলি জ্ঞানী মুসলমান উপস্থিত ছিলেন, ভক্তের কর্ত্তব্যবিষয়ে বক্তৃতা ও আলোচনা হইল। মুসলমান ভ্রাতাদিগের বিনয় এবং ভক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, ইহাঁরা যাইবার সময় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া গেলেন।

আর্য্যনারী সমাজ।

(বনভোজন উপলক্ষে)

রাগিনী বিভাস—তাল ঝাঁপতাল।

মনে মনে বনে বনে হরিনাম গুণ গানে।
নিবারিব সব জ্বালা শান্তি পাব প্রাণে।
(ভক্তি করে ডেকে হরি ধরিব তাঁর শ্রীচরণে)
বনলতা, বনপাতা, পরি অঙ্গে যথা তথা,—
বন ফুলে গাঁথি মালা দিব মায়ের শ্রীচরণে।
সব সাধ মিটাইব নির্জ্জন কাননে,
শীতল হইব মোরা সরোবর অবগাহনে।
সকল ভগিনী মিলে, প্রেমভক্তি রসে গলে,
দিব কুসুম অঞ্জলি বনদেবীর চরণে।
হাসিব গাইব মোরা ভ্রমিব পুষ্পচয়নে ;
পুরাইব মনসাধ নির্জ্জন বনভোজনে।
গাছ হতে পাড়ি ফল, সরোবরে তুলি জল,
আনন্দে করিব গান বনবিহঙ্গের সনে।
শীতল সরসী জলে, আনন্দে মিলে সকলে,
করি সুখে সন্তরণ কুমুদী কমল সনে।
কুঞ্জে কুঞ্জে তরুতলে, জলে স্থলে ফুলে ফলে,
সমীরণ হিল্লোলে, নিরখিব নিরঞ্জনে।

সংবাদ।

ভাই রামচন্দ্র সিংহ সম্প্রতি খাঁটুরা খুলনা বাগের হাট ও মঙ্গলগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে প্রচারার্থ গমন করিয়াছিলেন।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে আমাদের প্রচার বাটীর সাহায্যার্থ রংপুরের জমিদার রাজা গোবিন্দলাল রায় বাহাদুর ২৫৲ ও ডিব্রুগড়ের অন্তঃপাতী টালাপ চা বাগানের ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র ২০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

বিগত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ বুধবার প্রীতিভাজন শ্রীমান্ শ্রীনাথ দত্তের নবকুমারের নামকরণ নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। ঈশ্বর কুমারকে আশীর্ব্বাদ করুন।

গত ১৫ই জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজমোহন বসুর নবকুমারের জাতকর্ম্ম নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে।

বিগত ২১ শে জ্যৈষ্ঠ ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর সঙ্গে শ্রীমতী ভুবনমোহিনীর শুভ পরিণয় কার্য্য নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে। পাত্রের বয়স ৪২ বৎসর, পাত্রীর বয়ঃক্রম ২৩ বৎসর। পাত্রী বাল্যকালে বিধবা হইয়াছিলেন, ইহাঁর পিতা, পরলোকগত হরমোন বসু, নিবাস বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত হরিপুর। ঈশ্বর নবদম্পতীকে শুভ আশীর্ব্বাদ করুন।

ভাই উমানাথ গুপ্ত হিমালয়শিখর শিমলাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি গ্রীষ্মকাল সেখানে থাকিয়া সাধন ভজন করিবেন এরূপ ইচ্ছা রাখেন। তিনি যাইবার কালে বাঁকিপুর ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। বিগত ৮ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১২ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত উক্ত ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন আসাম প্রদেশের নানা স্থান এবং কুষ্টিয়া ও পাবনা অঞ্চল ভ্রমণ ও প্রচার করিয়া গত সপ্তাহে

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন, তিনি ২।১ দিনের মধ্যেই ঢাকায় যাইতেছেন।

১৫ই আগষ্ট কোচবিহারে নববিধান সমাজ স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া প্রতিবৎসর সেই দিন কোচবিহার রাজ্যের সমুদায় রাজকার্য্য বন্ধ থাকিবে মহারাজ এরূপ আদেশ করিয়াছেন।

ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর বিবাহ উপলক্ষে কোচবিহারের মহারাণী নগদ ও বস্ত্রালঙ্কারে ১০০৲ শত টাকা, বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ ভ্রাতৃবর লক্ষ্মণচন্দ্র আস ২৫৲ প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রমোহন মজুমদার ৫৲ এবং চট্টগ্রাম হইতে একটি মহিলা অন্তরণের জন্য ১০৲ দান করিয়াছেন। দাতাদিগকে আমরা অন্তরের সহিত ধন্যবাদ করি।

প্রেরিত।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

দ্বিতীয়। সকল প্রেরিত আজীবন একত্র থাকিবার জন্য, সহস্র মনোমালিন্য সত্ত্বেও এক ঘরে বাস করিবার জন্য, আচার্য্যদেবের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন; 'সকল প্রকার বৈষম্য দরবার ভিন্ন অন্য কোথাও মিটিবে না, এই তাঁহার আদেশ ছিল। কিন্তু এখন সে গভীর প্রতিজ্ঞা, সে সুন্দর ব্যবস্থা ভঙ্গ করা হইতেছে কোন্ জগতের কি আইনে? এরূপ গৃহবিচ্ছেদে কি প্রত্যবায় নাই? এবং যাঁহারা এই সকল বিরুদ্ধাচরণ করিতে দ্বিধা করিতেছেন না তাঁহাদের দ্বারা বিধানের কল্যাণ কোথায়? এই কয়টী সহোদরাপেক্ষা প্রিয় ভ্রাতা যদি একত্র থাকিতে না পারিলাম, ইঁহাদের প্রত্যেকের প্রতি যদি অটুট্ প্রেম না থাকিল তবে বিশ্ব সংসারকে বুকে ধারণ করিয়া কি প্রকারে বৈকুণ্ঠের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইব? যে পবিত্র বিধান পৃথিবীর সমস্ত বিসম্বাদ নষ্ট করিতে স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার প্রচারের গুরু ভার স্কন্ধে লইয়া চিরকালের সখা, সুহৃদ, সঙ্গী, সহচর, ধর্ম্মবন্ধু ইহ পরলোকের প্রাণের ভাই গুলিকে ছাড়িয়া থাকা, তাঁহাদের প্রতি অযথা গালি বর্ষণ করা, যে কত দূর অসামঞ্জস্যের ব্যাপার, তাহা বালকেও সহজে বুঝিতে পারে। বিধানবিরোধীদিগের সহিত সাধারণ মিলনের ভূমিতে একত্রিত হইতে পারি, অথচ যাঁহাদের সঙ্গে কোন প্রকার অনৈক্যের কথা নয় তাঁহাদের সহিত মিলিতে পারি না; ইহার কারণ ভগবান ভিন্ন ধরাধামে কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারেনা। যদি স্বতন্ত্র থাকিয়া পুরাতন প্রথাদি পরিবর্ত্তন করত নূতন সৃষ্টির জন্য ব্রাহ্ম সমাজের ইতিহাসে খ্যাতি রাখিয়া যাইবার মানস থাকে, তাহা হইলে আমরা নাচার। কিন্তু সে বিষয়ে একটী কথা আমাদের বিশেষ মনে রাখা কর্ত্তব্য, এখানে এখন যাহাই কেন করিনা, কাহারও কিছু বলিবার অধিকার নাই, বরং পাণ্ডিত্যের বলে যুক্তি তর্ক দ্বারা নিজের কাজ ভাল বলিয়া লোকের কাছে জয় লাভ করিয়াও যাইতে পারি; দুনিয়া মহা হুজুকের জায়গা, এখানে গোছাইয়া গোছাইয়া দুকথা বলিতে পারিলে অনেককে দলভুক্ত করা যায়; কিন্তু পরলোকে ভগবান ও তাঁহার প্রিয় ভক্তের সমক্ষে যখন সমগ্র হৃদয় বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িবে, তখন কি বলিয়া জবাব দিব, এবং কেমন করিয়া তাঁহাদের নিকট মুখ দেখাইব? সেখানে যে ভয়ঙ্কর মুস্কিলে পড়িতে হইবে? আচার্য্যদেব দেখেন না বলিয়া তাঁহার দোহাই দিয়া তাঁহারই মাথায় লাঠি মারিতে উদ্যত, কিন্তু সেখানে গিয়া এই সকল কাজের কি কৈফিয়ত দিব? জানিনা এরূপ যাঁহারা করিতে পারেন, তাঁহারা কিরূপ পরলোকে বিশ্বাস করেন; তাঁহারা হয়ত পরকালের ব্যাপার আর একরূপ ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন, যাহা সাধারণ মানব বুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠিতে পারে না। শুধু একা নয় বিদ্যা বুদ্ধির জোরে আমার কাজের সঙ্গে বহু লোককে জড়াইতেছি, ইহা কম দায়িত্ব নয়। আচার্য্যদেবের ভুল ধরিয়াছি, আবার সেই ভুল জগতের সমক্ষে প্রচার করিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞা করত দল বাঁধিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতেছি ইহা কম সাহসের কথা নয়, ভয়ানক ধর্ম্মবল, বিশ্বাসের তেজ না থাকিলে এরূপ ভীষণ ব্যাপারে কেহ হাত দিতে পারে না। যাহা হউক আমরা অবাক হইয়াছি, বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। ধন্য দুনিয়া! তোমার মায়া ও কুহকের শক্তি। তোমার খাতিরে আজ আচার্য্যদেবের পরম শত্রু, বিধানের ভয়ঙ্কর বিরোধী ঈশ্বরের বিদ্রোহী দিগকেও ধর্ম্ম বন্ধু, হৃদয়ের সখা বলিয়া দল বল সহ আলিঙ্গন করিতে চলিলাম; আর কি চাই? প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইলাম তোমার জোরে, হে সংসার! তোমার কুটিল প্রেমের কাছে স্বর্গের প্রেম কোন্ ছার! আচার্য্যদেবের স্বর্গীয় প্রেম যাহা কল্পনাতেও আনিতে পারে নাই, আমরা তাহা কাজে করিলাম। এরূপ উদার প্রেমেও যদি ইতিহাস ধন্য ধন্য না বলে, তাহা হইলে নাচার! মনে অনেক কথা রহিল বারান্তরে দেখা যাইবে।

গত ১লা বৈশাখের ধর্ম্মতত্ত্বে যে "নববিধান" নামে কাহারও কাহারও আপত্তির কথা শুনা গিয়াছে তাহা সর্ব্বনাশের প্রথম লক্ষণ। পূজ্যপাদ ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় তাঁহার ইণ্টারপ্রেটার পত্রে দুই এক কথায় নামের মাহাত্ম্য বিশেষ রূপে দেখাইয়াছেন, এবং নববিধান নামের গৌরব বিরোধীদিগের কঠিন হৃদয়ে মুদ্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, দেখিয়া বিশেষ আহ্লাদ হইল। তিনি যে সম্মিলন সভা করিয়াছেন বলিয়া নববিধান নাম ছাড়িবেন এরূপ আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক, নববিধান নাম তাঁহার প্রাণের সঙ্গী। সভা যাহা করিয়াছেন তাহা একটা সামাজিক ব্যাপার মাত্র। তিনি আর যতই করুন, নববিধান নিশান কাহারও খাতিরে স্কন্ধ হইতে নামাইতে পারেন না। তাঁহার চরণে আমরা এইমাত্র ভিক্ষা চাই যে তিনি আমাদের প্রতি বিশেষ দয়া করিয়া আমাদিগকে নিতান্ত অসহায় কৃপাপাত্রি বিবেচনা করিয়া আমাদের সহস্র দোষ ত্রুটি অপরাধ উপেক্ষাও মার্জ্জনা করিয়া ঈশ্বর ও আচার্য্যদেবের খাতিরে আমাদিগকে তাঁহার আশ্রয়ে স্থান দিন; আর নির্দ্দয় হইয়া আচার্য্য বিরহ কাতর দীন দুঃখী পাপ ভারাক্রান্ত বিধান মণ্ডলিকে পায়ে ঠেলিবেন না। আমরা তাঁহার ভরসা খুব রাখি, আচার্য্যদেবের বাল্য সহচর ও চিরসঙ্গী বলিয়া বড় আশা করিয়া আমরা আমরা তাঁহার মুখের দিকে মাতৃহীন শিশুর ন্যায় তাকাইয়া আছি। আর অধিক কি বলিব তাঁহাকে হারাইয়া আমরা অকুল পাঁথারে চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছি। হৃদয়ের এই সরল শোক তাঁহাকে অতি কাতর ভাবে জানাইতেছি, দেখি তাঁহার দয়া হয় কি না, ভগবান মুখ তুলিয়া তাকান কিনা। (ক্রমশঃ)

দিয়াগঞ্জ
১৮ ই বৈশাখ।

নিবেদক—
শ্রীচন্দ্রশেখর সেন—

এই পত্রিকা ৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড় বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্।
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে।

২৩ ভাগ। ১২ সংখ্যা। | ১৬ই আষাঢ়, শুক্রবার, ১৮১০ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে প্রেমময় হরি! তোমার প্রেমিক ভক্তগণ প্রেমের শাসনে শাসিত। প্রেমের সীমা অতিক্রম করিয়া কখন তাঁহারা কথা বলেন না ও কার্য্য করেন না। সত্য বটে প্রেমিক ভক্তগণ প্রেমে প্রমত্ত, তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া যায় প্রেমের জন্য, কিন্তু প্রেমকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই সচেতন সর্ব্বদাই জাগ্রৎ। যাহাতে প্রেমের ব্যাঘাত জন্মে, তাঁহাদের মুখে তেমন বাক্য সরে না। তাঁহাদের মনও তেমন চিন্তায় প্রবৃত্ত হয় না। প্রেমিকদিগের অচৈতন্যের ভাব বিষয়ের প্রতি। সংসারে কি হইতেছে, বিষয়ী লোকেরা কি বলিতেছে কি করিতেছে প্রেমিক ভক্ত সে দিকে কাণ দেন না, সে দিকে মনোযোগ দেন না, কিন্তু স্বর্গের ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহাদিগের কিছুমাত্র উপেক্ষা বা অমনোযোগ নাই। বৈষয়িক ব্যাপারে যে তাঁহাদের উপেক্ষা বা অমনোযোগ প্রকাশ পায় তাহা কেবল স্বর্গীয় বিধানের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া। তাই তাঁহারা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া অন্তর্জ্ঞানকে প্রদীপ্ত বা উজ্জ্বল করিয়া তোলেন। অথবা আভ্যন্তরিক জ্ঞানকে উজ্জ্বল করিবার জন্যই ইচ্ছাপূর্ব্বক বাহ্যজ্ঞানবর্জ্জিত হইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা বাহ্যজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরীন চেতনাও হারাইয়া ফেলেন তাঁহারা কি প্রেমিক? তাঁহারা তোমার ভক্ত নামের যোগ্য? হে ভক্তবৎসল! তোমার অনুগত দাসের কিসে ভাল হয় তাহা তুমি জান। এই জন্য ভক্তগণ তোমার প্রতি ভার দিয়ে আপনারা নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হন। কেন না তুমি তাঁহাদের জন্য যাহা করিবে তাহা কখন ভাল বৈ মন্দ হইবে না ইহাতে তাঁহারা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করেন। তুমি যেমন তাঁহাদিগের সম্বন্ধে ভুল করিয়া মঙ্গলের স্থলে অমঙ্গল বিধান করিতে পার না তাঁহারাও সেই জন্যই সেই অনুরোধেই তোমার প্রেমের ক্ষতি করিতে পারেন না। এই জন্য হরি হে, তোমার ভক্ত উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াও কোন মনুষ্যের নিকটে তাহা প্রকাশ করিয়া বলেন না। কেন না ওরূপ করিলে অপ্রেমিকের কার্য্য করা হইবে, ইহা তিনি সহজ জ্ঞানের বলে বুঝিতে পারেন। বরং তিনি তাহার (উৎপীড়কের) মঙ্গলের জন্য, তাহার অবিশ্বাসী হৃদয়কে বিশ্বাসী ও বিনীত করিবার জন্য তোমার দ্বারে ক্রন্দন করিতে পারেন, পাপীর পাপ অপরাধ মোচনের জন্য আপনার জীবন বলিদান করিতে পারেন, কিন্তু কোন লোকের

নিকটে সহানুভূতি পাইবার আশা করিয়া কিছুমাত্র বলিতে পারেন না। হে করুণাসাগর প্রভো। তোমার বিধানের মণ্ডলীভুক্ত দাসদলের মধ্যে তোমার প্রেমের এই গভীর রহস্য প্রকাশ কর, যেন তাঁহারা কদাচ নিজের দুঃখের কথা প্রকাশ করিয়া অন্যের হৃদয়কে ব্যথিত ও উত্তেজিত করিয়া না তোলেন। ওরূপ করিলে যে ক্ষতি তাহা আমাদিগের আপনারই ক্ষতি অন্যের নহে. কৃপানিধান। কৃপা করিয়া এই তত্ত্বটি আমাদিগকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেও।

—•—

প্রেম ও সহানুভূতি।

প্রেমের অর্থ ভালবাসা—ভালবাসার অর্থ, ভাল বলিয়া—অতিসুন্দর অতিনির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক বলিয়া গ্রহণ করা। আর ভাল বাসিলে, ভাল বলিয়া গ্রহণ করিলেই, ইচ্ছা হয় তাহাকে আপনার করি এবং আপনি তাহার হই—তিনি আমার আমি তাঁর হইয়া যাই। সহানুভূতির অর্থ সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করা—অন্যের সুখ দুঃখ আপনাতে অঙ্গীকার করিয়া অন্যের ভাবে ভোগ করা। যে ব্যক্তি প্রেমিক হয় সহানুভূতি তাহার সঙ্গের সঙ্গী। কেন না প্রেমিক হইলেই আপনাকে পরের ও পরকে আপনার করিতে হয়। যখন আপনি পরের ও পর আপনার হয় তখন অন্যের সুখে সুখানুভব করা এবং দুঃখে দুঃখানুভব করা স্বাভাবিক হইয়া পড়ে। কিন্তু প্রেমিক কদাচ অপরের নিকটে সহানুভূতির প্রত্যাশা করিতে পারেন না। কেন না অন্যের নিকট সহানুভূতির আশা করিলেই প্রেমের প্রতিকূলাচরণ করিতে হয়। আমি দুঃখের সময়, অপমান নির্যাতনের সময় অন্যের নিকটে সহানুভূতি চাহিলে প্রেমের বিরুদ্ধ ব্যবহার করা হয় কিরূপে, এটি সহজে সকলের বোধগম্য হওয়া কঠিন। তাই আমরা এবিষয়টি একটু পরিষ্কৃত করিতে চেষ্টা করিতেছি।

যে ব্যক্তি প্রেমিক, পৃথিবীতে তাঁহার কেহ শত্রু আছে ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে অসমর্থ। কেন না শত্রু আছে মনে করিলেই অপ্রেমকে হৃদয়ে স্থান দিতে হইবে। শত্রু আছে মনে না করিলে অপমান নির্য্যাতন ইত্যাদি পরের দুর্ব্যবহার মনে স্থান পাইতে পারে না। বিন্দুমাত্রও অপমান নির্য্যাতন যদি পোষণ করি, তাহাতে ক্ষুণ্ণ হই, তাহা হইলেই প্রেমের বিরুদ্ধ ব্যবহার করা হইবে। আর যদি লোকের নিকটে বলি যে, দেখ ভাই! আমার প্রতি অমুক অমুক ব্যক্তিরা এইরূপ উৎপীড়ন করিয়াছে। তাহা হইলে এক দিকে সেই উৎপীড়নকারীদিগের প্রতি লোকের মনকে বিদ্বেষের নিমিত্ত উত্তেজিত করিয়া দেওয়া হয়, অন্যদিকে নিজের দুঃখ মোচনের জন্য সেই সকল লোকের দয়াকে উত্তেজিত করিয়া তোলা হয়। নিজের দুঃখের কাহিনী পরের কর্ণগোচর করা আর অপরাধকারীদিগের প্রতিকূলে বিদ্বেষ করিবার জন্য লোকদিগকে শিক্ষা দেওয়া, একই কথা। এক জন অন্যজনের প্রতি অত্যাচার করিয়াছে এইকথা যখন কেহ মনোযোগ দিয়া শোনে তখন সেই দুঃখ বর্ণনকারীর কথার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতাদিগের রক্ত উষ্ণ, মন উত্তেজিত ও চঞ্চল হইয়া উঠে। কেহ বা অসাধ্য স্থলে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ও আরক্ত চক্ষু জলপূর্ণ করিয়া নীরব থাকে, কেহ বা আহা, উহু, প্রভৃতি বেদনাসূচক দুই চারিটি শব্দ উচ্চারণ করিয়া চলিয়া যায়, তন্মধ্যে যাহার শক্তি আছে, ক্ষমতা আছে সে নির্য্যাতনকারীদিগের নির্য্যাতন ও অপমানের প্রতিশোধ লইতে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপে আত্মদুঃখ রটনাকারী—আপনার অজ্ঞাতসারে প্রেমের বিরুদ্ধাচরণ করেন। কিন্তু যথার্থ প্রেমিক জীবন, এবিষয়ে অতিশয় সাবধান, তিনি ভ্রমেও অন্যকৃত অত্যাচারের কথা মুখে আনেন না। তিনি প্রভুর দৃষ্টান্তানুসারে ক্ষমা করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, কেবল ক্ষমাই জানেন ক্ষমাই করেন।

ক্ষমা করিলে আর অপ্রেমের প্রবেশাধিকার থাকে না। এইজন্য দেবাত্মা যিশুকে তাঁহার শিষ্য যখন জিজ্ঞাসা করিলেন যে "প্রভো! কতবার ভ্রাতৃকৃত অত্যাচার ক্ষমা করিব, সাতবার কি?" যিশু বলিলেন, "আমি তোমাদিগকে সাত বারের কথা বলি নাই কিন্তু সপ্ততিগুণ সাত বারের কথা বলিয়াছি।" ইহার অর্থ কেবল ক্ষমাই করিবে, ক্ষমাশূন্য হইবে না। অক্ষম লোকেরাই ক্ষমা করিতে পারে না ক্ষমতাবান লোকেরা অবলীলাক্রমে কেবল ক্ষমা করিয়া যান।

প্রেমের এই মহাশাস্ত্র অতি উচ্চ। সামান্য লোকেরা কখন ইহার শাসনের অধীন হইয়া জীবন কাটাইতে পারে না। সুতরাং দুর্ব্বলদিগের দৌর্ব্বল্যেরও ক্ষমা আছে। কিন্তু তাঁহারাই ঘোরতর অপরাধী, যাঁহারা পুনঃ পুনঃ প্রেমের শাস্ত্র মুখে উচ্চারণ করিয়া, আপনাকে প্রেমিক বৈরাগীর শিরোমণি বলিয়া লোকের নিকটে প্রকাশ করেন। যিনি প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান করিয়াই গান করেন, "আমারি পিতার রাজ্য এ বিশ্বসংসার। বিশ্বে হরি বিরাজিত, হরিতে বিশ্ব বিধৃত, আমি সকলের মিত্র, সকলে আমার।" তিনি যদি প্রেমের বিরুদ্ধাচরণ করেন। যদি লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়া কেবল নিজের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়নের কথা প্রচার করেন। চিরসঙ্গী জীবনসঙ্গীদিগের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া যাহারা তাঁহাদিগকে শত্রু মনে করে দোষী মনে করে তাহাদিগের সঙ্গে যদি বাস করেন, তিনিই এবিষয়ে মহা অপরাধী। কেন না "তিনি সকলের মিত্র সকলে তাঁহার মিত্র" এই যে গৌরবের কথা তিনি মুখে উচ্চারণ করেন, ইহাকে মূল্যবিহীন বস্তুর ন্যায় তিনি পদদলিত করিতেছেন। তিনি সকলের মিত্র অথচ অনাকৃত উৎপীড়নের কথাই সর্ব্বদা তাঁহার মুখে শুনিতে পাওয়া যায় ইহার কোনই সামঞ্জস্য হয় না। যাঁরা চিরসঙ্গী জীবন সঙ্গী পরলোকের সহযাত্রী—আমি যদি তাঁহাদিগের সঙ্গ প্রসঙ্গ সহ্য করিতে না পারি, যাঁহাদের সঙ্গে পান ভোজনে পরিত্রাণ তাঁহাদিগের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া যদি তাঁহাদের সমক্ষেই অন্যত্র পান ভোজন করি—যদি তাঁহাদের সঙ্গে দেখা শুনা বাক্যালাপ ও আহারাদির ভয়ে যদি আমি পলাইয়া বেড়াই, তবে আমার জীবন কেমন গভীর প্রতিহিংসা, ঈর্ষ্যা বিদ্বেষের অধীন হইয়া আছে, আমি না বুঝিলেও অন্য লোকে তাহা বুঝিবে; সুতরাং আমার প্রেমের কথা বৈরাগ্যের কথা কেবল কথামাত্র সার হইবে। প্রেম নহে প্রেমের ভাণ, বৈরাগ্য নহে বৈরাগ্যের ভাণ, আমার জীবনে আছে—এই যে ভাণ, এই যে মৃগতৃষ্ণা ইহা অনেক সরল লোকের প্রবঞ্চনার মূল। কেন না আমার ভিতরে বাহিরে, কথায় ও কার্য্যে মিলাইয়া লওয়া অন্যের কার্য্য নহে, ইহা আমার আপনার কার্য্য। কিন্তু আমি যদি অন্ধ হই, অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া দৃষ্টিশক্তি হারাই তবে আর পরিবর্ত্তনের আশা ও উপায় নাই।

প্রেম আত্মপ্রকাশ করে না—আত্মগোপন করে। প্রেম বৈরাগ্যের সহচর, সুতরাং বৈরাগ্যও আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। প্রেম ও বৈরাগ্যকে যদি জিজ্ঞাসা কর, "তোমার নাম কি?" সে কদাচ আত্মপরিচয় প্রদান করিতে পারিবে না। ইহারা নাকি ধর্ম্মরাজ্যের রাজা—রাজা স্বয়ং নিজমুখে পরিচয় দিতে পারেন না। আত্মপরিচয় দেওয়া রাজার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ও রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু কেহ যদি বলে বা পথে পথে বলিয়া বেড়ায় "আমি রাজা, আমি রাজা" তাহাকে সেই পরিচয়ের জন্যই প্রলাপকারী বলিয়া লোকে গ্রহণ করে, এবং হাস্য করে।

যে প্রেম আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না, আপনার নামটি পর্য্যন্ত বলিতে অসমর্থ সে অন্যের সহানুভূতি পাইবার আশা করিবে কিরূপে? অন্যের সহানুভূতি পাইবার অভিলাষ করিলেই বলিতে হয় "আমি অমুক দেশের রাজা বা রাজপুত্র, আমার এত মান সম্ভ্রম, সুখ সম্পদ

ছিল এখন আমার এই দুঃখ।" ইহা প্রেমের পক্ষে সুতরাং প্রেমিকের পক্ষে অসম্ভব। যিনি আপনার ধার্ম্মিকতা, আপনার শীলতা ও সৌজন্য, আপনার অভিজ্ঞতা ও বহু কাল সাধন ভজনে লব্ধপ্রতিষ্ঠার কথা সর্ব্বদাই লোকের কর্ণগোচর করেন, তাঁহার জীবনে প্রেম আছে তিনি নিজে বলিতে পারেন, কিন্তু বিজ্ঞান ইহা কোনরূপে স্বীকার করিবে না। প্রেমের প্রকৃতি প্রেমের বিজ্ঞান প্রকাশ করে। যাঁহারা প্রেমিক, তাঁহারা কেবল পরদুঃখে কাতর হইতে জানেন, পরের দুঃখমোচনের জন্য আপনার জীবন বিসর্জ্জন করিতে পারেন, কিন্তু আত্মদুঃখ মোচনের জন্য অন্যকে অনুরোধ করিতে পারেন না। আপনার ক্লেশ বর্ণন করিয়া কাহার প্রতিকূলে অন্যের মনকে উত্তেজিত করিতে পারেন না। যিনি বন্ধুকর্ত্তৃক তিরস্কৃত বা অপমানিত হইয়া জুড়াইবার জন্য বন্ধুর যিনি শত্রু তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন, আগে যাঁহার ছায়া স্পর্শ করা অপরাধ মনে করিতেন, এখন তাঁহারই অন্ন যদি শত্রুর শত্রু বলিয়া মিষ্ট বোধ হয়, এবং মনের বিতৃষ্ণা দূর করিয়া দেয়, তবে সে ব্যক্তির হৃদয় প্রেমের ক্ষেত্র নহে কিন্তু সে কেবল ঈর্ষ্যা বিদ্বেষের ক্রীড়াভূমি তৎপক্ষে কিছু সংশয় নাই। অতএব সহানুভূতি ও প্রেম কেবল অন্যকে দিবার জন্য, কিন্তু নিজে গ্রহণ করিবার জন্য নহে। এই শ্রেণীর প্রেমিক নামধারী ব্যক্তি যখন শত্রুর শত্রুর গৃহে গমন করিয়া নিজের মর্ম্মপীড়ার কথা বলিতে প্রবৃত্ত হন, শত্রুর শত্রুর অন্ন ভোজন করিয়া তৃপ্তি লাভ করেন তখন প্রেমের পরম শত্রু অহঙ্কারকে সহায়রূপে গ্রহণ করিতে হয়। কেন না আত্মগৌরব ও আপনার নির্দোষতা প্রচার করা অহঙ্কারের সাহায্য ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না। শত্রুর মলমূত্রাদি বিসর্জ্জনের স্থান পরিষ্কৃত করিতে পারেন, এবং অপরাধীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারেন ও করেন, প্রেম বা বিনয়কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া নহে—কিন্তু অহঙ্কারকর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াই এ সকল করিতে পারেন। এই প্রকারে কৃত্রিম প্রেমিককর্ত্তৃক প্রেমের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হয়, কিন্তু রক্ষিত হয় না। অনেক সময়ে অনেকে প্রেমের সঙ্গে প্রকৃতরূপে পরিচিত হইতে পারেন না বলিয়া প্রেমের স্বভাব রীতিনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণই অনভিজ্ঞ থাকেন, কাজেই না জানিয়া প্রেমের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেন।

প্রেমের সঙ্গে সহানুভূতির এই যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ইহা প্রকৃত প্রেমিক ব্যতীত অন্যের অনুভব হওয়া অসম্ভব। যাঁহারা প্রেমিক তাঁহারা প্রেমের অনুরোধে জীবন-বিসর্জ্জন করিতে পারেন, কিন্তু যাহাতে প্রেমের ক্ষতি, দয়ার ক্ষতি ও অহঙ্কার প্রকাশ হয় তেমন কার্য্য করিতে পারেন না। অপ্রেমিক প্রেমিক হইতে পারে, কিন্তু সহানুভূতির প্রার্থী কখন প্রেমিক হইতে পারে না। সহানুভূতির লালসা গূঢ়রূপে প্রেমমূল কর্ত্তন করিয়া ফেলে। মূষিক যেমন অজ্ঞাতসারে বৃক্ষের মূল কর্ত্তন করে, প্রথমতঃ কেহ বুঝিতে পারে না, যখন বৃক্ষটি মরিয়া যায়, তখন সকলে মূষিকের সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ সহানুভূতিস্পৃহা প্রেমের মূল অজ্ঞাতসারে কর্ত্তন করে, প্রেমের বৃক্ষটি মরিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত কেহ ইহাকে চিনিতে পারে না। যাঁহারা প্রেমের সাধক, প্রেমের প্রার্থী, তাঁহারা সহানুভূতি স্পৃহার এইরূপ মায়াত্মকতা ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত না হইলে প্রতারিত হইবার সম্পূর্ণই সম্ভাবনা আছে।

শুদ্ধতা ধর্ম্মের আরম্ভ।

ভগবান্ সর্ব্বপ্রথমে জীবগণের নিকটে শাস্তা হইয়া প্রকাশিত হইয়া থাকেন। মানুষের মন যতক্ষণ বিশুদ্ধ না হইতেছে, কিছুতেই সে ভগবান্‌কে চিনিতে পারে না। তিনি যে প্রকার নহেন, যাহা নহেন, সেই প্রকারে তাঁহাকে

তাহার ভ্রমবুদ্ধি প্রতিপন্ন করিয়া থাকে। সংসার একটি প্রকাণ্ড আবরণ হইয়া মনুষ্যের চক্ষুকে আবৃত করিয়া রাখে, সে আর ভগবান্‌কে দেখিবে কি প্রকারে বুঝিবে কি প্রকারে? যদি বিশুদ্ধি উপস্থিত না হইল, শত বর্ষ সাধন করিয়াও কিছু ফল লাভের সম্ভাবনা নাই। অগ্রে শুদ্ধি তৎপরে ঈশ্বরলাভ।

অগ্রে শুদ্ধি তৎপরে ঈশ্বরলাভ, এ কথাটী বড় সহজ হইল না, ইহাতে মনুষ্যমাত্রের মনে নিরাশা সমুপস্থিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা। মানুষ একেবারে শুদ্ধ হইবে, ইহা কি কখন সম্ভব? শুদ্ধ কেবল একমাত্র ঈশ্বর, তাঁহাকেই কেবল পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। ঈশ্বর ভিন্ন এমন কে আছে, যে বলিতে পারে, আমি এমন বিশুদ্ধ হইয়াছি যে, আমাতে আর কখন পাপের সম্ভাবনা নাই। সত্য, মানুষ এ কথা বলিতে পারে না, এবং তাহার বলিবার অধিকারও নাই, অথচ শুদ্ধিই ধর্ম্মের প্রথম আরম্ভ এ কথাও কিছুতে অস্বীকার করিতে পারা যায় না। এ দুইয়ের সামঞ্জস্য কোথায় একবার দেখা নিতান্ত প্রয়োজন।

আপাততঃ এ দুইয়ের সামঞ্জস্য যে প্রকার কঠিন বলিয়া মনে হয়, বাস্তবিক সে প্রকার কঠিন নহে। ঈশ্বরের শুদ্ধতা নিরপেক্ষ, মনুষ্যের শুদ্ধতা সাপেক্ষ। ঈশ্বর নিত্য শুদ্ধ, মানুষকে শুদ্ধ হইতে হইবে। সে কি প্রকারে শুদ্ধ হইবে? যাহা কিছু ঈশ্বরবিরোধী ইচ্ছা তাহার ভিতরে আছে, তাহা পরিহার করিতে হইবে। এই পরিহারই তাহার পক্ষে শুদ্ধি, এবং তাহাতেই তাহার ধর্ম্ম জীবনের আরম্ভ। আমি আমার মনের ভিতরে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী ইচ্ছা পোষণ করিতেছি, অথচ আমি তাঁহাকে দেখিব, স্পর্শ করিব, তাঁহার সহবাস সম্ভোগ করিব, এরূপ আশা দুরাশা। বিরুদ্ধ ইচ্ছা পরিত্যাগ কর, দেখিবে দিন দিন কেমন ভগবানের সহিত যোগনিষ্পন্ন হইতে থাকে।

বিরুদ্ধ ইচ্ছা ত্যাগ যদি জীবের পক্ষে শুদ্ধি হয়, তবে ইহা সহজ না কঠিন। সহজ কেন না স্বাভাবিক, কিন্তু অভ্যাস বিরুদ্ধইচ্ছাকে এমনই দৃঢ়মূল করিয়া ফেলিয়াছে যে, বিরুদ্ধ ইচ্ছা ত্যাগ করিতে গিয়া প্রাণান্তিক ব্যাপার সমুপস্থিত হয়। কিন্তু হইলে কি হইবে, ইহা না করিলে পরিত্রাণ নাই মুক্তি নাই, ঈশ্বর সহ যোগ নাই। এখানে জীবের পক্ষে একটি আশার সংবাদ আছে যাহা শ্রবণ করিলে তাহার সাধনে প্রবৃত্তি সমুপস্থিত হইবে। অভ্যাস আমাদিগকে কি প্রকার দাস করিয়া ফেলিয়াছে, পাপ আমাদিগের অস্থির মধ্যে কি প্রকার দৃঢ় আবাস নির্ম্মাণ করিয়াছে ইহা স্বয়ং ভগবান্ যে প্রকার জানেন, এমন আর কেহই জানে না। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধ ইচ্ছা পরিত্যাগে ইচ্ছা জন্মিয়াছে, ভগবান্ তাহার সেই ইচ্ছা দর্শন করিয়া, ইচ্ছাময় হইয়া তাহার দুর্ব্বল ইচ্ছাতে অবতরণ করেন। এই অবতরণে এমনই ইচ্ছাতে বল সমুপস্থিত হয় যে, পূর্ব্বে যে সকল দুরভ্যাস দূরে পরিহার করা একান্ত অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল, এখন সে সকল পরিত্যাগ অতি সহজে হয়।

আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে প্রতিপন্ন হইল শুদ্ধতা ধর্ম্মের আরম্ভ। শুদ্ধতা ভগবানেতে নিত্যসিদ্ধ, কেন না উহা তাঁহার স্বরূপ, কিন্তু মনুষ্যের এই শুদ্ধতা উপার্জ্জন করিতে হয়। উপার্জ্জন করিতে হয় এই জন্য বলিতেছি, কেন না এমন মানুষ এ সংসারে অতিবিরল যে ব্যক্তি পাপের হাতে বিকারের হাতে নিপতিত হয় নাই। শুদ্ধতা উপার্জ্জনে ক্লেশ আছে, সে ক্লেশ এমন নয় যে, ক্লেশ দেখিয়া কেহ যত্ন পরিত্যাগ করিবে। যদি ঈশ্বররূপ অমূল্য সামগ্রী শুদ্ধতাযোগে লাভ করা যায়, তবে তাহাতে উপার্জ্জন ক্লেশ দেখিয়া কে পৃষ্ঠভঙ্গ দিবে। প্রথম প্রথম ক্লেশ, কিন্তু যখন ঈশ্বরবিরোধী ইচ্ছা পরিহারে ইচ্ছার অভ্যুদয়

হইল, তখন তো আর ক্লেশ থাকিবে না। তখন যে স্বয়ং ভগবান্ সে ঈচ্ছার অভ্যন্তরে ইচ্ছারূপে অবতীর্ণ হইয়া সাধকের সকল দুর্ব্বলতা দূর করিয়া দিবেন। যখন দুর্ব্বলতা চলিয়া গেল তখন আর উপার্জ্জনের ক্লেশ কোথায় রহিল।

স্ত্রী পুত্র পরিবার, ভোগবাসনা, মানমর্য্যাদা সম্ভ্রমাদির জন্য ব্যাকুলতা, এবং অন্যান্য বিবিধ প্রকারের প্রবৃত্তি শুদ্ধতার পথে অন্তরায় হইয়া অবস্থিত করিতেছে। এত অন্তরায় সত্ত্বেও মানুষ শুদ্ধি লাভ করিবে, এবং সেই শুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়া চিরসুখী ও কৃতার্থ হইবে, ইহা কি কখন সম্ভবপর? হাঁ সম্ভবপর। মানুষের সাধনের পথে কেহই অন্তরায় নহে, কিছুই অন্তরায় নহে, অন্তরায় কেবল তাহার নিজের ইচ্ছা। যেখানে ইচ্ছা উৎপন্ন হইয়াছে, সেখানে কোন প্রতিবন্ধক তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। লোকে বলে, কৈ ইচ্ছা করিলেই যে হয় এ কথা কি-প্রকারে বলিব? আমাদের কি আর ইচ্ছা নাই, কিন্তু হাত পা মন সংসারে এমনই বদ্ধ যে, ইচ্ছা করিয়াও ছাড়াইতে পারি না। এ ইচ্ছা ইচ্ছা নহে, ইহা লোকের 'খেয়াল'। যদি হয় হউক, ইহাকে ইচ্ছা বলে না। আমার না হইলে চলে না, ঈদৃশ মনের একান্ত বাসনাকে ইচ্ছা বলা যায়। এমন কোন্ বিষয় আছে, যাহা ঈদৃশ ইচ্ছাতে নিষ্পন্ন না হয়। মানুষ মৃত্যু স্বীকার করিবে, তবু ইচ্ছা পরিত্যাগ করিবে না, এই ইচ্ছা বাস্তবিক ইচ্ছা।

শুদ্ধতা ইচ্ছার সহিত একান্ত সংলগ্ন। ভগবানের ইচ্ছাই শুদ্ধতা, সেই ইচ্ছার অনুসরণে সুতরাং জীবের শুদ্ধি। যেখানে শুদ্ধি সেখানে ইচ্ছার নিত্যবাস। আমরা যাহাকে ইচ্ছা বলি, তাহা ইচ্ছা নহে, কেন না তাহাতে শুদ্ধি অর্থাৎ অন্য সকল প্রকারের সংমিশ্রণের অভাব নাই। যখন জল ঠিক আপনি যাহা তাহাই থাকে, তখন উহা নির্ম্মল ও শুদ্ধ, কিন্তু যখন আর কিছু উহার সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তখন উহা অনির্ম্মল অশুদ্ধ। ইচ্ছা বাসনাদির সহিত সম্বন্ধবিরহিত হইয়া আপনাতে আপনি যখন স্থিতি করে তখন উহা শুদ্ধ, আবার যখন বাসনাদি সংযুক্ত হয়, তখন উহা অবিশুদ্ধ। ইচ্ছা সংমিশ্রণবর্জ্জিত হয়, এই জন্য সাধন, এবং এই সাধনে সিদ্ধ হইলে, ইচ্ছা আপন স্বভাবে আপনি স্থিতি করিলে, সেই ইচ্ছাতে ভগবানের ইচ্ছা অবতরণ করে। সুতরাং শুদ্ধিতেই ধর্ম্মের আরম্ভ।

—:•:—

ধর্ম্মতত্ত্ব।

দলের ভাব দুই প্রকার। এক পৃথিবীর সমুদয় দল ভাঙ্গিয়া এক বিশ্বজনীন দলে পরিণত করিবার যত্ন। দ্বিতীয় সমুদয় জগতের আশার মূল ছেদন করিয়া একদলকে শত শত দলে বিভক্ত করিবার চেষ্টা। প্রথম দলের প্রবর্ত্তক সাক্ষাৎ ভগবান, দ্বিতীয় দলের প্রবর্ত্তক শয়তান। ইহার একদল আশা ও আনন্দপ্রদ, অন্যদল শোক দুঃখের কারণ। যে দল ভগবান গঠন করেন তাহা শুনিলে মনে সুখের সঞ্চার হয়, আর শয়তানের নাম শুনিলেই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ভগবান তাঁহার স্বর্গরাজ্য ও প্রেম পরিবারের সৌন্দর্য্য দেখাইয়া পৃথিবীর সমুদয় নরনারীকে বিমোহিত করেন। তাহারা তাঁহার আকর্ষণে পড়িয়া সূত্রবদ্ধ পুত্তলিকার ন্যায় আকৃষ্ট হইয়া এক স্বর্গীয় সম্বন্ধ সূত্রে গ্রথিত হইয়া পড়ে। ভগবান স্বয়ং পিতা মাতা হইয়া মধ্যস্থলে উপবিষ্ট হন, আর জগতের নরনারীদিগকে ডাকিয়া চারিধারে বসান। তাহারা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়াই তাঁহাকে জনক জননী বলিয়া চিনিয়া লয়, আর জগতের সমুদয় নরনারীকে আপন ভ্রাতা ভগিনী বলিয়া গ্রহণ করে। তাহারা এইরূপে সমুদয় জগত্ মিলিয়া এক বিশ্বব্যাপী দল গঠন করিতে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু শয়তান ইহা সহ্য করিতে পারে না। সে এই সকল দলবদ্ধ লোকের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সকলকেই বিচারপ্রিয় তর্কপ্রিয় করিয়া তোলে। এবং প্রত্যেক নরনারীকে নিজের দোষদর্শনে অন্ধ করিয়া পরের দোষানুসন্ধানে পটু ও উত্তেজিত করিয়া দেয়। ঈশ্বরের উপদেশে পূর্ব্বে যাহাদিগকে ভ্রাতা ভগিনী বলিয়া গ্রহণ ও সমাদর করিয়াছিল, পরে শয়তানের উপদেশে তাঁহাদিগকে শত্রু বলিয়া গ্রহণ করে। এই কারণে ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠিত দল ভাঙ্গে, একদল ভাঙ্গিয়া শত শত দলে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ঈশ্বর যখন নেতা হইয়া লোকদিগকে একত্র দলবদ্ধ করেন, তখন তাহাদিগের মধ্যে স্বার্থ অহঙ্কার

স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না, কেন না তখন কর্ত্তা মানুষ নহে, ঈশ্বর। তখন সকলেই "আপনাকে ভুলে, পরের মঙ্গলে।" ব্রতী হন, কিন্তু শয়তানের দলে সকলই অগ্রকর্ত্তা। এই জন্য এক দলের পরিবর্ত্তে এক দল হয় না, একদল ভাঙ্গিয়া শত শত দল হয়। এইরূপ ঈশ্বরের দলের বিরুদ্ধে শয়তানের দলের কথা আমরা কল্পনা করিয়া বলিতেছি না। যাঁহারা ধর্ম্ম জগতের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন যে হিন্দু বৌদ্ধ য়িহুদি খৃষ্টান মোসলমান সকলেই শয়তানের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং ঈশ্বরের রাজ্যে শয়তানকে রাজা করিয়াছেন। তাঁহাদিগকে পৃষ্ঠভঙ্গ দিতে দেখিয়া এবার নববিধান স্পর্দ্ধা করিয়া পৃথিবীতে আসিয়া যে মহা ব্যাপার সাধন করিয়াছিলেন তাহা কে না জানে? আমরা আশা করিয়াছিলাম নববিধানের ভক্তদল কখন খর্ব্ব হইবে না, কিন্তু সে আশা আকাশকুসুমের ন্যায় অলীক বস্তু হইয়া পড়িয়াছে। অতি অল্পদিন মধ্যে নববিধানের একদল ভাঙ্গিয়া পাছে বিভিন্ন দলে পরিনত হয় ইহাই আশঙ্কার বিষয় হইয়াছে।

—•—

আচার্য্যের উপদেশ।

সিমুলিয়া ব্রাহ্মসমাজের অষ্টম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে।

মঙ্গলবার ১০ পৌষ, ১৮০০ শক।

"আরাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং।
নারাধিতো যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং॥
অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং।
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং॥

নারদপঞ্চরাত্র ১। ২ অস্যার্থঃ

"যদি হরি আরাধিত হন তবে তপস্যার ফল কি? আর যদি হরি আরাধিত না হন তবে তপস্যার ফল কি? যদি হরি অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান থাকেন তবে তপস্যার কি ফল? আর যদি হরি অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান না থাকেন তবে তপস্যার কি ফল?"

নারদ পঞ্চরাত্রের এই উক্তি ভক্তদিগের পক্ষে অমূল্য রত্ন। ভাবটি সহজ অথচ অতি নিগূঢ়, সরল অথচ গভীর। ইহাতে বালকের কথা অথচ মহা জ্ঞানীর কথা মিলিত হইয়াছে; সাধনের এবং ভক্তির সামঞ্জস্য হইয়াছে। আপাততঃ শুনিলে মনে হয় এই কথাতে যেন কিছু অসঙ্গত আছে। এই কথা শুনিয়া বোধ হয় বুঝি, তপস্যার কোন ফল নাই। "যদি হরি আরাধিত হন তবে তপস্যার ফল কি? আর যদি হরি আরাধিত না হন তবে তপস্যার ফল কি?" যদি ঈশ্বরের বর্ত্তমানতা দেখিয়া তাঁহার আরাধনা করিতে শিখিয়া থাক তবে আর তপস্যার প্রয়োজন কি? আবার যদি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস না কর এবং তাঁহাকে মনের সহিত ভাল বাসিতে না পার তাহা হইলেই বা তপস্যার ফল কি? বাস্তবিক তপস্যার কোন ফল আছে কি না? যাহাতে হরির আরাধনা হয় না অথবা হরির প্রতি প্রেমোদয় হয় না সেই তপস্যায় কোন ফল নাই, আবার যদি হরির প্রতি প্রেম হইয়া থাকে তবে তপস্যার প্রয়োজন নাই। অতএব ঈশ্বরারাধনা করিলেও তপস্যার ফল নাই; এবং ঈশ্বরারাধনা না করিলেও তপস্যার ফল নাই। হরিভক্তি মনুষ্য জীবনের একমাত্র ভূষণ। যিনি হরিকে ভক্তি করেন, হরি প্রেমে গলিয়া রহিয়াছেন তাঁহার আর তপস্যার প্রয়োজন কি? যিনি হরিকে ভক্তি রজ্জুতে বাঁধিয়াছেন তাঁহার আর তপস্যার প্রয়োজন কি? হরিকে আয়ত্ত করিবার জন্য তপস্যা, যিনি হরিকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তবে তপস্যার প্রয়োজন কি? আর যদি হরির আরাধনা করিতে না চাও তাহা হইলেও তপস্যার প্রয়োজন নাই। তপস্যার আগুণে দগ্ধ হওয়া কি জন্য? হরির প্রতি প্রেমের জন্য। যদি হরি প্রেম হইল তবে তপস্যার ফল কি? আবার মনে কর হরি প্রেমে মন মাতিল না তবে তপস্যার ফল কি? যে ব্যক্তি প্রাণের ভিতরে হরিকে প্রেমফুল দিয়া পূজা করিতে পারে না কঠোর তপস্যা করিলেও তাহার কিছুই হইবে না। যদি হরিপ্রেম বুঝিতে না পার, যদি হরি নামের প্রতি ভক্তি স্থাপন করিতে না পার তবে তপস্যায় কি হইবে। হে মানব, তুমি সমস্ত ধন, সম্পদ ছাড়, তুমি সমস্ত দিবস মনকে নিগ্রহ কর, কঠোর তপস্যা কর, নানা প্রকার কষ্ট স্বীকার কর, কিন্তু এ সকল দ্বারা তোমার কিছুই হইবে না যদি হরির আরাধনা না কর। হৃদয়ে যদি হরিভক্তি না থাকে বাহ্যিক তপস্যায় কি হইবে? হরিপ্রেম ভিন্ন তপস্যার কোন প্রয়োজন নাই। হরির আরাধনাই সর্ব্বস্ব। হরির নাম শুনিয়া যাঁহার চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রু পতিত হয়, তিনি কি জন্য কঠোর তপস্যা করিবেন? নিমেষের মধ্যে হরিপ্রেমে যাঁহার মন মত্ত হয় তিনি কেন তপস্যা করিবেন? যাঁহার অন্তরে হরিভক্তি জন্মিয়াছে তিনি সুখে হরি নাম করিতে লাগিলেন। তাঁহার আর তপস্যা করিতে হয় না। যিনি ঘরের ভিতরে রাশি রাশি ধন পাইয়াছেন তাঁহাকে কি বলিব তুমি জাহাজে যাও, তুমি বাণিজ্য কর, তুমি ধনবানদিগের সেবা করিয়া ধন অর্জ্জন কর? যাঁহার ঘরে টাকা নাই সেই ব্যক্তি কঠোর তপস্যা করিয়া, ধন অর্জ্জন করুক; কিন্তু যাহার হস্তে রাশি রাশি টাকা সে কি জন্য কঠোর তপস্যা করিবে? তপস্যা তাহাদিগের জন্য যাহারা বহু কষ্টে ধর্ম্ম অর্জ্জন করিতে চায়। প্রেমের পথ কষ্টের পথ নহে। অতএব যদি তোমরা প্রেমের সহিত ঈশ্বর আরাধনা করিতে শিখিয়া থাক তবে তপস্যার প্রয়োজন কি? আর যদি

ভক্তির সহিত ঈশ্বর আরাধনা না কর তবে সহস্র বৎসর তপস্যা করিলেও কিছু হইবে না। বৃক্ষ যদি মরিয়া শুকাইয়া যায়,তাহাকে হাজার যত্ন কর সে আর ফলবান্ হইবে না। আবার বৃক্ষ যদি ফলফুলে পরিশোভিত হইয়া মনুষ্যের কাছে আপনার উদ্দেশ্য সফল করিতে থাকে, তাহার প্রতি আর বৃথা যত্ন কেন? অতএব প্রেমিক হও, তপস্যার প্রয়োজন নাই।

দ্বিতীয়তঃ হরিকে অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্র প্রেমনয়নে দর্শন করিতে শিক্ষা কর। যেমন চক্ষু খুলিব অমনি চারিদিকে হরিকে দেখিব, যেমন চক্ষু বন্ধ করিব অমনি ভিতরে হরিকে দেখিব। যাঁহাদিগের অন্তরে হরির প্রতি প্রেম জন্মিয়াছে তাঁহারা যেখানে বসেন সেখানেই হরিকে দেদীপ্যমান দেখিতে পান। তাঁহারা আর কেন কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়া তীর্থযাত্রা করিবেন? তাঁহারা আর বৃথা তপস্যা করিয়া জীবনের শক্তি সকল ক্ষয় করিবেন কেন? যাহাদিগের অন্তরে বাহিরে হরিদর্শন হয় নাই তাহারাই বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া হরিদ্বার, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ পর্য্যটন করে। কিন্তু শাস্ত্রেতেই লেখা আছে "যদি হরি অন্তরে ও বাহিরে বিদ্যমান থাকেন তবে তপস্যার কি ফল? আর যদি হরি অন্তরে বাহিরে বিদ্যমান না থাকেন তবে তপস্যার কি ফল?" যিনি অন্তরে বাহিরে হরিকে দেখিতে পান তাঁহার হরিদ্বার বৃন্দাবন তাঁহার অন্তরে। তুমি ঘরে বসিয়া, হে ভক্ত, হরি সম্ভোগ কর, তোমার শ্রীক্ষেত্র কাশী বৃন্দাবন তোমার ঘরের ভিতরে। তোমার তীর্থযাত্রায় প্রয়োজন নাই,তোমার তপস্যার প্রয়োজন নাই। যদি হরিকে লাভ করিয়া থাক তবে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া শুষ্ক হইবে কেন? যদি হরিকে পাইয়া সুখী হইয়া থাক তবে গ্রীষ্মকালে চারি দিকে ভয়ঙ্কর অগ্নি জ্বালিয়া তাহার মধ্যে উত্তপ্ত, এবং শীতকালে জলের ভিতরে মগ্ন থাকিয়া শীতভোগ করিবে কেন? যদি প্রাণের মধ্যে প্রাণসখাকে পাইয়া থাক তবে আর কার জন্য তপস্যা করিবে? আর যদি অন্তরে বাহিরে হরিকে না দেখিতে পাও, যদি হরিবিচ্ছেদে তোমার মন জর্জ্জরিত হয়, এবং সেই অবস্থায় কোথায় শ্রীহরি, কোথায় শ্রীহরি বলিয়া ক্রন্দন করিতে থাক, এবং তোমার সেই ক্রন্দন আকাশ গ্রাস করিতে থাকে, না আপনার গৃহে, না প্রতিবাসীর গৃহে; না ফলে, না ফুলে, না পর্ব্বতশিখরে, না সাগরবক্ষে কোথায়ও হরিকে দেখিতে না পাও, সেই অবস্থায়ও তপস্যা বৃথা। কারণ যে হরিকে বিশ্বাস করে না, তাহার যে হরি অদর্শনের যন্ত্রণা, তাহা যে একপ্রকার নাস্তিকের ক্রন্দন হইল। তপস্যা অথবা কষ্টকর কার্য্য করিলেই যে হরিকে লাভ করা যায় তাহা মিথ্যা। তোমরা দেখিতেছ কত সন্ন্যাসী কত প্রকার কষ্ট স্বীকার করিয়া তপস্যা করিতেছে; কিন্তু তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, তোমরা কি হরিকে দেখিতে পাইয়াছ? তাহারা বলিবে আমরা হরিকে দেখিতে পাই নাই; কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাইব বলিয়া এত কষ্ট করিতেছি। ক্ষুধার সময় খাই না, শরীরকে শুষ্ক করিতেছি, কঠোর তপস্যা করিতেছি, কিন্তু কিছুতেই সুখ পাই না। এই জন্য কথিত আছে "নান্তর্বাহ যদি হরিস্তপসা ততঃ কিং।" আর যাঁহারা অন্তরে বাহিরে হরিকে দেখিতে পান তাঁহাদিগের এ সকল তপস্যার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা শাস্ত্রকে হৃদয়ে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন তাঁহারা কেন বর্ণমালা পড়িবেন? যাঁহারা হৃদয়ের মধ্যে ঈশ্বরতত্ত্ব জানিয়াছেন তাঁহারা কেন কষ্টপথে ভ্রমণ করিবেন? প্রেমিক লোকের পক্ষে ঈশ্বর দর্শনই যথেষ্ট। প্রেমিক লোক আপনার হৃদয়ের মধ্যেই তাঁহার হৃদয়সখা পরমেশ্বরকে দেখিতে পান। ঈশ্বর তপস্যা অগ্রাহ্য করেন। প্রেমিক বলেন, আমার হরিকে আমার নিকট আনিয়া দাও, আমি তপস্যা করিয়া কি করিব? শুষ্ক কঠোর তপস্যাতে প্রেম হয় না। হে মনুষ্য, তুমি উত্তরে যাইবে মনে করিয়াছ, দক্ষিণে যাইও না। তুমি ভক্তবৎসলের কাছে যাইবে মনে করিয়াছ, শুষ্ক পথে যাইও না। ভক্তিরাজ্যে অন্যের ব্যাপার। হরিভক্তি প্রচারের পূর্ব্বে এই কথা ছিল যে বহু কষ্ট করিয়া যাগ যজ্ঞ, যোগ ধ্যান না করিলে, বেদ বেদান্ত না পড়িলে ধার্ম্মিক হওয়া যায় না, হরিকে লাভ করা যায় না। কিন্তু যখন ভক্তির পথ প্রচার হইল সেই কঠোর জ্ঞানের পথ বন্ধ হইল। ভক্তির ধর্ম্মে শরীর শুষ্ক করিতে হইল না; কিন্তু শরীরের লাবণ্য বৃদ্ধি হইল। হরিভক্তেরা দ্বারে দ্বারে এই ঘোষণা করিলেন;—"ভাই, কেন আর তপস্যা কর? যদি হরি আরাধনা কর তবে তপস্যা কেন? আর যদি হরি আরাধনা না কর তাহা হইলেও তপস্যার ফল কি?" সেই সময় হইতে প্রেমশূন্য কঠোর জ্ঞান এবং কর্ম্মকাণ্ডের পথ বন্ধ হইল। এখনকার কথা কি? ব্রহ্মসুলভ, সুন্দর হরি হৃদয়ের মধ্যে বসিয়া আছেন। ঈশ্বর ভক্তের হৃদয়ের মধ্যে থাকিয়া ভক্তকে দেখা দেন, এবং ভক্তের সঙ্গে কথা কহেন। অতএব সকলে ভক্তির পথ অবলম্বন করিয়া কেবল দেখ আর শুন। আপনার স্থান হইতে দুই হস্ত দূরে যাইতে হয় না। ভিতরে মনকে বিনীত কর, মনের মধ্যেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। ঈশ্বর বলিতেছেন;—"তোমার প্রাণের ধন, হে ভক্ত, আমি তোমার নিকটেই রহিয়াছি।" দশ বৎসরে যাহা না হয় ভক্তি দ্বারা দুই মিনিটে তাহা হয়। বঙ্গদেশ বলিতেছেন, আমি আগে কত তপস্যা পরিশ্রম করিয়াও দেবের দুর্ল্লভ হরিকে পাইতাম না, এখন আমার কত সৌভাগ্য এখন আমি যেখানে বসি, সেখানেই হরিকে দেখিতে পাই। আগে বেদ বেদান্তের ঈশ্বর, হিমালয়ের

ঈশ্বর গুপ্ত থাকিতেন এখন অপ্রকাশ ঈশ্বর স্বপ্রকাশ হইয়াছেন। এমন পন্থা সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। কষ্ট দূর হইল। শাস্ত্রেতেই এই উক্তি পাইলাম। বল আমার ঈশ্বর এই স্থানে, এই ডান্ দিকে, এখনই বল পলকের মধ্যে দেখিবে ঘর পবিত্র হইল, পাড়া পবিত্র হইল, দেশ পবিত্র হইল। একবার বিশ্বাসের সহিত বলিলে ঈশ্বর এখানে আছেন, আর ভক্তির সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হইল। একবার হরি দর্শনের জন্য ভক্তের প্রাণ আকুল হইল আর তিনি ভিতরে বাহিরে চারি দিকে হরিকে দেখিতে পাইলেন। ভক্তবৎসল নিজে ভক্তের চক্ষুর অঞ্জন হইয়া ভক্তের নিকট প্রকাশিত হন। ভক্ত রাত্রে চন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, সেই চন্দ্রের সহাস্য জ্যোৎস্নার মধ্যে তিনি তাঁহার প্রাণেশ্বরের প্রসন্ন বদন দেখিতে পান, ভক্ত সংসারের দিকে তাকান, সেখানেও তিনি তাঁহার প্রাণের হরিকে দেখিতে পান। ভক্ত সংসারে স্বর্গের শোভা দেখিতে পান। আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা বলেন যে আমরা সন্তান পালন করি, বাট্না বাটি, কুট্না কুটি, রন্ধন করি, সংসারের অত্যন্ত নীচ কার্য্য সকল করি, আমরা কিরূপে ঈশ্বরকে পাইব? আমরা সংসার লইয়াই ব্যাপৃত, আমরা অত্যন্ত দুঃখিনী আমাদিগকে কি হরি দেখা দিবেন? আমাদিগের কি গতি হইবে? আমাদিগের প্রতি কি হরির এত দয়া হইবে? আমাদের ভগিনীরা দুঃখের দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিতেছেন;—"সকলের গতি হইবে; কিন্তু দুঃখিনী বঙ্গবাসিনীদিগের আর গতি হইবে না, আমরা ঘরের ভিতরে পড়িয়া আছি, এত গুলি ছেলে মেয়ে লইয়া থাকিতে হয়, সন্তানসেবা, পতিসেবা, পিতা মাতা সেবা ইত্যাদিতেই সমস্ত দিন কাটিয়া যায়, আমরা আর সাধন ভজন করিব কখন্? আমাদিগের ভবে আসা বৃথা হইল। এই ভবে ঈশ্বরকে দেখিতে না পাইয়া আমাদিগকে পরলোকে চলিয়া যাইতে হইবে।" এই নারদ পঞ্চ রাত্রের কথা,' হে দুঃখিনী বঙ্গবাসিনীগণ, তোমাদের নিরাশ বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া তোমাদিগকে আশ্বাস দান করিতেছে, তোমরা আর নিরাশার কথা বলিও না। এক দিকে তোমাদিগের স্বামী আর এক দিকে তোমাদিগের সন্তানগণ মধ্যে প্রাণের দেবতা হরি। তাঁহাদের মধ্যে হরিকে দেখিতে পাইবে।

প্রচারবৃত্তান্ত।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন হইতে প্রাপ্ত।

৩য় পত্র।

১লা জ্যৈষ্ঠ গোযানযোগে শিবসাগর লক্ষ্য করিয়া আমরা যোড়হাট হইতে ১৮ মাইল অন্তর টিয়ক চা-বাগিচায় চলিয়া যাই। টিয়কে আমার এক জন ঘনিষ্ট আত্মীয় ডাক্তর সপরিবারে স্থিতি করেন। বৃষ্টি নিবন্ধন বাধা হইয়া দুই দিবস তথায় স্থিতি করি। সেই আত্মীয় ডাক্তর ও তাঁহার পরিবার যার পর নাই আদর যত্ন করিয়া আমাদের আতিথ্য সৎকার করেন। ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ পূর্ব্বোক্ত বাহনযোগে শিবসাগর নগরে উপনীত হই। টিয়ক হইতে শিবসাগর ২০ বিশ মাইল অন্তর। এই স্থানে প্রাচীন আসাম রাজাদিগের রাজধানী ছিল। এ নগর ডেক্ নামক ক্ষুদ্র নদের কূলে স্থাপিত। নগরবক্ষে ও ইতস্ততঃ আসামরাজাদিগের বহু কীর্ত্তি বিদ্যমান। এখানে শিবসাগর নামে মহারাজ শিবসিংহ কর্ত্তৃক নিখাত একটি পরম রমণীয় সুবৃহৎ সরোবর আছে, এইরূপ প্রকাণ্ড দীর্ঘী আর কখন দেখি নাই। এই সরোবরের নামানুসারে নগরের নামও শিবসাগর হইয়াছে। সে স্থানে তত্রত্য জজ আদালতের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু বিনোদবিহারী ঘোষের গৃহে সাদর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া চারি দিবস স্থিতি করি। এখানে বহু সম্ভ্রান্ত আসামী ভদ্র লোক বাস করেন, বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে ৪০। ৫০ জন বাঙ্গালি বাবুও আছেন। এ স্থানে বিধানবিরোধি একটি ব্রাহ্মসমাজ আছে। ব্রাহ্মদিগের অনেকে আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, এবং তাঁহাদের বাড়ীতে ও সমাজগৃহে উপাসনা করিতে বলেন। আমি তাঁহাদিগকে জানাইলাম যে আমি নববিধানবাদী লোক, বিধানের বিরুদ্ধ ভাব থাকিলে আপনাদের সঙ্গে কার্য্য করিতে আমি সঙ্কুচিত। উক্ত সমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র ঘোষ, বিরুদ্ধ ভাব নাই এরূপ প্রকাশ করিলেন। ৫ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র ঘোষের গৃহে উপাসনা এবং রাত্রিতে উক্ত সমাজের অন্যতর সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু বিষ্ণুচরণ ঘোষের আলয়ে ধর্ম্মালোচনা ও সঙ্গীত প্রার্থনা হয়। ৬ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে তত্রত্য হাইস্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে উপাসনা হইয়াছিল। সন্ধ্যার পর বালিকা স্কুলগৃহে "যুগধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা হয়, বক্তৃতাতে নববিধানতত্ত্ব বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছিল। ৪০। ৫০ জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্বাহ্নে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের ডেপম্যান তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজের অন্যতর সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু হৃদয়নাথ দের আবাসে উপাসনা, রাত্রিতে উপাসনা আলোচনা ও সঙ্গীতাদি হয়। ভ্রাতৃবর মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আলোচনাদি করেন। ৮ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার পূর্ব্বাহ্নে সমাজগৃহে সহচর বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সামাজিক উপাসনা করেন। অপরাহ্নে নগর সঙ্কীর্ত্তন হয়, বাজারে ও রাজপথে মত্ততার সহিত কীর্ত্তন হইয়াছিল। দেড় শত দুই শত লোক সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছিল, মহেশ বাবু বক্তৃতা করিয়াছিলেন। রাত্রিতে

সমাজগৃহে সামাজিক উপাসনা হয়। জ্ঞান ও ভক্তি বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। অনেক গুলি ভদ্র লোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। সেই রাত্রি ২ টার সময় গোযানে আরোহণ করিয়া ডিব্রুগড়ে যাত্রা করি। ব্রহ্মপুত্র নদের কূলে ডিচাংমুখ পর্য্যন্ত দশ মাইল গোশকটে গমন করিয়া ৯ ই জ্যৈষ্ঠ বেলা প্রায় ২ টার সময় মেইল ষ্টীমারে আরোহণ করি, এবং সন্ধ্যাকালে ডিব্রুগড় নগরে উপস্থিত হই। ১০ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর ব্রাহ্মবন্ধুদিগকে লইয়া প্রার্থনা ও সঙ্গীত হয়। ১১ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে ডিব্রুগড়ের খাজাঞ্চি শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনারায়ণ দের আবাসে ব্রাহ্মবন্ধুগণ সহ উপাসনা হয়, সন্ধ্যার পর হাই স্কুলগৃহে "ধর্ম্মসমন্বয়" বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। ৫০। ৬০ জন বাঙ্গালি ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ডিব্রুগড় নগর আসামের অন্য অন্য নগর অপেক্ষা বৃহৎ, এ নগরে বহু সংখ্যক বাঙ্গালি বিষয় কর্ম্ম উপলক্ষে অবস্থিত করেন। নগরটী ডিব্রুনামক নদীর কূলে স্থাপিত, ব্রহ্মপুত্রনদ নগরের তিন মাইল অন্তর দক্ষিণপশ্চিমাংশে প্রবাহিত। ডিব্রুগড় জেলা পর্য্যন্তই আসাম প্রদেশ ও ইংরেজ রাজ্য শেষ। তাহার উত্তরে পার্ব্বত্য প্রদেশে আবোর নামক অসভ্য জাতির অধিকার। ডিব্রুগড়ে অত্রত্য ফরেষ্ট বিভাগের কর্ম্মচারী প্রীতিভাজন শ্রীমান্ জ্ঞানদাচরণ সেনের সাদর আতিথ্য গ্রহণপূর্ব্বক দুই দিবস স্থিতি করিয়া ১২ই জ্যৈষ্ঠ রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের সময় তেজপুরে ফিরিয়া যাইবার জন্য বাষ্পীয় পোতে আরোহণ করি। ১৩ই জ্যৈষ্ঠ তেজপুরে উপনীত হইয়াছি। এখানকার ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব সম্পাদন করিয়া অচিরেই ধুবড়ি যাইতেছি। উৎসবাদির বিবরণ পরে লিপিবদ্ধ হইবে। ধুবড়ি জেলার সীমা হইতে ডিব্রুগড় নগর পর্য্যন্ত জলপথে বাষ্পীয়পোত যোগে গমনাগমনে আসাম প্রদেশে প্রায় সহস্র মাইল ভ্রমণ করিতে বাধ্য হইলাম। উপর আসামে ৯৩ মাইল গোযানে, ৫ মাইল হস্তিপৃষ্ঠে, ডিব্রুগড়ে তিন মাইল ট্রেণে ভ্রমণ হইয়াছে। ঘোর অরণ্যাকীর্ণ প্রদেশ দিয়া কর্দ্দমময় দুর্গম বন্ধুর পথে গোযানারোহণে চলিতে আমার সঙ্গের বন্ধুটি সময়ে সময়ে বড়ই কষ্ট বোধ করিয়াছেন। ছাপ্পর শূন্য গরুর গাড়ীতে আমি জীবনে আর কখন আরোহণ করি নাই, ডিব্রুগড়ে ভাগ্যে তাহাও ঘটিয়াছে। আসাম প্রদেশে স্থলপথে চলিতে অশ্বশকট ও পাল্কী প্রভৃতি উৎকৃষ্ট যান কোথাও পাওয়া যায় না। গোশকট, হস্তী বা অশ্বই প্রধান অবলম্বন। বর্ষাকালে দূরের পথ হস্তী ও অশ্বযোগে গমনাগমন করা দুষ্কর। বিশেষতঃ বিদেশীয় লোকের পক্ষে তাহা অনেক স্থানে একান্ত দুর্ঘট। অগত্যা গরুর গাড়ী আশ্রয় করিতে হয়, উহা সর্ব্বত্র সুলভ। কলিকাতা হইতে আসিবার কালে আমাদের বাহন ইষ্টরবেঙ্গল মেইল ট্রেইণ ঘণ্টায় ৩০ মাইল চলিয়াছে। আমাদের দ্বিতীয় বাহন দ্রুতগতি মেইল ষ্টীমার, উহা ব্রহ্মপুত্রের খরস্রোতঃ অতিক্রম করিয়া ১১। ১২ মাইল, স্রোতের অনুকূলে ২০। ২৫ মাইল চলিয়াছে। আমাদের অপূর্ব্ব তৃতীয় বাহন গোযান ঘণ্টায় দুই মাইলও চলিতে অসমর্থ হইয়াছে।

এ দেশে আসিয়া জগজ্জননীর কৃপা বিশেষরূপে সম্ভোগ করা গেল। এই বর্ষাকালে অরণ্যময় আসাম প্রদেশে সুস্থ শরীরে ভ্রমণ করিয়া তাঁহার কাজ করিতে পারিব, পূর্ব্বে এরূপ আশা করিয়া উঠিতে পারি নাই। কিন্তু ভগবানের কৃপায় বেশ সুস্থ আছি। স্থানে স্থানে ভ্রাতাদিগের হৃদয়ের প্রীতি অশেষ আদর ও যত্ন লাভ করা গেল। কিছু অধিক দিন থাকিয়া কার্য্য করিতে অনেকে বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ সহকারে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আসাম বিস্তীর্ণ কার্য্যক্ষেত্র, এ দেশে এক জন উৎসাহী বিধান প্রচারক স্থায়ীরূপে অবস্থিতি করিয়া প্রচার করেন ইহা একান্ত প্রয়োজন। ২। ৩ বৎসর অন্তে এক এক স্থানে ২। ৪ দিন ঘুরিয়া বেড়াইলে বিশেষ কিছু কার্য্য হয় না। আসামের ব্রাহ্মবন্ধুগণ এ বিষয়ে যথোচিত সাহায্য দান করিতে বোধ করি কুণ্ঠিত হইবেন না। কেহ কেহ আসামে এক জন প্রচারকের স্থায়ীরূপে স্থিতি করার প্রস্তাব আমার নিকটে উপস্থিত করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় উত্তর প্রদেশের বিধানবাদী অনেক ব্রাহ্মের এরূপ সংস্কার যে প্রচারকগণ নিজব্যয়ে আসিয়া তাঁহাদের নিকটে প্রচার ও তাঁহাদের সেবা করিবেন, তাঁহারা তাঁহার পাথেয়াদির সামান্য সাহায্যও করিবেন না। রঙ্গপুর প্রদেশ হইতে মধ্য আসাম তেজপুর পর্য্যন্ত আমি আপন সহকারী বন্ধুসহ পুস্তকাদি বিক্রয় দ্বারা ও অন্য উপায়ে পাথেয়াদি নির্ব্বাহ করিয়া আসিয়াছি বন্ধুগণ আমাদের জাহাজ ভাড়া ইত্যাদির অভাব আছে কি না ইহার অনুসন্ধান লইতেও কর্ত্তব্য বোধ করেন নাই। আমি ও আপন অভাব আপনা হইতে তাঁহাদিগকে জানাইতে লজ্জা করিয়াছি এবং উচিত বোধ করি নাই। কোন কোন বিধানবাদী ব্রাহ্মের এরূপ বিষম ভ্রান্তি যে আমি বড় লোক, নিজের ব্যয়েই তাঁহাদের নিকটে প্রচার করিতে আসিয়াছি, অথবা প্রচার ফণ্ডের প্রচুর অর্থ স্বচ্ছলতা, কলিকাতার প্রচার ফণ্ড হইতে পাথেয়াদির ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। যাহা হউক তেজপুরে কোন বন্ধু আমাদের পাথেয়ের অভাব আছে কিনা, এবং এ পর্য্যন্ত কিরূপ জাহাজ ভাড়া ইত্যাদি চালাইয়া আসিলাম, তাহার অনুসন্ধান লন। তিনি সবিশেষ অবগত হইয়া দুঃখিত হন। পরে নিগিরিটিং যাইবার কালে তিনিও তাঁহার একজন বন্ধু টিকিট ক্রয় করিয়া জাহাজে যাইয়া আমাদের হস্তে অর্পন করেন। সমুদায় উপর আসাম ভ্রমণ করিয়া তেজপুরে

ফিরিয়া আশা পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে বন্ধুদিগের নিকটে এরূপ সদয় ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছি। যাঁহারা ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্গত লোক নহেন, উপর আসামে তাঁহাদের অনেকেও আহ্লাদের সহিত পাথেয়ের আনুকূল্য করিয়াছেন। তেজপুর হইতে ধুবড়ি পর্য্যন্ত ফিরিয়া যাওয়ার সমুদয় জাহাজ ভাড়া অত্রত্য দুই জন বন্ধু প্রদান করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

সমালোচনা।

আশা পুষ্প। কলিকাতা। ৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানিতে একজন মহিলার দৈনিক উপাসনা কালীন কয়েকটি প্রার্থনা ও কয়টী সঙ্গীত আর দুই একটি রচনাও মুদ্রিত হইয়াছে। এই মহিলা চট্টগ্রামস্থ নববিধান মণ্ডলীর কোন ধর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তির পত্নী। মণ্ডলী কর্ত্তৃক দৈনিক উপাসনা ও ভজন সাধনের জন্য আশ্রকুটীর নামে সে স্থানে একটী কুটীর প্রতিষ্ঠিত আছে। উক্ত মহিলা সেই কুটীরের সাধক সাধিকা দিগের একজন। ইঁহার প্রার্থনা ও সঙ্গীত গুলি পাঠ করিলে আশা হয় যে একদিন বিধান মণ্ডলীতে ভগবানের প্রকৃত স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।

সংবাদ।

বিগত ২১ এ জুন বৃহস্পতিবার কমলকুটিরের নবদেবালয়ে কুচবিহারের মহারাজার তৃতীয় রাজকুমারের জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু উপাসনা করেন।

ধ্রুব ও প্রহ্লাদ নামক পুস্তকখানি পুনরায় মুদ্রিত হইয়া আমাদের কার্য্যালয়ে বিক্রয় হইতেছে, এবার ইহার তৃতীয় সংস্করণ হইল। আমরা এই পুস্তকখানির প্রতি সকলেরই আদর দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি।

ভাই বলদেব নারায়ণ ভাগলপুর ও মুঙ্গের প্রদেশে আপনার দেশস্থ লোকদিগের মধ্যে খুব উৎসাহের সহিত প্রচার করিতেছেন। অল্প দিন হইল ভাগলপুরে একটি প্রকাশ্য বক্তৃতা স্থলে প্রায় ৫০০ শত লোক উপস্থিত ছিলেন। আমাদের ভ্রাতার উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোতাদিগের মধ্যে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। ভাই বলদেব নারায়ণ লক্ষ্ণৌ যাইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

আচার্য্যদেব শরীরে বর্ত্তমান থাকার সময় নববৃন্দাবন নাটকের শেষ অভিনয়ের রাত্রিতে আমাদের দেশস্থ ভদ্রলোকদিগকে সম্বোধন করিয়া যে একটি বক্তৃতা করেন তাহাতে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক নাটক সকল দেশস্থ ভদ্র সচ্চরিত্র লোক সকলের দ্বারায় বঙ্গীয় রঙ্গভূমিতে অভিনয় হওয়া আবশ্যক। নববৃন্দাবন নাটক কেবল সেই সৎঅনুষ্ঠানের আদর্শ স্বরূপ। নববৃন্দাবন নাটক অভিনয় দ্বারা দেশের উপকার হইয়াছে এ কথা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় অর্থাভাবে আমরা তাহাকে স্থায়ী করিতে পারিলাম না। সম্প্রতি কয়েকটি ভদ্র সুশিক্ষিত যুবা আর্য্যনাট্যসমাজ নামক একটি নাট্যসভা স্থাপন করিয়া শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত বীণানাট্যমন্দিরে, চন্দ্রহাস, প্রহ্লাদ চরিত্র, চৈতন্য লীলা, হরিদাস ঠাকুর প্রভৃতি নাটক অতি সুন্দররূপে অভিনয় করিয়া জনসাধারণকে বিশেষ সুখী করিতেছেন। ইহাঁদের অভিনয় ও সঙ্গীত অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও আনন্দপ্রদ। যাঁহারা একবার ইহাঁদের অভিনয় দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে অভিনেতৃগণকে প্রশংসা করিতেছেন। ইহাঁদের ভাব ভঙ্গি, আচার ব্যবহার, কথা, কার্য্য সমস্তই ভদ্রোচিত এবং সুন্দর। অভিনেতৃগণ ভদ্রকুলোদ্ভব সৎচরিত্র যুবা। প্রায় অধিকাংশ সভ্যই গবর্ণমেণ্ট এবং সওদাগরের আফিসের সম্ভ্রান্ত কর্ম্মচারী। ছোট ছোট বালকদিগের চরিত্র ভাল রাখিবার জন্য ইহাঁদের বিশেষ দৃষ্টি ও সতর্কতা আছে। ইহাঁদের কার্য্যপ্রণালী দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যেন ইহাঁরা এবং মাননীয় কবিবর শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয় আমাদের স্বর্গীয় আচার্য্যদেবের অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিবার জন্যই দৃঢ়সংকল্প হইয়াছেন। কুলটাদিগের নাট্যাভিনয় দেখিয়া আমাদের বঙ্গীয় যুবকদিগের মধ্যে অনেকেরই সর্ব্বনাশ ও চরিত্র দূষিত হইতেছে। এই ভয়ানক আসন্নবিপদ হইতে বঙ্গসমাজকে বাঁচাইবার জন্য আর্য্য নাট্যসমাজ যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছেন ও আমাদের আচার্য্যদেবের মনোগত অভিপ্রায় সুসিদ্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন দেখিয়া আমরা তাঁহাদিগকে নমস্কার ও সাধুবাদ প্রদান করিতেছি দয়াময় ঈশ্বর তাঁহাদের সাধু ইচ্ছা পূর্ণ করুন।

প্রশ্ন।—কোন একখানি কাগজ চালাইতে হইলে গ্রাহক এবং সম্পাদকের কর্ত্তব্য কার্য্য কি? আমরা আমাদের ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকার গ্রাহক মহোদয়গণের নিকট এই প্রশ্নের উত্তর ভিক্ষা করিতেছি। তাঁহারা যেন দয়া করিয়া একটু বিশেষ চিন্তা করত আমাদের প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করেন।

প্রেরিত।

(গত প্রকাশিতের পর।)

দুঃখের কথা অনেক বলিলাম এখন সুখের কথা কই—

কুচবিহারের বর্ত্তমান কাণ্ড কারখানায় ভগবানের লীলা দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। ইহাকেই বলে "ভক্তের অধীন ভগবান"। ঈশ্বর যে প্রকৃতই ভক্তবৎসল নামের গৌরব রক্ষার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত, ভক্তের মান বাড়াইতে যে তিনি পরম আহ্লাদ বোধ করেন, কুচবিহার তাহার জীবন্ত প্রমাণ। দশ বৎসর আগেকার ব্যাপার আর অদ্যকার কাণ্ড ভাবিলে আর জ্ঞান থাকে না, হৃদয় ফুলিয়া উঠে, ভেউ ভেউ করিয়া না কাঁদিলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না। রোগশয্যাতে পড়িয়া আছি তবু থাকিতে পারিলাম না, গত বারের ধর্ম্মতত্ত্ব পড়িতে পড়িতে প্রাণ নাচিয়া উঠিল, বাস্তবিক দাঁড়াইয়া উঠিলাম; প্রাণ ভরিয়া একবার নাচিলাম হাসিলাম, কাঁদিলাম, তবে স্থির হইতে পারিলাম। ধন্য কেশব চন্দ্র! ধন্য তাঁহার ভগবান! এমন না হইলে সংসারের নাস্তিকতা আর কিসে চূর্ণ হয়। আবার অপর দিকে ভাবিয়া দেখি দুনিয়া কি ভয়ানক দুরন্ত! দশ বৎসর পূর্ব্বে ভায়াদের ভবিষ্যদ্বাণীর গলাবাজির চোটে ভুবন ফাটিয়া গিয়াছিল, ইংলণ্ডের বিজ্ঞ, সভ্য, জ্ঞানী, বিবেচক ভায়ারা পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর হুজুকে মাতিয়া ছিলেন। তখন সবাই প্রফেট্, তাঁহাদের নিকট ভবিষ্যত যেন বর্ত্তমানাপেক্ষাও

উজ্জ্বল, এমনই তীক্ষ্ণ দূর দৃষ্টি! তাঁহাদের কাগজ খানা আর একবার পাঠ করিলাম। আজ কালের পাঠকগণ একবার শুনুন "We wish Mr. Sen and his friends had admitted this, if not for the sake of truth, yet for the sake ot an innocent girl who knew not what she was doing, where she was going and what was to become of her hereafter. Feelingly has Mr. Dall said "Polytheism, idolatry, Polygamy and worse stare her in the face." We pity Babu Keshub Chunder, but we still more pity the tender hearted and unconscious girl who has been sacrificed—made the victim of circumstances."—B. P. O. April 18, 1878.

—বাঙ্গলা করিয়া বলিতে প্রাণ ফাটিয়া যায়। কি করি যাঁহারা ইংরেজি জানেন না তাঁহাদের জন্য ভবিষ্যদ্বক্তা তাঁহাদের নিষ্ঠুর কথাগুলি সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইলাম।— "কেশব বাবু কন্যাকে বলি দিলেন। নিরীহ কোমলহৃদয়া অজ্ঞান বালিকা জানে না পিতা তাহার কি সর্ব্বনাশ করিলেন। পৌত্তলিকতা, বহুদেব পূজা, বহুবিবাহ ইত্যাদি এবং আরও কত ভীষণতরপাপ বালিকাকে গ্রাস করিবার জন্য ভবিষ্যতে হাঁ করিয়া রহিয়াছে। পিতা তদপেক্ষা কোমলহৃদয় অবোধ বালিকার দুঃখে আমরা বড়ই দুঃখিত।" ভেকের শোকে সাপের চক্ষে জল আর ধরে না। তাঁহারা দিব্য চক্ষে ভবিষ্যতের গর্ভে এই সকল ঘোর দুরবস্থা দেখিয়া সমবেদনার ব্যথাতে কাঁদিয়া আকুল। কি নিঃস্বার্থ প্রেম। উদার সহানুভূতি! অসীম দয়া! গভীর পরদুঃখ কাতরতা! মরি! মরি! "মিষ্টার সেনের" এমন সব হিতাকাঙ্ক্ষী প্রাণের সুহৃদ থাকিতে কিনা এমন বিপদ ঘটল! হায়! হায়! অবোধ বালিকাকে জাহান্নমে ফেলিয়া দেওয়া হইল। আহা পোড়া দেশে কি এমন একজনও সহৃদয় লোক ছিল না যে, সে সময়ে নির্ব্বোধ পিতার হাত চাপিয়া ধরিয়া অসহায় বালিকার প্রাণ রক্ষা করে? মতলবের ধারায় পরিচালিত হইয়া হিংসা ও পরশ্রীকাতরতার নিকট আত্মবিক্রয় করিলে মানুষ যে কত দূর হীনতার পরিচয় দিতে পারে, বঙ্গভূমিতে তাহার চূড়ান্ত উদাহরণ দেখা গিয়াছিল, এবং, মিথ্যা হুজুকে মাতিয়া ভারতের লোক যে যা ইচ্ছা তাই করিতে পারে, বিরোধীদিগের দুর্ব্ব্যবহার চিরকালের জন্য তাহার জীবন্ত প্রমাণ হইয়া রহিল। তার পর এখন তাঁহারা কি বলেন? মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না? উপরন্তু ভবিষ্যদ্বাণীর সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাপার সংঘটিত হইল, দেখিয়া কি এখন আর এক প্রকার হিংসায় জ্বলিতেছেন? তাঁহারা যে বিজ্ঞতা ও বিবেকের চাপটে অন্ধ হইয়া এমনই কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানরহিত হইয়াছিলেন যে, ঐরূপ ঘোর অসত্য প্রচার দ্বারা সহস্র সহস্র তরলমতি যুবার গলায় ছুরি দিতে দ্বিধা করেন নাই, তাহা কি এখন চক্ষু মেলিয়া দেখিতে পাইতেছেন? স্বীকার করুন আর নাই করুন, এখন তাঁহারা মনে মনে বেশ বুঝিতে পারিতেছেন যে, স্বর্গ প্রেরিত মহাত্মার অমিত তেজ বঙ্গদেশীয় অনকত হিতাহিত বিবেচনাশূন্য, ঘোর অকৃতজ্ঞ, হুজুকে, হীনমতি যুবকের দ্বারা মলিন হইবার নহে। ভগবান যে প্রিয়ভক্তের পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান, টাকা বা বিদ্যা বুদ্ধির জোরে মানুষ তাঁহার কোন কালে কোন প্রকার ক্ষতি করিতে পারে না। ঈশ্বরের অভিপ্রায়, অনুমোদন ও আদেশে যে কুচবিহার বিবাহ হইয়াছিল, এখন বোধ হয় কাহারও বুঝিতে বাকি নাই। কুচবিহারে ভগবানের এমন পবিত্র লীলা হইবে, মানুষের সাধ্য কি তাহা আটকাইয়া রাখে? অমনই বিধাতার কৌশল যে ইংলণ্ড ও ভারতেশ্বরী পর্য্যন্ত আচার্য্যদেবের কাজের সুফল দেখিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। দুষ্টেরা আশা করা গিয়াছিল চারিদিকে সকল প্রকারে তাহার সহস্রগুণ অধিক ফল দেখিয়া আমাদের হৃদয় মন চরিতার্থ হইল। এখন পৃথিবী দেখুক যে আচার্য্যদেবের কীর্ত্তি কুচবিহারের মহারাজা মহারাণীর মত ব্রহ্মনিষ্ঠ দম্পতী সমগ্র ভারতবর্ষে আর একটী আছে কি না। আবার একটী সমস্ত করদ রাজ্য নববিধান প্রচারের বিস্তৃত ভূমি হইয়া ভক্তের ও ভগবানের জয়ধ্বনিতে মেদিনী কাঁপাইতে আরম্ভ করিল। স্বাধীন রাজার রাজধানীতে নববিধানের বিজয় নিশান উড়িল এত শীঘ্র, ইহা অপেক্ষা আমাদের আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? সত্যের জয় হইল, শত্রুর মুখে চুনকালি পড়িল, অসত্যের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল, ভক্ত মহাপুরুষের যশঃখ্যাতি দিগন্তব্যাপী হইল, স্বর্গে দেবগণ নববিধানের জয় গান করিতে লাগিলেন। আচার্য্যদেব সশরীরে এই সকল দেখিতে পাইলেন না বলিয়া অনেকে দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু আমি বলি তিনি দিব্যচক্ষে এ সব দেখিয়া গিয়াছেন, এবং এখন বৈকুণ্ঠধামে পিতার সিংহাসনের সম্মুখে বসিয়া এই সব ব্যাপারে পরম আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, আমরা তাহাতেই কৃতার্থ হইলাম। জয় নববিধানের জয়! জয় সত্যস্বরূপের জয়!

ফিরোজপুর
২৮শে বৈশাখ।
নিবেদক—
শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেণ্টের এমন কোন বিশেষ নিয়ম নাই যাহাতে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের নৈতিক উন্নতি হয়। বর্ত্তমান কালের ছাত্রেরা অনেক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছে সত্য কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে অনেকেরই নৈতিক জ্ঞান কিছু শিথিল দেখিতে পাওয়া যায়। আবার বঙ্গভাষায় এমন পুস্তকও বিরল যদ্দ্বারা ছাত্রদিগের এই মহৎ অভাবটী দূর হইতে পারে, এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া আমরা এই উপহার নামক ক্ষুদ্র পুস্তকখানি ছাত্রদিগকে বিনামূল্যে প্রদান করিবার সংকল্প করিয়াছি। ১৮০৮ শকে পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় স্বদেশের নৈতিক ও সামাজিক সর্ব্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে অমূল্য উপদেশ দেন এই পুস্তকে তাহাই মুদ্রিত হইল। কিরূপে সৎপুত্র হওয়া যায়, কিরূপে সৎপতি ও সৎগৃহী হওয়া যায় এবং কিরূপে ধর্ম্মশীল ও সাধু হওয়া যায় এই পুস্তকে সংক্ষেপে সেই সমস্ত উপদেশ আছে। ফলতঃ ইহা একখানি বঙ্গভাষায় উজ্জ্বল রত্ন। প্রতি গৃহস্থেরই ইহার এক এক খণ্ড রক্ষা করা আবশ্যক, আমরা এই আশয়ে বহুল পরিমাণে ইহা মুদ্রিত করিলাম। কলিকাতায় বিতরণ করিবার কোনই ব্যয় নাই। মফস্বলে প্রতি ৫ খণ্ড পুস্তকে ১০ সামান্য ডাক মাশুল লাগিবে। যাহাদের আবশ্যক হইবে আমার নিকট ডাকমাশুলসহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিলেই পাইবেন।

৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন,
যোড়াসাঁকো, কলিকাতা।
শ্রীনীলকমল মুখোপাধ্যায়।

এই পত্রিকা ৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ॥

২৩ ভাগ ।
১৩ সংখ্যা ।

১লা শ্রাবণ, রবিবার, ১৮১০ শক ।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৹
মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা ।

হে অনাথশরণ, জীবগণকে নিত্যসুখী করিবার জন্য তোমার ব্যবস্থা । আমরা যে সংশয়িগণের দলে মিশিয়া তোমার সৃষ্টির নিন্দা করিব, এরূপ প্রবৃত্তি যেন আমাদিগের কখন না হয় । তোমার সৃষ্টি তোমার আপনার জন্য নয়, পরের জন্য । তুমি যাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছ, তাহাদিগকে সেই প্রকৃতি দিয়া সৃষ্টি করিয়াছ । সকলে পরার্থ দেহ মন প্রাণ সকলই উৎসর্গ করিবে, এই তোমার সৃষ্টির মর্ম্ম । স্বার্থপর জীবগণ তাহা করিতে সর্ব্বদা কুণ্ঠিত, এবং সেই জন্য অশেষ ক্লেশ পায়, অথচ ক্লেশের জন্য তোমার প্রতি নিয়ত দোষারোপ করে । আত্মরক্ষা এই জন্য যে, জীব তাহা হইলে দীর্ঘকাল অপরের সেবা করিতে পারিবে । দেখ প্রভো, সেই আত্মরক্ষা এখন স্বার্থপরতায় পরিণত হইয়াছে । প্রকৃতি যাহার পরসেবার জন্য গঠিত, সে স্বার্থপর হইয়া তাহার বিরুদ্ধে গমন করিয়া বল কেমনে করিয়া সুখী হইবে ? নাথ, তুমি আমাদিগের নিজ নিজ প্রকৃতি বুঝিতে দাও, আমরা যে কি প্রকার সেবার জন্য এ সংসারে আসিয়াছি, তাহা যেন স্পষ্ট বুঝিয়া তাহার অনুসরণ করি । তোমার কৃপা ভিন্ন কে আপনাকে আপনি বুঝিতে পারে । যে আপনাকে বুঝিল না সে কি প্রকারে অপরের সেবায় আপনাকে প্রবৃত্ত করিবে । এ সংসারে সকলকেই খাটিতে হয়, কিন্তু কেবল খাটিলেই তো আর সুখ হয় না । প্রকৃতির বিরোধে খাটিয়া খাটিয়া লোকের কেবল বলক্ষয় হয় তাহা নহে, অণুমাত্র তাহার মনে সুখোদয় হয় না । মানুষ নিজের বহু চেষ্টায়ও ঠিক জায়গায় বসিতে পারে না, সে কেবল ঘুরিয়া ঘুরিয়াই জীবন কাটাইয়া দেয় । যখন লোকে তোমার নিকটে আসিয়া বসে, এবং তোমার মুখের উপদেশ শুনে, তখন সে দিব্য জ্ঞান লাভ করে, আপনাকে আপনি চেনে এবং তোমার ইঙ্গিতে নিজ জীবনের কর্ত্তব্য বুঝিয়া লইয়া তাহার অনুসরণে কৃতার্থ হয় । হে দীনবন্ধো, বুঝিয়াছি তোমার নিকটে বসাই জীবনের সার কার্য্য । যে তোমার নিকটে বসিল না, তাহার সমুদায় জীবন বিফল । সে পরিশ্রম করে, কার্য্য করে, কিন্তু সে পরিশ্রম ও কার্য্যে তাহার জীবনের কিছু উপায় হয় না । যে কার্য্য অনন্ত জীবনের উপযোগী নহে তাহাতে লাভ কি ? পশুরাও আহার বিহারের জন্য পরিশ্রম করে, শরীর রক্ষার্থ অঙ্গচালনা করে, কিন্তু তাহাতে কি তাহাদের নিত্যজীবন লাভ হয় ? এ সংসারে অধিকাংশ লোক বৃথা জীবন ক্ষয়

করে, তোমাকে না চিনিয়া পরলোকগত হয়। শ্রীহরি, আমাদের কাহারও যেন সে দশা না হয়। তোমার নিকটে বসিয়া থাকাই যেন আমাদিগের জীবনের গভীর আনন্দ হয়। তোমার মুখের কথা শুনিয়া একগাছি তৃণ স্থানান্তর করিয়াও আমাদিগের কৃতার্থতা হইবে, অন্যতা শত মঙ্গলকর কার্য্য করিয়াও কিছু হইবে না, এই জানিয়া হে জীবিতেশ্বর, আমরা যেন তোমার উপদেশানুরক্ত হই, এই তোমার শ্রীচরণে বিনীত ভিক্ষা।

উপাসনা সমুদায় কর্ত্তব্যের মূল কেন ?

মানুষ মনে করে, আর পাঁচটি কর্ত্তব্য যেমন উপাসনাও জীবনের তেমনি একটি কর্ত্তব্য। কিন্তু উপাসনা যে সমুদায় কর্ত্তব্যের মূল, উপাসনা ভিন্ন যে কর্ত্তব্যের পরিধি বিস্তীর্ণ হয় না, ইহা অতি অল্প লোকেরই চিন্তাপথে সমুদিত হয়। এ সংসারে মানুষ যে ভাবে জীবন অতিবাহিত করে, তাহাতে কোন কালে যে তাহারা বুঝিবে, সমুদায় কর্ত্তব্য উপাসনামূলক, ইহা অসম্ভব। মানবপ্রকৃতিনিহিত কতক গুলি নৈতিক কর্ত্তব্য সহজে অভিব্যক্ত হয়, যাঁহারা নীতিমান্ তাঁহারা সেই গুলি অনুসরণ করিয়া চলেন। যেখানে দুই বা তিন প্রকারের কর্ত্তব্যের বিরোধ উপস্থিত হয়, সেখানে তাঁহারা বিচারে প্রবৃত্ত হন, এবং যে দিকে ভাবের ঝোঁক বেশি থাকে সেই দিকে নত হইয়া পড়েন, সুতরাং বুদ্ধি হৃদয়ের দাস হইয়া তাহারই অনুসরণ করেন। যে কোন প্রকারে মানুষকে হৃদয়ের দাস হইতেই হইবে। এই হৃদয় আবার যে তাহাকে ক্রয় করিয়া লইয়াছে তাহার দাস। সুতরাং বুঝিতে হইবে, হৃদয়কে এমন কাহারও দাস করিতে হইবে, যাঁহার দাসত্বে বুদ্ধিবিপর্য্যয় উপস্থিত হয় না, বুদ্ধি সতেজ ও স্বাধীন হয়।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতেই পাঠকগণ বুঝিতেছেন, বিষয়টি কোন্ দিকে যাইতেছে। যাহারা জন্মদাস তাহাদিগকে দাসত্ব করিতেই হইবেই। সে দাসত্ব প্রভুভেদে মহৎ এবং ক্ষুদ্র হইয়া থাকে। এ সংসারে মানুষ যে প্রভুভেদে আপনাকে গৌরবান্বিত, অথবা ক্ষুদ্র মনে করিয়া থাকে, ইহা অতিস্বাভাবিক। যাহারা দেশাধিপতির পার্শ্বস্থ দাস তাহারা অন্যান্য দাসাপেক্ষা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ মনে করে, এবং সে জন্য তাহারা অভিমান পোষণ করে। আবার সেই দেশাধিপতির নিকটবর্ত্তী দাসগণের যাহারা দাস, তাহারা পূর্ব্বোক্ত দাসগণ অপেক্ষা অশ্রেষ্ঠ হইলেও অপরাপর দাসগণের নিকট তাহাদের গৌরব অল্প নয়। পৃথিবীর প্রভু অপেক্ষা পরম প্রভুর দাসত্ব করায় গৌরবের আধিক্য স্বতঃসিদ্ধ। পৃথিবীর প্রভুগণ দাসের সম্মান রক্ষা করেন না, তাঁহারা মনে করেন, দসের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিবেন বলিয়াই তাঁহারা তাহাদিগকে বেতনভুক্ করিয়াছেন। প্রভু কিরূপ হইতে হয়, ঈশ্বর তাহার আদর্শ, কিন্তু সে আদর্শে কোন প্রভুই পৃথিবীতে চলেন না। ঈশ্বর প্রভু হইয়াও সেবা চান না, স্বয়ং সেবক হইয়া সেবা করেন, এবং তাঁহার সেবকেরা সেবা কার্য্যে তাঁহার অনুকরণ করে, কেবল তিনি এই চান। যদি পৃথিবীতে এমন কোন প্রভু থাকেন যিনি আপনার শরীর মন যাহা কিছু পরার্থ অর্পণ করিয়াছেন, তিনি যে তাঁহার সেবকগণের সেবা আত্মার্থ গ্রহণ করিতেছেন না পরার্থ ইহা সহজে বুঝা যায়, এবং তাঁহার দাসগণ তাঁহার সেবা করিতেছেন না, জগতের সেবা করিতেছেন ইহাও সহজে প্রতিপন্ন হয়। পৃথিবীতে এরূপ প্রভু বিরল, সুতরাং দাসদের নীচতা কিছুতেই তিরোহিত হইতেছে না।

যাহা হউক, এখন মূল বিষয়ের অনুসরণ করা যাক। আমরা স্বাধীন হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি, এ কথা যেমন সত্য, তেমনি ইহাও সত্য

যে আমরা দাস হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছি। এরূপে জন্মগ্রহণ আমাদিগের পক্ষে অগৌরবের বিষয় নহে, কেন না পূর্ণ গৌরবান্বিত প্রভু যিনি, তাঁহারও এই প্রকার প্রকৃতি, তিনি পূর্ণ স্বাধীন, অথচ পূর্ণ সেবক। ঈশ্বর স্বাধীন হইয়াও অধীন এ কথা বলিলে, মনে প্রথম কেমন কেমন লাগে, কিন্তু স্বাধীন শব্দটির মধ্যে যে অধীন শব্দটি আছে, তৎপ্রতি দৃষ্টি করিলে সকল সন্দেহ ঘুচিয়া যায়। যে আপনার অধীন আপনি নয়, সে স্বাধীন নহে পরাধীন। ঈশ্বর আপনি যাহা করিয়াছেন, তিলার্দ্ধের জন্য কোন অনুরোধে তাহা খণ্ডন করেন না, নিত্য তদনুসরণ করেন, সুতরাং তিনি আত্মাধীন। তিনি নিজ ইচ্ছায় যে মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন তাহা কদাপি উল্লঙ্ঘন করেন না, সুতরাং নিজকৃত মর্য্যাদার অধীন, ইহাই পূর্ণতা। অধীনতা যদি নিন্দনীয় না হইল তবে এখন স্থির হউক উপাসনা কি? উপাসনা শব্দের অর্থ নিকটে স্থিতি। কি ভাবে? অনুগত ভাবে। যে যাহার অনুগত হইয়া নিকটে থাকে, সে তাহার উপাসনা করে। এইরূপে কেহ ধনের উপাসনা করে, কেহ মানের উপাসনা করে, কেহ স্ত্রীর উপাসনা করে, কেহ সন্তানের উপাসনা করে। যখন আনুগত্যের ভাব স্বাভাবিক, তখন কাহারও না কাহার অনুগত হইয়া তাহার নিকটে থাকিতেই হইবে। নীচতা ও উচ্চতা এইরূপ অনুগত হইয়া নিকটে থাকাতে ঘটিয়া থাকে। হৃদয় ও বুদ্ধি নিয়তকাল এই আনুগত্যের অনুসরণ করিয়া চলে।

আমরা বলিয়াছি, যেখানে কর্ত্তব্যদ্বৈধ সমুপস্থিত হয়, সেখানে লোক দৃষ্টতঃ বুদ্ধির অনুসরণ করে, বস্তুতঃ হৃদয় যাহার দাস, সেই দাসত্ব অনুসারে বুদ্ধি সেই দিকে ঝুকিয়া পড়ে। এই জন্য যে বিষয়ে হৃদয়ের আনুগত্য, উহাই লোকের কার্য্যের পরিচালক। কর্ত্তব্যের মূল ঈশ্বরের ইচ্ছা, সেই ঈশ্বরেতে যাহার আনুগত্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহার কখন কর্ত্তব্য হইতে স্খলন হইবার সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বরের উপাসনা অনুগত ভাবে তাঁহার নিকটে থাকা, কখন তাঁহা হইতে দূরে গমন না করা। এইরূপে অবস্থিতি হইতে যে কর্ত্তব্য পালন সমুপস্থিত হয় ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। সুতরাং উপাসনা যে সকল কর্ত্তব্যের মূল তাহা সহজে নিষ্পন্ন হইল।

উপাসনা পাঁচ প্রকারের কর্ত্তব্য মধ্যে একটি কর্ত্তব্য না হইয়া সকলের মূল হইল কেন, আমরা দেখিলাম। এখন দেখা যাউক, উপাসনা মনুষ্যজীবনে ওপ্রকার উচ্চ স্থান অধিকার করিল কেন? মনুষ্য স্বভাবতঃ যে সকল উপাদান লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা জীবনের আরম্ভের উপযোগী, উন্নত জীবনের উপযোগী নহে। শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে যে সকল উপাদান লইয়া পৃথিবীতে আইসে তাহা নূতন নূতন উপাদানের আগম দ্বারা বর্দ্ধিত না হইলে বাল্য যৌবনাদি অবস্থা লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না, এবং সে জনসমাজের কোন কার্য্যেরই যোগ্য হইত না, কেবল ভারবহ হইত, এবং কালে পরিত্যক্ত হইয়া জীবন ত্যাগ করিত। মানুষের আত্মা যে উপাদান লইয়া পৃথিবীতে আইসে, তাহা আরম্ভোপযোগী, কিন্তু উন্নতাবস্থার উপযোগী নহে। উন্নত হইতে হইলে, নিত্য নূতন উপাদান সংগ্রহের প্রয়োজন। এই উপাদান সংগ্রহ উপাসনা হইতে ঘটিয়া থাকে, তাই উপাসনা এত উচ্চ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। মানুষ এই উপাসনার অভাবে, জরা মৃত্যু ব্যাধি প্রভৃতির ক্লেশ পরাজয় করিয়া স্বর্গীয় সুখ লাভ করিতে পারে না, এই জন্য সৃষ্টির প্রতি ধিক্কার অর্পণ করে, কিন্তু এ ধিক্কারের উপযুক্ত যে তাহারা নিজে, ইহা অন্ধতাবশতঃ বুঝিতে সমর্থ হয় না।

পদচিহ্ন অনেক কিন্তু পথ এক।

আমরা প্রতিনিয়ত পথে গমনাগমন করি। পথ না পাইলে চলিতে পারি না। গৃহ হইতে গৃহান্তরে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে গমন করিতে হইলে পথ চাই। আমরা পথ পাইলেই যাই, পথ ভিন্ন কোথাও গমনাগমন করা আমাদিগের অসাধ্য। পথ আমাদিগের সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য সুতরাং পথের সঙ্গে আমাদিগের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। পথ ভিন্ন আমাদিগের গমনাগমন বন্ধ হইয়া যায়, এমন যে নিত্য পরিচিত পথ, সেই পথ বস্তুতঃ কি, তাহা আমরা কখন চিন্তা করি না। কিন্তু নববিধান অভ্যুদিত হইয়া আমাদিগের নিকট পথের প্রকৃত তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছে। আমরা এখন অতি সুন্দররূপে বুঝিতে পারিয়াছি, পথ আর কিছুই নহে কেবল পদচিহ্ন মাত্র। কোন স্থান দিয়া যদি বহু লোক গমনাগমন করে, সেই স্থানে পুনঃ পুনঃ তাহাদিগের পদসম্পাত হইতে হইতে ভূমিস্থিত দূর্ব্বাপ্রভৃতি ক্ষুদ্র তৃণ সকল নিরঙ্কুর হইয়া যায়, এবং ক্রমাগত বিশেষরূপে চিহ্নিত হইতে থাকে। যত অধিক লোক চলিতে থাকে ততই পদচিহ্ন গাঢ়রূপে বসিতে থাকে এবং পরিস্কৃত পথ নামে পরিচিত হয়। যে স্থানে পথ আছে কিন্তু সেপথ তেমন উজ্জ্বল নহে, সে স্থলে বুঝিতে হইবে যে অতি অল্প লোকের পদচিহ্ন পড়িয়াছে। তাদৃশ পথ, গমনের জন্য নিঃসংশয় বা নিরাপদ নহে। অর্থাৎ নিঃসংশয় হইয়া কেহ তাদৃশ পথে গমন করিতে পারে না। অতএব অতি স্পষ্টরূপে প্রতীত হইতেছে যে পথ বহুলোকের পদচিহ্নের সমষ্টি মাত্র। এবং বহুলোকের পদচিহ্ন না পড়িলে একটি পথ হইতে পারে না। ইহা দ্বারা পদচিহ্নের বহুত্ব ও পথের একত্ব অতি সুন্দররূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে "পদচিহ্ন অনেক কিন্তু পথ এক" বহু পদচিহ্ন পড়িয়া বহু পথ প্রস্তুত করে না, কিন্তু বহু পদচিহ্ন পড়িলে একটি পথ প্রস্তুত হইতে পারে।

যেমন বাহিরে তেমনি ভিতরে। অথবা যেমন সংসারে তেমনি ধর্ম্ম জগতে পথ ভিন্ন কেহ চলিতে পারে না। কথিত আছে, "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।" মহাজন যে পথে গমন করিয়াছেন সেইটি প্রকৃত পথ। মহাজন একজন নহে, মহাজন বহু। বহু মহাজনের গমনে অথবা বহু মহাজনের পদচিহ্নে যে এক পথ প্রস্তুত হইয়াছে তাহা ইতিপূর্ব্বে কাহারও বোধগম্য হয় নাই। ইতিপূর্ব্বে সকলেই জানিত যে কোন এক মহাজনের সঙ্গে অপর কোন মহাজনের সম্বন্ধ নাই, তাঁহারা প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন পথে গমন করিয়াছেন। কিন্তু "পরে আসিয়া কেশব, রটালেন এ সব, গোপনীয় কথা ধরাতলে," নববিধান আসিয়া বলিলেন, যে তাহা হইলে "পথ" এই শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারিত না। যখন পথের সঙ্গে উপমিত হইয়াছে তখন নিশ্চয় মানিতে হইবে, যে প্রত্যেক মহাজনের সঙ্গে প্রত্যেকের যোগ বা সম্বন্ধ আছে। এবং প্রত্যেকেই একস্থানে গমনের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বহু লোক যদি এক স্থানের যাত্রী হয়, তবে তাহারা সকলেই যে একই পথের প্রতিষ্ঠাতা হইবে তৎপক্ষে আর সংশয় কি? বহুলোক এক গৃহে কিম্বা এক প্রদেশে গমন করে বলিয়া তাহাদিগের বহুতর পদচিহ্ন পড়িয়া এক পথ প্রস্তুত হইয়া থাকে। কখন এক পথের বহুতর শাখা প্রশাখা দেখিতে পাওয়া যায় অথবা এক গম্য স্থানের অনেক পথও দৃষ্টিগোচর হয় কিন্তু সে সকল নিরাপদ নহে। সে সকল যে আপদসঙ্কুল, পথের সঙ্কীর্ণতা ও জঞ্জালবাহুল্যই তাহা সপ্রমাণ করিয়া দেয়। যে পথে বহু লোক যায় সে পথ জঞ্জালশূন্য প্রশস্ত ও পরিস্কৃত, যে পথে অল্প লোক যায়

সেপথ জঙ্গালপূর্ণ অপ্রশস্ত। ইহার কারণ কেবল পদচিহ্ন। যত অধিক পদচিহ্ন পড়ে পথ তত প্রশস্ত ও পরিষ্কৃত হয় এবং সেই কারণেই পথ যে সাপদ কি নিরাপদ তাহাও অনায়াসেই বোধগম্য হইতে পারে। কেন না পথে আপদ বা শ্বাপদ থাকিলে, পরস্পর জনরবে তাহা প্রকাশ পাইয়া পড়ে সুতরাং সে পথে, প্রায় কেহ গমন করিতে চাহে না। যাহারা অজ্ঞ দূরদেশবাসী তাহারাই না জানিয়া সেই পথে গমন করে বলিয়া অল্প পদচিহ্ন পড়ে কিন্তু সঙ্কীর্ণতা ও জঙ্গালপূর্ণতা দূর হয় না। পথের প্রতি দৃষ্টি করিলে পথের অবস্থা দর্শনেই সে পথ সাপদ কি নিরাপদ বোধ হয়।' অতএব নববিধান বলিলেন যে বহু লোকের পদচিহ্ন ভিন্ন এক পথ প্রস্তুত হইতে পারে না। কিন্তু সামান্য লোকের পদচিহ্ন পড়িয়া স্বর্গে গমনের পথ প্রস্তুত হয় না। স্বর্গে গমন করিতে হইলে "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" হওয়া আবশ্যক। সুতরাং এক স্থানে বহু মহাজনের পদচিহ্ন উপর্য্যুপরি পড়িয়াছে ইহা স্বীকার্য্য। বহু মহাজন যদি পথ প্রস্তুতির কারণ হয় তবে তাঁহারা সকলে একই পথের কারণ হইবেন তৎপক্ষে কোন সংশয় নাই। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" বলাতে মহাজনদিগের জাতিভেদ নাই বোঝা যাইতেছে, কেন না—

"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনি র্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা॥"

"বেদ সকল ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতি সকলও ভিন্ন, এমন মুনি নাই যাঁহার মত ভিন্ন নহে। সুতরাং ধর্ম্মের তত্ত্ব দুর্জ্ঞেয়। অতএব মহাজন যে পথে গমন করে সেই যথার্থ পথ।" ইহা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে বেদপ্রণেতা ঋষিগণ, স্মৃতি প্রণেতা মুনিগণ, ইহাঁরা কেহ মহাজন নহেন। কেন না ইহাঁদের মধ্যে একতা নাই। যাঁহাদের মধ্যে একতা আছে তাঁহারাই মহাজন। একতা যখন মহাজনের মহত্ব, তখন মহাজনের জাতিভেদ থাকিবে কি রূপে? সুতরাং মহাজন সকলেই একজাতি এবং একই পথের পথিক।

এ স্থলে কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যোগী ঋষি মুনি তপস্বী কাহারও সঙ্গে কাহার ঐক্য নাই, কিন্তু মহাজনদিগের ঐক্য হয় কিরূপে? ইহার প্রমাণ আছে "ভিন্নরুচির্হি লোকঃ" প্রত্যেক মানুষের রুচি ভিন্ন ভিন্ন। যাঁহারা মানুষ, মনুষ্যত্বের বলে কার্য্য করাই তাঁহাদের ধর্ম্ম। যাঁহারা মনুষ্যত্বকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করেন তাঁহাদের মত ভিন্ন ভিন্ন হইবেই। কেন না মনুষ্য স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রুচিবিশিষ্ট, কিন্তু যাঁহারা মহাজন, তাঁহারা মনুষ্যত্বকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য করা দোষ বলিয়া জানেন। মনুষ্যত্ব অহঙ্কারমূলক, অহঙ্কার নাস্তিকতার আশ্রয়ভূমি। এই জন্য যাঁহারা আত্মকর্তৃত্ব ঈশ্বরচরণে উৎসর্গ করিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞাবহ দাস হইয়া যান তাঁহারাই মহাজন। ঈশ্বরের আজ্ঞাই মহাজনের মহত্ব লাভের উপায়, যেখানে মহাজন সেই স্থানে মনুষ্যকর্তৃত্ববিহীন ঈশ্বরপ্রভাব। সুতরাং মহাজনের কার্য্য বলিলেই বুঝিতে হইবে সে কার্য্যের কর্ত্তা স্বয়ং ঈশ্বর। সকল মহাজনের কার্য্যই স্বয়ং ঈশ্বর নির্ব্বাহ করেন, সুতরাং এক ঈশ্বরের কার্য্য বলিয়া সর্ব্বত্রই ঐক্য থাকে, কোথাও অনৈক্য প্রত্যক্ষ হয় না। নববিধান এই দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বকে মনুষ্যসমাজে পরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। সকলে জানিত বটে "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" কিন্তু "মুনি ঋষি বেদ বেদান্ত প্রভৃতি হইতে মহাজন ভিন্ন কেন, তাঁহাদিগের মধ্যে নিশ্চয় একতা আছে এ সকল তত্ত্ব নববিধানের প্রসাদেই জগৎ লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। কেবল এইমাত্র নহে—"এই স্বর্গীয় অধিকারে (প্রত্যাদেশ লাভের অধিকারে) প্রত্যেক নরনারী অধিকারী, একটি ক্ষুদ্র মানবাত্মাও ইহাতে বঞ্চিত

নহে। যত্ন করিয়া গ্রহণ করিলেই নিশ্চয় পাইবে" এই অপূর্ব্ব তত্ত্বও নববিধান প্রচার করিয়াছেন, সকলে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া কার্য্য করিতে যত্ন করিলে প্রত্যেক মানবাত্মাতে একতার ভাব পরিস্ফুট হইবে। সকলে ভগবানের আজ্ঞাবহ হইলে আর ভবিষ্যতে অনৈক্য থাকিবে না। যোগী ঋষিদিগের সঙ্গে মহাজনদিগের স্বরূপগত ও আচারগত বিভিন্নতা অনেক আছে, প্রস্তাববাহুল্য ভয়ে আমরা সে সকল পরিত্যাগ করিলাম।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ধ্যানের পথ সুগম করিবার জন্য, আরাধনা করা আবশ্যক। ঈশ্বর ইন্দ্রিয়াতীত, সহজে তাঁহাকে ধারণা বা ধ্যান করা যায় না। আরাধনা দ্বারা এই অব্যক্ত ঈশ্বর একটি বরণীয় রমণীয় ব্যক্তিরূপে গঠিত হন। অব্যক্ত ঈশ্বর ব্যক্তি হইলেই ধ্যানের পথ সুগম হইল। সে ব্যক্তি কিরূপ শোন। সত্যের ভাব বিদ্যমানতা, সুতরাং সত্য সর্ব্বব্যাপী। এই জন্য সত্যকে দেহরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কেন না জ্ঞান প্রেম অনন্ত সর্ব্বনই ঈশ্বরের বিদ্যমানতার ভাব থাকা উচিত। জ্ঞান এই সত্যস্বরূপ দেহের চক্ষুঃ। যাহা দ্বারা জানা যায় তাহার নাম জ্ঞান, যাহা দ্বারা দেখা যায় তাহা চক্ষুঃ। চক্ষুঃ জানিবারই উপায় এই জন্য সত্য দেহের চক্ষুঃ জ্ঞান। অনন্ত তাঁহার ভুজ বা বাহু, বাহু শক্তির আশ্রয়, তাঁহার শক্তি ও ক্ষমতা অসীম, এই জন্য অনন্ত বাহুরূপে গণ্য হইয়াছে। প্রেম বা মঙ্গল ভাবের আধার হৃদয়, এই নিমিত্ত শিব তাঁহার হৃদয়। এবং পদ অদ্বৈত। মানুষের একমাত্র আশ্রয় তাঁহার পদ, এই কারণে অদ্বৈতকে পদরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। পুণ্য তাঁহার বর্ণ। সত্য বস্তু পুণ্যের বর্ণে রঞ্জিত হইয়া সুন্দর মনোহর হয়। আর সর্ব্বসঞ্চারী আনন্দ সত্য সুন্দর দেহের লাবণ্য। কেন না লাবণ্য সৌন্দর্য্যেরও সৌন্দর্য্য। চক্ষু কর্ণ হস্ত পদাদি যত টুকু উন্নত কি অবনত প্রশস্ত কি সঙ্কীর্ণ হইলে উপযুক্ত হয় তার একটু অধিক বা অল্প নহে, পরস্পর এইরূপ অন্বিত ভাবকে লাবণ্য বলা যায়, সুতরাং বর্ণে সৌন্দর্য্য হয় না সৌন্দর্য্য হয় লাবণ্যে। অতএব লাবণ্য সর্ব্বদেহের বিষয়। কেন না কোন এক অঙ্গ লইয়া লাবণ্যের অর্থ হয় না। এই জন্য আনন্দ লাবণ্য, কেন না জ্ঞানেতে ও আনন্দ, সত্যেতেও আনন্দ, প্রেমেতেও আনন্দ, পুণ্যেতেও আনন্দ ইত্যাদি রূপে আনন্দ সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইয়া সকলগুলি স্বরূপকেই মিষ্ট করিয়া তোলে। আনন্দের পর অমৃত, ঈশ্বর অতিমিষ্ট অথচ মৃত্যুরূপ পাপভয়হারী, এই জন্য তিনি অমৃত রূপে পরিচিত। পুণ্য সমাগমে দেহ মন প্রাণ শুদ্ধ হয়, তখনই আনন্দ সমাগমের অবসর। অশুদ্ধতা পাপই দুঃখ ও মৃত্যু, এই পাপ চলিয়া গেলেই সুখ। সুতরাং পুণ্যের পর আনন্দ এবং আনন্দের পর অমৃত। অমৃতের পর শান্তি। যখন ঈশ্বর আসিয়া মানুষের সকল আশা পূর্ণ করেন, তখন আর এটা ওটা সেটা বলিয়া বিষয়ের প্রতি মন ধাবিত হয় না। সুতরাং ঈশ্বর সমাগমে বিষয়বাসনার অগ্নি নির্ব্বাণ হয়, চিত্ত তরঙ্গবর্জ্জিত হয়, চিত্ত তরঙ্গবর্জ্জিত অচঞ্চল হইলেই শান্তি। তার পর আর কোন উদ্বেগ উৎকণ্ঠা থাকে না। তাই বলিতেছি সত্য জ্ঞান অনন্তাদির ভাবময় দেহে শান্তি প্রাণরূপে জীবনরূপে উদিত হইয়া ঈশ্বরকে এক অপরূপ ব্যক্তিত্বে পরিণত করে। তাঁহার কোন আকৃতি নাই অথচ তিনি ব্যক্তি।

নববিধানের উপাসনার শেষ শান্তিতে! শান্তি চরম লভ্য পরম ধন। শান্তি উপাসনার প্রাপ্য বা ভোগ্য ফল। কেন না যে পর্য্যন্ত শান্তি উদিত না হয় সে পর্য্যন্ত বিষয়বাসনা নির্ব্বাণ হয় না। শান্তি চাঞ্চল্য রোগের মহৌষধ, শান্তি অপ্রকৃতিস্থকে প্রকৃতিস্থ করে, আর "যস্মিং স্থিতো নদুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে" যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে গুরুতর দুঃখ দ্বারাও আর বিচালিত হয় না, সেই শান্তি। এই জন্য শান্তি সকলের শেষে থাকা আবশ্যক। শেষে থাকা আবশ্যক বলিয়াই সকলের শেষে শান্ত স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। এমন সুন্দর উপাসনা প্রণালীতে ইচ্ছা পূর্ব্বক অনাদর করিলে মহা অপরাধে লিপ্ত হইতে হয়। কেহ কেহ বলেন এটা পৌত্তলিকতাপ্রধান দেশ, এ দেশের উপাসনাপ্রণালী অদ্বৈত স্বরূপে শেষ হওয়া উচিত। এ কথার উত্তরে আমরা বলিব এ দেশ পৌত্তলিকতাপ্রধান, এই জন্য যে স্থান হইতে পৌত্তলিকতা উদিত হয়, সেই শিব স্বরূপের সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈত স্বরূপ সংযুক্ত আছে। সকলের শেষে লইয়া গিয়া শিবের সঙ্গে অদ্বৈতের যোগভঙ্গ করিয়া দিলে পৌত্তলিকতা নিবারিত হইবে না কিন্তু বাড়িবে। অতএব চক্ষুষ্মান লোকের পক্ষে এই প্রণালী অপরিহার্য্য। ধর্ম্ম দুই প্রকার। এক আড়ম্বরশূন্য পুষ্টিকর খাদ্যের অনুরূপ। দ্বিতীয় মূল্যবান সুদৃশ্য পরিচ্ছদের অনুরূপ। যেটি আড়ম্বরশূন্য পুষ্টিকর খাদ্য তাহাতে লৌকিক ভাব নাই। তাহা লোকের চিত্তরঞ্জন করিবার জন্য নহে কিন্তু জীবনকে সুস্থ ও সবল করিবার জন্য। আর যেটি সুদৃশ্য পরিচ্ছদ। তাহা কেবল লোকচক্ষুর পরিতৃপ্তির জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু জীবনের পুষ্টি বলও স্বাস্থ্য বর্দ্ধনের পক্ষে বিন্দুমাত্র ও সাহায্য দান

করে না। এইটি বিচার করিবার বিষয়। যে ব্যক্তি জীবন ভালবাসে, সে জীবনের তেজও পুষ্টিপ্রদ আয়োজন পরিত্যাগ করিয়া পরিচ্ছদ গ্রহণ করিতে চাহেনা। যে ব্যক্তি কেবল লোকরঞ্জন ভালবাসে সে পরিচ্ছদ লইয়া জীবন পরিত্যাগ করে কিন্তু জীবন পরিত্যাগ আর মৃত্যুর একই অর্থ।

আচার্য্যের উপদেশ।

ছায়াপূজা এবং জীবন্ত ঈশ্বর।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রেমচাঁদ বড়ালের বাটী।

শনিবার ২২ চৈত্র, ১৮০১ শক।

সকল বস্তুর ছায়া কাল। বস্তু যদি অতি সুন্দর হয় তাহার ও ছায়া কাল। সুন্দর বস্তুর ছায়া যদি প্রাচীরের উপরে দেখি, দেখিব সেই ছায়াতে সৌন্দর্য্য নাই। ছায়া একে অসার তাহাতে অত্যন্ত কাল এবং কদাকার। অত্যন্ত লাবণ্যযুক্ত গোলাপ ফুলের মতন যে শিশু তাহার ছায়াও কাল। পৃথিবীতে ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ যিনি, যাঁহার মুখে ধর্ম্মের উচ্চ লক্ষণ সকল ঘনীভূত, যাঁহার চক্ষু হইতে তেজ নিঃসৃত হয়, রসনা হইতে অমৃত বর্ষণ হয়, যাঁহার সঙ্গে থাকিলে মন পবিত্র এবং সুখী হয়। যাঁহার মুখের সুমধুর হাসি এবং অনির্ব্বচনীয় কান্তি দেখিলে মন মোহিত হয়, এমন যে সাধুপুরুষ তাঁহার ছায়াও কুৎসিত। অত্যন্ত কদাকার বস্তুর ছায়া যেমন, অত্যন্ত সুন্দর বস্তুর ছায়াও সেইরূপ। যদি জড় সম্বন্ধে এরূপ হইল তবে ঈশ্বর সম্বন্ধেও এইরূপ। সহস্র গোলাপ, সহস্র কমলের সঙ্গে ব্রহ্মমুখের তুলনা হয় না। এমন যে পরম সুন্দর হরি, যিনি সমস্ত সাধুতার সমুদ্র, এবং অনন্ত সৌন্দর্য্যরাশির আকর তাঁহার ছায়া পূজাও অসার। ঈশ্বরের ছায়া পূজা করিয়া কেহই অন্তরে প্রকৃত সুখ ভোগ করিতে পারে না। ছায়া পূজাতে চিত্ত শুদ্ধ এবং সুখী হয় না। সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর সুন্দর; কিন্তু তাঁহার ছায়া সুন্দর হয় না। ঈশ্বরের ছায়াকে কোন মতে সুন্দর করিতে পার না। তোমাদের বুদ্ধির আলোকে তোমাদের আত্মার প্রাচীরের উপর ঈশ্বরের যে ছায়া পড়ে সেই ছায়াতে জীবন এবং সৌন্দর্য্য নাই। সেই কুৎসিত নির্জীব ছায়া দেখিয়া যদি হে ব্রহ্মসাধক, তুমি ভয় পাইয়া থাক তাহা তোমার দোষ, ব্রহ্মের কোন দোষ নাই। তোমার মুখ দেখিয়া বুঝিতেছি তুমি অতি মলিন, তোমার মুখ ঘনীভূত দুঃখের অন্ধকার বিস্তৃত করিতেছে। যাহার অন্তরে বিষাদ রহিয়াছে সে ব্রহ্মের ছায়া পূজা করিতেছে। যিনি যথার্থ ব্রহ্মের সাধক তিনি আনন্দের সন্তান, তাঁহার চক্ষু হইতে আনন্দ ধারা বহিতেছে। হে মনুষ্য, তুমি যদি ছায়া পূজা কর, তুমি কাহার নিকট আনন্দ লাভ করিবে? দুঃখের সময় কে তোমাকে সান্ত্বনা দিবে? যে ব্যক্তি ছায়া পূজা করে, তাহার ধন হানি, মানহানি অথবা বন্ধুবিয়োগ হইলে সে যে দুঃখে হাহাকার করিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? ছায়া কি মানুষের দুঃখ মোচন করিতে পারে, না তাহাকে সুখী করিতে পারে? যাহারা প্রকৃত ঈশ্বরকে দেখিতে না পাইয়া ছায়া পূজা করে তাহাদিগের প্রাণের ভিতরে দুঃখ যন্ত্রণার অগ্নি জ্বলিতেছে এবং তাহাদিগের মুখে ক্রমাগত খেদোক্তি শুনা যায়। হরি কি দুঃখের দেবতা? হরিপূজা করিলে কি অন্তরে দুঃখ থাকিতে পারে? আমরা নানা কারণে সংসারে কষ্ট পাই, হরিসভাতেও কি আমরা কষ্ট পাইব? সংসারে কাঁদি বলিয়া কি আমরা ব্রহ্মমন্দিরেও কাঁদিব? যখন ব্রহ্মস্তব এবং ব্রহ্মধ্যান মননে মগ্ন হই তখনও কি দুঃখী হইব? ব্রহ্মোপাসনা কি দুঃখ যন্ত্রণার ব্যাপার? ব্রহ্মপূজা করিলে কি সুখ শান্তি লাভ করা যায় না? ব্রহ্ম কি অত্যন্ত কঠিন? তাঁহাতে কি কিছুমাত্র রস নাই? সুন্দর মূর্ত্তি হরি প্রেমরসে পূর্ণ হইয়া সর্ব্বত্র বসিয়া আছেন, তুমি ছায়া দেখিতেছ কেন? এমন সুন্দর হরির উপাসনা কি কষ্টের উপাসনা? সুখময় হরির উপাসনায় কি সুখ শান্তি নাই? পরম সুন্দর হরির নিকটে বসিয়া কাল ছায়া দেখিয়া ভয় পাইতেছ? কাঁদিতেছ? আলোকের মধ্যে থাকিয়া অন্ধকার দেখিতেছ কেন? ভ্রান্ত জীব, সর্ব্বাগ্রে বস্তু নিরূপণ কর। হরি ছায়া নহেন, হরি অন্ধকার নহেন, দুঃখে হরি থাকেন না, সুখেতে হরির বাস। হরিকে দেখিলে ভক্তের প্রাণের মধ্যে আনন্দলহরী উঠে। হরি দর্শনে, হরি সহবাসে যেমন সুখ এমন সুখ আর কোথায়ও নাই। হরি আনন্দে গঠিত, এই জন্য তাঁহার নাম সচ্চিদানন্দ। তোমরা যদি দুঃখের সহিত হরিপূজা কর তাহা হইলে তোমরা জীবন্ত হরিকে দেখিতে পাও নাই। যথার্থ হরিকে দেখিলে তোমাদিগের অন্তরের দুঃখের আগুন নির্ব্বাণ হইবে এবং তোমাদের প্রাণ আনন্দ রসে সিক্ত হইবে। প্রকৃত হরিপূজা করিয়া যখন তোমাদের প্রাণ মধুর হইবে তখন দুঃখী পৃথিবী তোমাদের কাছে দৌড়িয়া আসিবে। লীলারসময় হরির অর্চ্চনা করিলে দুঃখ থাকে না। অনেক তপস্যা এবং বহু সাধন ভজন করিয়াও যদি মনের মধ্যে দুঃখ থাকে, তাহা হইলে জানিবে জীবন্ত হরিদর্শন হয় নাই। যদি হরিকেই না দেখিলে তবে ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসী হইয়া নানা প্রকার কষ্ট সাধন করিলে কি হইবে? ব্রহ্মসাধক, তুমি কিরূপে আনন্দস্বরূপ হরিকে পূজা করিয়া এত সহজে সুখী হইলে? পূর্ব্বে মুনি ঋষিরা বহুকাল তপস্যা করিয়াও এমন সুখী হইতে পারিতেন না। কথিত আছে, কত বৎসর চলিয়াগেল তথাপি কোন কোন যোগী ঋষি ব্রহ্ম দর্শন পাইলেন না। তাঁহারা গ্রীষ্ম কালে অগ্নি জ্বালিয়া

তাহার মধ্যে বসিয়া তপস্যা করিলেন, যে অরণ্যে ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সকল তর্জ্জন গর্জ্জন করে তাহার মধ্যে বাস করিয়া কত সাধন করিলেন, তথাপি তাঁহারা ব্রহ্মদর্শন লাভ করিয়া সুখী হইতে পারিলেন না। কিন্তু বর্ত্তমান শতাব্দীর ব্রহ্মসাধক, তুমি কি সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া এত সহজে ব্রহ্মতত্ত্ব লাভ করিলে? পূর্ব্বে যোগী ঋষিগণ সংসার পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে গিয়া ব্রহ্মসাধন করিতেন; কিন্তু তুমি কোন্ সাহসে বলিতেছ যে তুমি ঘরে বসিয়াই হরিদর্শন লাভ করিবে। হরিদর্শন কি এখন এত সুলভ হইয়াছে? কে ইহাকে এত সুলভ করিল? একজন উপকারী পরম বন্ধু। তাঁহার নাম মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য; সে নাম চিরস্মরণীয় এবং চিরস্থায়ী। শ্রীচৈতন্য ভাবিলেন সকল লোকের পক্ষে পর্ব্বতশিখরে বসিয়া যোগ সাধন করা সম্ভব নহে অতএব তাহাদিগের পরিত্রাণের জন্য একটি বিশেষ উপায় আবশ্যক। পৃথিবীর দুঃখ দেখিয়া তাঁহার চক্ষু হইতে কৃপাবারি বর্ষিত হইল। পাপী জগত উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার মন উন্মত্ত হইল। তিনি বলিলেন "যিনি ভক্তির সহিত হরিকে ডাকিবেন তিনি কি রন্ধনশালায়, কি শয্যায়, কি কর্ম্মক্ষেত্রে সর্ব্বত্র হরিকে দেখিতে পাইবেন।" এইরূপে তিনি সকলের পরিত্রাণের জন্য ভক্তির ধর্ম্ম প্রচার করিলেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মমতে একবার ভক্তির সহিত শ্রীহরি বলিয়া ডাকিলেই হৃদয় পবিত্র এবং প্রাণ উল্লসিত হয়। পঞ্চাশ বৎসর কঠোর তপস্যা করিয়া যাহা লাভ করা যায় না ভক্তির সহিত একবার হরিনাম উচ্চারণ করিলে তাহা পাওয়া যায়। এই ভক্তির ধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে প্রায় কেহই ঈশ্বরকে পাপীর বন্ধু, দীনবন্ধু বলিয়া ডাকিত না। মহাত্মা শ্রীচৈতন্য এই সুধাময় নাম জগতে প্রচার করেন। তাঁহার সময় হইতে বঙ্গবাসীদিগের অদৃষ্ট ফিরিয়াছে, কেন না তাঁহারা হরিনাম সুধার অধিকারী হইয়াছেন। সেই একই হরি এখনও ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে তাঁহার লীলা প্রকাশ করিতেছেন। মনে করিওনা যে সেই হরি একজন শুষ্ক কঠোর দেবতা। তাঁহার মধ্যে কিছুমাত্র শুষ্ক ভাব নাই, তাঁহার হৃদয় অসীম প্রেমরসে পরিপূর্ণ, তিনি করুণার সাগর, পরম সুন্দর, তিনি আপনার রূপলাবণ্যেই ভুবনমোহন হইয়া রহিয়াছেন। লোকের মনোরঞ্জন করিবার জন্য তাঁহাকে কল্পনার রং দিয়া চিত্রিত করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহাকে দেখিলেই লোকের মন ভুলিয়া যায়। তিনি ভক্ত চিত্তহারী ভুবনমোহন। যাঁহারা সাধারণ লোকদিগের পক্ষে সুলভ করিবার জন্য তাঁকে লুকাইয়া রাখিয়া মনগড়া একটী ঠাকুর প্রস্তুত করিয়া দেয় তাহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। জীবন্ত হরি ভিন্ন কল্পিত দেবতা মনুষ্যকে পরিত্রাণ করিতে পারে না। সত্য পরিত্যাগ করিয়া ছায়া পূজা করিলে আত্মার দুঃখ মোচন হয় না। সেই পুরাতন বেদ বেদান্তের হরি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহাকে না দেখিয়া যদি তোমরা তাঁহার মূর্ত্তি অথবা ছায়া কল্পনা করিয়া তাঁহার পূজা কর তাহাতে কদাচ তোমরা পরিত্রাণ এবং সুখ শান্তি লাভ করিতে পরিবেনা। আমরা দেখিতে পাইতেছি, হরির চরণতলে যেমন চারিবেদ, তেমনি সমস্ত পুরাণ একত্র রহিয়াছে। তাঁহার চরণ তলে, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি যোগী ঋষিগণ এবং নারদ চৈতন্য প্রভৃতি ভক্তগণ এক পরিবার হইয়া বাস করিতেছেন। এই বর্ত্তমান নববিধানে সেই হরি এই প্রেমের সমাচার বিস্তার করিতেছেন। এই সমাচার শুনিয়া জীব সহজে ব্রহ্ম পদার্থ লাভ করিবে। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা ভক্তির সহিত এই সমাচার গ্রহণ করিবেন! দুঃখী তাহারা যাহারা এ সম্বাদ পাইল না। তাহারা এখনও ছায়া পূজা করিতেছে তাহারা এখনও সত্য শিব-সুন্দর-হরির মুখ দেখিতে পায় নাই। যাঁহারা ধীর শান্ত এবং প্রকৃত বিশ্বাসী তাঁহারা বিশ্বাস নয়নে জীবন্ত হরিকে দেখিয়া বলেন "হে হরি, তুমিই আমাদিগের বেদ তুমিই আমাদের পুরাণ, তুমি আমাদিগের যোগবল তুমি আমাদিগের ভক্তিরস, তুমিই যোগেশ্বর মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব তুমিই আমাদের ভক্তবৎসল ভগবান্। তোমারি পাদপদ্ম সেই উচ্চ হিমালয় শিখরে যোগী ঋষিদিগের চিত্তকে সুখী করিয়াছে। তোমারি পাদপদ্ম নবদ্বীপবাসী শ্রীচৈতন্য এবং অন্যান্য ভক্তদিগের বক্ষ শীতল করিয়াছে।" বাস্তবিক হরিছায়া নহেন, তিনি পরম বস্তু, তাঁহাকে হৃদয়ের ভক্তির দ্বারা স্পর্শ করা যায়। তাঁহার সহবাস ভোগ করা যায়। তিনি সচ্চিদানন্দরূপে তোমার ঘরে, আমার ঘরে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। যখন জিজ্ঞাসা করি, "হরিহে, তুমি কি আমার ঘরে বর্ত্তমান আছ?" তিনি বলেন "হাঁ সন্তান তোমার ঘরে আমি আছি, কেন না আমি ভক্তের নিকট বাঁধা।" হরি প্রতি জনের ঘরে বিদ্যমান রহিয়াছেন। সত্য যুগ অপেক্ষা কলি যুগের বিশেষ মাহাত্ম্য, কেন না কলি যুগের লোকেরা সংসারের মধ্যে থাকিয়াই হরি দর্শন লাভ করিবে। পূর্ব্বকার লোকেরা সংসার ছাড়িয়া অরণ্যে গিয়া হরির আরাধনা করিতেন, এখন আমরা মলিন পাষণ্ড লোক হইয়াও এক হাতে সংসারের বিষ খাইতেছি, আবার আর এক হস্তে স্বর্গের অমৃত পান করিতেছি! হরির সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমরা মোহিত হইয়াছি। কলিযুগে হরির অপার লীলা দেখিতেছি। হরি স্বয়ং মহৌষধ হইয়া আমাদিগের চিত্তের সকল প্রকার ব্যাধি দূর করিতেছেন। আমরা সংসারের কীট হইয়াও হরিসহবাসের বিমল আনন্দ সম্ভোগ করিতেছি। যখনই আমরা কোন প্রকারে কষ্ট পাই তখনই হরিকে বলি "হরিহে অমুক আমাকে দুঃখ দিয়াছে"। হরি তৎক্ষণাৎ সহিষ্ণুতা গুণ দিয়া আমাদি-

পকে সেই কষ্ট সহ্য করিতে ক্ষমতা দেন। হরি যাঁহার প্রতি প্রসন্ন তাহার আর দুঃখ ভয় কি? যখন নিতান্ত ধনের অভাব হয় তখন হরি বলেন, "আমি কুবের হইয়া তোমার ঘরে বাস করিতেছি, তোমার ধনের ভাবনা কি?" যাঁহারা সংসার ছাড়িয়া অরণ্যে গিয়া যোগ সাধন করেন তাঁহাদিগের সুখ হয় বটে কিন্তু তাঁহাদিগের অপেক্ষাও যোগী সংসারির সুখ গভীরতর। এই নববিধানে সংসারে যোগ সাধন করিতে হইবে, অতএব এই সময়কে কলিকাল বলিয়া তিরস্কার করিও না। কলি অপেক্ষা হরিনাম বড়। কলি-আমাদিগকে কত কাল করিবে? হরি আমাদিগকে ভাল করিবেন। এমন হরিকে হৃদয়ে দেখিয়াছি, যে হরির ক্ষমতা আছে দুঃখ দূর করিবার। যেমন ভয়ঙ্কর রোগ, দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা তেমনি হরি মহৌষধ। যদি জীবনের রক্ত দিয়া হরির চরণ ধৌত করিতে পারি তবে আর পৃথিবী দুঃখ দিতে পারিবে না। এমন হরি বাঁচিয়া থাকিতে কেন মিথ্যা ছায়া এবং কল্পনার পূজা করিয়া মরি। অতএব ছায়া কল্পনা ছাড় সকলে জীবন্ত হরি পূজা করিতে আরম্ভ কর। হরি সকলের ঘরে বসিয়া আছেন। হরি কাহাকেও ঘৃণা করেন না। কে চণ্ডালকে অন্ন জল দেন? তুমি ঘৃণা করিয়া চণ্ডালের নিকট যাওনা কিন্তু হরি চণ্ডালকে আলিঙ্গন করেন। হরির নিকট সকলেই সমান। চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঋষির আশ্রমে যেমন হরি ঋষিদিগকে দেখা দিতেন আজ চণ্ডালের বাটীতেও হরি বাস করিতেছেন। অতএব তোমরা সকলেই স্ত্রী পুত্র বন্ধুবান্ধব সকলকে সঙ্গে লইয়া হরির আরাধনা কর। হরির কৃপায় সংসার তপোবন হইবে এবং পৃথিবীতে স্বর্গ দেখিতে পাইবে। বিশ্বাসের অটল পর্ব্বতশিখরে বসিয়া ঈশ্বরের চরণ বন্দনা কর, যোগশীল হও, এবং পূর্ব্বকালের ঋষিগণ যেমন ঋষি-পত্নীদিগকে সঙ্গে লইয়া যোগ সাধন করিতেন তোমরাও সেইরূপ সপরিবারে ব্রহ্মোপাসনা কর। যদি পরিবার মধ্যে বৈকুণ্ঠ স্থাপিত না হয় তবে ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং নববিধান মিথ্যা। হরির আবির্ভাবে বিশ্রীমুখ সুশ্রী হইবে, নরকের মধ্যে স্বর্গের শোভা দেখিবে, অন্ধকারে আচ্ছন্ন জীবন জ্যোৎস্নাময় হইবে। হরিকে লাভ করিলে তাহার সঙ্গে স্বর্গও তোমাদিগের হস্তগত হইবে। হরিই তোমাদিগের স্বর্গ, হরিকে লাভ করিলে সমুদয় সাধুদিগকে দেখিতে পাইবে। হিমালয়, যোগাশ্রম, ঋষিদিগের কুটীর সমস্ত তোমাদিগের বাটীতে আসিবে। হরি তাঁহার সমস্ত স্বর্গ রাজ্য সঙ্গে লইয়া প্রতিজনের বাটীতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। অতএব প্রত্যেকে আপনার বাটীতে হরিকে অনুসন্ধান কর। সকল স্থানে সেই মহা প্রভুকে দর্শন কর। তাঁহার কৃপায় পাপদেহের পরিবর্ত্তে ভাগবতী তনু লাভ করিবে, এবং সংসারের মধ্যেই সশরীরে স্বর্গ রাজ্যের অধিকারী হইবে। ইহাই সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের নূতন সমাচার। এই নূতন বিধিতে যোগ ভক্তি এক হইবে, শক্তি-পূজা হরিপূজা ভিন্ন থাকিবে না, ইহাতে সকল সাধু এবং সকল ধর্ম্মের মিলন হইবে। এবং সকলের চিত্ত ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হইবে।

ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজ।

বিধানের সমন্বয়।

বিধানের সমন্বয় বলিতে বিধানবাহী মহাপুরুষদিগের জীবনের সমন্বয় বুঝিতে হইবে। কেন না জীবন হইতেই তত্তৎ সাময়িক বিধানের শাস্ত্র সকল সঙ্কলিত হইয়াছে। এই জন্য আমরা বৈদিক সময়ের ঘটনাবলীকে বিধান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। কেন না ঋগ্বেদাদি বিধানের অতীতলক্ষণাক্রান্ত। বিধান বলিয়া কোন তত্ত্বকে গ্রহণ করিতে হইলে দেখিতে হইবে, তাহাতে শ্রৌতিক দৈবপ্রেরণা আছে কি না, যে স্থানে শ্রৌতিক দৈববল পরিলক্ষিত হয় সেখানে ভক্ত নূতনসাজে সজ্জিত হইতে বাধ্য হন। শ্রৌতিক দৈববলে পরিচালিত হইয়া নূতন দশাপ্রাপ্ত হইলেই বিধানের অভ্যুদয় হয়। কিন্তু ঋগ্বেদের সূক্ত সকলের কুত্রাপিও এই দৈবপ্রেরণার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং ঋগ্বেদকে এবং তদুক্ত ঘটনাবলীকে কোনক্রমেই বিধান বলিয়া অঙ্গীকার করা যায় না। কেবল একটি মাত্র স্থানে আছে যথা—

> "তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
> ধিয়ো যো নঃপ্রচোদয়াৎ ॥"

ঋগবেদ। ৩ ম, ৬২ সূ, ১০ ঋ

"সেই জগৎপ্রসবিতা পরম দেবতার জ্যোতির্ম্ময় আবির্ভাব ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।"

এ স্থলে কেবল "যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন, এইমাত্র প্রেরণার নিদর্শন আছে, কিন্তু ইহা বিধানের প্রেরণার সঙ্গে তুলিত হইতে পারে না। এ স্থলে বুদ্ধিবৃত্তির প্রেরণাবলিতে প্রতিনিয়ত আমাদিগের ভিতরে যে বুদ্ধিবৃত্তি স্ফূর্ত্তি পায় এবং যাহার সাহায্যে আমরা সমুদয় সাংসারিক কার্য্যকলাপ নির্ব্বাহ করিয়া থাকি সেই বুদ্ধিবৃত্তি। এ প্রেরণায় কেহ উন্মত্ত হয় না, এবং নূতন ভাব ও নবজীবনও লাভ করে না। ইহা কখন বিশেষ বিধান বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না। ইহা সাধারণ বিধান মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে, কেন না স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয় না। সাধারণ বিধান তর্কের বিষয় নহে, সুতরাং তদ্বিষয়ে আমাদিগের কিছু বলিবার নাই।

বিশেষ বিধান তর্কের বিষয় এ জন্য বিশেষ বিধান আমাদিগের আলোচ্য বিষয়।

আর একটি কথা আছে—কেহ কেহ বলেন, কোন কোন গ্রন্থেও দেখা যায় যে লোকস্রষ্টা ব্রহ্মা প্রথমতঃ আপন হৃদয়ে বেদবিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট হন। * তিনি আবার সেই বেদ ঋষিদিগের মধ্যে প্রচার করেন। এ কথা সত্য হইলে বেদ বস্তুতঃ বিধান বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কেন না বিধান বলিতে বিধাতার সাক্ষাৎ ক্রিয়া বুঝিবার বিধি। বিধাতার সাক্ষাৎক্রিয়ানুসারে ব্রহ্মা যদি নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তবে ইহা বিধান তৎপক্ষে সংশয় করা যায় না। কিন্তু ব্রহ্মার প্রত্যাদেশবিষয়ক যে প্রমাণ উপরে উক্ত হইল এবং পরে প্রদর্শিত হইতেছে তাহা বিধান বিষয়ক প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

মুণ্ডকোপনিষদে আছে—

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব
বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠা
মথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥

মুণ্ডকোপনিষদ।

"ভুবনের রক্ষক বিশ্বের কর্ত্তা ব্রহ্মা সকল দেবতার প্রথমে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মবিদ্যা আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্ব ঋষিকে বলেন।"

ইহা দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে ব্রহ্মা অথর্ব্ব ঋষিকে ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছিলেন। কিন্তু এ ব্রহ্মবিদ্যা যে বেদ তাহার কোন প্রমাণ নাই। বরং বিপরীত প্রমাণ অনেক আছে।—

"অপরা ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদো
হথর্ব্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং
চ্ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথপরা যয়া
তদক্ষরমধিগম্যতে॥

মুণ্ডকোপনিষদ। ১। ১। ৫

"ঋগবেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ জ্যোতিষ এ সকল অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, যদ্দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।"

মুণ্ডকোপনিষদের পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মবিদ্যা এই, অর্থাৎ যে কোন উপায় দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় তাহারই নাম ব্রহ্মবিদ্যা; কিন্তু ঋগ যজুঃ সাম প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানের তেমন সহায় নহে বলিয়া উহা অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা। অতএব পূর্ব্বোক্ত বচন অনুসারে ব্রহ্মা বেদে প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া সপ্রমাণ হইতেছেনা। যদি পূর্ব্বোক্ত বচন অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মাকে বেদবিষয়ে প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া স্বীকার করা যায় এবং তিনি আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বার নিকট সেই প্রত্যাদেশ প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া ও যদি বিশ্বাস করা যায়। তবু ব্রহ্মা প্রত্যাদিষ্ট সপ্রমাণ হইবার উপায় নাই। কেন না ঋগবেদের কুত্রাপি ব্রহ্মার নামগন্ধও নাই। কত ঋষি আছে, রাজা আছে, ইন্দ্র বরুণ যম মিত্র প্রভৃতি, বহু দেবতা আছে কিন্তু ব্রহ্মা বলিয়া কোন ব্যক্তির উল্লেখ নাই। এক ব্রহ্মার নাম পাওয়া যায় তাহা কোন ব্যক্তির নাম নহে যজ্ঞের পৌরহিত্যকারী পদ বিশেষের নাম। যদি সত্যসত্যই ব্রহ্মা হইতে বেদের প্রচার হইত তবে সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ঋগবেদে তাহার নিদর্শন কোথাও না কোথাও কিছু থাকিত। এবং চিরকাল বেদ অক্ষুন্ন অবিকৃত অপরিবর্ত্তিত ও অপরিবর্দ্ধিত ভাবে থাকিত কিন্তু তাহা হয়নাই পূর্ব্বে একমাত্র ঋগবেদ ছিল * পরে যজুঃ ও সাম প্রভৃতি তাহাহইতে পৃথক্কৃত হইয়াছে কিন্তু কেবল যে কয়টি সূক্ত ঋগবেদ হইতে ঐ সকল বেদে গৃহীত হইয়াছে তাহাই যজুঃ অথর্ব্ব প্রভৃতি নহে। যজুঃ অথর্ব্ব প্রভৃতিতে ঋগবেদে নাই এমন নূতন ঋক ও অনেক প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং সে গুলি পরে রচিত হইয়াছে তৎপক্ষে সংশয় নাই। কেবল তাহাই নহে ঋগ্‌বেদেই আছে যথা— ক্রমশঃ

প্রচারবৃত্তান্ত।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন হইতে প্রাপ্ত।

৪র্থ পত্র।

১০ই জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার সন্ধ্যার পর তেজপুরে তথাকার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু শশিভূষণ দত্ত মহাশয়ের ভবনে ধর্ম্মালোচনা, সঙ্গীত ও প্রার্থনা হয়। ১৪ ই শনিবার সন্ধ্যার পর সমাজগৃহে উৎসবের আরম্ভ সূচক মহিলাদিগের জন্য শাস্ত্র পাঠ, ব্যাখ্যা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইয়াছিল। ১৫ ই রবিবার তেজপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতঃকালে সমাজ গৃহে উপাসনা হয়, পুণ্য সঞ্চয় বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। অপরাহ্নে ভ্রাতৃবর মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী জীবনবেদ ও ব্রহ্মগীতোপনিষদ হইতে কয়েকটি বিষয় এবং আচার্য্যের একটি উপদেশ পাঠ করেন। পরে অভ্যস্ত পাপ বিষয়ে প্রশ্ন উপস্থিত হইলে আলোচনা হয়। রাত্রিতে উপাসনা ও "দেব জীবন" বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে সমাজগৃহে উপাসনা হয় ভোজনান্তে বেলা প্রায়

---

* তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎসূরয়ঃ।
(ভাগবত)

* এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্‌ময়ঃ।
দেবো নারায়ণো নান্য এ কোঽগ্নির্বর্ণএবচ॥
ভাগবত। ৯। ১৪

১১ টার সময় ধুবড়ি নগরে যাত্রা করা যায়। তেজপুর নগর ক্ষুদ্র, এখানে লোকসঙ্খ্যা অল্প কিন্তু পর্ব্বতশ্রেণী ও খর-স্রোতঃব্রহ্মপুত্র নদের যোগে নগরটি পরম শোভা ধারণ করিয়াছে। প্রবাদ যে এ নগরে পরম শৈব বাণরাজার রাজধানী ছিল। তাহার নিদর্শন সূচক প্রস্তর ময় বৃহৎ প্রাসাদের নানা কারুকার্য্যযুক্ত ভগ্নাবশেষ নগরবক্ষে এবং নগরের অদূরে গিরিশৃঙ্গে স্তূপাকার রহিয়াছে। প্রাচীন বৃহৎ পরিখা ও প্রকাণ্ড সরোবর নগরের বক্ষে ও প্রান্ত-ভাগে বিদ্যমান। অনেকে বলেন এই তেজপুর নগরে বাণরাজার কন্যা উষা দেবীর মন্দির ছিল উহা কত শত বা কত সহস্র বৎসর হইয়াছে কেহই বলিতে পারেন না। ইতিহাসে ও পাওয়া যায় না। যাহা হোক তেজপুর হইতে সেইদিন অপরাহ্ণ ৫ টার পর আমরা গোহাটি নগরে উপস্থিত হই। সেই রাত্রিতে আমাদের বাষ্পীয় পোত গোহাটীর ঘাটেই সংলগ্ন থাকে। আমরা পোত হইতে অবতরণ করি। পণ্ডিত ভারত চন্দ্র ভট্টাচর্য্যের গৃহে সঙ্গীত ও প্রার্থনা হয়। ১৭ই জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্ণে ধুবড়িতে আগমন করি। তথাকার ডেপুটী কমিশনরের শেরেস্তাদার বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ ঘোষের গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিয়া দুইদিন অবস্থান করা যায়। সেই দিন সন্ধ্যার পর যদুবাবুর গৃহে সঙ্গীত ও প্রার্থনাদি হয়। অনেক বন্ধু আসিয়া যোগ দান করিয়াছিলেন। ১৮ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে কয়েকটি বন্ধুকে লইয়া যদুবাবুর আলয়ে উপাসনা হয়। সন্ধ্যার পর তত্রত্য হাই স্কুল গৃহে "প্রকৃত স্বর্গ রাজ্য" বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনর শ্রীযুক্ত বাবু রাম গোপাল খাঁ, অন্যতর একষ্ট্রা এসিষ্টান্ত কমিশনর শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র মজুমদার এবং বকড়ি বাড়ীর সম্ভ্রান্ত জমীদার শ্রীযুক্ত বাবু হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী এবং প্রায় সমুদয় নগরের সম্ভ্রান্ত আমলা উকিল সর্ব্বশুদ্ধ ন্যূনাধিক দেড়শত লোক উপস্থিত ছিলেন। ১৯ শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে ভ্রাতৃবর বাবু যদুনাথ ঘোষ মহাশয়ের গৃহেই উপাসনা হয়। অপরাহ্ণে ডেস্‌প্যাচ ষ্টীমার যোগে গোয়ালন্দে যাত্রা করি। দক্ষিণাভিমুখে ধুবড়ি জেলার সীমা ছাড়িয়া চলিয়া গেলেই বঙ্গদেশে প্রবেশ করিতে হয়। আমরা ২০ শে জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্ণে গোয়ালন্দে আগমন করিয়া সেই দিন রাত্রি যাপন করি। ২১ জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে আমার সঙ্গের বন্ধুটি ষ্টীমারে ঢাকায় যাত্রা করেন, আমি রেইলযোগে কৃষ্ণনগর জিলার সবডিবিজন কুষ্টিয়ায় চলিয়া যাই। মধ্যাহ্ন কালে তথাকার প্রথম মোন্‌সেফ শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশ চন্দ্র গুপ্ত বি, এ, মহাশয়ের গৃহে যাইয়া তাহার সাদর আতিথ্য স্বীকার করি। জগদীশ বাবু একজন ধর্ম্মোৎসাহী উপাসনাশীল লোক, বাঙ্গালি বিচারকদিগের মধ্যে তিনি দৃষ্টান্ত স্থল। আমি তাঁহার সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গ করিয়া বিশেষ সুখী হইয়াছি। চৈতন্যদেবের প্রতি তাঁহার অন্তরের নিগূঢ় টান আছে, বৈষ্ণব ধর্ম্মের অনেক গূঢ়তত্ত্ব তিনি জ্ঞাত আছেন। জগদীশ বাবু সুবিস্তীর্ণ চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ বিশুদ্ধ সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ব্যাখ্যা ও টীকা সহ ক্রমশঃ প্রকাশ করিতেছেন। অচিরেই তাহা সমাপ্ত হইবে। এই মহা কীর্ত্তির জন্য তিনি ভগবদ্ভক্তদিগের বিশেষ ধন্য বাদের পাত্র। তাঁহারই উৎসাহে ও যত্নে কুষ্টিয়ার ব্রাহ্ম সমাজ পুন র্জীবিত হইয়াছে। গত ২৯ শে জ্যৈষ্ঠ মহা সমারোহে এখানে ব্রহ্ম মন্দিরের ভিত্তিস্থাপিত হয়। ভক্তি ভাজন প্রধানাচার্য্য মহাশয় নিজ বদান্যতা গুণে এই মন্দিরের জন্য সহস্র মুদ্রা দান করিয়াছেন। এখানকার সমাজ নিয়ুট্রাল, অর্থাৎ কলিকাতাস্থ মূল তিন সমাজের সঙ্গে যোগ-রক্ষা করিয়া চলিতে ব্যগ্র। ভিত্তিস্থাপনের উৎসব উপলক্ষে ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, তাঁহার জন্য পাথেয়ও প্রেরিত হইয়াছিল। আমিও উৎসবে থাকিতে অনুরুদ্ধ হইয়াছিলাম, নানা কারণে উৎসবের ২।৩ দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় চলিয়া যাইতে বাধ্য হই। ২১ শে জ্যৈষ্ঠ রাত্রিতে মোন্‌সেফ বাবুর গৃহে সৎ প্রসঙ্গ সঙ্গীত ও প্রার্থনা হয়। ২২ শে রবিবার কুষ্টিয়ার সমাজগৃহে সমা-জিক উপাসনা হইয়াছিল। ৭।৮ জন ব্রাহ্ম বন্ধু উপস্থিত ছিলেন। "জীবন্ত উপাসনা" বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। সেই দিন অপরাহ্ণে মোন্‌সেফ বাবু আমাকে ও তত্রত্য অপর দুইজন ব্রাহ্ম বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া গোড়াই নদীতে নৌকা যোগে প্রায় একক্রোশ দূরে সাওড়া গ্রামে লালন সাহ নামক ফকিরের আস্তানায় উপস্থিত হন। ফকিরের বয়ঃক্রম নাকি এক শত সাত বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। তাঁহার ও তাঁহার শিষ্য বর্গের বেশ পরিচ্ছদ ও আচরণ বৈষ্ণব বাউলের ন্যায়। তাঁহারা কৌপিন ও বহির্ব্বাস পরিধান করেন, মস্তকের মধ্যস্থানে কেশপুঞ্জ জড়াইয়া বাঁধেন। গোঁপ শ্মশ্রুধারণ করেন। মোসলমানের মত আচরণ তাহাদের কিছুই নাই তাঁহারা নমাজ রোজার ধার ধারেন না। জীব হিংসা করেন না। একমাত্র নিরাকার ঈশ্বর মানেন। তাঁহাদের একজন একটি উর্দ্দু বচন পড়িলেন। তাহার ভাব এই যে, মোসলমানি ও হিন্দুয়ানি পরিত্যাগ কর, কোরাণ পুরাণ জলে ফেলিয়া দাও, এক মাত্র ঈশ্বরকে ভজনা কর। লালন শাঁইজি কুমার, তিনি কখন বিবাহ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার আশ্রমে তাঁহার ও তাঁহার শিষ্যবর্গের পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত অনেক স্ত্রীলোক আছে দেখিতে পাওয়া গেল। ফকির এই ক্ষণ জরা দৌর্ব্বল্য বশতঃ চলিতে ফিরিতে অক্ষম, কিন্তু ঘোঁড়ার উপর চড়াইয়া দিলে ঘোঁড়া চালাইয়া দূরের পথও যাইতে পারেন। শুনিলাম নানাস্থানে তাঁহার প্রায় হাজার শিষ্য, সকলই নিম্ন শ্রেনীর মোসলমান। সে দেশের

সাধারণ লোক মাত্রই ফকির লালনশাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করে। মোনসেফ বাবু তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্, তিনিও মোনসেফবাবুকে অতিশয় আদর শ্রদ্ধা করেন। ফকির আমাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন আমরা কয়েক ঘণ্টা বসিয়া তাঁহার সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করিলাম। তাঁহার কথায় বুঝা গেল যে তিনি কোন প্রণালীও নিয়ম অনুসারে সাধন ভজন করেন না। ধ্যানযোগে অন্তরে বাহিরে ঈশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করা তাঁহার জীবনের কার্য্য। তাঁহার মত খুব উদার. তিনি কোন ধর্ম্মের নিন্দা করেন না, কোন বিশেষ ধর্ম্ম সম্প্রদায় ভুক্ত হইতেও প্রস্তুত নহেন। সকল সম্প্রদায় হইতে সত্য গ্রহণ করিতে উৎসুক। লেখাপড়া জানেন না, অথচ জ্ঞান বেশ মার্জ্জিত ও পরিষ্কার। সেই সময় স্থানান্তর হইতে দুই জন মৌলবি সেই গ্রামে লালনশার সঙ্গে বিচার করিতে আসিয়াছিলেন। পরে বিচার হইয়াছে কিনা জানি না। কথোপকথনের পর আমাদের অনুরোধ মতে ফকির স্বীয় দুই তিন জন সহচর সঙ্গে মিলিত হইয়া ডগ্‌গি ও মন্দিরা যোগে বৈরাগ্য বিষয়ক ৩।৪ টী সঙ্গীত করিলেন। গানগুলি তাঁহারই রচিত। সঙ্গীত হইলে পরে আমরা কুষ্টিয়ায় ফিরিয়া আসি। মোন্‌সেফ বাবু লালনশার জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। অনেক লোক উক্ত ফকিরকে টাকা পয়সা দান করিয়া থাকে, তিনি তাহা সঞ্চয় করিয়া রাখেন না। সময়ে সময়ে বিশেষ ভোজোৎসবের নিমন্ত্রণ করিয়া শত সহস্র লোককে তৃপ্তি পূর্ব্বক ভোজন করান। ফকির খর্ব্বকায় ক্ষীণাঙ্গ, কিন্তু মুখ মণ্ডল প্রফুল্ল ও প্রদীপ্ত।

ক্রমশঃ

সংবাদ।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, ঢাকা হইতে তাঁহার পূজনীয়া জননীকে দেখিতে নিজ জন্ম ভূমী পাঁচদোনায় গমন করেন, তথায় নিজ গৃহের সিঁড়ি দিয়া আসিবার সময় দক্ষিণ পায়ে অত্যন্ত আঘাত পাইয়া প্রায় ৩ সপ্তাহ শয্যাগত হইয়াছেন। বেদনা অনেক কম পড়িয়াছে। একটু বিশেষ হইলে তিনি ঢাকায় আসিবার মনস্থ করিয়াছেন।

ভাই গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় কয়েক দিবসের জন্য রংপুর ও কুড়িগ্রামে প্রচার করিবার জন্য আসিয়াছেন। উভয় স্থানে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া শীঘ্র কুচবিহার যাত্রা করিবেন।

আমাদের ভ্রাতা লক্ষ্মণচন্দ্র পাণ্ডা বহরমপুর প্রদেশে গমন করিয়াছেন, তথায় নববিধান আশ্রিত ব্রাহ্মভ্রাতাদের সহিত যোগ দিয়া কয়েক দিন উপাসনা সংকীর্ত্তন এবং কথকতা দ্বারা তিনি বেশ উৎসাহের সহিত বিধানের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন। তাঁহার তথাকার কার্য্য বিবরণ জনৈক স্থানীয় বন্ধুর নিকট হইতে আমরা পাইয়াছি। আমাদের ভ্রাতা শীঘ্রই ভাগলপুর যাইবেন।

ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত বিগত ২৯ শে আষঢ় তারিখে উলুবেড়িয়ার অঞ্চলে গমন করিয়াছেন। তাঁহার ঘাঁটাল বাটুল প্রভৃতি কয়েকটি পল্লিগ্রামে যাইয়া প্রচার করিবার ইচ্ছা আছে। দয়াময় ঈশ্বর আমাদের ভ্রাতার সাধুইচ্ছা পূর্ণ করুন। যে সকল পল্লিগ্রামে আমাদের বিধান ধর্ম্ম কিছুই প্রচারিত হয় নাই, সে সকল স্থানে প্রচার করানিতান্তই প্রয়োজন হইয়াছে।

হিমালয় ব্রাহ্মসমাজের দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক উৎসব গত ২লা জুলাই তারিখে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ভাই উমানাথ গুপ্ত তথাকার কার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমারা ইচ্ছা করি, আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ ভাই কিছু দিন উক্ত শৈলশিখরস্থ সমাজে থাকিয়া নিজের এবং তথাকার ভ্রাতা দিগের আত্মার কল্যাণ সাধন করেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রচারবিভাগের ত্রৈমাসিক আয় ব্যয় বিবরণ।

এপ্রেল, মে, জুন ১৮৮৮।

আয়।

মাসিক দান সংগ্রহ	...	৩৬৩৸৹
এককালীন দান	...	২৪৲
শুভ কর্ম্মে দান	...	২৭৲
পাথেয়	...	২৪৫৷৶১০
ক্ষুদ্র আয়	...	১৶৹
পুস্তক বিক্রয়	...	১১৲৷৫
ঋণ শোধ জন্য সাহায্য	...	১০০৲
ধর্ম্মতত্ত্ব	...	৭১৷৶৹
পরিচারিকা	...	৩১৸১৫
ভাই প্যারীমোহন চৌধুরীর বিবাহের সাহায্য		১৪৫৲
রবিবাসরীয় বিদ্যালয়	...	১০৲
	সমষ্টি—	১১৩১৷৶১০

ব্যয়।

প্রত্যহ গড়ে ৪০ জনের চাউল, কয়লা, আটা, বাজার শিশুদের জন্য দুগ্ধ প্রভৃতিতে	...	২৪৪৶৹
বস্ত্র ও বিনামা	...	১৩৷৹
রোগীদিগের ঔষধ ও পথ্য	...	২০৲
মন্দিরে, যাওয়াতে গাড়িভাড়া	...	২৷/৹
ক্ষুদ্র ব্যয় পুস্তক প্রভৃতি পাঠাইতে	...	১৩৷৶৫
রাঁধুণী, ধোপ, বেহারা, প্রভৃতির বেতন	...	৪৮৷১৫
পাথেয়	...	২২৩৷১৫
আফিস বাটী ভাড়া	...	২৭৲
অপরের পুস্তকের গচ্ছিতশোধ	...	৩৲
পুরাতন ঋণ শোধ	...	১৫০৲
উৎসব উপলক্ষে	...	১৷/৹
বাটী মেরামতি (চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় দং কাং)		৮৲
মুদ্রাঙ্কন ব্যয় (পুস্তক ও পত্রিকার জন্য)		১৩০৲
ধর্ম্মতত্ত্ব (কাগজ ও মাসুল)	...	৭৫৶১০
পরিচারিকা ঐ ঐ	...	২২৸৴৫
কাগজ খরিদ (পুস্তকের জন্য)	...	১৩৷৹
ভাই প্যারীমোহনের বিবাহের মোটখরচ		১৫০৴৫
ট্যাক্স (মিউনিসিপাল)	...	২৩৸৶৫
	সমষ্টি—	১১৬১/৹

দাতা দিগের নাম ইংরাজী পত্রিকায় প্রতিমাসে প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া পুনরায় আর এই হিসাবের সহিত দেখান হইল না।

কলিকাতা। ১০ই জুলাই ১৮৮৮। } দাস শ্রীকান্তিচন্দ্র মিত্র। কার্য্যাধ্যক্ষ।

এই পত্রিকা ৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২৩ ভাগ। ১৪ সংখ্যা। | ১৬ই শ্রাবণ, সোমবার, ১৮১০ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২॥০ মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে বিশ্বাসীজনের ঈশ্বর, একবার তুমি আমাদিগের মধ্যে স্বর্গের বিশ্বাস লইয়া অবতরণ কর। অবিশ্বাসে মানুষের মৃত্যু, অবিশ্বাসে পাপে পতন, অবিশ্বাসে হতাশ হইয়া আত্মহত্যা চিরকাল করিয়াছে; বল প্রভো, তাহা আমাদিগের মধ্যে কেন ঘটিবে না? তীক্ষ্ণ অস্ত্র মাথার উপরে উপস্থিত, এই প্রাণ যায়, এই প্রাণ যায়, এ অবস্থায় যদি বিশ্বাস অটল না রহিল তবে, নাথ, তাহাকে কি বিশ্বাস বলা যাইতে পারে? তোমার বিধানবাদিগণের আর সকলই থাকিলে থাকিতে পারে, বিশ্বাসের ভাগ যে বড় অল্প, তা দিন দিন স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে। বিভো, যদি আমাদিগের তীব্র বিশ্বাস থাকিত, আমরা কি তোমায় ছাড়িয়া সংসারের দিকে ফিরিয়া তাকাইতাম, তোমার বিধি ব্যবস্থা সকলের উপরে আস্থাশূন্য হইতাম? আমরা সকলেই অবিশ্বাসের ফল ভোগ করিতেছি, অথচ দেখ আমাদিগের একটুও চেতনা নাই। যাঁহারা আমাদিগের বন্ধু ছিলেন, তাঁহারা আমাদিগের প্রতি বিমুখ হইলেন, এমন কি এখন আমাদিগের নিন্দাবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহারা দুঃখিত হন না, বরং এই বলিয়া আহ্লাদ করেন, যেমন কর্ম্ম তেমন ফল। কারণ না থাকিলেও লোকে আমাদিগের চরিত্রের উপরে কলঙ্কারোপ করিতেছে; আমাদিগের আচার ব্যবহারকে পাপের সহচর বলিয়া গণনা করিতেছে, যেখানে পবিত্রতা সেখানে অপবিত্রতা দর্শন করিতেছে। হে বিধানপতি, এ সকল আর কিছুই নয়, আমাদিগের অবিশ্বাসের প্রতিফল। আমরা এখন ঘোর পরীক্ষায় পড়িয়া আর যে কাহারও উপরে দোষারোপ করিব তাহার উপায় নাই। যখন তুমি স্পষ্ট দেখাইতেছ, এ সকল অবিশ্বাসের ফল, তখন অমুক অমুক আমাদিগকে বৃথা আক্রমণ করিল, অন্যায়রূপে দোষারোপ করিল, গ্লানি করিল, এ কথা বলিয়া আর কি করিব? যখন সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অবিশ্বাসরূপ পাপ করিয়াছি, তখন যদি লোকে চোর বলে ডাকাইত বলে ব্যভিচারী বলে তাহাতে আর একটা বেশি নিন্দা কি হইল? অবিশ্বাস তোমার বিরুদ্ধে ব্যভিচার, তদপেক্ষা বল আর কি মহাপাপ হইতে পারে, তাই করযোড়ে বিনীতভাবে, আমরা তোমার নিকটে প্রার্থনা করিতেছি, হে জগৎপতি, বিধানপতি, তুমি বিশ্বাস লইয়া আমাদিগের হৃদয়ে অবতরণ কর। আবার যদি আমরা বিশ্বাসে জাগ্রৎ হইয়া উঠি, তবে এ সকল পরীক্ষা, সূর্য্যের উদয়ে যেমন কুজ্ঝটিকা তৎক্ষণাৎ পলা-

য়ন করে, তেমনি পলায়ন করিবে, আমরা জয় শব্দ করিয়া সকলে জাগিয়া উঠিব। বুঝিয়াছি, নাথ, আর বিশ্বাস ভিন্ন আমাদিগের এ ঘোর পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় নাই। আমাদিগকে সেই বিশ্বাস দাও, বিশ্বাস দিয়া পুনর্জ্জীবিত কর এই তব পাদপদ্মে বিনীত ভিক্ষা।

আশ্চর্য্য চিকিৎসালয়।

এ সংসার একটি প্রকাণ্ড চিকিৎসালয়। এখানে কেবল দেহের রোগের চিকিৎসা নিয়ত চলিতেছে তাহা নহে, এখানে মানসিক রোগের চিকিৎসাও প্রতিমুহূর্ত্তে সাধিত হইতেছে। শরীরে যখন রোগের কারণ সঞ্চিত হয়, তখন কাহার সামর্থ্য যে, উহা গোপন করিয়া রাখে? উহা যথাসময় প্রকাশ পাইবেই পাইবে। মানসিক রোগসম্বন্ধেও এ কথা বিলক্ষণ সংলগ্ন হয়। কাহারও মনে করা উচিত নয়, মন যেমন অদৃশ্য, তাহার রোগও তেমনি অদৃশ্য; সুতরাং মনের রোগের বাহিরে প্রকাশ অসম্ভব। মন অদৃশ্য হইলেও তাহার ক্রিয়া যেমন আমরা সকলেই স্পষ্ট দেখিতে পাই, তেমনি সেই ক্রিয়াতেই আবার মনের রোগ প্রকাশ হইয়া পড়ে। প্রতি দিন মানুষের মনের রোগ তাহার প্রতিবেশীর নিকটে প্রকাশ পাইতেছে, কিন্তু তাহারা মনে করে যে, শরীরের রোগের চিকিৎসা আছে, কেন না তৎসম্বন্ধে চিকিৎসক বিরল নহে, কিন্তু মনের রোগের চিকিৎসা কিছুতেই হইতে পারে না। এই ভ্রম নিবারণের জন্য আমরা আশ্চর্য্য চিকিৎসালয়ের কথা বলিতেছি। রোগ আছে, তাহার চিকিৎসা নাই, ইহা অসম্ভব কথা। মনের রোগের কি বাস্তবিকই চিকিৎসা হইতেছে, একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

শরীর ক্ষণধ্বংসী, তাহার চিকিৎসা এত সত্বর চাই যে, সহজেই চিকিৎসার বিশেষ আড়ম্বর ঘটিয়া থাকে। যেখানে আড়ম্বর অধিক সেখানে সকলেরই মনে হয় যে, অমুকের রোগের বড়ই চিকিৎসা হইতেছে। এ বাহ্য আড়ম্বরের আরও কারণ আছে। জড় শরীরের চিকিৎসার আয়োজন জড়বস্তু লইয়া। সুতরাং সেই সকল আয়োজন দেখিয়া লোকে মনে করে বেশ চিকিৎসা চলিতেছে। মন অজড়, তাহার চিকিৎসা জড় পদার্থ দ্বারা হইবার সম্ভাবনা নাই। তবে যে সময়ে সময়ে মনের চিকিৎসা চিকিৎসাশাস্ত্রে জড় ঔষধ দ্বারা সাধিত হইবার কথা লিখিত আছে, উহা মনের চিকিৎসা নহে, শারীরিক স্নায়ুর চিকিৎসা, যথার্থ মনের চিকিৎসা, মন যেমন অদৃশ্য তেমনই অদৃশ্য, তবে ফলের দ্বারা চিকিৎসা প্রত্যক্ষ হয়। এ রোগের চিকিৎসক স্বয়ং ঈশ্বর মনুষ্য নহে, এই জন্য চিকিৎসকও অদৃশ্য, অদৃশ্য রাজ্যের সকলই অদৃশ্য, অথচ দৃশ্য অপেক্ষা অদৃশ্য পরম সত্য। কেন না শরীরের যখন নিশ্চয় পতন হইবে তখন কোন চিকিৎসাই কার্য্যকর হয় না। মনের চিকিৎসাসম্বন্ধে তাহা বলা যায় না। মন নিত্যস্থায়ী, তাহার মরণ নাই। মরণ না থাকিলেও রোগ থাকিতে পারে, কিন্তু যিনি এখানে রোগের চিকিৎসক, তিনি যে বিষয়ে যত্ন করেন, তাহাতে তাঁহার অসিদ্ধমনোরথ হইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং তাঁহার হাতে মনের রোগের নিশ্চয় বিরাম হইবে, ইহা নিঃসন্দেহ।

আমরা ঈশ্বরকে চিকিৎসক বলিয়া বিশ্বাস করি, এ জন্যই এ সংসারকে চিকিৎসালয় বলিয়াছি। এই চিকিৎসালয় বাস্তবিকই আশ্চর্য্য চিকিৎসালয়। এখানে সকলেই চিকিৎসকের অধীনে আছেন, ছেদ ভেদ প্রভৃতি গুরুতর গুরুতর চিকিৎসার অঙ্গ সকল এখানে প্রতিনিয়ত চলিতেছে, অথচ রোগী চিকিৎসকের হস্ত দেখিতেছে না, কে যে চিকিৎসিত হইতেছে বুঝিতে পারিতেছে না। সে যেন নিয়ত 'ক্লোরফরমে' অচেতন হইয়া আছে। এই 'ক্লোরফরমের' শাস্ত্রীয় নাম মোহমদিরা। যাঁহারা শরণাপন্ন

হইয়াছেন, চিকিৎসক বুঝিতে পারিয়াছেন। ইহাদিগকে ক্লোরফরম না করিয়াই চিকিৎসা করা যাইতে পারে, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে যে, সকল ছেদ ভেদ প্রভৃতি চিকিৎসাক্রিয়া হইতেছে, তদ্দ্বারা রোগের উপশম বুঝিয়া তাঁহারা চিকিৎসককে ধন্যবাদ দিতেছেন। আমরা দেখিতেছি, আমাদিগের আত্মার অঙ্গে মারাত্মক ক্ষতবিশেষ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া চিকিৎসক সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রতিনিমেষে চালনা করিতেছেন, তাহাতে ঘোরতর ব্যথা ও যন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে। দুর্ব্বলতা-নিবন্ধন আমরা উচ্চরবে রোদন করিতেছি, কখন কখন অল্প বিশ্বাস নিবন্ধন এ রোগ হইতে আর অব্যাহতি নাই বলিয়া হতাশ হইতেছি। রোগের যন্ত্রণা, তদুপরি শস্ত্রচালনার যন্ত্রণায় অধীর হইয়া আমরা চিকিৎসককে ভুলিয়া যাই, তাই বিশ্বাসহীন হইয়া বলি, এ রোগ হইতে বিমুক্তি অসম্ভব। কিন্তু যখন চেতনা আইসে, তখন হায় কি অপরাধ করিলাম, যে চিকিৎসকের যত্ন কোন দিন বিফল হইতে পারে না, তাঁহাকে অবিশ্বাস করিলাম, এই বলিয়া মহান্ অনুতাপ করি। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা রোগ বা শস্ত্রাঘাতের যন্ত্রণায় একবারও মুখে অবিশ্বাসের কথা আনেন না, অতি বিশ্বস্তচিত্তে চিকিৎসকের উপরে সকল ভার রাখিয়া দিয়া সুস্থমনা থাকেন।

আমাদিগের বিধানমণ্ডলী মধ্যে এ সময়ে গুরুতর ক্ষতরোগের চিকিৎসা চলিতেছে। আমরা সকলেই এখন এই চিকিৎসার জন্য দল বান্ধিয়া চিকিৎসালয়ে আছি। এত বৎসর আমাদিগের মধ্যে যে সকল রোগের কারণ সঞ্চিত হইয়াছে, সেই সঞ্চিত কারণ হইতে মহাক্ষত সমুপস্থিত। এই যে কয়েক বৎসর যে ঘোরতর বিপ্লাবন চলিতেছে, তাহা ছেদ ভেদরূপী গুরুতর শস্ত্র চিকিৎসা। চারিদিকে ত্রাহি ত্রাহি শব্দ উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে যাঁহারা 'ক্লোরফরমের' যোগ্য তাঁহারা অচেতন হইয়া আছেন, অথচ তাঁহাদিগের উপরেও সমানে চিকিৎসা চলিতেছে। ও ছেদ ভেদ এমনই যন্ত্রণাদায়ক যে এমন লোক অতি অল্পই দেখা যায় যাঁহারা রোগ ও শস্ত্রাঘাতের যন্ত্রণায় চিকিৎসককে ভুলিয়া না গিয়াছেন। তাই অনেক রোগীর মুখে নিরাশার কথা, অবিশ্বাসের কথা পুনঃ পুনঃ বাহির হইতেছে। এমন কি যন্ত্রণার আঘাতে অধীর হইয়া কখন কখন রোগী এ কথাও বলিতেছে, এবার চিকিৎসক আমাদিগের এ রোগের নিকট হারিয়া গেলেন, আর তাঁহার ক্ষমতায় কুলাইয়া উঠিল না। রোগের যন্ত্রণাই হউক, শস্ত্রাঘাতের তীব্র ব্যথাই হউক, এরূপ অবিশ্বাস ক্ষমার যোগ্য নহে বলিয়া আমরা একান্ত ভীত হইয়া পড়িয়াছি। সুখের সময়ে সুস্থতার সময়ে কখন মানবাত্মার বিশ্বাসের পরীক্ষা হয় না, রোগের সময়ে, যন্ত্রণার সময়ে দুঃখের সময়েই হয়। এই প্রবল বিশ্বাসের পরীক্ষার সময় যদি আমরা অল্পবিশ্বাসী হইয়া চিকিৎসককে বলি, ঠাকুর, আর তোমার দ্বারা কিছু হইয়া উঠিল না, তাহা হইলে যে আমাদিগের ঘোর সর্ব্বনাশ। সকল নরক অপেক্ষা অবিশ্বাসের নরক অতি ভয়াবহ। আমাদিগের সে নরকে যেন কখন পতন না হয়, এ প্রার্থনা যেন নিরন্তর আমাদিগের সকলের অন্তরে থাকে।

সমুদ্র-মন্থন।

"সমুদ্র-মন্থন" কথাটি অতি পুরাতন অন্বেষণ করিলে ইহাতে নূতন সামগ্রীও প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরাণে সমুদ্র মন্থনের যে ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা এইরূপ—পূর্ব্বে দেবগণ মরিতেন, কিন্তু অসুরেরা মরিলেও আবার শুক্রাচার্য্যের প্রসাদে পুনর্জ্জীবিত হইত। এই কারণে দেবগণ আসুরিক অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া ভক্তবৎসল ভগবানের শরণাপন্ন হইলেন এবং সমুদয় দুঃখ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন, ভগবান দেবতাদিগের দুঃখের কারণ অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, "হে দেবগণ! তোমরা সমুদ্র মন্থন

করিয়া অমৃত উৎপাদন কর, সেই অমৃত পান করিলে আর মৃত্যু ভয় থাকিবে না কিন্তু সমুদ্র মন্থন করা শুদ্ধ তোমাদিগের বলে হইবে না, অসুরদিগের সঙ্গে যোগ রক্ষা করা আবশ্যক। অসুরদিগের সঙ্গে মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন করিলে নিশ্চয় অমৃত লাভ হইবে কিন্তু অসুরেরা সে অমৃত পাইবে না। আমি এমন কৌশল করিব যাহাতে অসুরেরা অমৃতপানে বঞ্চিত হয়।" তৎপর অসুরদিগের সাহায্য লইয়া দেবগণ সমুদ্র মন্থন করিলেন, এবং অমৃত পান করিয়া অমরত্ব লাভ করিলেন।

এই প্রস্তাবের বাহ্যপ্রকৃতি যেরূপ, ইহার আভ্যন্তরিক ভাব সেরূপ নহে। ইহার প্রকৃত রহস্য ভেদ করিতে হইলে মনুষ্য জীবন বা মনুষ্যত্বের প্রতি মনোযোগ প্রদান করিতে হয়। যদি মনোযোগ দেওয়া যায় তাহা হইলে জানা যায় যে, উচ্চাবচ ভাব সকলের সমন্বয়ের নাম মনুষ্যত্ব। একদিকে দেবত্ব অন্যদিকে আসুরিকতা এই উভয়ের অবিরুদ্ধভাবে স্থিতি বা কার্য্য সাধনের নাম মনুষ্যজীবন। যাহাকে দেবত্ব বলা যায়, তাহা মনুষ্যত্ব নহে, এবং পশুত্ব বা বা আসুরিকত্ব ও মনুষ্যত্ব নহে কিন্তু উভয়ের সাম্যাবস্থাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি বৃত্তিকে আসুরিকতা বলাযায়, কেন না এ সকল বৃত্তি প্রতিনিয়ত পাপের দিকেই আকর্ষণ করে। আর জ্ঞান প্রেম ভক্তি ও তপোনিষ্ঠা প্রভৃতিকে দেবত্ব বলা যায়, কেন না ইহারা প্রতিনিয়ত স্বর্গের দিকে আকর্ষণ করে। যখন কাম ক্রোধাদি কর্ত্তৃক জ্ঞান প্রেমাদি পরাজিত হয় তখন দেবগণের মৃত্যু ও অসুরগণের জয় হয়, আবার জ্ঞান প্রেম ভক্তি প্রভৃতি বর্দ্ধিত হইয়া যখন মানুষকে কেবল ধ্যান মননে নিযুক্ত করে এবং সাংসারিক অন্য সমুদয় কার্য্য হইতে বিরত করে তখন দেবগণের জয় অসুরগণ নির্জ্জিত হইয়া থাকে। এই দ্বিবিধ অবস্থার একটিও মনুষ্যত্ব নহে। যখন অসুরগণ কর্ত্তৃক দেবগণ পরাজিত হয়, তখন পুণ্যের ক্ষয় ও পাপের বৃদ্ধি হইতে থাকে। দেবগণ প্রবল হইয়া অসুরদিগকে উপেক্ষা অনাদর করিলেও প্রকৃত প্রাপ্য হস্তগত হইবার বিঘ্ন জন্মে। কামাদি শারীরিক বৃত্তি মিলিয়া সংসার রচনা করিয়াছে। এই কামাদিকে অনিয়মিত ভাবে চলিতে দিলে কেবল পাপের আতিশয্য হইবে তৎপক্ষে সংশয় নাই; কিন্তু ইহাদিগকে নিয়মিত করিয়া ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন হইয়া চলিতে পারিলে ঐ সকল নীচ বৃত্তিই স্বর্গের পথে সাহায্য দান করে। মানুষের শরীর আছে, ইন্দ্রিয় আছে হস্তপদাদি উপকরণ আছে। ইহাদিগকে নিয়ত উপেক্ষা করাই যদি আমাদিগের জীবন হইত, ইহারা কদাচ জীবনের সঙ্গে গ্রথিত হইয়া থাকিত না। যখন ইহারা আছে তখন স্বর্গের পথে ইহাদিগের প্রয়োজন আছে মানিতে হইবে। আবার প্রয়োজন আছে বলিয়া ইহাদিগকে উচ্ছৃঙ্খল ভাবে ছাড়িয়া দিলেও ইষ্ট সাধনের ব্যাঘাত ঘটিবে। এই অনিষ্টাপাত নিবারণ করিয়া ইহাদিগের দ্বারা ইষ্ট সাধন করিয়া লইবার জন্য মানুষকে জ্ঞান বুদ্ধি প্রভৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। অশ্ব সুশিক্ষিত হইলে এবং যন্তা হইয়া তাহাকে চালাইতে পরিলে অশ্বদ্বারা বহু উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায় কিন্তু সাবধান হইয়া শিক্ষা না দিলেও সেই শিক্ষানুসারে না চালাইতে পারিলে সে অশ্ব মৃত্যুমুখে নিক্ষিপ্ত করিয়া চলিয়া যায়। অগ্নি দ্বারা কার্য্য সাধন করিয়া লইতে হইলে অগ্নিকে অতি সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়, না করিলে গৃহদাহ দেহদাহ সকলই সম্ভব।

আমরা যাহা বলিলাম তাহা দ্বারা "সমুদ্র-মন্থন" ইহার কোন অর্থ হইল কি না বিবেচনা করিয়া দেখা আবশ্যক। "সমুদ্র-মন্থনের" অর্থ হইয়াছে, মানুষের জীবন সমুদ্র, এই সমুদ্রে অমৃত (বিশ্বাস) আছে, মন্থন করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অমৃত হস্তগত হইলে মনুষ্য মৃত্যু ভয় হইতে বাঁচিতে পারে। কিন্তু অসুরগণের সাহায্য না পাইলে "সমুদ্র মন্থন" হইবে না। মনুষ্য

জীবনের সৎপ্রবৃত্তি সকল দেবতা, অসৎপ্রবৃত্তি সকল অসুর। চণ্ডালস্পর্শে যেমন ব্রাহ্মণ মরে তেমনি অসুর সংস্পর্শে দেবতা মরে কিন্তু দেব-সংস্পর্শে অসুর মরে না। দেবতাদিগের এই সহজ মৃত্যু নিবারণ করিবার জন্য অমৃতের (বিশ্বাসের) প্রয়োজন, আসুরিক বলের আনুকুল্য ব্যতীত সে অমৃত লাভ করা যায় না। শরীর আছে বলিয়া ইন্দ্রিয় সকল আছে বলিয়া দয়াময় ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষরূপে দেখিতে পাই, বুঝিতে পারি। চক্ষুর দৃষ্টি শক্তি, কর্ণের শ্রবণ শক্তি, মনের চিন্তাশক্তি সকলের মূলে তিনি প্রত্যক্ষ বিদ্যমান রহিয়াছেন এইটি নিশ্চিতরূপে জানা বিশ্বাস। এই বিশ্বাস ক্রমে ক্রমে উজ্জ্বল হয়, প্রথমতঃ অনুমান, তার পরে বোধ, তার পরে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হয়। তিনি আছেন, না থাকিলে এসংসার আছে কিরূপে এটি অনুমান। শব্দ স্পর্শরূপ রসাদির সঙ্গে তাঁহার অনুভূতির নাম তাঁহার বোধ। আর এই যে আমার নিশ্বাসের ভিতর দিয়া তাঁহার নিশ্বাস, পড়িতেছে—এই যে হৃৎপিণ্ডের ভিতরে রক্ত স্রোতের মধ্যে হরি আমার সন্তরণ করিতেছেন এইরূপ নির্ব্বাচনের নাম প্রত্যক্ষ। এইরূপ প্রত্যক্ষ দর্শনই বিশ্বাস, এই বিশ্বাসকেই অমৃত বলা যায়। যেরূপ অবস্থায় মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাতে কামক্রোধাদির সাহায্য না পাইলে এই বিশ্বাসরূপ অমৃত প্রাপ্ত হইবার অন্য উপায় নাই। অতএব জীবন সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত লাভ করিতে হইলে অসুর সকলকে সৎপরামর্শ দ্বারা, বাধ্যতা দ্বারা বশে আনিতে হইবে, তবে ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা। অসুরগণ অনুকূল না হইলে জীবন সমুদ্র মন্থন হইবে না, অমৃত ও লাভ হইবে না মৃত্যু ভয়ও ঘুচিবে না। কিন্তু এই সমুদ্র মন্থনের ভাব জীবনে সহসা উদিত হয় না। মানুষ নিজের বুদ্ধিতে রিপু দিগের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করিয়া অমৃতোৎপাদন করিতে পারে না। সে প্রথমতঃ সংসারে আসিয়া অসুরদিগের নিকট পরাজয় স্বীকার করিয়া যথা সর্ব্বস্ব হারায়। অসুরেরা বলপূর্ব্বক সমুদয় দেবভূমি অধিকার করিয়া বসে। অনেক দিন আসুরিক অত্যাচার সহ্য করিয়া পরিশেষে চেতনা লাভ করে। তখন দুঃখ শোকে অধীর হইয়া ভক্তবৎসল ভগবানের শরণাপন্ন হয় এবং তাঁহার নিকটে কাতর চিত্তে উপায় জিজ্ঞাসা করে। ভগবান তখন দেবতাদিগের দুঃখ মোচনের জন্য সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত উৎপাদন করিতে পরামর্শ দেন, এবং অসুরদিগকে বশীভূত করিতে বলিয়া দেন। এবং ইহাও বলেন "এই রূপ করিতে পারিলে আমি তোমাদিগের সহায়তা করিব।"

কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে "তুমি মনুষ্য হইয়াছ কি জন্য? তাহা হইলে কি উত্তর দিবে চিন্তা করিয়া স্থির করা আবশ্যক।" "মনুষ্য হইয়াছ কি জন্য" ইহার উত্তরে "কামক্রোধাদির বশীভূত হইয়া পশুবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য" ইহা কদাচ বলিতে পারিবে না। অথবা "কামাদিকে বিনাশ করিয়া নির্ম্মূল করিয়া দেববল সঞ্চয় করিবার জন্য" ইহাও বলিতে পারিবে না। কেন না কামাদিকে একেবারে বিনাশ করা শরীর থাকিতে অসম্ভব। তাদৃশ চেষ্টা দ্বারা কালে বিপরীত ফল হস্তগত হয় কিন্তু ইষ্ট লাভ কদাচ হইতে পারে না ইহা পরীক্ষিতই আছে। সুতরাং বলিতে হইবে "আমি মানুষ হইয়াছি দেবতা ও অসুরে সমন্বয় করিবার জন্য অসুরদিগের আসুরিক ভাব দূর করিয়া দেবতাদিগের আনুগত্য করিতে শিক্ষা দিবার জন্য।" সমুদ্র মন্থনের এই রহস্য নববিধানের প্রসাদে জগতে প্রচারিত হইয়াছে। নববিধান অভ্যুদিত হইয়া বলিয়াছেন যে স্ত্রী পুত্রাদি পরিবার গৃহ বিত্ত দাস দাসী জ্ঞাতি বন্ধু প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যগামী হইলে প্রকৃত ধর্ম্মসাধন হইবে না। প্রকৃত সাধন করিয়া অমৃত লাভ করিতে চাহিলে সংসারে থাকিয়া সমুদ্র মন্থন করিতে হইবে। অতএব আমি যদি এই বিধি প্রতিপালন করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে পারি, তবে

আমার নববিধানে বিশ্বাস সপ্রমাণ হইবে। এ উপদেশ, এ বিধির প্রতি উপেক্ষা করিয়া যদি আসুরিক বলের আনুগত্য করি, তাহাদিগকে আমার বশীভূত না করিয়া যদি আমি তাহাদিগের হইয়া যাই। তাহা হইলে "আমি প্রেরিত, আমি প্রচারক, আমি সাধক, আমি গৃহস্থ-বৈরাগী ও গৃহস্থ বিশ্বাসী" ইহার একটি কথারও অর্থ হইবে না ও মূল্য থাকিবে না। আমার "কাম ক্রোধাদি" বলা যাইবে না, কেন না "আমি কাম ক্রোধাদির" হইয়া যাইব। আমি কাম ক্রোধাদির হইলে কাম ক্রোধাদিকর্ত্তৃক প্রেরিত হইতে পারি কিন্তু বিধাতাকর্ত্তৃক প্রেরিত ইহা কাহারও নিকটে বলিতে পারি না। এতদিন যে লোকের নিকটে বলিয়াছি, "আমি বিধান বিশ্বাসী বা প্রেরিত" সে কথা মিথ্যা হইবে। লোকের নিকট আমাদিগের মিথ্যাবাদ চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে এবং স্বর্গের দ্বার অবরুদ্ধ থাকিবে। নববিধান স্ত্রী পুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যগামী হইতে নিষেধ করেন এবং স্ত্রী পুত্রাদির বশীভূত হইয়া আত্মহারা হইতেও নিষেধ করেন। উভয়ের সমন্বয়ে সমুদ্র মন্থন ও অমৃত লাভ।

আচার্য্যের উপদেশ।

কলিকাতায় নববিধান।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, রবিবার ১৬ই চৈত্র ১৮০১ শক।

আপনাকে যে বড় জ্ঞান করে সে অহঙ্কারী। অহঙ্কার করিলে পাপ হয়। আপনাকে বড় জানিয়া অপর সকলকে ঘৃণা করিলে নিশ্চয়ই অহংকার পাপ হয়। যে আপনাকে বড় করিতে চায় সে নীচ হয়; কিন্তু যে আপনার ধর্ম্মকে বড় মনে করে না সে পামর। আপনাকে তৃণ অপেক্ষাও নীচ মনে করিবে; কিন্তু আপনার ঈশ্বরের মহিমা অত্যন্ত মহীয়ান্ করিবে। আপনাকে ছোট মনে করা পুণ্য; কিন্তু আপনার ধর্ম্মকে ছোট মনে করা পাপ। যতই আপনাকে ছোট মনে করিবে ততই আপনার ধর্ম্মকে বড় মনে করিবে। আপনাদিগের হীনতা দেখিয়া যদি তোমরা তোমাদিগের ধর্ম্ম এবং তোমাদিগের ঈশ্বরের অবমাননা কর তাহা হইলে তোমরা গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইবে। হে ব্রাহ্মসমাজ, তুমি তোমার ব্রাহ্মধর্ম্মকে সর্ব্বদা মহৎ এবং সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবান্বিত জানিবে। তোমার হাতে স্বয়ং ঈশ্বর এই ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ অমূল্য রত্ন দিয়াছেন ইহা যদি তুমি বিশ্বাস না কর তাহা হইলে তুমি এই রত্নের মূল্য বুঝিতে পার নাই, এবং তুমি যথার্থ সাধু বিশ্বাসী নহ। তুমি অল্পবিশ্বাসী, তোমার বিশ্বাস দৃঢ় হয় নাই, তুমি আপনার ধর্ম্ম আপনি চিনিতে পার নাই। বাস্তবিক অতি অল্প লোক ব্রাহ্মধর্ম্মকে স্বর্গীয় ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করে। ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ইহা অতি শোচনীয় ঘটনা। যদি ব্রাহ্মেরা পূর্ণ বিশ্বাসী হইতেন তাহা হইলে এই দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মমহিমা মহীয়ান্ হইত এবং যে স্থানে প্রথমে এই ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইল সেই স্থানের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইত। এই কলিকাতা নগরে পঞ্চাশ বৎসর গত হইল ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মের আলোক বিকীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু যে বঙ্গভূমিতে এই সত্য ধর্ম্ম প্রচারিত হইল, সেই দেশে ইহার প্রতি অনুরাগ দেখা যায় না। যে নগরে প্রথমে এই ধর্ম্ম অভ্যুদিত হইল সেই নগরই এই ধর্ম্মের প্রতিকূল; কিন্তু এই পঞ্চাশ বৎসর নানা প্রকার প্রতিকূল ঘটনা অতিক্রম করিয়াও ঈশ্বরের ধর্ম্ম প্রবলতর হইয়াছে, ইহা কি বিস্ময়কর ব্যাপার নহে? যে নগরমধ্যে ঈশ্বর প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী এত বড় ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন, সেই নগর এখনও নিদ্রিত রহিল। কবে এই নগর মধ্যে আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মকে মহীয়ান্ এবং জয়যুক্ত করিব? ব্রাহ্মগণ, তোমরা কি বিশ্বাস কর যে তোমরা যে ধর্ম্ম পাইয়াছ এমন ধর্ম্ম আর পৃথিবীতে নাই? যে কলিকাতায় এবং যে সময়ে স্বর্গের এই উৎকৃষ্টতম ধর্ম্ম প্রকাশিত হইল তোমরা কি সেই কলিকাতা এবং সেই সময়কে ধন্যবাদ করিতেছ? যে প্রকারে এই ধর্ম্ম সমস্ত দেশে জয়যুক্ত হইতে পারে তোমরা কি তজ্জন্য প্রাণপণ যত্ন করিতেছ? কলিকাতা ভূমির কি কোন মাহাত্ম্য নাই? যে কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপক সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিলেন সেই স্থানকে কি তোমরা অন্যান্য স্থানের ন্যায় মনে কর? ব্রাহ্মগণ, তোমরা কি এত দূর উদার হইয়াছ যে তোমরা অন্যান্য স্থান এবং কলিকাতাকে সমান জ্ঞান কর? তোমাদের নিকটে জঙ্গল যেমন সহরও তেমনি? কলিকাতায় সর্ব্বাগ্রে সত্য ধর্ম্মবিকাশ হইয়াছে এই জন্য কি কলিকাতা তোমাদের বিশেষ অনুরাগের ভূমি নহে? যদি অন্যান্য স্থান অপেক্ষা তোমরা কলিকাতাকে অধিক ভালবাসিতে না পার, তাহা হইলে তোমরা ব্রাহ্মধর্ম্মের যথার্থ গৌরব বুঝিতে পার নাই। যদি কলিকাতাকে অধিক অনুরাগ দিতে পার তাহা হইলে জানিব যথার্থই তুমি আপ-

নায় ধর্ম্মকে চিনিয়াছ। যদি বল অন্যান্য নগরেও গ্যাসের আলোক, জলের কল, উদ্যান এবং প্রশস্ত রাজপথ প্রভৃতি দেখা যায় তবে কলিকাতা কেন অধিক অনুরাগের স্থান হইবে, তাহা হইলে তুমি কলিকাতার বিশেষ মাহাত্ম্য জান না। আমি উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছি অন্যান্য দেশ যেমন মহানগর কলিকাতা তেমন নহে। আমি কলিকাতার পক্ষপাতী। তোমরা তোমাদের উদারতার পরিচয় দিবার জন্য নিরপেক্ষভাবে সকল দেশকে সমান বলিতে পার; কিন্তু আমার নিকটে কলিকাতা বিশেষ অনুরাগের স্থান। যেখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং নববিধানের অভ্যুদয় হইয়াছে তাহা সাধারণ স্থান নহে। অন্যান্য দেশকে যে ভাবে দেখি কলিকাতাকে সেই ভাবে দেখিতে পারি না। সকল দেশই যদি সমান হইত তবে মানুষ আপনার মাতৃভূমিকে কেন অধিক ভাল বাসে? যে কলিকাতায় আমরা ব্রহ্মপূজা করিতে শিখিলাম, যেখানকার ব্রহ্মমন্দিরে প্রতি রবিবারে সবান্ধবে আমরা ব্রহ্মপূজা করি, যেখানে নূতন নূতন ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে সেই স্থানকে আমরা কিরূপে অন্যান্য স্থানের সমান জ্ঞান করিব? হিন্দুরা বৃন্দাবনকে ঈশাভক্ত খ্রীষ্টানেরা জেরুজিলামকে, মুশলমানেরা মেক্কা মদীনাকে তীর্থ বলিয়া যেরূপ মান্য করে আমরা সেই ভাবে কলিকাতাকে তীর্থস্থান মনে করি না। কলিকাতায় কোন অবতার জন্মিয়াছেন ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। কোন ভয়ানক দানব কিম্বা দৈত্যকুল সংহার করিবার জন্য; কিম্বা কতকগুলি অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া লোক সমাজকে বিস্ময়াপন্ন করিবার জন্য কলিকাতায় কোন অবতার জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ইহা আমরা বিশ্বাস করি না; কিন্তু তথাপি আমরা বিশ্বাস করি কলিকাতা মহৎ এবং পবিত্র স্থান। কলিকাতা কিসে মহৎ ব্রাহ্মগণ, তোমাদিগের ভাবিয়া দেখা উচিত। কলিকাতার ইতিহাসে অলৌকিক কোন কথা শুনা যায় না। এখানে এমন কোন পুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন নাই যাঁহার আজ্ঞাতে সূর্য্য দণ্ডায়মান হইয়াছে অথবা গঙ্গা নদী শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। কোন সাধুপুরুষের জন্মস্থান বলিয়া কলিকাতাকে মহৎ বলিতেছি না. কেন না অন্য অন্য দেশে সাধু পুরুষ অথবা ভাল ভাল লোকের জন্ম হইয়াছে। তবে কলিকাতা সকল দেশ অপেক্ষা কিসে অধিক সৌভাগ্যবিশিষ্ট এবং মহৎ হইল? কোন মনুষ্যের অলৌকিক কীর্ত্তির জন্য কলিকাতা মহৎ নহে; কিন্তু কলিকাতায় সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরের সত্য ধর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে এই জন্য পৃথিবীর অন্যান্য সকল দেশ অপেক্ষা কলিকতা মহৎ। যে দেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে সেই দেশের সঙ্গে অন্য স্থানের তুলনা হইতে পারে না। যে ভূমির ভিতর হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে তাহা সামান্য ভূমি নহে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ঘোরান্ধকার ভেদ করিয়া এখানে যখন নূতন ব্রাহ্মধর্ম্ম সূর্য্য উদিত হইয়াছিল; এই দেশে তখন এক অসামান্য ব্যাপারের সূত্রপাত হয়। সমস্ত লৌকিক আচার ব্যবহার এবং পুরুষ পরম্পরাগত সমস্ত কৌলিক মত সংস্কারকে পদাঘাত করিয়া যখন এক নূতন ধর্ম্ম স্থাপিত হইল তখন কলিকাতায় এক অলৌকিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এবং এই জন্যই কলিকাতা মহৎ। ব্রিটিস্ রাজ্যের প্রধান নগর অথবা সমস্ত পৃথিবী ব্যাপ্ত বিস্তীর্ণ বাণিজ্যের মধ্য বিন্দু বলিয়া কলিকাতা মহৎ নহে। পৃথিবীর প্রধান প্রধান জাতির প্রতিনিধি সকল কলিকাতায় বাস করিতেছেন, এবং বিদ্যা, সভ্যতা, ধনে কলিকাতা উন্নত এই জন্য কলিকাতার সুখ্যাতি করিতেছি না। কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী, কলিকাতা ইউরোপীয় সভ্যতার প্রধান স্থান, প্রত্যেক দশ বৎসরে কলিকাতা শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠতর উন্নতি লাভ করিতেছে, এ সকল কথা বলিয়া অনেকে আহ্লাদ করিতে পারেন; কিন্তু আমাদিগের আহ্লাদের কারণ স্বতন্ত্র। সভ্যতা, বিদ্যা, ধন, জনতা ইত্যাদি বিষয়ে অন্যান্য অনেক দেশ কলিকাতা অপেক্ষাও উচ্চতর উন্নতি লাভ করিয়াছে অতএব এ সকল কারণে আমি কলিকাতাকে মহৎ বলি না। এই হতভাগ্য কলিকাতা কত বিষয়ে নিকৃষ্ট; কিন্তু ইহার প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ কৃপাকটাক্ষপাত হইয়াছে। এই কলিকাতা নগরেই সর্ব্বপ্রথমে স্বর্গ হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রেরিত হইয়াছে। ঈশ্বরের নববিধান সর্ব্বাগ্রে এই কলিকাতা নগরে অবতরণ করিয়াছে। পৃথিবীতে কত কত সভ্য এবং উন্নতদেশ রহিয়াছে, কিন্তু কোন্ দেশ সর্ব্বাগ্রে নববিধানকে গ্রহণ করিবার জন্য মস্তক পাতিয়া দিল? কলিকাতা নানা বিষয়ে হীনাবস্থ হইয়াও আনন্দধ্বনি করিতে করিতে সর্ব্বাগ্রে নববিধানকে গ্রহণ করিল। এত ভাল ভাল দেশ থাকিতে ঈশ্বর বঙ্গভূমির হাতে কেন নববিধান প্রেরণ করিলেন? এই দুঃখী দরিদ্র দেশে কেন সর্ব্বাগ্রে নববিধান আসিল? তুমি ইহার কারণ জান না, মানবসন্তান, আমিও ইহার কারণ জানি না। জানেন কেবল প্রভু ঈশ্বর যাঁহার জ্ঞান দুরবগাহ্য এবং যাঁহার প্রেম গভীর অতলস্পর্শ। পৃথিবীতে অন্যান্য বিষয়ে সৌভাগ্যশালী অনেক দেশ আছে; কিন্তু এই সত্য ধর্ম্মসম্পর্কে এই দেশের যেমন সৌভাগ্য ও উন্নতি দেখিতেছি এরূপ আর কোন দেশের দেখা যায় না। ধন্য দয়াময় ঈশ্বর, যে তিনি কৃপা করিয়া এই কয় জন হতভাগ্য কাঙ্গালীদিগকে তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্টতম ধর্ম্ম দান করিলেন! যাঁহার দয়া অনন্ত তিনি দয়া করিয়া আমাদিগকে এই উচ্চতম ধর্ম্ম দিলেন। তাঁহারই অসীম কৃপাবলে তিনি এই কলিকাতায় আমাদের চক্ষের সমক্ষে নানা প্রকার ধর্ম্মের ব্যাপার ঘটাইলেন। এখানে আমরা কত নূতন নূতন স্বর্গের তত্ত্ব লাভ করিলাম। এখানে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রকাশিত হইল, এখান

হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ হইল, এখানে নববিধানের অভ্যুদয় হইল, এখানে সমস্ত ধর্ম্মের ঐক্য এবং সমুদয় সাধুদিগের সম্মিলন হইল। এখানে আরও কত ব্যাপার হইবে কে জানে? অতএব এইস্থান সামান্য ভূমি নহে। যে ধর্ম্ম সার্ব্বভৌমিক যে ধর্ম্ম সকল ধর্ম্মকে আপনার মধ্যে একীভূত এবং ঘনীভূত করিবে, যে ধর্ম্ম সকল সাধুকে সমাদর করিবে সেই ধর্ম্ম এই কলিকাতায় প্রকাশিত এবং প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহা স্মরণ করিলে কলিকাতাকে পবিত্র ভূমি বলিয়া মনে হয় এবং কলিকাতাকে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে নমস্কার করিতে ইচ্ছা হয়।

কলিকাতা মহানগরি, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি ব্রাহ্মধর্ম্ম এবং নববিধানের জন্মভূমি। তোমার মধ্যে এই নববিধান শিশু সাধুতা এবং বিবিধ সভারত্নে বিভূষিত হইয়া প্রবল হইয়া উঠিবে। হে মহানগরি এখনও তোমার কার্য্য শেষ হয় নাই। এই নববিধান শিশুকে তুমি আরও খাও য়াও পরাও। এখনও এই শিশু দেখিতে ছোট সিংহের ন্যায়, এই ছোট শিশু তেজস্বী পুরুষ হইবে, যখন ইনি বড় হইবেন তখন ইনি সহস্র মুখে ঈশ্বরের গুণ কীর্ত্তন করিবেন। তখন আকাশের চন্দ্র সূর্য্যের সঙ্গে ইহাঁর তুলনা হইবে। নববিধানের প্রভাবে বৃন্দাবন অপেক্ষাও কলিকাতা পবিত্রতর। আমরা কুসংস্কারাপন্ন হইয়া কলিকাতাকে তীর্থ মনে করিতেছি না; কিন্তু কলিকাতা আমাদিগের নিকটে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশের আদি স্থান। যে ধর্ম্ম পৃথিবীর সমস্ত মানব জাতিকে শীতল করিবে কলিকাতায় সেই ধর্ম্মের নূতন নূতন উচ্ছ্বাস হইতেছে। যে নববিধান একদিন সমস্ত পৃথিবীকে চমৎকৃত করিবে তাহা এই কলিকাতায় প্রকাশিত। অতএব কলিকাতা, তোমাকে যে অনাদর করে, সে যে কেবল দেশানুরাগবিহীন তাহা নহে; কিন্তু সে অবিশ্বাসী। দিগ্বিজয়ী কলিকাতা, তোমার গলায় নববিধান রূপ জগচ্চন্দ্র হার পড়িয়াছে, এক দিন সমস্ত পৃথিবী তোমাকে আদর করিবে। ব্রাহ্মগণ, আজও তোমরা কলিকাতার মহিমা বুঝিলে না, শতাব্দী শতাব্দী পরে লোকে কলিকাতার মাহাত্ম্য বুঝিবে। তখন ইউরোপ, চীন, আমেরিকা প্রভৃতি নানা স্থান হইতে লোক সকল পুণ্যভূমি কলিকাতা দর্শন করিতে আসিবে। সহস্র বৎসর পরে কলিকাতার মুখ কত উজ্জ্বল হইবে কে জানে? ভবিষ্যতে যে সকল বাঙ্গালী আসিবেন তাঁহারা কলিকাতার মহিমা বুঝিতে পারিবেন। ব্রাহ্মগণ, ঈশ্বর কলিকাতায় এই পঞ্চাশ বৎসর কত স্বর্গের ব্যাপার দেখাইলেন এই বিষয় যত ভাবিবে ততই তোমাদের মন শুদ্ধ এবং সুখী হইবে। যেখানে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম প্রকাশ হইয়াছে সেখানে আমরা বসিয়া আছি ইহা কি আমাদের সামান্য সৌভাগ্য? যাহারা কাশী বৃন্দাবনে বাস করে তাহারা কাশী বৃন্দাবনের মহিমা জানে না। ব্রাহ্মগণ, তোমরা এই বিপদগ্রস্ত হইও না তোমরা পবিত্র বৃন্দাবনে বেড়াইতেছ। এমন সুন্দর স্থানে ঈশ্বরকে দেখ। এখানে সর্ব্বত্র ভগবান্ তাঁহার লীলা দেখাইতেছেন। পবিত্র কলিকাতার মহিমা স্মরণ করিতে করিতে দেব লীলা দেখিতে দেখিতে দিন দিন শুদ্ধ এবং সুখী হও।

কুরুপাণ্ডবের আখ্যায়িকা। *

মহাভারতে লিখিত আছে যে, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের পূর্ব্বে যখন উভয় পক্ষ হইতে লোক জন অশ্ব রথ গজ প্রভৃতি সংগ্রহ হইতে লাগিল, রাজা দুর্য্যোধন ও অর্জ্জুন উভয়েই বৈকুণ্ঠপতির সহায়তা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বোধ করিলেন। কথিত আছে, রাজা দুর্য্যোধন বৈকুণ্ঠাধিপতির নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিয়া সহায়তা ভিক্ষা করিলেন। বৈকুণ্ঠপতি প্রার্থনা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "আমি স্বয়ং বিদ্যমান আছি, এবং অযুত অগণ্য নারায়ণী সেনা উপস্থিত রহিয়াছে, আমি তোমাকে এ উভয় অর্পণ করিলাম। তুমি তোমার যাহা প্রয়োজন লইয়া যাও।" রাজা দুর্য্যোধন বৈকুণ্ঠপতিকে উপেক্ষা করিয়া বৈকুণ্ঠপতির অগণ্য সেনা সামন্ত ধন ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করিয়া পৃথিবীকে তৃণসম জ্ঞান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। অর্জ্জুন এ দিকে বৈকুণ্ঠপতির সহায়তা নিতান্ত প্রয়োজন জ্ঞানে ব্যাকুল ভাবে বৈকুণ্ঠনাথের সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক বিনীত ভাবে মনোবাঞ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। বৈকুণ্ঠনাথ উত্তর করিলেন "আমার যত ধন ঐশ্বর্য্য সেনা সামন্ত সমস্ত আমি রাজা দুর্য্যোধনকে দান করিয়াছি, এখন আমার তো আর কোন ঐশ্বর্য্য নাই যে তোমাকে দিব?" অর্জ্জুন বিনীত ভাবে করযোড়ে নিবেদন করিলেন, "আপনার কোন ঐশ্বর্য্যে আমার প্রয়োজন নাই, সে সমস্ত কিছুই নহে, আমি আপনাকেই ভিক্ষা করি। এই আমার প্রার্থনা যে আপনি নিজে আমাদের সখা হউন, আপনাকে পাইলেই আমাদের সকল অভাব পূর্ণ হইবে।" এ দিকে রাজা দুর্য্যোধন সমুদয় ধরার অধিপতি। পৃথিবীর বড় বড় রাজা তাঁহাদের অগণ্য সেনা সামন্ত লইয়া তাঁহার আজ্ঞাধীন, তাহার উপর নারায়ণী সেনা তাঁহার পক্ষে রণক্ষেত্রে উপস্থিত। সামান্য পঞ্চ পাণ্ডব তাঁহার কখন সমকক্ষ নয়, তাঁহাদিগকে জয় করিতে তাঁহার ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত লোকের কোন আয়াসের প্রয়োজন নাই মনে ভাবিতে ভাবিতে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। অপর দিকে কেবলমাত্র বৈকুণ্ঠপতিকে সহায় ও সারথী করিয়া পঞ্চ ভ্রাতা রণে প্রবৃত্ত হইলেন।

* খাটুরা ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে প্রাতুরে প্রদত্ত বক্তৃতার মধ্যে একটি।

যুদ্ধে কি হইল তাহা আপনারা সকলেই অবগত আছেন। রাজা দুর্য্যোধনের অত সেনা সামন্ত, অত বীর্য্য পরাক্রম বায়ুনিক্ষিপ্ত তুষের ন্যায় কোথায় উড়িয়া গেল, মহারথি মহা যোদ্ধা সেনাপতিগণ একে একে ধরাশায়ী হইল। কেবল পাণ্ডব দলেরই জয় লাভ হইল।

এই সংসারে দুই শ্রেণীর লোক আছে, এক শ্রেণীর লোক রাজা দুর্য্যোধনের বংশ, অপর শ্রেণীর লোক পাণ্ডবদিগের বংশোদ্ভব। পৃথিবীর সকল লোকেই ঈশ্বরের নাম লইয়া থাকে ও তিনি যে এক জন আছেন তাহা বিশ্বাস করে। ধনী দরিদ্র, জ্ঞানী মূর্খ, সভ্য অসভ্য, নর নারী সকলেই ভগবানকে মান্য করিয়া থাকে। যাহারা দুর্য্যোধনের বংশ তাহারা ক্রমাগত তাঁহার দ্বারে গিয়া "ধনং দেহি মানং দেহি, পুত্রং দেহি, যশো দেহি" বলিয়া চীৎকার করিতেছে। সংসারকে লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইতেছে। গৃহে পুত্রের পীড়া বা ধনহানি অথবা মানহানি হইল অমনি ঈশ্বরকে ডাকিতেছে। কিসে সংসারের উন্নতি হয়, কিসে মান মর্য্যাদা হয়, কিসে ধন অট্টালিকা অশ্ব গজ বিষয় বিভব বৃদ্ধি হয় দিবানিশি তাহার জন্য ব্যাকুল হইতেছে, এবং মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার জন্য স্বস্ত্যয়ন যাগযজ্ঞ দ্বারা ঈশ্বরকে কত প্রকারে সন্তুষ্ট করিতেছে। অবারিত ঈশ্বরের ভাণ্ডার। বিশ্বের সমস্ত পদার্থ তাঁহারই, যে যাহা চাহিতেছে কল্পতরু তাঁহাকে তাহাই দিতেছেন। রাজার রাজ্য, সম্রাটের সাম্রাজ্য, ধনীর ধন ঐশ্বর্য্য, গৃহস্থের পুত্র, কন্যা, মনুষ্যের সুখ সচ্ছন্দতা, বলবানের সুস্থতা ও শক্তি সমস্তই তাঁহার দান পৃথিবীতে যে যাহা সম্ভোগ করে সমস্তই তাঁহার প্রদত্ত। কিন্তু রাজা দুর্য্যোধনের যে দশা হইয়াছিল, সংসারের ভাগ্যবানদিগের সকলেরই সেই দশা। অদ্য রাজা রাজ্যেশ্বর, সমস্ত সাম্রাজ্যের অধিপতি, সৌভাগ্যের উচ্চতম শিখরে আরূঢ়, কল্য পথের ভিখারী, চারি দিকে আর কেহ নাই, মহাদুঃখ কষ্টে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পৃথিবী ত্যাগ করিতেছেন। ঐ রূপবান গুণবান পুত্র জনক জননীর শেষ জীবনের আশা ও যষ্টিস্বরূপ, অদ্য গৃহকে আলোকিত করিয়া চারি দিকে আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে, আবার কল্য সেই পুত্রের মৃতশরীর সম্মুখে করিয়া তাহার পিতা মাতা তাহার উপর অশ্রুবারি বর্ষণ করিতেছে। অদ্য বল বীর্য্য যৌবন লাবণ্য স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইয়া মনুষ্য সংসারে সুখে বিচরণ করিতেছে, কল্য রোগ, শোক, দুঃখ দারিদ্র্য, নিরাশা অন্ধকার এবং মৃত্যু তাহাকে প্রতীক্ষা করিতেছে, যাহারা রাজা দুর্য্যোধনের ন্যায় নির্ব্বোধ তাহাদের সংসারে এইরূপই দুর্দ্দশা হইয়া থাকে। কিন্তু ধন্য সেই অল্প সংখ্যক লোক যাহারা পঞ্চ ভ্রাতা পাণ্ডবদিগের মত গোলোকপতিকে বলিতে পারে "এ সংসারের বিষয় বিভব অস্থায়ী ও অকিঞ্চিৎকর ধন মান সুখ স্বাস্থ্য লইয়া কি করিব, আমরা তোমাকেই চাই" যাহারা ভগবানের মিত্রতাকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহকাল ও পরকালের সহায়তা ও আশ্রয় স্থান মনে করিয়া তাঁহারই শরণাপন্ন হন তাঁহাদের কি পৃথিবীতে কোন বিপদ হয় না? পৃথিবীতে তাঁহাদের বিপদ পরীক্ষা তো পদে পদে। ভগবান বলেন "যে করে আমার আশ আমি তার করি সর্ব্বনাশ।" বাস্তবিক ধার্ম্মিক ঈশ্বরাশ্রিত ব্যক্তিদিগের পদে পদে বিপদ ও পরীক্ষা। পাণ্ডুতনয়দিগের অবস্থা ভাবিয়া দেখ। তাহারা নির্ব্বাসিত তাড়িত রাজ্যচ্যুত হইয়া দুঃখ ভয় বিপদ ও মৃত্যুর আশঙ্কার একসীমায় উপনীত হইয়া বনে বনে পথে পথে দুঃখিনী পত্নী দ্রৌপদীসহ নিরন্তর নিরাশ্রয় অবস্থায় ভ্রমণ করিতেন, কিন্তু কে তাঁহাদিগের সহায় ছিলেন? কে তাঁহাদিগের দারিদ্র্যের ধন ছিলেন ও অসহায়ের সহায় ছিলেন? যখন সমস্ত পৃথিবী তাঁহাদের প্রতি বিমুখ হইয়াছিল কে তাঁহাদিগের মিত্র ছিলেন? এক শ্রীহরি যাঁহাকে তাঁহারা সার করিয়াছিলেন কেবল তিনিই তাঁহাদিগকে সকল বিপদ সকল দুঃখ হইতে আশ্চর্য্যরূপে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং তাঁহাদিগের রন্ধনশালায় অন্ন এবং শত্রুকর্ত্তৃক ভয়ানকরূপে আক্রান্তা পত্নীর লজ্জার বস্ত্র হইয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেনও তাঁহাদিগের লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিকটই তিনি লজ্জানিবারণ নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ সংসারে এই কলিযুগে যাঁহারা তাঁহাদিগের মত কেবল এক ভগবানকেই প্রার্থনা করেন, তাঁহারা পাণ্ডবদিগের বংশোদ্ভব, তাঁহাদের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হয়। তাঁহারা যদি অন্নাভাবে হরিনাম সার করিয়া ছিন্ন কন্থা পরিধান করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেন, তাঁহাদের সঙ্গে স্বয়ং ভগবান ভ্রমণ করেন ও তাঁহাদের সকল অভাব মোচন করেন, পঞ্চ পাণ্ডবের রণক্ষেত্রের রথের সারথী ন্যায় ধার্ম্মিকদিগের পক্ষে এই সংসাররূপ রণক্ষেত্রের সারথী স্বয়ং ভগবান। ভাই, তাঁহার রূপ নাই, তিনি নিরাকার, যদি তাঁহার রং রূপ থাকিত তাহা হইলে তোমার আমার চর্ম্মচক্ষু পদে পদে তাঁহাকে ধরে ফেলিতে পারিত কিন্তু তুমি দেখ আর না দেখ, তুমি কখন একাকী নও। সেই নিরাকার অনুপমস্নেহে মত্ত ভগবান তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেছেন। কখন তোমার দুঃখ হইল, মুখ শুকাইল, তিনি দেখিতেছেন এমন গূঢ় অভাব দুঃখ সকল যাহা তোমার পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র কেহই জানিতে সক্ষম নহে সেই নিরাকার জননী তাহা জানেন ও তোমার গভীর মর্ম্মবেদনা দূর করেন। মনে করিওনা যে তোমার ঘরে কেহ নাই, কেবল আকাশ ও দাস দাসী ও স্ত্রী পুত্রে পরিপূর্ণ। নিরাকার মা গৃহলক্ষ্মী স্বয়ং তথায় বর্ত্তমান থাকিয়া তোমার সংসারের সকল কার্য্য করিতেছেন, তোমাদের খাওয়াই-

তেছেন পরাইতেছেন আর আর সকল অভাবমোচন করিতেছেন। মাকে কে তাড়াইতে পারে? ভাই আর আর সকলকে আমরা দেখিলাম কেবল নিরাকার জননীকে দেখিলাম না? অনেক দিনান্তে একবারও তাঁহাকে ডাকিল না? তুমি তাঁকে ডাক আর নাই ডাক, মান আর নাই মান, কৃতজ্ঞ হও আর নাই হও, তিনি তোমাকে দেখিবেন। পাপী তাপী লোক কত আছে মা তাঁহার একটি সন্তানকে ছাড়েন না, ভুলেন না। তাই বলি ভাই যা কর তা কর কিন্তু মাকে মানিও, একবার করিয়া ডাকিও, তাঁহাকে তোমার বন্ধু বলিয়া তাঁহার উপর নির্ভর রাখিও। ইহকাল পরকালে কল্যাণ হইবে তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া জানিলে সশরীরে স্বর্গভোগ হইবে। মৃত্যুকে পরাজয় করা যাইবে, এবং ইহলোকে ও পরলোকে নিত্য সুখে সুখী হইবে।

প্রচারবৃত্তান্ত।

(ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত হইতে প্রাপ্ত)

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

১৪ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে গৃহে গৃহে কীর্ত্তন, মধ্যাহ্নে ভ্রাতা নীলমণি বাবুর বাসায় পারিবারিক উপাসনা হয়। বৈকালে বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের সভা আহ্বান করিয়া "ছাত্রদিগের কর্ত্তব্য" বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হইল। রাত্রে বিধানবিশ্বাসী ভ্রাতা অনন্ত নাথ সেনের বাসায় বিশেষ উপাসনা হইল। অনেকগুলি ভদ্রলোকে ঘর পরিপূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু এক জন সুরাপায়ীর গোলমালে মধ্যে মধ্যে উপাসনার বিশেষ ব্যাঘাত হইয়াছিল। কোন ভদ্রলোক তাঁহাকে ধরিয়া গৃহে পঁহুছিয়া দেওয়ায়, শেষে নির্ব্বিঘ্নে উপাসনা শেষ হয়। অনুতাপ বিষয়ে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল।

১৫ ই জ্যৈষ্ঠ মধ্যাহ্নে নিয়মিত পারিবারিক উপাসনা, বৈকালে বঙ্গবিদ্যালয়ে ভদ্রলোকদিগের সভা, অনেক গুলি সম্ভ্রান্ত প্রধান প্রধান গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী, উকীল, মোক্তার, জমীদার প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন ও এক ঘণ্টা কাল "সাধারণ কর্ত্তব্য" বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। বাবুদিগের ইচ্ছা ছিল আরও কিছুক্ষণ বক্তৃতা হয়। মুন্সেফ বাবু প্রভৃতির সহিত নববিধান ও আচার্য্যদেবসম্বন্ধে অনেকক্ষণ আলোচনা হইয়াছিল। অবশেষে মুন্সেফ বাবু উপেন্দ্রনাথ ঘোষ বলিলেন, "আপনার আগমনে কেশবচন্দ্রসম্বন্ধে আমার যে ভ্রম ছিল কুসংস্কার ছিল তাহা দূর হইল, অন্যলোকে নানা প্রকার অপবাদ দিয়া আমাকে তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ ভ্রমে ফেলিয়াছিল।" তিনি নববিধানের পুস্তকাদি পাঠ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অদ্য রাত্রে সামাজিক উপাসনা, অনেক লোকে ঘর পরিপূর্ণ হইয়া গেল, বক্তৃতার বিষয়, "মৃত্যু, গর্ভ যন্ত্রণা ও পুনর্জ্জন্ম।

১৭ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতে চাঁচল যাত্রা করি। মহানন্দা নদী দিয়া নৌকাযোগে প্রায় ৬৫ মাইল যাইতে হয়; খর স্রোতের বিরুদ্ধে উজান যাওয়ায় অত্যন্ত বিলম্ব হয়, কিন্তু এ পথে প্রকৃতির শোভা অতি রমণীয়, সুতরাং এই পথে যাওয়াই আবশ্যক, ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ তাঁহার বজরা করিয়া আমাকে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হওয়ায় বিশেষ সুবিধা হইল, ১৯ এ বৃহস্পতিবার বেলা ১টার সময় মথুরাপুরের ঘাটে উপস্থিত হইলাম। এই আড়াই দিবস নদী বক্ষে অতি সুখে কাটাইলাম, দিবারাত্র ঠিক মার ক্রোড়ে পবিত্র ভাবে ছিলাম। প্রাতঃসন্ধ্যা বজরার উপর একতারা হস্তে প্রকৃতির শোভা দর্শন করিয়া যখন মার নাম গান করিতাম, তখন যে প্রকৃতি আমার সহায় হইয়া নদীজলে, বৃক্ষলতায়, মেঘের মধ্যে, পশু পক্ষীর মধ্য হইতে আমার মাকে দেখাইয়া দিয়া হৃদয়ের ভিতর হইতে কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করিত, প্রবল ঝড় বৃষ্টির মধ্যে কত সুধা বর্ষিত হইত। একবার একতারায় আঘাত করিবামাত্র যেন প্রকৃতি চারি দিকে "মা" বলিয়া নাচিয়া উঠিত। উপাসনায় বসিবা মাত্র যেন প্রাণের ক্ষুধা মিটিয়া যাইত। এই নদীবক্ষে আমি যে উপকার লাভ করিয়াছি, তজ্জন্য বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের নিকটে চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। যোগেন্দ্র বাবুর সহিত সঙ্গীত এবং আলোচনাদিও হইত। বেলা ১ টার সময় মথুরাপুরের ঘাটের পঁহুছিয়া স্নানাদী করিলাম, চাঁচলের জমীদারের গৃহ হইতে হাতি আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল, চাঁচল এখান হইতে সাত মাইল হস্তিযোগে গমন করিলাম। আমাদিগের পরিচিত ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু কালীনারায়ণ রায় এখানে কোর্ট অব ওয়ার্ডের ম্যানেজার, তাঁহার বাসায় কয়েক দিবস বাস করিলাম প্রাতে তাঁহার বাসায় পারিবারিক উপাসনা এবং অপরাহ্নে একদিবস ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু গণেশচন্দ্র রক্ষিতের গৃহে উপাসনা, আর একদিন ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বেণীমাধব মজুমদার মহাশয়ের বাসায় উপাসনা হইল। বেণী বাবুর গৃহের উপাসনায় অনেক গুলি ভদ্রলোক যোগদান করিয়াছিলেন, মনঃসংযোগ বিষয়ে উপদেশ হইয়াছিল। রবিবার সন্ধ্যার পর কালীনারায়ণ বাবুর বাসায় সামাজিক উপাসনা হইল প্রায় ৫০ জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন, জমীদার কুমার শরচ্চন্দ্র রায় চৌধুরী ও তথায় উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার আত্মীয় বন্ধুগণ এবং শিক্ষক মহাশয় ও উপাসনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। নাবালক জমীদার বাবু একজন বিশেষ উৎসাহী যুবা, প্রজাদিগের যাহাতে উপকার হয় তাহাতে বিশেষ যত্ন দেখা গেল। এখানে একটী দাতব্য চিকিৎসালয় আছে এবং সম্প্রতি একটী এণ্ট্রান্স স্কুল খোলা হইতেছে। পর দিন প্রাতে স্থলপথে গোশকট যোগে পুনরায় মালদহে যাত্রা করিলাম, স্থলপথেও প্রকৃতির রমণীয় সৌন্দর্য্য

যথেষ্ট দর্শন করিলাম। সন্ধ্যাকালে প্রাণপুর নামক গ্রাম দিয়া যাইতেছিলাম, সবডেপুটী বাবু ওদ্দারকে আসিয়াছেন তিনি আমাকে ধরিয়া অতিথি করিলেন, এই স্থানটি অতি সুন্দর। কালিন্দীনামক নদীর তীরে বসিয়া উপাসনা করিলাম। বহুদূরস্থিত রাজমহলের পর্ব্বত মালা এখান হইতে অতিসুন্দর দেখায়। পর দিন মধ্যাহ্নে অমৃতি নামক গ্রামে ভ্রাতা রামকমল রায়ের বাসায় তাঁহার সহিত উপাসনা করিয়া অপরাহ্নে মালদহ পহুছিলাম। পর দিন ২৫ এ জ্যৈষ্ঠ রাত্রে রাজমহল যাত্রা করিলাম। বৃহস্পতিবার মধ্যাহ্নে রাজমহলে পহুছিলাম, এখানকার পুলিস ইনস্পেক্টর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্রনাথ বসুর বাসায় উপস্থিত হইলাম, আমার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না, শেষে পরিচয় পাইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, রাজমহলে এবং তাঁহার বাসায় কখন কোন প্রচারক যান নাই বলিয়া দুঃখী করিতে লাগিলেন, মধ্যাহ্নে তাঁহার সহিত উপাসনা হইল। সন্ধ্যাকালে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সহিত আলাপ করিলাম, অনেকক্ষণ নানা কথায় অতিবাহিত হইয়া গেল। সন্ধ্যার পর সঙ্গীত হইল, অদ্য রওনা হইবার কথা, কিন্তু ইঁহাদিগের বিশেষ অনুরোধে অদ্য যাওয়া স্থগিদ করিতে হইল। শুক্রবার মধ্যাহ্নে গিরীন্দ্র বাবুর বাসায় পারিবারিক উপাসনা হইল সন্ধ্যার পর সঙ্গীতাদি হইয়া ষ্টেসনে পঁহুছিলাম।

২৮ এ জ্যৈষ্ঠ প্রাতে জিয়াগঞ্জে ভ্রাতা চন্দ্রশেখরের বাসায় পহুছিয়া উপাসনাদি করিলাম। সমস্ত দিন বৃষ্টি হওয়ায় অত্যন্ত প্রাকৃতিক গোলমাল হইতে লাগিল, অপরাহ্নে কয়েক জন ভদ্রলোকের সহিত দেখা করিতে গেলাম। পর দিন প্রাতে উপাসনাদি করিয়া নৌকাযোগে বহরমপুর রওনা হইলাম। রাত্রে তথাকার সমাজে সামাজিক উপাসনা করিয়া নৌকায় আবার উঠিলাম, পর দিন সোমবার অতি প্রত্যূষে স্নানাদি করিয়া নৌকায় সূর্য্যোদয়ের সহিত উপাসনা করিয়া আজিমগঞ্জে পহুছিলাম এবং বাষ্পীয় শকটযোগে রাত্রে কলিকাতায় আসিলাম।

প্রচার বৃত্তান্ত।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন হইতে প্রাপ্ত।

গত প্রকাশিতের পর।

২৩ শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে মুনসেফ বাবুর গৃহে পারিবারিক উপাসনা হয়, মধ্যাহ্নে আহারান্তে পাবনা নগরে যাত্রা করা যায়। ফেরি ষ্টীমারে পাবনা পার হইয়া গোযানের আশ্রয়ে তিন মাইল পথ অতিক্রম পূর্ব্বক পাবনায় উপস্থিত হই। কুষ্টিয়ার ঘাটে ষ্টীমারে কিশোরগঞ্জ স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক ব্রাহ্মভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু বিহারীলাল সেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি পাবনায় যাইতেছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহাকে পাইয়া, বিশেষ আহ্লাদ হইল। তাঁহার সঙ্গে এক যোগেই অপরাহ্নে পাবনায় সমাগত হই। তথাকার মুনসেফ প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু কেদার নাথ রায় এম্ এ বি এলের ভবনে আমরা সাদরে অবস্থিতি করি। সে দিন সন্ধ্যাকালে প্রার্থনা ও সঙ্গীত হয়। কেদার বাবু সপরিবারে যোগদান করেন। ২৫ শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে পারিবারিক উপাসনা হয়, সন্ধ্যার পর সমাজ গৃহে "ধর্ম্মের ক্রমোন্নতি" বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। ১৫। ১৬ জন লোক মাত্র উপস্থিত ছিলেন। পাবনার ন্যায় বৃহৎ নগরে একরূপ অল্প সংখ্যক লোক হওয়ার কারণ এই প্রকার বোধ হয়, বিজ্ঞাপন উপযুক্তরূপে প্রচার না হওয়া, আফিসের আমলা বর্গের সম্বন্ধে অনুপযুক্ত সময়ে বক্তৃতার সময় নির্দ্ধারণ করা, এবং স্কুল বন্ধ থাকা। পাবনার ব্রহ্মমন্দির অতি সুন্দর, কিন্তু ইহা নববিধানের অন্তর্গত মন্দির না হইলেও এই গৃহে বিধানবাদী লোকগণ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে অধিকার প্রাপ্ত হন। বিধানবিরোধীদিগের প্রভাব এখানে প্রবল। ২৫শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে কেদার বাবুর গৃহে পারিবারিক উপাসনা, রাত্রিতে প্রার্থনা ও সঙ্গীত হয়। ২৬ শে জ্যৈষ্ঠ প্রাতে পারিবারিকউপাসনান্তে কুষ্টিয়া যাত্রা করি। তথায় মধ্যাহ্নে পৌঁছিয়া রাত্রিতে মুনসেফ বাবুর সঙ্গে সংসঙ্গ সঙ্গীত প্রার্থনাদি করিয়া কলিকাতায় চলিয়া যাই। কেদার বাবুর ভাবের নূতনত্ব ও উপাসনানুরাগ দেখিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি, ঈশ্বর কৃপায় তাঁহার জীবনে এইভাব স্থায়ী ও দিন দিন উন্নত হউক। পাবনার সমাজের উপাচার্য্য কৈলাস বাবুও প্রতিদিন আসিয়া পারিবারিকউপাসনায় যোগ দান করিয়াছিলেন।

আসাম দেশের অনেক দূর ভ্রমণ করিয়া আসিলাম,অথচ আসামী লোকদিগের সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গই হইল না। তজ্জন্য তাঁহাদের বিষয়ে ২। ১ টী কথা লিখিয়া উপসংহার করিতেছি। আসামী লোকদিগের মধ্যে ব্রাহ্ম অতি অল্প। ২। ১টী নগরে ২ ১ জন ব্রাহ্ম দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালী বাবুদিগের সঙ্গে আসামী লোকেরা প্রায় মিশিতে চাহেন না। আসামের অনেক নগরে বহু বাঙ্গালী বাবুর চরিত্রের জঘন্যতা ইহার একতর কারণ বলিতে হইবে অন্য কারণ ও আছে। কিন্তু আমি ভিন্ন ভিন্ন নগরে উচ্চপদস্থ কৃতবিদ্য অনেক আসামী বাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়া তাঁহাদের সৌজন্য শিষ্টাচারে বিশেষ সুখী হইয়াছি। অনেকে বক্তৃতাদি স্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। গোহাটীর অন্তর্গত বড় পেটা নিবাসী অতিসম্ভ্রান্ত বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত গোবিন্দরাম চৌধুরী আমাকে আপন হস্তী যোগে বড় পেটায় পাঠাইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। বড় পেটা কামরূপের সবডিবিজন, আসামের ধর্ম্ম সংস্কারক শ্রীশঙ্করদেবের প্রধান প্রচারক্ষেত্র, তন্মতাবলম্বী লোকদিগের তীর্থস্থান বিশেষ। কিন্তু নানা কারণে আমার তথায় যাওয়া হয় নাই। গোহাটী হইতে তেজপুর যাইবার সময় ঘোর অন্ধকার রাত্রি দ্বিতীয় প্রহারের সময় এক মাইল দূরে জাহাজে আমরা আরোহণ করিতে যাইতেছিলাম। তখন এক জন অপরিচিত আসামী বাবু নিজের কোন আত্মীয়কে জাহাজে উঠাইয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতে ছিলেন। তিনি পথে আমাদিগের পরিচয় পাইয়া বলিলেন যে, যে জাহাজ উপর আসামে যাইবে তাহা নির্ণয় করিয়া আরোহণ করিতে আপনাদের কষ্ট হইবে।

আমি আপনাদিগকে জাহাজে পঁহুছাইয়া দিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইব। এই বলিয়া তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসেন। ক্রমশঃ পাশাপাশি শ্রেণীবদ্ধ চারি খানা ষ্টীমার অতিক্রম করিয়া যত্নপূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট ষ্টীমারের যথাস্থানে তিনি আমাদিগকে লইয়া যান, এবং টিকিট ক্রয় হইলে পর গৃহে প্রত্যাগমন করেন। এরূপ সহৃদয়তা অনেক স্থলে স্বদেশস্থ ঘনিষ্ঠ বন্ধুর নিকটেও দুর্লভ হয়। এবার প্রচারক্ষেত্রে অনেক ভগিনী যে বিশেষ আদরসৎকারে সেবা করিয়াছেন তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারি না। কোন কোন সম্ভ্রান্ত বন্ধুর পত্নী আমার সঙ্গে পূর্ব্বে আলাপ পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও অবরোধ ও আবরণ অতিক্রম পূর্ব্বক ভগিনীর ন্যায় সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সাদর সম্ভাষণ ও আত্মীয়তা ঘনিষ্টতা প্রকাশ এবং আতিথ্য সৎকারাদি করিয়াছেন ও উপাসনাদিতে যোগ দিয়াছেন।

সংবাদ।

ভাই প্রতাপচন্দ্র তাঁহার খড়দহস্থ বাটিতে, আমেসায় ও জ্বরে কয়েক দিন কষ্ট পাইয়াছেন এক্ষণে অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। তিনি আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহেই কলিকাতায় আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, মধ্যে এই অসুখ হওয়ায় বোধ করি এখানে আসায় বিলম্ব হইবে।

ভাই গিরিশচন্দ্র ঢাকায় আসিয়া তাঁহার পায়ের চিকিৎসা করাইতেছেন, পাএর বেদনা আজও সম্পূর্ণরূপে ভাল হয় নাই বলিয়া, তিনি কলিকাতায় আসিতে পারিতেছেন না।

ভাই রামচন্দ্র উত্তর বাঙ্গালায়, ভাই প্রাণকৃষ্ণ মেদিনীপুরে, ভাই উমানাথ সিমলা পাহাড়ে, ভাই বলদেব গয়াতে, ভাই নন্দলাল বালেশ্বর প্রভৃতি স্থানে এবং ভ্রাতা লক্ষ্মণচন্দ্র পাণ্ডা ভাগলপুরে প্রচার করিতেছেন।

ভাদ্র মাসের সমস্ত দিনব্যাপী উৎসব আগামী ১১ই ভাদ্র রবিবারে হইবার কথা হইতেছে. আমরা বিদেশস্থ সমস্ত প্রচারক ভাইদিগকে সেই সময় কলিকাতায় উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করিতেছি। ভাদ্রোৎসব তত বাহিরের ধুম ধাম ও সমারোহের ব্যাপার নহে, যত আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য। এই সময় সকলে একত্র হইয়া বিশেষ সাধন ভজন করেন ইহাই আমাদের একান্ত ইচ্ছা। আমরা আশা করি ভাই বঙ্গচন্দ্র, ভাই গৌরগোবিন্দ এবং ভাই দীননাথ এই উৎসবে আসিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইবেন। তাঁহারা সময় থাকিতে আপনাপন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের সুবন্দবস্ত করেন।

সুবিখ্যাত দানশিলা মহারাণী স্বর্ণময়ী আমাদের প্রতি সদয় হইয়া প্রচার ও নাটক প্রভৃতির পুরাতন ঋণ শোধ দিবার জন্য ৫০ পঞ্চাশ টাকা সাহায্য প্রদান করিয়াছেন। বালুচরের শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রচাঁদ লাহা মহাশয় এই জন্য ৫৲ টাকা দিয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে দাতাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

আজকাল ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনায় বেশ লোকের সমাগম হইতেছে। সমস্বরে প্রার্থনা পাঠ ও সংগীত পর্য্যন্ত প্রায় মন্দির পূর্ণ থাকে। তাহার পর কতকগুলি লোক আর বেশীক্ষণ থাকিতে না পারিয়া উঠিয়া যান। দুই ঘণ্টাকাল চুপ করিয়া উপাসনা প্রার্থনা উপদেশ প্রভৃতিতে সময়ক্ষেপন করা অনেকের পক্ষে সহজ কথা নহে। আমরা বিশ্বাস করি নিয়মিতরূপে যাঁহারা ব্রহ্মমন্দিরে প্রতি সপ্তাহে এইরূপ এক ঘণ্টাকালও উপস্থিত থাকিতে পারেন ভবিষ্যতে দেবপ্রসাদে তাঁহারা নিশ্চয়ই সমস্ত সময় থাকিবার জন্য বিশেষ যত্নবান হইবেন। ভগবানের গৃহে আগমন করার একটি বিশেষ আকর্ষণী শক্তি আছে। গত রবিবারের উপদেশের সার মর্ম্ম এইরূপ ছিল। "আমরা হিন্দুসমাজে থাকিয়া সম্পূর্ণরূপে আমাদের আরাধ্য দেবতার ইচ্ছা মত জীবন প্রস্তুত করিতে না পারিয়াই ব্রাহ্মসমাজের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ছিলাম, এখানে অন্য সমস্ত সাংসারিক ভাব পরিত্যাগ করিয়া কিসে আমরা সেই নিত্য ধন পরম ধন নিরাকার হরিকে পাইয়া প্রাণ মনকে পুলকিত করিতে পারি তাহারই জন্য সম্পূর্ণ যত্ন চেষ্টা ও সাধন ভজন ছিল। এক্ষণে কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মরাজ্যের মধ্যেও দেখি সেই পুরাতন সংসারের মিশ্রিত ভাব সকল আসিয়া উপাসকদিগকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিতেছে। যেখানে কেবল পূর্ব্বে ভগবানকে পাইবার জন্যই সমস্ত ব্যাপার সংঘটিত হইত। সেখানে এখন সাংসারিকতা মান, যশ, প্রভুত্ব প্রভৃতির প্রত্যাশা আসিয়া পড়ায় ধর্ম্মসমাজকে বিপর্য্যস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া ফেলিতেছে। ধর্ম্মরাজ্যের, শাসন, বিধি ব্যবস্থা সমস্তই ধর্ম্মরাজ বিশ্বপতির হস্তে চিরকাল আছে ও থাকিবে ইহাইতো আমাদের বিশ্বাস। মধ্য হইতে মানুষ কেন বিধাতার ভার আপনাদের হস্তে লইয়া গণ্ডগোল করিয়া আপনারা বিপদগ্রস্ত হয় ও অন্যকে কষ্ট প্রদান করে? ফল কথা, ঈশ্বরকে না পাইলেই মনুষ্য সংসারেই থাকুক অরণ্যেই গমন করুক কিংবা ধর্ম্মসমাজেই প্রবিষ্ট হউক। তাহার আসুরিক প্রবৃত্তি সকল তাহাকে বিধিমতে কষ্ট দিয়া থাকে। ইত্যাদি বিষয় গুলি সুন্দররূপে দৃষ্টান্তের সহিত আলোচিত হইয়া উপদেশ প্রদত্ত হয়।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে ১লা মাঘ হইতে ১৫ মাঘ পর্য্যন্ত। প্রাচীন আরব্য পারস্যাদি প্রসিদ্ধ জীবনী গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত মহাপুরুষ মোহম্মদের সুবিস্তীর্ণ জীবনচরিত যাহা তিন ভাগে সমাপ্ত হইয়াছে ৩৷৹ টাকা মূল্য স্থানে ২৲ দুই টাকা নগদ মূল্যে বিক্রয় হইবে বিদেশে ডাকে পাঠাইতে হইলে।৹ চারি আনা ডাক মাশুল লাগিবে।

কলিকাতা
৫৪ নং মেছুয়াবাজার রোড
১৬ই শ্রাবণ ১৮৮৮ শক।

ব্রাহ্মসমাজ।
প্রচারকার্য্য সাধনের
অধ্যক্ষ।

কোরাণের সটিক বঙ্গানুবাদ যাহা বৃহৎ ৩ ভাগে সমাপ্ত হইয়াছে, আগামী ১ লা ভাদ্র হইতে ৫ পৌষ পর্য্যন্ত ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে ৭৲ টাকা মুল্যস্থলে ৩৲ তিন টাকা মূল্যে ৫৪ নং মেছুয়া বাজার রোড আফিস বাড়ীতে শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের দ্বারা নগদ মূল্যে বিক্রীত হইবে। বিদেশের জন্য ৷৹ আনা ডাক মাশুল লাগিবে। অনুবাদক।

☞ এই পত্রিকা ৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্।
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে।

২৩ ভাগ।
১৫ সংখ্যা।

১লা ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৮১০ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০
মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে দীনবন্ধো হরি, তুমি অনন্ত লীলার সাগর, তোমার লীলা দেখিয়া অবাক্। তুমি ক্ষুদ্র জীবের প্রতি এত করুণাশীল, ইহা পূর্ব্বে জানিতাম না। জীবের জন্মিবার অগণ্য কাল পূর্ব্বে তুমি তাহার নিয়তি ঠিক করিয়া রাখিয়াছ, সে নিয়তি খণ্ডন করে কাহার সামর্থ্য? লোকে ভয় পায় কেবল অবিশ্বাসে। সে জানে না যে, জন্মিবার কত পূর্ব্বে তুমি তাহাকে বুকে করিয়া রাখিয়াছিলে, এবং যখন তাহাকে কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত করিলে তাহার অনন্ত ভবিষ্যতের ভার আপনি নিজহস্তে রাখিলে। পূর্ব্বেও যেমন বুকে করিয়া রাখিয়াছিলে, পরেও তুমি তাহাকে বুক হইতে নামাইলে না। এই যে জীবকে তুমি বুক হইতে নামাও না, ইহাতেই তাহার অমরত্ব, ইহাতেই তাহার স্বর্গ নিশ্চয়। এ ভাব ভাবিলে মনে কেমন আশা হয়। তুমি আমার অনন্ত ভবিষ্যতের ভার লইয়া রহিয়াছ, আমার নিয়তি যাহাতে আমার সম্বন্ধে সিদ্ধ হয়, তাহারই জন্য পৃথিবীতে আমায় শত শত ঘটনার মধ্য দিয়া লইয়া যাইতেছ। আমি মনে করিতেছি, আমার এইবার মহাসর্ব্বনাশ উপস্থিত, এ সকলই ভ্রম। আমার বিনাশ নাই,—কেন না তুমি আমার রক্ষক হইয়া রহিয়াছ। আমি পাপাচরণ করিয়া কলুষিত হই, কিন্তু তুমি আবার ধুইয়া পুঁছিয়া নির্ম্মল কর। যখন দুশ্চিকিৎস্য বিকারের অধীন হই, তখন আপনি কৃপা করিয়া তাহার সুচিকিৎসা করিয়া থাক। তোমার মত কৃপানিধান বল আর কে আছে? বল, হে প্রভো, তোমার এ ভাব বুঝিয়া আমরা কেন আশ্বস্তচিত্ত হইব না? আমরা কেন নিরাশ হইব? তোমার সঙ্গে নিত্য কালের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ বুঝিয়া কেন আমরা আনন্দে জীবনপথে অগ্রসর হইব না? মৃত্যু—আমাদিগের নিকটে মৃত্যু কি কখন উপস্থিত হইতে পারে? অমঙ্গল অকল্যাণ, ইহা যে একেবারে অসম্ভব? মৃত্যু যখন অমঙ্গল করিতে পারিল না, বিঘ্ন জন্মাইতে পারিল না, তখন এমন আর কি আছে যাহা আমাদের পথে অন্তরায় হইতে পারে! হে জগৎপতি, ভূত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালে আমরা সমান ভাবে তোমার যত্নাধীন ইহা জানিয়া আমরা ভয় শোক পরিহার করি, তোমাতে নিত্যকাল আমাদের সুখ শান্তি নিয়তি, ইহা নিশ্চয় জানিয়া, আমরা তোমার আদেশ পালনে আশ্বস্তমনে প্রবৃত্ত হই। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, তোমার সঙ্গে আমাদিগের অচ্ছেদ্য যোগ এবং আমাদিগের প্রতি তোমার

অবিচ্ছিন্ন করুণা জানিয়া যেন আমরা সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার নীচতা ও ক্ষুদ্রতা পরিহার করি, এবং দিন দিন তোমার উপযুক্ত ভৃত্য ও সন্তান হইয়া কৃতার্থ হই।

যোগনিদ্রা ও যোগ মায়া।

সগুণ ও নিগুর্ণ ব্রহ্মবাদের উৎপত্তি ভারতবর্ষে, প্রথমতঃ সগুণ কি প্রথমতঃ নিগুর্ণ ব্রহ্মবাদ এবিচার নিষ্প্রয়োজন। প্রথমে সগুণ পথ অবলম্বিত হইয়া থাকিলেও পরিশেষে নিগুর্ণবাদ হইতে পুনরায় সগুণবাদের অভ্যুদয় হইয়াছে, বেদান্ত ও পুরাণ আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীত হয়। আমরা কয়েক দিন হইল নিগুর্ণবাদ ও সগুণবাদের সামঞ্জস্য কোথায় দেখিতে প্রবৃত্ত হইয়া যে মীমাংসায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, তাহাতে পুরাণোক্ত 'যোগনিদ্রা' ও 'যোগমায়া' এ দুটি শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি প্রতিভাত হইয়াছে, তাই আমরা এ প্রবন্ধের শিরোভাগে যোগনিদ্রা ও যোগমায়া শব্দ বিন্যস্ত করিলাম।

সগুণ ও নিগুর্ণবাদের বিবাদ কোথায়? বিবাদ ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দ্দেশে। নিগুর্ণবাদিগণ বলেন, ব্রহ্ম আছেন, আমরা এই মাত্র বলিতে পারি, তদ্ভিন্ন তাঁহার সম্বন্ধে আমরা আর কিছুই নির্দ্ধারণ করিতে পারি না, কেন না নির্দ্ধারণ করিতে গেলেই ব্রহ্মে মনুষ্যবৎ বিকার আসিয়া সমুপস্থিত হয়। কেবল মাত্র সত্তানির্দ্দেশ যদিও যথার্থ নিগুর্ণবাদ, তথাপি এদেশের নিগুর্ণ ব্রহ্মবাদিগণ চিন্মাত্র ব্রহ্ম বলিয়া ব্রহ্মকে জ্ঞানস্বরূপ সহ অভিন্ন ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহারা তর্কের হাত হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। আমরা যাহাকে জ্ঞান বলি, ব্রহ্মের সেই জ্ঞান থাকিলে, তাঁহা হইতে অতিরিক্ত পদার্থান্তর স্বীকার করিতে হয়। কেন না পদার্থান্তরের পর্য্যালোচনা হইতে আমাদিগের জ্ঞান সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। যদি কেহ বলেন, সমগ্র সৃষ্টি ব্রহ্মেতে বিলীন ছিল, যখন সেই সৃষ্টি তাঁহা হইতে বিনিঃসৃত হইল, তখন সেই সকলের পর্য্যালোচনায় জ্ঞান প্রকাশ পাইল। এ মতে সৃষ্টির বিলীনাবস্থায় জ্ঞান ছিল না, ইহাই সিদ্ধান্ত হয়। সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা বেশি কিছু কমিল না, বরং বাড়িল, কেন না এ মতে অজ্ঞানপূর্ব্বক সৃষ্টি মানিতে হইল। যদি বল, ব্রহ্মের জ্ঞান আমাদের জ্ঞানের মত নয়, সে জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান। স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান কিরূপ আমরা তাহা জানি না। সুতরাং ব্রহ্মের জ্ঞান থাকা না থাকা আমাদিগের পক্ষে উভয়ই সমান।

একালের নিগুর্ণবাদিগণ জ্ঞানাদি কোন স্বরূপ স্বীকার না করিয়া শক্তির শক্তিত্ব স্বীকার করেন। ব্রহ্ম আছেন কিরূপে? শক্তিরূপে। এখানেও দোষ পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে, বিচার করিলে অনায়াসে প্রতিভাত হইবে। আমাদিগের শক্তির জ্ঞান কোথা হইতে সমুৎপন্ন হয়? আমাদিগের দৈহিক প্রযত্ন হইতে। যখন কোন বস্তু আমার ঐচ্ছিকগতির প্রতিরোধক হয়, তখন আমি সেই প্রতিরোধ দূর করিবার জন্য যত্ন করি, এই যত্ন হইতে আমার শক্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে যে বস্তু আমার প্রতিরোধ করিল তাহার ভিতরে আমার বলের মত বল আছে প্রতীতি হয়। কিন্তু এখানে আমার শক্তিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ু প্রভৃতির ক্রিয়ার যোগ আছে, সে যোগ ভিন্ন আমার বল বা শক্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। জড়বস্তু সমূহেতে বল বা শক্তি অনুভব করিতে গেলেও তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ু প্রভৃতির যোগ মন হইতে দূর করিতে পারা যায় না। এ স্থলে আমি যে শক্তি অনুভব করি, সে শক্তিও প্রকৃতি বা ব্রহ্মের শক্তি এক হইল না। সুতরাং ব্রহ্মকে শক্তিস্বরূপ বলা না বলা সমান হইল।

ঈশ্বরেতে প্রেমাদিও আরোপ করা যাইতে পারে না। কেন না আমরা যাহাকে প্রেম বলি

তাহা উদ্দীপন ও আলম্বন সাপেক্ষ। বিনা আলম্বনে প্রেম থাকিতে পারে না এবং আলম্বন থাকিলেও তাহাতে ক্রমে নানা ভাবের আগম ও বিগম হওয়া চাই, অন্যথা আমরা প্রেম কি কিছুই বুঝিতে পারি না। আমরা প্রেমে কখন হাসি কখন কান্দি, কখন বা অন্য ভাব প্রকাশ করি, তাই প্রেমের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। ঈশ্বরেতে যখন এ সকল পরিবর্ত্তন সম্ভবে না, তখন তাঁহাতে প্রেমও সম্ভবে না। আমরা যাহাকে প্রেম বলিয়া বুঝি, যদি তদ্ভিন্ন আর কোন প্রকারের প্রেম থাকে থাকুক, কিন্তু তৎসম্বন্ধে আমাদিগের কোন জ্ঞান নাই, এবং আমাদিগের সম্বন্ধে সে প্রেম থাকা আর না থাকা সমান।

ঈশ্বরের ইচ্ছাকে অনেকে নির্ব্বিবাদরূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু এখানেও সামান্য গোল নহে। আমরা যাহাকে ইচ্ছা বলি, তাহার সঙ্গে অভিপ্রায়ের ঘনিষ্ঠযোগ। বিনা অভিপ্রায়ে ইচ্ছা থাকে না। অগ্রে অভিপ্রায় পশ্চাৎ ইচ্ছার অভ্যুদয়। আমাদিগের ইচ্ছা শত শত অভিপ্রায় দ্বারা পরিচালিত। একটি অভিপ্রায় সিদ্ধ হইলে তৎসম্বন্ধের ইচ্ছা নিবৃত্ত হইল। আবার আর একটি অভিপ্রায় আসিয়া সম্মুখে উপস্থিত। এইরূপে ক্রমিক অভিপ্রায় যোগে ইচ্ছা জাগ্রৎ থাকে, তাই আমরা ইচ্ছার অস্তিত্ব বুঝিতে পারি। ঈশ্বরে এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায়, এবং ভিন্ন ভিন্ন অভিপ্রায় যোগে ইচ্ছার প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি স্বীকার করিলে, তাঁহার অপরিবর্ত্তনশীলতা রক্ষা পায় না এবং সর্ব্বত্র তিনি সমানভাবে অবস্থিতি করিয়া কার্য্য করিতেছেন, ইহাও প্রতীত হয় না; শুধু তাই নহে, এতদ্দ্বারা তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব থাকে না। কেন না যখন একটি অভিপ্রায়ে ইচ্ছা নিবিষ্ট, তখন সেইটি তাঁহার জ্ঞানের বিষয়, অপরটি এখন তাঁহার নিকটে আইসে নাই, সুতরাং তৎসম্বন্ধে জ্ঞানও নাই।

নির্গুণবাদিগণের এই সকল যুক্তি দেখিতে অকাট্য। যদি অকাট্য হয়, সগুণবাদ জ্ঞানিগণের মনে কখন স্থান পাইবে না। কালে সগুণবাদ পৃথিবী হইতে তিরোহিত হইয়া যাইবে। সগুণবাদের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে পূজা অর্চ্চনা বন্দনা যোগধ্যান প্রভৃতি সকলই বন্ধ হইবে। কেন না যাঁহার বিষয় কিছুই জানি না, তাঁহাকে আমরা পূজা অর্চ্চনা কেন করিব? কেনই বা অন্বেষণ করিব? কেহ যে সগুণবাদকে বিদায় দিয়া ধর্ম্ম পৃথিবীতে স্থির রাখিবেন, ইহা যেন কখন মনে না করেন। যাঁহার সঙ্গে আমার আত্মার সহানুভব নাই, তাঁহাকে আমার সুহৃৎ বলিয়া কেন বরণ করিব? যদি তিনি আমার সুহৃৎ হন, এবং আমি তাঁহাকে জানিতে পারি, তবে তাঁহাকে ডাকিব, তাঁহার পূজা করিব।

এখন তবে প্রথম জিজ্ঞাসা এই, আমি তাঁহাকে জানি কি না? হাঁ জানি, কিরূপ জানি? "স্বস্যাত্মনঃ সখ্যুঃ" আমার আত্মার সখা বলিয়া জানি। প্রয়াস প্রযত্নদ্বারা জানি না, প্রহ্লাদের মত অতি সহজ ভাবে জানি। আমি যেমন এক জন, তেমনি তিনি আমার ভিতরে আর একজন। আমি যদি কিছু অন্যায় করিতে যাই, অমনি তিনি নিষেধ করেন, আবার ভাল কাজে অনুমোদন জানাইয়া আমাকে হৃষ্ট করেন। এই একজন আমার মধ্যে যিনি, সকলের মধ্যে তিনি। তিনি যেমন উপাসনা প্রত্যাদেশ দিয়া আমায় অগ্রসর করেন, এমনই সকলকে করেন। এমন কি মনুষ্যসমাজ আজ যেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; ইহারই জন্য দাঁড়াইয়াছে, ভবিষ্যতে যে অগ্রসর হইবে, তাহা ইহারই জন্য।

যখন তিনি আমায় নিষেধ করেন, বিধি দেন, তখনই তাঁহার জ্ঞান আছে, জ্ঞান না থাকিলে নিষেধ বিধি কি প্রকারে সম্ভবে? যদি জ্ঞান থাকে, তবে নির্গুণবাদীরা জ্ঞান থাকিলে যে দোষ পড়ে বলেন, তাহা ইহাঁর প্রতি ঘটিতেছে। কখন নিষেধ কখন বিধি ইহাতেই জ্ঞানের কখন প্রবৃত্তি কখন নিবৃত্তি দেখা যাই-

তেছে। কেন না যখন নিষেধের কারণ উপস্থিত হয় তখন নিষেধ করেন, আবার যখন বিধির কারণ উপস্থিত হয় তখন বিধি দেন। এ স্থলে তাঁহার জ্ঞানের কিছুই দোষ পড়িতেছে না। তাঁহাতে নিত্য পূর্ণ জ্ঞান আছে, আমি আমার অবস্থানুসারে তাহার বিকাশ মাত্র আমাতে দেখিতেছি। আমরা কি বলিলাম, ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিতে চেষ্টা করি। এই চেষ্টার পূর্ব্বে পূর্ণজ্ঞান কি নির্দ্ধারিত হউক।

যাহা এখন হইল পূর্ব্বে ছিল না, তাহা পূর্ণ জ্ঞান নহে। [illegible] সম্বন্ধে জ্ঞান পূর্ব্বে ছিল না, আজ [illegible] জ্ঞান হইল ইহা পূর্ণ জ্ঞান নহে অপূর্ণ জ্ঞান। এইরূপ একটি একটি পদার্থ লইয়া বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের উৎপত্তি হয় এবং তাহাতেই আমরা জ্ঞান বস্তু বুঝি বলিয়া জ্ঞানরূপ কোন বস্তু পূর্ব্বে ছিলনা ইহা নহে। জ্ঞানরূপ বস্তু না থাকিলে, তাহা এখন বস্তু দেখিয়া উপস্থিত হইল ইহা কোন যুক্তিতে আইসে না। তুমি বলিবে থাকিলে থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা আমার বোধের বিষয় নহে। হাঁ বোধের বিষয়। আমি সংস্কৃত জানি, সমুদায় ন্যায়শাস্ত্রে আমি ব্যুৎপন্ন, কিন্তু আমি যখন চুপ করিয়া বসিয়া আছি, তখন সংস্কৃত জানা না জানা ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন বা অব্যুৎপন্ন, মনে হয়, কিছুই বোধের বিষয় নয়। কিন্তু যাই এক জন নৈয়ায়িক আমার নিকটে আসিয়া সংস্কৃতে প্রশ্ন করিলেন, অমনই আমার মস্তিষ্ক মধ্যে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিত সংস্কৃত ও ন্যায়শাস্ত্র উভয়ই অনর্গলরূপে বাহিরে প্রকাশ পাইতে লাগিল। আইস এখন আমরা 'যোগনিদ্রা' এই মত পরীক্ষিত ব্যাপারের সঙ্গে সংলগ্ন করি, কেমন উৎকৃষ্ট তত্ত্ব আমাদিগের নিকট প্রতিভাত হইবে। আমি যখন তুষ্ণীম্ভাবে ছিলাম, অর্থাৎ সত্তামাত্রে ছিলাম, তখন আমাতে সংস্কৃত ও ন্যায়শাস্ত্র নিদ্রিত ভাবে ছিল যোগে আমার সঙ্গে অভিন্ন ভাবে স্থিতি করিতেছিল। কিন্তু যাই এক জন সংস্কৃতজ্ঞ নৈয়ায়িক আসিয়া আমায় প্রশ্ন করিলেন, তখন আমার যোগনিদ্রা ভাঙ্গিল এবং সংস্কৃত ও ন্যায়শাস্ত্র আমা হইতে স্বতন্ত্র হইয়া বাহিরে প্রকাশ পাইল।

কিন্তু এখানে জিজ্ঞাস্য, আমার সত্তা জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আমি যে সংস্কৃতজ্ঞ ও এক জন বিশিষ্ট নৈয়ায়িক এ জ্ঞান আমার আছে কি না? অবশ্য আছে। না থাকিলে আমি প্রশ্ন করিবামাত্র উত্তর দানে কৃতসংকল্প হইব কেন? সুতরাং সিদ্ধান্ত হইতেছে সত্তার সঙ্গে জ্ঞান ছিল। এ দেশের নির্গুণ ব্রহ্মবাদিগণ এই জন্যই চিৎসত্তা স্বীকার করিয়াছেন। ঈশ্বর নিত্য বোধস্বরূপ ইহা বৌদ্ধেরাও অস্বীকার করিতে পারেন না।

যদি একটি স্বরূপ নির্দ্দোষ ভাবে দাঁড়াইল, এখন আর আর স্বরূপ গুলি দাঁড় করান কিছু কঠিন ব্যাপার নহে। আমাদিগের প্রবন্ধ প্রমাণাতিরিক্ত না হয়, এ জন্য আমরা একটি সহজ পন্থা অবলম্বন করিয়া এক ইচ্ছার সঙ্গে প্রেমকে সংযুক্ত করিয়া এক যোগে দুইটিকে স্থির করিব। প্রেম অভিপ্রায় এবং সেই অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করা ভগবানের ইচ্ছা। ক্রিয়া শত সহস্র অসংখ্য, অভিপ্রায় এক প্রেম বা মঙ্গল। যখন অভিপ্রায় এক অপরিবর্ত্তনীয়, তখন ইচ্ছাও এক অপরিবর্ত্তনীয়। জগতে অনেক প্রকার ক্রিয়া প্রকাশ পাইতেছে, তোমার আমার তদ্বিষয়ে শত ভিন্ন অভিপ্রায় হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায় মঙ্গল। তাঁহার এক মঙ্গল অভিপ্রায়ে সহস্র প্রকার ক্রিয়া হইলেও অভিপ্রায় ও ইচ্ছা একই রহিল, সুতরাং তাঁহাতে কোন বিকার উপস্থিত হইল না। শক্তি সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন করে না, জ্ঞানসম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতেই তৎসম্বন্ধেও নিষ্পত্তি হইয়াছে।

ঈশ্বরের সত্তার সঙ্গে সঙ্গে শক্তি আছে, যোগে অভিন্ন ভাবে আছে। যখন সৃষ্টি উপস্থিত, তখন যোগমায়া উপস্থিত। এখানে

মায়া শব্দ কেন? যোগ শক্তি বলিলেই তো হইত। হঁা হইত, কিন্তু মায়া শব্দ বলার একটি বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। যখন সৃষ্টি হইল তখন মনে হইল যাহা ছিল না তাহা হইল, এইটি মায়ার কার্য্য। মায়া কি না ইন্দ্রজাল। যাহা দেখিতেছি, যাহা ক্রমান্বয়ে হইতেছে এ সমুদায় শক্তিরূপে নিত্যকাল ঈশ্বরেতে ছিল। কিন্তু এই যে বহু আকারবিশিষ্টতা ইহা শক্তির ভোজবাজী, শক্তির খেলা। পূর্ব্বে আকার ছিল না, কিন্তু শক্তির বিচিত্র সন্নিবেশে যাহা পূর্ব্বে কেবল শক্তিমাত্র ছিল, এখন তাহা বিবিধ বেশ ধারণ করিল। এই সমুদায় নামরূপ ভেদ করিয়া একটু নিম্নে যাও, দেখিবে শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। শক্তি ভিন্ন আর কিছু না দেখা বিজ্ঞান, এবং সেই বিজ্ঞানের নিকটে মায়া আর মায়া থাকে না, সৃষ্টি শক্তিরূপে প্রতিভাত হয়।

এ মায়ার নাম যোগমায়া কেন? যোগমায়া এই জন্য যে এক নিমেষের জন্যও ভগবানের সঙ্গে যোগ কাটে না। এত বাহিরে ধূমধাম, অথচ ইনি ঈশ্বরের সঙ্গে এক যোগে অবস্থিতি করিতেছেন, এক যোগে না থাকিলে আরও কোটি কোটি বিচিত্র সৃষ্টি প্রসূত হইবে কি প্রকারে? এ যাহা বলা হইল, ইহা রূপক নহে। ইহা যে রূপক নহে, বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানশাস্ত্র ক্রমান্বয়ে তাহাই সপ্রমাণ করিতেছে।

আচ্ছা যোগমায়া যখন আসিলেন, তখন কি যোগনিদ্রা একেবারে ভঙ্গ হইল? না। এ যোগনিদ্রা অনন্ত কাল চলিবে। অনন্ত শক্তির যখন অনন্ত বিকাশ তখন অনন্ত কাল অভিন্নযোগে অর্থাৎ যোগনিদ্রায় প্রকাশ পাইবার যোগ্য বিষয়সমূহ থাকিবে। সুতরাং যোগনিদ্রারও বিরাম নাই, যোগমায়ারও বিরাম নাই।

আচ্ছা আমার সত্তার সঙ্গে অভিন্ন ভাবে নিদ্রিতাবস্থায় অবস্থিত সংস্কৃত ও ন্যায় বিষয়ক জ্ঞান নৈয়ায়িকের প্রশ্নে জাগ্রৎ হইল। এখানে কে বাহির হইতে আসিয়া আমার যোগনিদ্রা ভঙ্গ করিল, ভগবান্‌কে কে এরূপে প্রেরণা করে? তাঁহার প্রেরক আর কেহ নাই, নিজের অনন্ত মঙ্গল ইচ্ছা। তিনি যখন নিজবোধস্বরূপ, তখন তাঁহাতে অনন্তশক্তি নিদ্রিত আছে, তাহা তিনি জানেন, তাই নিজ ইচ্ছাযোগে সে সমুদায়কে নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ করেন, এবং ক্রমান্বয়ে বিচিত্র সৃষ্টি প্রকাশ পাইতে থাকে। তুমি আমি ভগবানেতে অপরিমেয় কাল পূর্ব্বে নিদ্রিত ছিলাম, শক্তিরূপে ছিলাম, আজ আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছি, আরও এখন তাঁহাতে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তি নিদ্রিত আছে কে তাহার সংখ্যা করিবে। যখন তাহাদের সময় হইবে, তাহারা কার্য্যক্ষেত্রে প্রকাশ পাইবে। আচ্ছা আমাতে যে জ্ঞান নিদ্রিত থাকে, যেমন দৃষ্টান্তস্থ সংস্কৃত ও ন্যায় বিষয়ক জ্ঞান, উহা তো উপার্জ্জিত, বস্তু সাহায্যে উৎপন্ন, ভগবানেতে তাহা যখন অসম্ভব তখন এ দৃষ্টান্ত খাটে কৈ? তুমি যদি জানিতে তোমাতে অনুপার্জ্জিত কত শক্তি ও আশ্চর্য্য জ্ঞান নিদ্রিত আছে তাহা হইলে এ কথা কখন বলিতে না। সে সকল বিষয় আজ আর উল্লেখে নিষ্প্রয়োজন। কেন না প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, এই যে 'আমি আছি জ্ঞান' ইটি স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান কি না *? যদি হয়, জ্ঞানের স্বতঃস্থিতি প্রমাণিত হইল। ঈশ্বরের সত্তার সঙ্গে সঙ্গে যদি জ্ঞান থাকে তবে তাঁহাতে যাহা কিছু আছে, সকলই তাঁহার জ্ঞানের বিষয়।

* কেহ কেহ বলিবেন, বাহিরের বস্তুর সহিত প্রতিঘাতে এ জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয়। কিন্তু 'আমি' এ জ্ঞান না থাকিলে বাহিরের সঙ্গে প্রতিঘাতের বোধ কি প্রকারে হইবে?

মন্ত্র।

মন্ত্রের এক অর্থ ঈশ্বর-বাচক শব্দ—আর এক অর্থ গুহ্য বিষয়। ঈশ্বর নিরুপাধি তাঁহার আপনার নির্দ্দিষ্ট কোন নাম নাই। মানুষেরা শক্তি ও ভাবানুসারে তাঁহার নাম রাখিয়াছে, ঈশ্বরের স্বরূপ ও শক্তি অনন্ত। তাঁহার নামও অনন্ত। নামে কোন উপকার হয় না উপকার হয় ভাবে। ভাবশূন্য ঈশ্বরশব্দ, আর বৃক্ষ শব্দ দুই তুল্য। অতএব মন্ত্র উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে সেই উচ্চারিত শব্দের ভাবটি হৃদয়ে মুদ্রিত হওয়া চাই। কিন্তু মন্ত্র সকল যে ভাবে রচিত হইয়াছে ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহা দ্বারা সে আশা পূর্ণ হইবার কোনই উপায় নাই। একতঃ মন্ত্র সকল অভিধানের প্রচলিত কোন শব্দ নহে, উহা তান্ত্রিক বা তন্ত্রশাস্ত্রপ্রণেতা-দিগের মনঃ কল্পিত প্রহেলিকা। সুতরাং তাহার ভাব ও শক্তি অপ্রচলিত। অভিধানে যাহার কোন ভাব লাভ করা যায় না, তাহা কাজেই প্রহেলিকা মাত্র হইবে। দ্বিতীয়তঃ মন্ত্র সকল অতি গোপনে গৃহীত ও উচ্চারিত হইবার রীতি, এক জন অন্য জনের গৃহীত মন্ত্র শ্রবণ করিবার অধিকারী নহে, যে ব্যক্তি মন্ত্র গ্রহণ করে, সেও সে মন্ত্র অন্য লোকের নিকটে অপ্রকাশ রাখিতে বাধ্য। সুতরাং মন্ত্রের দেববাচকত্ব দূর হইয়া কেবল গুহ্যত্ব মাত্র শেষ রহিয়াছে। যে মন্ত্র জপ করে, শুক পক্ষীর ন্যায় ভাবশূন্য হইয়া জপ করে তাহাতে উপকার দর্শিবে কেন?

এ স্থলে জিজ্ঞাস্য এই—ঈশ্বরবোধক শব্দ যদি মন্ত্র হয় তবে তাহা গুপ্ত থাকিল কেন? ঈশ্বর বস্তু সকলের সাধারণ সম্পত্তি, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র, এমন কি চণ্ডাল পর্য্যন্ত ঈশ্বরের উপাসক হইবার অধিকারী তবে তাঁহার নাম গুপ্ত থাকিবে কেন? গুপ্ত রাখিয়া উপকার পাইবারই বা উপায় কি? তার পর ঈশ্বর অতি গুপ্ত বস্তু। ঈশ্বর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নহেন, মানুষেরা জগতের সাধারণ বস্তু যে প্রণালী অনুসারে গ্রহণ করে ঈশ্বরকে সে প্রণালী অনুসারে গ্রহণ করিতে পারে না। তিনি "অশব্দমস্পর্শম-রূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ" তাঁহাতে শব্দ স্পর্শরূপ রসাদি কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় নাই। তিনি শুধু ভাবের বস্তু, ভাবে তাঁহাকে বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে হইবে। সেই ভাবের অভাব হইলে বা ভাব গুপ্ত থাকিলে উপকার পাইবার আশা কোথায়? ঈশ্বরের দুজ্ঞেয়ত্ব দূর করিয়া সহজ বোধ্য করিবার জন্য আর্য্যঋষিগণ কত শত শত উপায় করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। সে স্থলে মন্ত্রের অর্থ গুপ্ত রাখিয়া উপকৃত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই? তন্ত্র ও মন্ত্রবাচ্য দেবতা গুপ্ত হইল কেন, ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে পূর্ব্বে বৈদিক সময়ের মন্ত্র কেবল ওঁঙ্কার এবং স্বাহা স্বধা স্বস্তি ইত্যাদি। ইহার একটিও তান্ত্রিক মন্ত্রের ন্যায় গুপ্ত নহে। ইহা মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থেও অর্থ সহ বিশেষ ভাবে বিবৃত হইয়াছে। সুতরাং প্রায় অধিকাংশ লোকে ইহা জানে, যাঁহারা জানেন না বুঝাইয়া দিলে তাঁহারা অনায়াসে বুঝিতে পারেন। এই মন্ত্র সকলের মধ্যে ওঙ্কারই প্রকৃত ঈশ্বরবাচক মন্ত্র। ওঙ্কারের গৌরব যেরূপ অন্য মন্ত্র সকলের গৌরব সেরূপ নহে। এই ওঙ্কার শব্দের প্রতিপাদ্য সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তা পরমেশ্বর। যাহার বাচ্য সার্ব্বভৌমিক সর্ব্বজনসেব্য তাহা গুপ্ত থাকা নিষ্প্রয়োজন এই জন্যই বৈদিক মন্ত্র ওঙ্কার গুপ্ত নহে। সকল জগতের সকল নরনারীর যদি একই ঈশ্বর হয়, তবে তাঁহার মন্ত্র ও সর্ব্বজনীন হইবে. গোপন করিয়া কোন ফল নাই। তবে গোপনে রহিল কোন মন্ত্র? গোপনে রহিল তান্ত্রিক মন্ত্র। তন্ত্র প্রণেতাদিগের দেবতা সকল তাঁহাদিগের মনঃ কল্পিত, সুতরাং ছোট ছোট। দেবতা ছোট হইল কিরূপে? দোষের জন্য বা অভাবের জন্য।

পূর্ণ বস্তু দুই বা অধিক হইতে পারে না; কেন না ইহা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ। অধিক ঈশ্বর কল্পনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেই এক ঈশ্বরকে ভাঙ্গিয়া কল্পনা দ্বারা ছোট ছোট ঈশ্বর প্রস্তুত করিতে হয়। বড় ঈশ্বরকে ছোট করিলে তাঁহার ঐশ্বর্য্য ও গৌরবের লাঘব না করিলে হয় না। এই জন্য তন্ত্র শাস্ত্রে প্রকাশিত অধিকাংশ ঈশ্বর, অভাবের আধার, সুতরাং ছোট ছোট, সুতরাং নিন্দিত ও অগ্রাহ্য। বড় ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনা করিলেই এই সকল দেবতার ক্ষুদ্রতা বা দোষ প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, এই জন্য একজনের উপাস্য দেবতা ও দেববাচক মন্ত্র অন্যের নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ। যাহা প্রকাশ করিতে নিষেধ তাহারই নাম মন্ত্র। দ্বিতীয় কারণ ব্যবসায়ীদিগের ব্যাবসায় রক্ষা। যাঁহারা মন্ত্রজীবী, মন্ত্র দান করিয়া যাঁহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, মন্ত্র সাধারণকে জানিতে দিলে মন্ত্রব্যবসায়ীদিগের গৌরব বিলুপ্ত হইয়া যায়, মন্ত্র গোপনে রাখিবার ইহাও একটি কারণ। আর একটি কারণ, দল প্রবর্ত্তন করিবার প্রবল স্পৃহা। এ জন্য দুই একটি মিথ্যাকে সত্যের পরিচ্ছদে আবৃত করিয়া প্রকাশ করিতে তাঁহারা সঙ্কোচিত হন না।

যদি আমরা বৈদিক কাল হইতে ধর্ম্মজগতের ইতিহাস পাঠ করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই বেদের সময়ে একটি মাত্র ওঙ্কার যাহা মন্ত্ররূপে গৃহীত হইয়াছিল তাহা আধুনিক তান্ত্রিক মন্ত্র সকলের ন্যায় গুপ্ত ছিল না। তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে জানা যায় তখন জাতিভেদ ছিল না। সকলেই ব্রাহ্মণ সকলেই আর্য্য, সুতরাং কাহারও নিকটে গোপন করিবার প্রয়োজন বোধ হয় নাই। পরে যখন সঙ্কীর্ণ ভাব আসিয়া জাতিভেদ প্রবর্ত্তিত হইল তখন হইতেই প্রকাশ্য ব্যবহৃত মন্ত্র যে ওঙ্কার তাহারও উচ্চারণের জন্য অধিকারী নির্দ্দিষ্ট হইল। শূদ্রদিগকে প্রণব উচ্চারণের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য শাস্ত্রীয় শাসন সকল প্রচলিত হইল। ইহাও অহঙ্কারমূলক দলাদলির ভাব হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছে। যাহারা অনুপযুক্ত, অজ্ঞান, তাহারা যাহাতে জ্ঞানবান্ ও উপযুক্ত হইতে পারে তাহার অনুরূপ শিক্ষা দিবার চেষ্টাই প্রকৃত হৃদয়বান্ সত্যানুরাগীর কার্য্য কিন্তু তাহাদিগকে সে অধিকার হইতে একেবারে বঞ্চিত করিবার চেষ্টা অতীব ভয়াবহ তৎপক্ষে কোন সংশয় নাই।

যাঁহারা গোপনে মন্ত্র [illegible] গ্রহণ ও সাধন করেন,তাঁহারা অগৃহীতমন্ত্র ব্যক্তিকে বলেন,"মন্ত্র গ্রহণ করিবার উপকারিতা আছে, উপকার হয় কি না গ্রহণ করিয়া দেখ।" যাঁহারা স্পর্দ্ধার সহিত মন্ত্রের উপকারিতা স্বীকার ও ব্যক্ত করেন, আমরা তাঁহাদিগের জীবন সাধারণ লোকদিগের জীবনের ন্যায়ই দূষিত দেখিতে পাই। যদি দেখিতে পাইতাম একজন মহাপাপী মন্ত্র গ্রহণ করিবামাত্র সমুদয় পাপপ্রবৃত্তি হইতে মুক্তিলাভ করিল, তাহার জীবনে পাপের দৌরাত্ম্য অসম্ভব হইল, তাহা হইলে মন্ত্রের দিব্যশক্তি স্বীকার করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহার যখন আশা নাই, তখন মন্ত্রকে আর অনুচিত মর্য্যাদা দিয়া প্রয়োজন কি? এ স্থলে মন্ত্রজীবী যদি বলেন "সাধন করিতে হইবে, বিনা সাধনে সে ধন মিলে না।" তাহা হইলে সেটা সাধনের বল কিন্তু মন্ত্রের নহে। যদি সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিতে হয়, প্রচলিত হরিনামাদি প্রকাশ্যভাবে সাধন করিলেও সকলেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে ও করিয়াছে। হরিদাস প্রভৃতি মহাভক্তগণ তাহার প্রমাণ। মন্ত্র গ্রহণের এই অনিষ্টকর প্রহেলিকা নিবারণ করিবার জন্যই ভক্তির অবতার চৈতন্যের প্রকাশ এবং তাঁহা হইতে প্রকাশ্য নাম সঙ্কীর্ত্তনের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, চক্ষুষ্মান লোকেরা যদি ইহা দেখিয়াও না দেখেন তবে আর উপায় কি?

মন্ত্রজীবীদিগের আর এককথা ঈশ্বর দর্শন। ইহাও এক প্রহেলিকা। মন্ত্র জপ করিলে অদৃশ্য ঈশ্বর দৃশ্য হন কিরূপে তাহা তাঁহারা সপ্রমাণ করিতে প্রস্তুত নহেন। কিন্তু অকুণ্ঠিতভাবে সব দেবদেবী ও মৃত ব্যক্তির দর্শনের কথা লোকের নিকট ব্যক্ত করেন। যে হিন্দুশাস্ত্রে দেবদেবীর কথা বলে সেই হিন্দুশাস্ত্রেই লিখিত আছে "উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।" কল্পনা যে সত্য নহে ইহা বুদ্ধিমান লোকদিগকে বুঝাইবার প্রয়োজন ইহবে না। যাঁহারা দেবদেবী দর্শন করেন ও স্পর্শ করেন তাঁহারাও যে কল্পনা দর্শন স্পর্শ করেন তৎপক্ষে আর সংশয় কি ?

ধর্ম্মতত্ত্ব।

প্রত্যাদেশ মিলনের ভূমি, প্রত্যাদেশ নববিধানের ভূমি। প্রত্যাদেশ রূপ ভূমিতে নববিধানের জন্ম ও বিশ্বজনীন দলের উৎপত্তি। ঈশ্বর বিধাতা হইয়া অপনাকে পিতা মাতাও পরিত্রাতা বলিয়া প্রকাশ করেন এবং জগতের সমুদয় নরনারীকে এক পবিত্র সম্বন্ধসূত্রে গ্রথিত করেন। যে ঈশ্বরকে বিধাতারূপে দেখে, সেই তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়া নবজীবনে সঞ্জীবিত হয়। যে তাঁহাকে দেখে সেই তাঁহার কথা শোনে। যে তাঁহার কথা শোনে সেই তাঁহার ভক্তদিগের দলভুক্ত হইয়া কৃতার্থ হয়। এই জন্য যিনি স্বয়ং প্রত্যাদিষ্ট, অন্য প্রত্যাদিষ্টের সঙ্গে তাঁহার অনৈক্য হইতে পারে না। প্রত্যাদেশ মানুষের নহে ঈশ্বরের ; আবার মানুষও যদি ঈশ্বরের হইয়া যায়, তবে আর অনৈক্য বিবাদ বিসংবাদের অবসর থাকেনা। ঈশ্বর সার্ব্বভৌমিক, তাঁহার প্রত্যাদেশও সার্ব্বভৌমিক। তিনি নির্ব্বিকল্প প্রত্যাদেশও নির্বিকল্প। এই জন্য একজন নববিধানবিশ্বাসী অপর নববিধানবিশ্বাসীর সঙ্গে অসম্মিলন করিতে অসমর্থ। দুইজন নববিধানবিশ্বাসীর সঙ্গে পরস্পর মতভেদ হইলে নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, হয় তাঁহারা দুইজনেই প্রতারিত, না হয় একজন ভ্রান্ত। বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের এই কথাটি স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

প্রেরিতদিগের সহিত ব্রাহ্মমণ্ডলীর সম্বন্ধ একটি গুরুতর প্রশ্ন। যখন প্রেরিতদিগের প্রেরিতত্ব নববিধানের একটি অঙ্গ বিশেষ, তখন এ বিষয় পরিষ্কার রূপে না বুঝিলে কোন ব্যক্তি প্রকৃতরূপে বিধানবিশ্বাসী হইতে পারেন না। প্রায় পঞ্চবিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে যখন প্রচারক সভা প্রথমে সংস্থাপিত হয়, তখন এ সম্বন্ধে অনেক কথার আলোচনা হইয়াছিল। নববিধান প্রচারকদিগের প্রচারকত্ব কিরূপ, তাহার মূল কোথায়, তাহার স্খলন কখন হয় কি না, ব্রাহ্মসমাজে প্রচারকদিগের প্রতি কিরূপ শাসনপ্রণালী হওয়া উচিত, এবং কিরূপ ভিত্তির উপর প্রচারভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত এ সমস্ত কথা আমাদিগের আচার্য্যদেব তখন বিষদরূপে ব্যক্ত করিয়া প্রচারক সভা সংস্থাপন করেন। দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান সময়ে কয়েক জন ভ্রাতা তাহা না বুঝিয়া অথবা সে সকল সত্যের বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া সে সমস্ত মূল তত্ত্বে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইয়াছেন। নববিধানের প্রচারকগণ ঈশ্বরের আদেশে প্রচারক, তাঁহাদের কর্য্যের জন্য তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট হিসাব দিবেন, তাঁহাদের দোষ ও ক্রটির জন্য তাঁহারা প্রত্যক্ষরূপে ঈশ্বরের নিকট দায়ী। অন্যান্য ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রচারকের ন্যায় কোন ব্যক্তি বিশেষ সমাজ বিশেষ আমাদিগের প্রচারকদিগের প্রচারক পদ প্রদান করেন নাই. সুতরাং কোন মনুষ্য সমাজের নিকট আমাদের প্রচারকগণ কার্য্যের জন্য হিসাব দিতে বাধ্য নহেন, এবং তাঁহারা কখন কোন পার্থিব সভা বা মনুষ্য বিশেষের শাসনাধীন নহেন। যে কোন উদ্দেশে হউক না কেন প্রচারকদিগকে যাঁহারা শাসন করিতে বা ভয় প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ঈশ্বরের আসন গ্রহণ করিতে অভিলাষী এবং নববিধানের মূল তত্ত্বে অনভিজ্ঞ। নববিধানমণ্ডলীতে সাংসারিক নিয়ম প্রচলিত করিয়া প্রচারকদিগকে সাংসারিক প্রণালীতে শাসন করিতে চেষ্টা করা, নববিধানের প্রাণনাশে কৃতসংকল্প হওয়া সমান। প্রচারকগণ মণ্ডলীর দাস ইহার পদসেবাই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত। যাঁহারা পদসেবা করিতে দিবেন, তাহাতে বাধা দিবেন না, তাঁহাদিগের প্রতি প্রচারকগণ চিরকৃতজ্ঞ থাকিয়া বিনীত ভাবে যথাসাধ্য দাসের ন্যায় প্রভুদিগের আদেশ পালন করিবেন। যে স্থানের লোক সে অধিকার দিবেন না, প্রচারকদিগকে দূর করিয়া দিবেন, আমাদিগের অগ্রগামী নেতা ঈশার আদেশানুসারে তাঁহারা সে স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করিবেন। যাঁহারা দুঃখী প্রচারকগণ অথবা তাঁহাদিগের স্ত্রী পুত্রদিগের মুখ পানে তাকাইয়া ঈশ্বরের নামে এক কপর্দ্দক দান করিবেন প্রণতমস্তকে তাহা গৃহীত হইবে। ভগবান্ সে জন্য দাতাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন, কিন্তু যাঁহারা যে কারণে হউক না কেন বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে অন্ন বস্ত্র দেওয়া অন্যায় মনে করিবেন, সে জন্যও প্রচারকগণ তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। প্রচারকগণ কোন কালে কাহার অর্থসাপেক্ষ ছিলেন না, এবং কখন থাকিবেন না। এখন যদি আমাদিগের দাতারা ভয় প্রদর্শন

জন্য দান বন্ধ করিতে চান, সে জন্য প্রচারকপরিবার কখন অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবেন না। যে অপূর্ব্ব নিয়মে এই ঘোর অন্ধকারের সময়, এত বিরোধের মধ্যে, এত গুলি লোক প্রতিপালিত হইতেছেন, তাহাতে যে ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাদের ভার গ্রহণ করিয়াছেন সে বিশ্বাস আমাদের খুব দৃঢ় হইয়াছে। আমরা কখন বর্ত্তমান সময়ে এক দিনের জন্যও সম্মিলনের বিরোধী নহি। আমরা আরও প্রেমিক হই, আরও পবিত্র হই, ইহা আমাদিগের নিতান্ত কামনা। এ জন্য আমাদিগের ভ্রাতারা সকলে সহায় হউন, কিন্তু প্রচারকদিগকে ভয়প্রদর্শন বা অযথা শাসন করিবার অভিলাষে ধর্ম্মের মূলে হস্তক্ষেপ করিতে গিয়া কাহাকে নববিধানের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে দেখিলে আমরা অত্যন্ত ব্যথিত-হৃদয় হইব।

আলেগজেন্দ্রিয়া নগরে এস্‌লামধর্ম্ম প্রচার।

ঈশ্বরপ্রেমিক ধর্ম্ম প্রচারকগণ যে স্থানে গমন করেন সেখানে প্রেম শান্তি কুশল বিস্তার করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পদার্পণে দেশের শ্রী ও কল্যাণ হয়। লোকের জ্ঞানোদয় ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি ও আনন্দ উল্লাস হয়। কিন্তু পূর্ব্বতন এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারকগণের পদার্পণে লোক সকল ত্রাহি ত্রাহি করিয়াছে। যে দেশে তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া গিয়াছেন, লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারাইয়াছে, স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা বন্দী হইয়া দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়াছে, ধন মান সুখ সম্পত্তি স্বাধীনতা একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে কেবল হাহাকার ও রোদন ধ্বনি উঠিয়াছে, হুলস্থূল পড়িয়াছে। দাবানল যেমন অরণ্যানীকে দগ্ধ করে তদ্রূপ এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারক বীর পুরুষগণ যে ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত দেশে উপস্থিত হইয়াছেন সে দেশ ছারখার ও শ্মশান ভূমি তুল্য করিয়াছেন। খলিফা ওমরের সময়ে বহু সহস্র এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারক বা বীর পুরুষ প্রবল পরাক্রমে রোম রাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক সম্রাট্‌কে রাজ্যচ্যুত করেন। সেই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের কোটি কোটি লোকের লাঞ্ছন ও দুর্গতির এক শেষ হয়, বহু লক্ষ লোক তাঁহাদের সুতীক্ষ্ণ তরবালের আঘাতে প্রাণ ত্যাগ করে। প্রবল ঝটিকায় সঞ্চালিত ভয়ঙ্কর দাবানল সদৃশ দুর্দ্দমনীয় মোসলমান্ প্রচারকদলকে সম্রাটের দশপনের লক্ষ সৈন্য বাধা দিয়া নিবারণ করিতে পারে নাই। এস্‌লাম বীরপুরুষগণ সেই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য অধিকার পূর্ব্বক তথায় এস্‌লাম ধর্ম্ম স্থাপন ও গির্জ্জা সকল ভাঙ্গিয়া মস্‌জেদে পরিণত করেন। পরে ওমরের আদেশে তাঁহাদের এক দল প্রচারক বা সৈন্য ইজিপ্‌টে যাইয়া আক্রমণ করে ইজিপ্‌টের অধিপতি আরলড়ুলয়স সংগ্রামে পরাস্ত হইয়া আলেগ্‌জেণ্ড্রিয়া নগরীতে পলায়ন করেন। রাজধানী মোসলমানদিগের হস্তগত হয়। পরে মোসলমান সৈন্য দলের খালেদ নামক দুর্জ্জয় বীর পুরুষ সেনাপতির পদ গ্রহণ পূর্ব্বক অল্প সংখ্যক সৈন্য বা প্রচারক সহ আলেগ্‌জেণ্ড্রিয়া নগরে গিয়া আক্রমণ করেন। ইজিপ্টাধিপতি আরলড়ুলয়স উদ্দাম তরঙ্গের ন্যায় মোসলমান সেনাদিগের আক্রমণে তথায়ও স্থির থাকিতে না পারিয়া রজনীতে পলাইয়া যান। নগরবাসী প্রধান প্রধান লোক অনন্যোপায় হইয়া প্রাতঃকালে সন্ধি স্থাপন পূর্ব্বক প্রাণরক্ষার জন্য খালেদের শরণাপন্ন হয়। রোমের সম্রাট্ ও তাঁহার প্রজাবর্গ এবং ইজিপ্টের রাজা ও তাঁহার প্রজা খ্রীষ্টবাদী ছিলেন। আলেগ্‌জেন্দ্রিয়া নগরে সম্ভ্রান্ত লোকগণ খালেদের নিকটে আসিয়া শরণাপন্ন হইলে যেরূপ কথোপকথন ও নির্দ্ধারণ হইল, "মেসর বিজয়" নামক প্রসিদ্ধ আরব্য ইতিহাস গ্রন্থ হইতে [illegible] অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল। নগরবাসিগণ বিনয় করিয়া বলিল "হে আমির" আপনাদের, বিশুদ্ধ ভাব ও খাটি অন্তঃকরণের জন্য ঈশ্বর আমাদিগের উপর আপনাদিগকে জয়ী করিয়াছেন, যেহেতু আপনারা এমন একদল যে পরমেশ্বর আপনাদের অন্তরে দয়া স্থাপন করিয়াছেন, আমরা ইচ্ছা করিতেছি যে আপনারা আমাদের প্রতি ন্যায়াচরণ করুন্ ও আমাদের প্রতি করুণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করুন্, আপনাদের পূর্ব্ববর্ত্তী রোমীয় লোকেরা যেমন আমাদের প্রতি ন্যায়াচরণ করিয়াছেন আপনারাও তদ্রূপ ন্যায়ানুসারে আদেশ করুন্।" খালেদ বলিল "হাঁ, আমরা সেই লোক, নিশ্চয় ঈশ্বর আমাদের অন্তরে দয়া স্থাপন করিয়াছেন, তিনি আমাদের ধর্ম্মের নিদর্শনানুসারে আমাদিগকে জয়যুক্ত করিয়াছেন এবং শত্রুকুলের বিরুদ্ধে সহায়তা করিয়াছেন, সমুদয় পরাজিত নগরের অধিবাসীদিগের প্রতি আমরা যেরূপ আচরণ করিয়াছি তোমাদিগের প্রতি সেইরূপ আচরণ করিব। এইক্ষণ আমরা ইচ্ছা করিলে তরবালের সাহায্যে তোমাদের নগরে প্রবেশ করিতে পারি। হাঁ আমাদের সম্বন্ধে সেই অধিকার আছে। কিন্তু যাহারা সাম্যভাব অবলম্বন ও ক্ষমা করে তাহাকেই মানব শ্রেষ্ঠ বলে। এইক্ষণ তোমাদের সম্বন্ধে আমরা ইচ্ছা করিতেছি যে তোমাদের জীবনের জন্য ও তোমাদের পরিবারের পরিণাম ও পুত্রকন্যাদিগের জীবনের জন্য ও তোমাদের উচ্চতর সম্পত্তির জন্য লক্ষ দিনার (মুদ্রাবিশেষ) যোগে তোমাদের সঙ্গে সন্ধি বন্ধন করিব, তৎপর এসলামধর্ম্ম ঈশ্বরের একত্ববাদ ও হজরত মোহম্মদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মবিধি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিব। যাহারা তাহা স্বীকার করিবে আমাদের জন্য যাহা কিছু আছে তাহা তাহাদের ও আমাদের নিকটে যাহা আছে তাহা তাহাদের হইবে, এবং তোমাদের যে সকল লোক এস্‌লাম ধর্ম্ম অগ্রাহ্য করিবে আগামী বৎসর হইতে তাহাদের প্রত্যেক বয়ঃ প্রাপ্ত ব্যক্তি হইতে জজিয়ানামক কর স্বরূপ বার্ষিক চারি মুদ্রা (দিনার) গ্রহণ

করা যাইবে। তাহাদের সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহা তাঁহারা প্রতিপালন করিতে বাধ্য, যথা তোমরা এস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ না করিলে অশ্বাদি কোন পশুর উপর আরোহণ করিতে পারিবে না, মোসলমানদিগের গৃহ অপেক্ষা আপনাদের গৃহ উচ্চ করিবে না, তাঁহাদিগের নিকটে উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিবে না, এস্থানে এস্‌লাম ধর্ম্ম সত্ত্বে কোন গির্জ্জা বা দেবালয় নির্ম্মাণ করিবে না, এবং তোমাদের ধর্ম্মের যে সকল রীতি পদ্ধতি বিলুপ্ত হইয়াছে তাহা পুনরুদ্দীপন করিবে না, এবং মোসলমানদিগের সঙ্গে নীচুভাবে ও বিনম্র ভাবে সাক্ষাৎ করিবে, এবং তাঁহাদের প্রয়োজন সাধনের জন্য ও তাঁহারা আপনাদের মঙ্গলের জন্য যাহা ইচ্ছা করিবেন [illegible]নের জন্য তোমরা সত্বর হইবে। এস্‌লাম [illegible] তদ্‌ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে সম্মান করিবে। তোমাদের যে ব্যক্তি অপরাধ করিবে তাহাকে আমরা বেত্রাঘাত করিব এবং যে আমাদের কথা অমান্য করিবে তাহাকে আমরা বধ করিব আপন ধর্ম্মজ্ঞাপন উদ্দেশ্যে কটীদেশে তোমরা উপবীত বন্ধন করিতে পারিবে কিন্তু শঙ্খধ্বনি করিতে পারিবে না, ক্রুশ উর্দ্ধে স্থাপন করিতে পারিবে না। তোমাদের ধর্ম্ম ও বিরুদ্ধাচার সম্বন্ধীয় কোন বস্তু মোসলমানদিগের সম্মুখে প্রকাশ করিবে না, যখন তোমরা গির্জ্জাতে উপাসনা করিবে, উচ্চধ্বনিতে তোমারা বাইবেল পাঠ করিতে পারিবে না। তখন নগরবাসী লোকেরা বলিল হে আমির, আমাদের সম্বন্ধে আপন পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা দুষ্কর। সেই সময় খালেদ ঈষদ্ হাস্য করিয়া কোরাণোক্ত এই বচনটি পড়িলেন, যখন তাহাদিগকে বলা হইল যে ঈশ্বর যে ধর্ম্ম অবতরণ করিয়াছেন তোমরা তাহার অনুসরণ কর তখন তাহারা বলে আমরা স্বীয় পৈতৃক ধর্ম্মে স্থিতি করিতে দেখিয়াছি তাহার অনুসরণ করিব। অনন্তর তাহারা বলিল, হে আমির, আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন তাহাতে আমরা সম্মত হইলাম। পরিশেষে সেই রাজ্যে এস্‌লাম ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ও খ্রীষ্ট ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়।

আচার্য্যের উপদেশ।

বিশ্বাসের উচ্চ ভূমি।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

রবিবার ২৫ ফাল্গুন, ১৮০১ শক।

নিম্ন ভূমি হইতে অনেক দূর দেখা যায় না। কেবল উচ্চ ভূমি হইতে দূরদৃষ্টি সম্ভব। নিম্নদেশে বসিলে যদি অর্দ্ধ ক্রোশ দেখা যায় উচ্চ ভূমিতে বসিলে দশ ক্রোশ দেখা যাইতে পারে। মনুষ্য যত উপরে বসিবে তত তাহার দৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধি হইবে। জ্ঞানের ভূমি নিম্নদেশে, বিশ্বাসের ভূমি উচ্চ। বিশ্বাসের উচ্চভূমি আরোহণ করিলে ইহলোকে থাকিয়া পরলোক দেখা যায়। বিশ্বাসের ভূমি হইতে নরলোকের ব্যাপার এবং স্বর্গলোকের ব্যাপার উভয়ই দেখা যায়। বিশ্বাসী বর্ত্তমান ঘটনা সকল দেখিতে পায়। আবার ভবিষ্যতে কি হইবে তাহাও জানিতে পারে। নিম্নতল গৃহে বসিয়া থাক কেবল চারিদিকে কি হইতেছে দেখিতে পারিবে, কিন্তু ছাদের উপরে উঠ, কত বিস্তীর্ণ মাঠ, নগর গ্রাম ইত্যাদি দেখিতে পাইবে, এইরূপে যতই উপরে উঠিবে ততই কত নূতন নূতন নগর এবং নদ নদী সকল দেখিতে পাইবে। খুব উপরে উঠিলে এমন এক নূতন রাজ্য দেখিবে এমন এক মনোহর দৃশ্য দেখা যাইবে যাহা কখনও দেখ নাই এবং কল্পনাতেও ভাব নাই। প্রত্যেক বিশ্বাসী এইরূপে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে আরোহণ করিয়া আপনার অন্তরের সত্য ভাণ্ডারকে বৃদ্ধি করিতে পারেন। দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে কি হইয়াছিল অথবা দুই হাজার বৎসর পরে কি হইবে বিশ্বাসী তাহা দেখিতে পান। বিশ্বাসীর চক্ষে ভূত ভবিষ্যৎ নিকট দূর এক হইয়াছে। বিশ্বাসীরা চিরকালই এই উন্নত জ্ঞান সম্ভোগ করেন। নিম্নদেশে, নিম্ন তলায় ঘরে বসিয়া থাক দূরের বস্তু সকল দেখিতে পাইবে না, যদি দূরের বস্তু সকল দেখিতে চাও তবে উচ্চ ভূমি আরোহণ করিতে হইবে। এই জন্যই ইতিহাস পাঠে জানা যায় সময়ে সময়ে এক এক জাতি দলবদ্ধ হইয়া পৃথিবীর নিম্নভূমি পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বাসের উচ্চ গিরিশিখরে আরোহণ করিতেন। পৃথিবীর নিম্নভূমি ছাড়িয়া প্রকাণ্ড হিমালয়ের উপরে উঠিলে চক্ষু আশ্চর্য্য দৃশ্য সকল দেখিতে পায়; চারি দিকে কত নদ নদী, কত নগর, কত গ্রাম কে সংখ্যা করিবে? এখানে মুনির আশ্রম ওখানে মুনির আশ্রম, ঐ পরলোক, ঐ যোগী ঋষিদিগের তপোবন, ঐ ভক্তদিগের ভক্তির ঘাট ইত্যাদি কত অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। হিমালয়ের শিখরে আরোহণ করিলে অদ্ভুত দৃশ্য সকল দেখিয়া মন পুলকিত এবং চমৎকৃত হয়। যখন উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া এ সকল দৃশ্য ভোগ করা যায় তখন পৃথিবীতে এক শুভক্ষণ প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক জাতি মধ্যে এই বিশেষ সময় প্রকাশিত হয়। ইতিহাসের এই শুভক্ষণ গুলি আলোচনা করা আবশ্যক। যাঁহারা এ সকল শুভক্ষণে বাস করেন তাঁহারা ইহলোকে থাকিয়া পরলোক দেখিতে পান, একস্থানে দাঁড়াইয়া অনেক দূর দেখা যায়, এক কালে বাস করিয়া অনেক শতাব্দী দেখা যায়। বিশ্বাসী ভিন্ন সামান্য লোকের ভাগ্যে এ সকল ঘটে না। দশ সহস্র বৎসর পরে কি হইবে সামান্য বিষয়ীরা তাহা জানিতে পারে না। কেবল বিশ্বাসের চক্ষেই ভূত ভবিষ্যৎ প্রকাশিত হয়। বিশ্বাসীরা উচ্চ

পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া বলেন ;—"ঐ দেখ পরকাল, ঐ দেখ যোগাশ্রম, ঐ দেখ ভক্তি সরোবর!" নিম্নদেশবাসীরা বলে, কৈ আমরাত কিছুই দেখিতে পাই না। বিশ্বাসীরা উচ্চস্থানে থাকিয়া বলিতেছেন ;—"ঐ দেখ মহর্ষি ঈশার বাগানে কেমন সাধুতা পুষ্প ফুটিতেছে!!" উপরের লোকেরা বলিতেছেন ;—"কেমন চমৎকার শীতল বায়ু!! কেমন আশ্চর্য্য বরফ!!" নিচের লোকেরা সংসারের রৌদ্রে, বিষয় বাসনার উত্তাপে উত্তপ্ত। তাহারা বলে ;—"স্বর্গের শীতল বায়ু কি? বরফ কি? আমরা জানিলাম না।" সেই উচ্চদেশে ভক্তগণ ভক্তিরসে মত্ত হইয়া কত আমোদ করিতেছেন, তাঁহারা দেখিতেছেন পরলোকবাসী সাধুরা কেমন আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। নীচের লোকেরা বলে, "কে নাচে, কে গান করে, আমারত কিছুই দেখিতে পাই না।" সময়ে সময়ে উপরের লোকেরা তাঁহাদিগের মনের কথা পুস্তকাকারে লিখিয়া পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। পৃথিবীর লোকেরা তাহা পড়ে, কণ্ঠস্থ করে কিন্তু তাহার ভাব বুঝিতে পারে না। মানুষের সামান্য বুদ্ধি স্বর্গের কথা বুঝিতে পারে না। অবিশ্বাসীর নিকট সে সকল কথা দুর্ব্বোধ। যখন শত শত লোক বিশ্বাসের পর্ব্বতের উপরে দাঁড়ায় তখন ঈশ্বরের প্রত্যেক কথা জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় আসিয়া তাহাদিগকে জীবন্ত করে। তাহারা সহজে ঈশ্বরের কথা শুনিতে পায়। এ সকল শুভক্ষণে ক্রমশঃ গ্রাম, নগর এবং সমস্ত দেশ পরিত্রাণ লাভ করে। এইরূপে দেশে দেশে হইয়াছে, বঙ্গ দেশেও সেই সময় আসিয়াছে। পরলোকের প্রতি দৃষ্টি করিবার সময় আসিয়াছে। বঙ্গদেশ এখন নববিধানের আশ্রয় লাভ করিয়াছে। ঈশ্বর কি আগে ছিলেন না? ছিলেন। তিনি হিমালয়ের উপরে মুনি ঋষি তপস্বীদিগকে দেখা দিতেন। নিম্ন পচা অবিশ্বাসের ভূমিতে আসিয়া ঈশ্বর কাহাকেও দেখা দেন নাই। অতএব তাঁহাকে দেখিবার জন্য চিরকালই বিশ্বাসের উচ্চ শিখরে উঠিতে হইবে। শুভক্ষণ আসিয়াছে। ঈশ্বর যে গিরিরাজ হইয়া কেবল হিমালয়ে বসিয়া আছেন তাহা নহে। তিনি চিরকালই সর্ব্বব্যাপি, দেশেতে এবং কালেতে অনন্ত; কিন্তু তিনি জ্ঞানের নিম্ন ভূমিতে দুষ্প্রাপ্য। বিশ্বাসের উচ্চভূমি আরোহণ না করিলে তাঁহাকে দেখা যায় না। ঐ দেখ কোটি কোটি লোক মান, সম্ভ্রম এবং বিদ্যার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতেছে; আর দেখ একটি ক্ষুদ্র দল হিমালয়ের দিকে বেগের সহিত প্রধাবিত হইতেছে। ঐ উচ্চ পর্ব্বতের উপরে স্বর্গ হইতে এমনি উজ্জ্বল আলোক পড়িয়াছে যে তাঁহারা সেই দিকে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছেন। আর সেখানে উঠিয়া চীৎকার করিতে করিতে নিম্নস্থ লোকদিগকে বলিতেছেন ;—"স্বর্গরাজ্য দেখা যাইতেছে, স্বর্গরাজ্য দেখা যাইতেছে, সকলে উপরে উঠিয়া এস।" যে সকল লোক বিশ্বাসের পর্ব্বতে উঠিতেছেন, এই পৃথিবীর নির্ব্বোধ লোকেরা তাঁহাদিগকে উপহাস করিতেছে কত কটুকথা বলিতেছে, কত প্রকারে নির্যাতন করিতে চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু ঈশ্বর স্বয়ং নেতা হইয়া তাঁহাদিগকে উর্দ্ধ হইতে উর্দ্ধতর স্থানে লইয়া যাইতেছেন। ঈশ্বর চিরকালই মনুষ্যের কাছে বসিয়া আছেন; কিন্তু এই নববিধানে তাঁহার বিশেষ প্রকাশ হইতেছে। এই সময়ে ঈশ্বর সংসারের ঘটনাবলীর মধ্যে ভক্তদিগকে দেখা দিতেছেন। এখন ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মবাণী শ্রবণ, পরলোকবাসীদিগের সঙ্গে সম্মিলন সুলভ হইয়াছে। ইতিহাস মধ্যে এইরূপ শুভ [illegible] অতি বিরল। অতএব, বঙ্গবাসীগণ, সময়োচিত সাধন [illegible] কর। এমন সৌভাগ্য চন্দ্রকে অবহেলা করিও না। [illegible] হাতের ভিতরে। বঙ্গবাসী, উঠ, আর সংসারের নিম্ন ভূমিতে থাকিও না। স্বর্গরাজ্য আসিতেছে, নূতনতর বিধানের গান হইতেছে। এই সময়ে আনন্দধ্বনিতে বিধানের গান কর।

গাজিপুরস্থ শ্রদ্ধেয় বন্ধু হইতে প্রাপ্ত।

বিনীত প্রণাম গ্রহণ করুন—

আপনাকে এক শুভ সংবাদ দিতেছি, আমাদের ভক্তিভাজন পাওহারি বাবা প্রায় ৫ বৎসর পরে বাহির হইয়াছেন, এবং একটি মহৎ ব্রত উদযাপন করিয়াছেন। এই উপলক্ষে এক যজ্ঞ হইয়াছিল, নানা স্থান হইতে অনেক সাধু মহাত্মার সমাগম হইয়াছিল। ইঁহারা এখানে প্রায় চারি পাঁচ দিন ছিলেন, মধ্যে মধ্যে সকলে একত্র হইয়া পাওহারি বাবার সহিত সদালাপ করিতেন। এই সভা অতি মনোহর দৃশ্য ধারণ করিয়াছিল। যাহা এ সময়ে দেখা যায় না। এই যজ্ঞ উপলক্ষে যে দিন তাঁহার প্রথম বাহির হইবার কথা সে দিন প্রায় কুড়ি হাজার লোক তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি সে দিন বাহির হন নাই। অনেক লোককে সেই দিবস পরিতোষরূপে ভোজন করান হয় ও বিদেশী সাধুদিগকে বস্ত্রাদি দেওয়া হইয়াছিল। ২৩ শে জুলাই সোমবার এই কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। তাহার পর দিবস হইতে বাবাজি প্রতি দিন বাহির হইতেছেন, এবং প্রত্যহ অসংখ্য লোক তাঁহাকে দেখিয়া যাইতেছে, ইতিমধ্যে আমার সহিত তাঁহার দুই বার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আর তাঁহার বাহির হইবার কিছু দিন পূর্ব্বে ঘরের ভিতর হইতে দুই একটি লোকের সহিত কথা কহিয়াছিলেন, এই সংবাদ পাইয়া আমি এক দিন সন্ধ্যার সময় সেখানে উপস্থিত হই, এবং আমারও সঙ্গে ঘরের ভিতর হইতে কথা কহিয়াছিলেন। প্রথমেই আমা-

দের পূজনীয় স্বর্গীয় আচার্য্য মহাশয়ের সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং তাঁহার কার্য্যপ্রণালী কিরূপে নির্ব্বাহ হইতেছে বিশেষ আগ্রহের সহিত তাহা শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক প্রচারক মহাশয়গণের (যাঁহার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল) সকবের নাম করিয়া তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং আমাকে কহিলেন, "দাসের" সাষ্টাঙ্গ সকলকে লিখিবেন। আর কহিলেন, স্বর্গীয় আচার্য্যদেবের উপদেশ সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ যদি সংস্কৃত ভাষায় থাকে, তবে তাহার একখানি পাইলে দাস কৃতার্থ হইবে। এই শুভ সংবাদ আপনি অনুগ্রহ করিয়া পূজনীয় প্রচারক মহাশয়গণকে জানাইবেন।

গাজিপুর, ৩১ শে জুলাই। } স্নেহাকাঙ্ক্ষী— শ্রীগগনচন্দ্র রায়।

সংবাদ।

আগামী ১১ই ভাদ্র রবিবার ব্রহ্মমন্দিরে সমস্ত দিনব্যাপী ব্রহ্মোৎসব হইবে। প্রাতে ৭ টার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ৯॥ টা পর্য্যন্ত, সংগীত, উপাসনা, প্রার্থনা, আলোচনা, পাঠ, ধ্যান, সংকীর্ত্তন প্রভৃতি কার্য্য ক্রমান্বয়ে চলিবে। বিদেশস্থ প্রচারক মহাশয়দিগকে উৎসবে যোগ দিবার জন্য শ্রীদরবার হইতে পত্র লেখা হইয়াছে।

মুঙ্গেরস্থ আমাদের বিধানবিশ্বাসী ভ্রাতা দ্বারিকানাথ বাগচি মহাশয়ের কার্য্য প্রণালী অবগত হইয়া আমরা বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি। ইনি বেস উৎসাহ ও নিষ্ঠার সহিত মুঙ্গের এবং জামালপুর ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। মধ্যে তিনি মুঙ্গেরের সবডিপুটি বাবু ভূপেন্দ্রনাথ রায় মহাশয়ের কন্যার নামকরণ নবসংহিতার ব্যবস্থামতে সম্পাদন করিয়াছেন। ভূপেন্দ্র বাবুর এই পারিবারিক অনুষ্ঠানের জন্য আমরা বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছি। দয়াময় ঈশ্বর তাঁহাকে এবং তাঁহার প্রিয়তমা কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করুন।

এত বাধা বিঘ্নসত্ত্বেও পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও নববিধান প্রচার কার্য্য বেস চারি দিকে ভাল রূপে সম্পাদিত হইতেছে দেখিয়া আমরা বড় আনন্দ অনুভব করিতেছি। ভাই প্রাণকৃষ্ণ ঘাটাল, চন্দ্রকোণা প্রভৃতি স্থান হইতে লিখিয়াছেন, "এ অঞ্চলের লোকেরা ব্রাহ্মধর্ম্ম কি তাহা কিছুই জ্ঞাত নহেন, বরং ব্রাহ্মদিগের সম্বন্ধে তাঁহাদিগের কুসংস্কার ছিল। আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা হইয়া এবং আমাদের সংগীত ও উপাসনা প্রভৃতি দর্শন ও শ্রবণ করিয়া তাঁহারা বিশেষ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়াছেন।" অপনার দ্বারা অনেক উপকৃত হইলাম বলিয়া তাঁহারা আমাদের ভ্রাতাকে যথেষ্ট আদর ও সম্মান করিয়াছেন। ভাই প্রাণকৃষ্ণ এখন মেদিনীপুরে আছেন। ভাই বলদেব নারায়ণ ভাগলপুর ছাড়িয়া মুঙ্গের ও গয়ায় কিছু দিন থাকিয়া লক্ষ্ণৌ গিয়াছেন। তিনি সেখানে দুই মাস থাকিবেন এমন ইচ্ছা করিয়াছেন। ভাই গিরিশচন্দ্র এবার আসাম প্রদেশের শেষ সীমা পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। ভাই নন্দলাল উড়িষ্যার সমস্ত দেশ ঘুরিতেছেন। ভ্রাতা লক্ষ্মণচন্দ্র পাণ্ডা যে যে স্থানে যাইতেছেন সেই সেই স্থান হইতে তাঁহার কার্য্যের খুব প্রশংসাসূচক সংবাদ আসিতেছে। ভাই উমানাথ সিমলা পাহাড়ে কয়েকটি ভাইকে লইয়া সাধন ভজন করিতেছেন। ভাই বঙ্গচন্দ্র কয়েকটি ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া মুরাদনগর গমন করিয়াছিলেন। ভাই প্যারীমোহন চট্টোগ্রামে প্রচার করিতেছেন। ভাই রামচন্দ্র দিনাজপুর, রংপুর কুড়িগ্রাম পরিদর্শন করিয়া জলদিবাড়ী গিয়াছেন। এই সকল প্রচারকগণের উৎসাহপূর্ণ প্রচার বিবরণ পাঠ করিলে কাহার মনে না আশার সঞ্চার হয়? দয়াময় ঈশ্বর যখন তাঁহার নববিধানকে পৃথিবীতে জয়যুক্ত করিবেন ইচ্ছা করিয়াছেন, তখন কাহার সাধ্য ইহাকে বাধা দেয়।

গত ২৭ শে শ্রাবণ শুক্রবার মঙ্গলগঞ্জ প্রচারআশ্রমে শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আসের কন্যার নামকরণ হইয়াছে। ভাই অমৃতলাল বসু কেদারনাথ দে এবং ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল এই অনুষ্ঠানোপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছিলেন। কন্যার নাম শ্রীমতী সুপ্রভা রাখা হইয়াছে। দয়াময় ঈশ্বর কন্যাকে এবং তাঁহার জনক জননীকে আশীর্ব্বাদ করুন।

আমাদিগের শ্রদ্ধেয় ভাই কালীশঙ্কর দাস কবিরাজ মহাশয়ের দৌহিত্রের জাতকর্ম্ম নবসংহিতার বিধি অনুসারে বিগত ২০ শ শ্রাবণ তারিখে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শিশুর পিতা শ্রীমান ঈশ্বরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কার্য্যানুরোধে বিদেশে থাকায় শিশুর মাতাই প্রার্থনা পাঠ করিয়াছিলেন। শিশু দয়াময়ের কৃপায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়া পরিবারস্থ সকলকে আনন্দবর্দ্ধন করুক।

সংশোধিত বিজ্ঞাপন।

আগামী ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে ১লা ভাদ্র হইতে ১১ই ভাদ্র পর্য্যন্ত মূল কোরাণের সটীক প্রশংসিত বঙ্গানুবাদ যাহা বৃহৎ তিন ভাগে সমাপ্ত হইয়াছে, ৭৲ মূল্য স্থান ৩৲ নগদ মূল্যে, এবং প্রাচীন আরব্য পারস্যাদি প্রসিদ্ধ জীবনী গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত মহাপুরুষ মোহম্মদের সুবিস্তীর্ণ জীবন চরিত যাহা তিন ভাগে সমাপ্ত হইয়াছে ৩০ মূল্য স্থানে ২৲ নগদ মূল্যে, ৫৪ নং মেছুওয়া বাজার রোড আফিস বাড়ীতে শ্রীযুক্ত কান্তিচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের দ্বারা বিক্রীত হইবে। বিদেশের জন্য ॥০ ও ৹ আনা করিয়া ডাকমাশুল লাগিবে।

নূতন পুস্তক।

নিম্ন লিখিত কয়েক খানি পুস্তক আগামী ভাদ্রোৎসব দিবসে বাহির করিবার জন্য চেষ্টা হইতেছে।

দৈনিক প্রার্থনা ৪ র্থ ভাগ ... ॥৵
(কমলকুটিরে আচার্য্যের প্রত্যাহিক প্রার্থনা)

মাঘোৎসব ১ ম ভাগ ... ||০
(মাঘোৎসব উপলক্ষে শ্রীমান আচার্য্য কেশবচন্দ্রের প্রার্থনা ও উপদেশ প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া)

প্রেম-কুসুম প্রথম ভাগ ... ।৴০
(এই খানি একটী আর্য্য নারী কর্ত্তৃক আচার্য্যের প্রার্থনা অবলম্বন করিয়া পদ্যে রচিত গ্রন্থ।)

উপাসনা সাধন ... ।৹
(ভাই কালীশঙ্কর দাস কর্ত্তৃক অতি সহজ ভাষায় বিরচিত।)

এই পত্রিকা ৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২৩ ভাগ। ১৬ সংখ্যা।	১৬ই ভাদ্র, শুক্রবার, ১৮১০ শক।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে দীনশরণ, তুমি সত্য পরম সত্য। কে বলে তুমি প্রত্যক্ষের বিষয় নও। তুমি আমাদের প্রাণের ভিতরে নিত্য বাস করিতেছ। তুমি যেমন প্রত্যক্ষ এমন আর প্রত্যক্ষ কে আছে? আমরা তোমায় দেখিয়া তোমার কথা শুনিয়া তোমার চরণপদ্মে প্রণত হইয়াছি। তুমি তোমার মনোহর রূপ দেখাইয়া আমাদিগের মন হরণ করিয়াছ, নইলে কি আমরা তোমার চরণে আত্মবিক্রয় করিতাম? প্রভো, তোমার রূপ যাহাতে আমাদিগের চক্ষের নিকটে আচ্ছাদিত হইয়া না পড়ে, তোমার কথার প্রতি আমাদিগের কর্ণ বধির না হয়, ইহার উপায় করিয়া দাও। এ সংসারে যখন আমরা আছি, তখন আমাদিগকে কত সময়ে কত অবস্থার মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। সেই সকল অবস্থা যদি আমাদিগকে চঞ্চল ও অস্থির করে, তবে তোমার প্রেমমুখ বল আমরা কি প্রকারে দেখিব। তুমি যেমন সকল অবস্থার অতীত, হে প্রভো, আমাদিগকেও তেমনি অবস্থার অতীত কর। তুমি নিত্যানন্দ, কিছুতেই তোমার আনন্দের হ্রাস বৃদ্ধি নাই, তোমার সন্তানগণ তোমার ন্যায় নিত্য আনন্দে পূর্ণহৃদয় থাকিবে, এই তাহাদিগের নিয়তি। আমরা আনন্দময়ীর সন্তান হইয়া নিরাশ নিরানন্দ হইব, এ যে, মাতঃ, আমাদিগের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। এ সংসারে শোক দুঃখ বিষাদের অনেক কারণ, মানুষ সে সকলেতে অস্থির হইবে না, অধীর হইবে না, ইহাই বা কি প্রকারে সম্ভবে? যদি আমরা আমাদিগের নিজের দিকে তাকাই, আমাদিগের ভিতরে এমন কিছু দেখিতে পাই না, যদ্দ্বারা আমরা আমাদিগের প্রকৃতিনিহিত এই দুর্ব্বলতাকে পরাজয় করিতে পারি। তুমি আমাদিগের প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান না করিলে, তোমার আবির্ভাবে আমরা পূর্ণ না হইলে, কোথা হইতে সে বল আসিবে, যে বলে আমাদিগের মন অটল স্থির অচঞ্চল থাকিবে। তুমি আমাদিগের প্রাণের ভিতরে উদিত হইয়া আমাদিগকে তোমার মত সর্ব্বপ্রকারের অবস্থার মধ্যে অচঞ্চল করিয়া দাও যে, আমরা তোমাতে নিত্য আনন্দ লাভ করিতে পারি। আনন্দময়ি জননি, আমরা তোমার সন্তান, তোমাতে আমরা পূর্ণ আনন্দ লাভ করিয়া সর্ব্বপ্রকারে সুখী হইব, এই তোমার নিত্য অভিপ্রায়। যাহাতে তোমার এই অভিপ্রায় আমাদিগেতে পূর্ণ হয়, তুমি এই প্রকার আশীর্ব্বাদ কর, এই ভিক্ষা পূর্ণ কর।

বিংশ ভাদ্রোৎসব।

এবার ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে আমাদিগের বিদেশস্থ প্রেরিত ভ্রাতৃবর্গের মধ্যে অনেকে অসুস্থতা-নিবন্ধন আসিতে পারেন নাই। উৎসবের দুদিন পূর্ব্বে কলিকাতানগরী যে প্রকার জলে প্লাবিত হইয়াছিল, রাস্তবর্ত্ম পর দিন পর্য্যন্ত যেরূপ জলে নিমগ্ন ছিল, আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন ছিল, তাহাতে উৎসবের দিনে যে আকাশ পরিষ্কৃত থাকিবে তাহার আশা ছিল না। প্রাতঃকাল যদিও সম্পূর্ণ মেঘাবরণোন্মুক্ত হয় নাই, তথাপি বর্ষণের আশঙ্কা কাহার মনে উদিত হয় নাই, বরং সূর্য্যের উত্তাপ নিবারিত হওয়াতে সুস্নিগ্ধতায় প্রাতঃকালের দীর্ঘতাই বর্দ্ধিত হইয়াছিল। আমরা কোন কালে উৎসবদিনে ভগবানের কৃপাবায়ু হইতে বঞ্চিত হই নাই, এবার কেনই বা বঞ্চিত হইব? প্রাতঃকাল ৭ টা হইতে ৮ টা পর্য্যন্ত সঙ্গীত ও সঙ্কীর্ত্তন হয়। তৎপর উপাসনা আরম্ভ হইয়া ১১টার সময় উপাসনা শেষ হয়। উপাসনার প্রথম ভাগ পরিসমাপ্ত হইলে নিম্নলিখিত আচার্য্যদেবের প্রার্থনাটী পঠিত হইয়াছিল।

"হে দীনবন্ধু, হে শান্তিদাতা, তুমি পুরুষ কি পুরুষত্ব, তুমি সুশীল কি তুমি সু, তুমি কর্ত্তা কি তুমি কর্ম্ম, তুমি বৈকুণ্ঠপতি কি বৈকুণ্ঠ, তুমি মুক্তিদাতা কি স্বয়ং মুক্তি, শাস্ত্রকারেরা ইহার বিচার করিয়াছেন, করিবেন। ও কথাতে আমাদেরও অনুরাগ আছে। হে পিতা, তোমাকে পিতা মাতা বলিয়া ডাকিলে সুখ হয়, আর তোমাকে ধন মান শান্তি সুখ বলিয়া ডাকিলেও এক রকম সুখ হয়। আমরা দুইতেই আছি। মা বলে তোমার অঞ্চল ধরিলেও সুখ আছে, আবার একটা চিদাকাশ, একটা সুখ, এ ভাবিলেও সুখ আছে। তোমাকে হাসি বলে পূজা করিলে যেমন তোমাকে ডাকিব, অমনি আমি হাসিব; আমার শরীর, আমার বাড়ী, আমার বাগানের গাছপালা, আমার দাসদাসী সকলে হাসিবে। আমি তোমাকে পূর্ণ হাসি, অনন্ত হাসি বলিয়া পূজা করিব, এই বর দাও। একখানা হাসিবিজ্ঞান, তাঁকে বলে আদ্যাশক্তি, ব্রাহ্মেরা বলে ব্রহ্ম, বৈষ্ণবেরা বলে হরি, জ্ঞানীরা বলেন চিন্ময়। হাসি বলিয়া যদি তোমাকে পূজা করি, মুখে আপনাপনি চিন্ময় হাসি আসিয়া পড়িবে; মন প্রেমানন্দে মগ্ন হইবে। বুক জোড়া হাসি তুমি। গঙ্গা যেমন উথলে পড়ে, এমন তোমার হাসি। বসন্তের ফুলের মত সাজান তোমার হাসি। তোমাকে আর কেন পুরুষ বলি? তুমি ঠিক যেন বসন্তকাল, ঠিক যেন পদ্ম। তোমাকে আর বাবা মা বলে পুরোণো রকম ডাকি কেন? তুমি এক খানা অখণ্ড হাসি, তুমি একটা অবস্থা। আমি তোর পূজা করে যে দুঃখী হব, তার সম্ভাবনা নাই, আর আমি যে তোর সাধন ভজন করে কখন অবসন্ন কাঙ্গাল হব, তারও সম্ভাবনা নাই। আমার ঘরে যে ঘর পোরা হাসি রহিল। আমাদের হৃদয়ে যে অনন্ত হাসির জ্যোৎস্না রহিল! হাসি যে আমার স্বর্গ,—শরীরের সুস্থতা, তাতে মনের আনন্দ হবে। হে পূর্ণ হাসি, হে আনন্দনাথ, তোমার ভক্ত যে দুঃখ পায় না, এই নববিধানের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য। বার বার পরীক্ষিত হয়ে হাসি জিনিষটুকু টিঁকে যাবে। পূর্ণ হাসিতে যে হেসেছে, তারই জীবন সফল! যে হেসেছে, সেই টিঁকিবে। সুখ কি পেয়েছি? তোমার সিঁদুরের মত ঠোঁট দেখে, আমার কাল ঠোঁট কি সিঁদূর হয়ে গেল, হাসিতে কেঁপে উঠিল, এ কি হয়েছে? আমি তোমার হাসিতে মিশিয়ে যাব। তুমি হাস, আর আমি হাসি। তোমার হাসি দেখি, আর আমি হাসি হয়ে যাই; এই ন্যায়শাস্ত্র, এই বেদবেদান্ত, এই ষড়দর্শন, এই ব্রহ্মজ্ঞান। আমরা পূজাঘরে যাই, হাসি সম্মুখে রাখি, হাসি শুনে আমরা হেসে ফেলি। মা, বিবেক ভিন্ন পবিত্র হাসি কে হাসিতে পারে? পাপকল্পনা কচ্চি, পাপ ভাবচি, তখন কি হাসিতে পারি? ধার্ম্মিকের মুখ ভিন্ন হাসে না কেউ। কালমুখে শয়তানী হাসি তোমার হাসি নয়। এ কেমন, শান্ত পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার মত স্বর্গ থেকে একটা স্রোত ঢেলে দিচ্চ যেন। মা, মনটা হোক্ শুদ্ধ। আমি চির দিন ভেসে যাই। হে পূর্ণ আনন্দ, আমাদের দলসম্বন্ধে পৃথিবীর লোকেরা যেন চিরকাল এই কথা বলে যে, এরা চিরকাল হেসে খেলে গিয়েছে। ছেলেমানুষের হাসি, কোলের খোকার হাসি, স্বর্গের পরীর হাসি, নববিধানের দলের লোকদের মুখে ছিল। ও ছাঁচের হাসি ত পৃথিবীর লোকের নয়। মা, তোমার হাসি মজার হাসি। মা, ঐ দুলক্ষ টাকার এক ভরি যে হাসি, তা যদি একটু পাই এইখানেই বৈকুণ্ঠ লাভ হয়। মা, অন্য কিছু চাই না, তুমি হাস, আর আমি হাসি। তুমি আমার চাঁদ হও, আর আমি তোমার ভাবের ভাবুক হয়ে তোর একটু জ্যোৎস্না হয়ে যাই। তা হলে তুইও হয়ে গেলি অবস্থা, আমিও তাই হলাম। তুইও হলি জড়, আমিও জড় হলাম। হায় হরি, সুখের হরি, প্রাণের হরি, হাসির হরি, হাসাও হরি। আর দুঃখ দিও না, ঢের দুঃখ শোক পেয়েছি। আর না। পূর্ণ হাসি হয়ে কাছে এস। আমি আর সাধন করিব না, কেবল ঐ হাসি

দেখিব। হাসি সত্য, আর সব মিথ্যা। হে আনন্দময়ী, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এত কাল যে দুঃখ কষ্টে কাঁদিলাম, তা ত্যাগ করিয়া শেষ কয়টা দিন বিবেকের হাসির পবিত্র রং ঠোঁটে লাগিয়ে হাসির প্রশংসা সঙ্গীতে বিস্তার করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রার্থনামূলক যে উপদেশ হয়, তাহার সার এই প্রকারে সংগৃহীত হইতে পারে। আজ কয়েক দিন বাহির যেমন ঘন মেঘে আচ্ছন্ন, নগর জলে প্লাবিত, আমাদিগের মণ্ডলীর অবস্থাও তদ্রূপ। এ সময়ে হাসির কথা কেন? এ তো সময়ের উপযোগী কথা নয়। হাঁ, এ সময়ই হাসির উপযোগী। এখন সাধকগণের হাসিবার সময়, ঈশ্বরেতে সমধিক আনন্দ লাভ করিবার সময়। যে সময় দুঃখ বিপদের অন্ধকারে চারি দিক্ আবৃত হয়, সেই অন্ধকারের মধ্যে ঈশ্বরের প্রেমমুখ উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়। জননী অন্ধকারের ভিতর দিয়া যখন আপনার মুখ বাড়ান, তখন সে মুখ দেখিয়া সাধকের প্রাণ গলিয়া যায়। দুঃখ দারিদ্র্য শোক যন্ত্রণা কষ্ট মৃত্যু ইহার মধ্যে যে ব্যক্তি ঈশ্বরেতে উচ্চতম সুখ না পায়, সে কখন সাধক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যদি দুঃখ দারিদ্র্য প্রভৃতি আমাদিগের পরম বন্ধু না হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপ পৃথিবীতে কখন স্থান পাইবে না। জর্ম্মণদেশীয় পণ্ডিতগণ ক্লেশ যন্ত্রণা দুঃখের কথা বলিয়া ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এমন সমুদায় কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, লোকের অবিশ্বাস নাস্তিকতা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। সে ঢেউ এদেশেও আসিয়া উপস্থিত। এ সময়ে বিধানবাদিগণ যদি নিজ নিজ জীবনে দেখাইতে না পারেন যে, ঈশ্বরে আনন্দবর্দ্ধনের জন্য এ সকল অনুকূল, এ সকল বিনা যোগানন্দে প্রবিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই, এ গুলি কেবল কাল জমীর উপরে বিচিত্র বর্ণ প্রতিফলিত করিবার জন্য বিধাতার বিধান, তাহা হইলে তাঁহারা সংশয় নাস্তিকতাকে কিছুতেই পরাজয় করিতে পারিবেন না। আমাদিগের অনেকগুলি প্রিয় বন্ধু এ সময়ে আমাদিগকে ছাড়িয়া আছেন, আমাদিগের নিন্দাবাদে তাঁহারা আমোদ লাভ করিতেছেন, এমন কি আমাদিগের নামে কলঙ্ক রটনা করিতেও ত্রুটি করিতেছেন না, মিথ্যাবাদী বঞ্চক ধূর্ত্ত অবিশ্বাসী প্রভৃতি কটু কথা তাঁহারা অনায়াসে প্রয়োগ করিতেছেন, এ সময়ে যদি আমরা মার মুখের হাসি দেখিতে না পাই, তবে যে আমাদিগের সর্ব্বনাশ; তবে যে সংশয় নাস্তিকতা আসিয়া আমাদিগকেও গ্রাস করিবে। এই তো অনুকূল সময় মার হাসিমুখ দেখিয়া হাসিবার পক্ষে। অন্ধকার আসিয়া না ঘেরিলে কি কোন দিন কেহ মার হাসিমুখ দেখিয়াছে? "আমার যে করে আশ, তার করি সর্ব্বনাশ" এ কথা কি সামান্য কথা। ঈশ্বরের যাহারা প্রিয় তিনি তাহাদিগের উপরেই বিপদ্ পরীক্ষা আনয়ন করিয়া থাকেন। অমন প্রিয়পুত্র ঈশা তিনি ক্রুশে নিহত হইলেন কেন? এমন কোন্ মহাজন মহাত্মা সাধুপুরুষ আছেন, যাঁহার জীবন ঘোরতর পরীক্ষার মধ্য দিয়া যায় নাই। যেখানে পরীক্ষা নাই, সেখানে তো উচ্চধর্ম্ম নাই, উচ্চসুখ নাই। সে দিন উপাসনা নিস্তেজ, সাধন ভজন নিস্তেজ, যে দিন পরীক্ষায় আমরা আক্রান্ত না হই। যদি কেহ বলেন, আমার ধর্ম্মজীবনে কোন পরীক্ষা উপস্থিত হয় নাই, আমি সংসারের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে আছি, তবে বুঝা গেল তিনি অধ্যাত্মজীবনের অতি নিম্ন ভূমিতে অবস্থিতি করিতেছেন। মার কথা কোন্ দিন অতিসুমিষ্ট? যে দিন সংসারের আক্রমণে হৃদয় জর্জ্জরিত। কোন্ দিন হাসিমুখ আমাদিগের নিকটে অপূর্ব্বসৌন্দর্য্যভূষিত? যে দিন বিপদ্ পরীক্ষার ঘোরান্ধকারে চারি দিক্ আবৃত। নববিধান সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে সকল অবস্থায় মার হাসিমুখ আমাদিগের নিকটে প্রকাশিত রাখিবার জন্য আসিয়াছে। সুখে সম্পদে

মাকে লোকে ভুলিয়া যায়, দুঃখে বিপদে নাস্তিক অবিশ্বাসী হয়। এ দুই অবস্থায় মার হাসিমুখ দেখা, সেই হাসিমুখদর্শনে বিপদ্‌কে বিপদ্ বলিয়া মনে না হওয়া, নববিধান জগৎকে ইহাই দেখাইবেন। আমাদিগের আচার্য্য জীবনে ইহাই দেখাইয়াছেন। যখন রোগের যন্ত্রণায় শরীর ছট্‌ফট্ করিতেছিল, তখন সেই অবস্থার মধ্যে মার হাসিমুখ দেখিয়া কি যে হাসিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহা সকলেই দেখিয়াছি। সংশয়ী নাস্তিকগণের সংশয় ও নাস্তিকতা দূর করা যখন আমাদিগের জীবনের কার্য্য, তখন নিন্দা গ্লানি অবমাননা ঘৃণা রোগ শোক বিপদের মধ্যে আমাদিগকে মার হাসিমুখ দেখিয়া হাসিতেই হইবে। যাঁহারা আমাদিগকে নিপীড়ন করেন, তাঁহারা আমাদিগের পরম বন্ধু, কেন না তাঁহারা অজ্ঞাতসারে মার হাসিমুখ দেখাইবার পক্ষে সহায় হইতেছেন। আমরা তাঁহাদিগকে হৃদয়ের সহিত আশীর্ব্বাদ করিব, এবং জননী তাঁহাদিগকে কখন বিনষ্ট হইতে দিবেন না বিশ্বাস করিয়া আবার আমাদিগের সঙ্গে মিশিয়া তাঁহারা মার নাম গান করিবেন বিশ্বাস করিব। আমাদিগের এখন যে দুঃখ ক্লেশ আছে, তাহা যদি শত গুণ আরও বর্দ্ধিত হয়, আমরা যেন তাহাতে অবসন্ন না হই। মার মুখ ভাল করিয়া দেখিবার জন্য উহা তাঁহার প্রেরিত পরীক্ষা জানিয়া আনন্দের সহিত আলিঙ্গন করিব। এখন অন্নপান আগমের যে সমুদায় দ্বার আছে, যদি মার ইচ্ছা হয়, অবরুদ্ধ হউক, আমরা আমাদিগের সন্তান সন্ততিগণের উপবাসমধ্যে মার অসীম করুণা দর্শন করিয়া তাঁহার হাসিমুখের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই দেখিব। তিনি সর্ব্বদা হাসিতেছেন, আমরাও হাসিব। কোন প্রকার অবস্থায় যেমন তাঁহাতে হাসির পরিবর্ত্তন হয় না, আমাদিগেরও তাহাই হইবে। লোকে বৈরাগ্যকে কঠোর বলিয়া পরিহার করিতে যায়, কিন্তু যেখানে বৈরাগ্য নাই, সেখানে মার হাসি দেখিবারও অবকাশ নাই। বিলাস, বাসনা, পাশ্চাত্য দূষণীয় আচার ব্যবহার যাহাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিষয়াসক্ত করিতেছে, তাহাদিগের ঈশ্বরে আনন্দিত হইবার সম্ভাবনা কোথায়? যাহারা অবস্থার অধীন তাহারা সকল অবস্থায় জননীর হাস্যমুখ কি প্রকারে দর্শন করিবে? মা আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আমরা সম্পূর্ণরূপে বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত হইয়া সর্ব্বাবস্থায় তাঁহার হাসিমুখ দেখিতে পাই।

বেলা দুটার সময়ে ভাই রামচন্দ্র সিংহ মাধ্যাহ্নিক উপাসনার কার্য্য করেন। তৎপর ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত বৈরাগী রঘুনাথ দাসের জীবনী পাঠ করেন। দাস রঘুনাথের অলৌকিক বৈরাগ্যের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া সকলেরই হৃদয় আর্দ্র হয়। তদনন্তর ধ্যান, ব্যক্তিগত প্রার্থনা এবং পরিশেষে সায়ংসঙ্কীর্ত্তন হয়। ভ্রাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দেব প্রমত্ত সঙ্কীর্ত্তন করেন। সঙ্কীর্ত্তনানন্তর সায়ঙ্কালের উপাসনা ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল নির্ব্বাহ করেন। তাঁহার উপদেশের সার এইরূপে সংগৃহীত হইতে পারে। ঈশ্বর মানুষ হইতে দেবতা গঠন করিবার জন্য নিরন্তর তাহাকে নানা ঘটনার চক্রে ফেলিয়া ঘুরাইতেছেন। কুম্ভকার যে প্রকার মৃত্তিকার তাল হইতে ঘটাদি বিবিধ সামগ্রী নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি মনুষ্যগণ হইতে বিবিধ চরিত্র উৎপন্ন করিয়া থাকেন। ঘটাদি যে পর্য্যন্ত আকার ধারণ না করিতেছে, তত ক্ষণ যেমন সেই মৃত্তিকার তাল হইতে কি উৎপন্ন হইবে জানিতে পারা যায় না, তদ্রূপ কোন্ মনুষ্য কি প্রকার দেবত্বগুণসম্পন্ন হইবে, কেহই বলিতে পারে না। মানুষ যেমন এই প্রকার ভিন্ন চরিত্র লাভ করিয়া থাকে, তেমনি ঈশ্বরও তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রানুসারে ভিন্নভিন্নরূপে প্রতিভাত হন। এই জন্য দুজনের ঈশ্বরের ভাব কখন সমান হয় না। মনুষ্যগণের চরিত্রের যে প্রকার বিচিত্রতা, এবং এই বিচিত্রতানুসারে ঈশ্বরানুভব যে প্রকার

স্বতন্ত্র, তাহাতে দুজন মানুষের এক হওয়া অত্যন্ত অসম্ভব। একতার ভূমি জ্ঞানে নহে, মতে নহে, শাস্ত্রে নহে, আর কোথাও নহে, হৃদয়ে। হৃদয় যদি নির্ম্মল হয়, বিশুদ্ধ হয়, তাহাতে ব্রহ্মের আবির্ভাব স্পষ্ট প্রতিফলিত হয়। সেই আবির্ভাব শত হৃদয়কে এক করিয়া দেয়। যদিও জ্ঞানাদিতে ভিন্নতা আছে এবং থাকিবে, কিন্তু হৃদয়ে ব্রহ্মদর্শন হইলে তাঁহার যোগে সকল ভিন্নতা তিরোহিত হইবে।

রাত্রি দশটার পর উৎসব পরিসমাপ্ত হয়। সায়ঙ্কালে গৃহ এমনই পরিপূর্ণ হইয়াছিল যে, অনেককে দণ্ডায়মান থাকিতে হইয়াছিল। আমরা ঈশ্বরের গৃহে অবস্থিতি করিয়া এক দিনের জন্যও নিরাশ বা নিরানন্দ হইবার কারণ পাইলাম না। তাঁহার কৃপায় আমাদিগের আশা বিশ্বাস ও আহ্লাদ দিন দিন বাড়িতেছে। আমরা যে গৃহে এত কাল লালিত পালিত পরিবর্দ্ধিত হইয়া জননীর স্নেহ সম্ভোগ করিলাম, সে গৃহ ছাড়িয়া আমরা কোথায় যাইব, কোথায় গিয়া শান্তিলাভ করিব। কোন ভাই ভগিনী যেন এ গৃহের প্রতি কখন উদাসীন না হন। আমাদিগের অন্য সহস্র ক্লেশ আইসে তাহাতে আইসে যায় না, যদি আমাদের আরামের গৃহ—ঈশ্বরের গৃহ আমাদিগকে ছায়া ও আশ্রয় দান করে। বিধানপতি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন কোন ভাই ভগিনী ঈশ্বরের গৃহের বহির্ভাগে অবস্থিতি না করেন।

দলের স্বাস্থ্য।

মানুষের শরীর আছে, মানুষের দলও তেমনি শরীর বলিয়া পরিচিত। মানবশরীরের রোগ আছে, স্বাস্থ্যও আছে। দলেরও রোগ ও স্বাস্থ্য আছে। শরীর কার্য্য করে, দলও কার্য্য করে। শরীরে অনেক যন্ত্র ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে, দলেও অনেক যন্ত্র ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল কার্য্য করে, দলেরও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল কার্য্য করে, কিন্তু তাহারা কেহ কার্য্যের কর্ত্তা নহে সাধক। একটি কার্য্যের বহু কর্ত্তা থাকিতে পারে না, কার্য্য এক, কর্ত্তাও এক। বরং বহু কার্য্যের এক কর্ত্তা হইতে পারে, কিন্তু এক কার্য্যের বহু কর্ত্তা হইতে পারে না। তবে দল কার্য্য করে কিরূপে? দল এক নহে, বহু লোকের সমষ্টিতে দল হয় সুতরাং দল বলিলেই এক কার্য্যের বহু কর্ত্তা স্বীকার করিতে হয়। আমরা এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। দেহের যেমন বহু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কার্য্য সাধনের উপায় কিন্তু কর্ত্তা নহে, কর্ত্তা এক দেহী, সেইরূপ দলদেহেরও বহু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে, তাহারা কার্য্য নির্ব্বাহ করে কিন্তু তাহারা স্বয়ং কর্ত্তা নহে, কর্ত্তা দেহী এবং এক। এক দেহী কর্ত্তা হইয়া ইন্দ্রিয় সকল ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকলকে কার্য্যে নিযুক্ত করে, তাহারা কর্ত্তার (দেহীর) নিয়োগানুসারে নিয়মিত হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করে। এই কথাটী আমরা আর কিছু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি।

দেহে যে সকল যন্ত্র ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে, তাহারা পরস্পর সমন্বিত ও সমবেত। পরস্পর পরস্পরের অনুকূল, পুষ্টিবর্দ্ধক ও সহায়, সকলেই সকলের বল। একটি যন্ত্র অন্য একটি যন্ত্রকে কার্য্যক্ষম করে এবং সেটি আবার অপরটিতে উপযোগিতা প্রদান করে। আবার যন্ত্র সকল ইন্দ্রিয় সকলকে ও অপর অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে উপযুক্ত করে, কার্য্যক্ষম করে। এক ইন্দ্রিয় অন্য ইন্দ্রিয়ের সহায়, এক যন্ত্র অন্য যন্ত্রের সহায় এবং এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের সহায় হইয়া আছে। এইরূপে ইহারা সকলেই সকলের প্রভু বা পরিচালক, সকলেই সকলের অনুগত দাস। এই প্রকার প্রভুত্ব ও আনুগত্যের মিলন ব্যতীত মনুষ্যদেহ একটিও কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে না। সুস্থতা এই মিলনের মূ[illegible]। [illegible]কান অঙ্গে কি যন্ত্রে যদি রোগ জন্মে, তবে সেই কারণে দেহের সমুদয় যন্ত্র ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ [illegible] ও অসুস্থ হইয়া পড়ে, এবং সমুদয় অঙ্গ[illegible] পরস্পরকে

সাহায্যদানে অসমর্থ হয়। দৈহিক বৈকল্য দেহীকেও বিকল করিয়া তোলে সুতরাং সমুদয় কার্য্য কর্ম্ম বন্ধ হইয়া যায়। দেহের বৈকল্য দেহীকে বিকল করে, দেহী বিকল হইলে দেহ বিকল হইয়া থাকে। দেহদেহীর সম্বন্ধে যেমন, দলের সম্বন্ধেও সেইরূপ। দলস্থিত প্রত্যেক মানবীয় ব্যক্তিত্ব ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। প্রত্যেক ব্যক্তির বুদ্ধি ইহার যন্ত্র, এবং প্রত্যেক বিবেক ইহার ইন্দ্রিয়। হস্তপদাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের সাধন বা উপায়; সে বিষয়ে ইহারা কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া কার্য্য করে না, কিন্তু অন্য দিকে পরস্পর পরস্পরের বল ও সহায়। প্রত্যেক ব্যক্তির বুদ্ধিরূপ যন্ত্রও ঐরূপ এক দিকে স্বাধীন অন্য দিকে পরস্পরের অধীন। প্লীহা যে কার্য্য করে, যকৃৎ তাহা করে না, ফুস্‌ফুস যে কার্য্য করে হৃৎপিণ্ড তাহা করে না, ইহাদিগের প্রত্যেকের কার্য্যপ্রণালী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, কিন্তু প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বল ও সহায়। একের কার্য্য অচল হইলে সেই কারণে অন্যেরও কার্য্য অচল হয়। একটি বিকৃত হইলে, সেই কারণে অন্যোতেও বিকার উপস্থিত হয়। দলস্থিত ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি স্বতন্ত্র ভাবে বিচার করে, কার্য্য করিবার উপায় নির্দ্দেশ করে। কিন্তু একের বুদ্ধি অন্যের বুদ্ধির প্রতি বিরোধাচরণ করে না। সকলেরই বুদ্ধি সকলের বুদ্ধির আনুকূল্য ও পোষণ করে। ইন্দ্রিয় সকল জ্ঞানের বা আলোকের উপায়। দলস্থিত ব্যক্তিদিগের প্রত্যেকের বিবেক প্রত্যেককে আলোকিত করিয়া পথপ্রদর্শন করে। বিবেকবস্তু মানুষের নিজস্ব নহে, ইহা ঈশ্বর হইতে মনুষ্যেতে অবতরিত হইয়া থাকে, সুতরাং ইহাতে বিরোধ সংঘটিত হইতে পারে না; কিন্তু প্রত্যেকের বিবেক প্রত্যেককে আলোকিত করিয়া অগ্রসর করে। দেহে যেমন দেহী কর্ত্তা হইয়া সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে নিয়মিত ও পরিচালিত করিয়া কার্য্য করিয়া লয়, দলেতে ঈশ্বর দেহীর ন্যায় হইয়া প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে নিয়মিত ও পরিচালিত করেন। দেহ যেমন আত্মার নিয়ম ও বিধি অগ্রাহ্য করিতে পারে না, দলও সেইরূপ ঈশ্বরের নিয়ম ও বিধি অগ্রাহ্য করিতে পারে না। এইরূপে আপন আপন স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া পরস্পরের আনুগত্য করিতে পারিলেই দল সুস্থ থাকে, কিন্তু দেহের ন্যায় দলেরও রোগ আছে, বিকার আছে। যখন স্বার্থ পদমর্য্যাদা অভিমান অহঙ্কার অবিশ্বাস প্রভৃতি মারাত্মক রোগ দল দেহে প্রবেশ করে তখন ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল যন্ত্র সকল ও ইন্দ্রিয়নিচয় বিকৃত হইয়া পড়ে। এই সময়ে একজনের ব্যক্তিত্ব অন্যের ব্যক্তিত্বের বিরোধাচরণ করে, এক জনের বুদ্ধি অন্যের প্রতিকূলে আপত্তি উপস্থিত করে, এক জনের বিবেক অন্যের আলোক নির্ব্বাণ করিয়া দিতে প্রোৎসাহিত হয়। বস্তুতঃ এ অবস্থায় এক অপরের উপকারিতা স্বীকার করিতে চাহে না। কেহ কাহাকেও হিতৈষী ও সহায় বলিয়া বুঝিতে পারে না। কেহ কাহারও বাধা মানে না, বারণ মানে না। ভাল কথা বলিলে, ভাল কাজ করিলে তাহাতে কল্পনা করিয়া মন্দ অর্থ করে। আপনি মন্দ অর্থ গ্রহণ করে এবং অন্য লোকেরাও যাহাতে সেই মন্দ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তাঁহাদিগকে সেইরূপে প্ররোচিত করিতে থাকে। এইরূপে দলদেহের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া যায়। দেহের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে দেহীর নিয়ম ও বিধিব্যবস্থানুসারে কার্য্য করিতে ইন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তি হয় না। তাহারা পদে পদে দেহীর নিয়ম ও শাসন অমান্য ও অগ্রাহ্য করিতে থাকে।

এইটি দলের অসুস্থাবস্থা। পৃথিবীতে যত দল আছে অথবা পূর্ব্বে ছিল, তাঁহারা সকলেই এই অসুস্থতার পরিচয় দিয়াছেন, ইতিহাস ইহার প্রমাণ, কিন্তু জগতে অনেক দল আছে যাহাতে এক ব্যক্তি বা এক কর্ত্তা কার্য্য করে না, বহু কর্ত্তা কার্য্য করে, সে সকল দল পার্থিব

নিয়মেই প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হয়, সুতরাং তাহার সুস্থতা অসুস্থতা বুঝিবার উপায় নাই, কারণ তাঁহাদের ভিতরের অস্বাস্থ্যের লক্ষণ বাহিরে প্রকাশ পাইবার অবকাশ পায় না। দশ জন বিচারক বিচার করে, অথবা দেশের মঙ্গলজনক কোন বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করে। সে স্থলে অধিকাংশ বিচারকের মতানুসারে মীমাংসা হইবার রীতি আছে; সত্যাসত্য হিতাহিত ন্যায় অন্যায় কিরূপ হইল তাহা আলোচনা করিবার বিধি নাই। অধিক ব্যক্তির মত যদি এক হয়, অন্যায় অহিত বা অসত্য হইলেও তদনুসারে চলিতে হইবে। কাজেই এস্থলে প্রকৃত অসুস্থতা থাকিলেও বাহিরে তাহা প্রকাশ পায় না। এ সকল পৃথিবীর দল পার্থিব বিধি নিয়মেই চলে ও চলিবে, তাহাতে দ্বিরুক্তি করিবার উপায় নাই কিন্তু স্বর্গীয় দল এ নিয়মে চলে না। তাহা স্বর্গের মুক্ত বিধি অনুসারে চলে। তাই ইহার ভিতরে অস্বাস্থ্য লুক্কায়িত থাকিয়া অনিষ্ট সাধন করিতে পারে না। কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, স্বর্গের বিধি ব্যবস্থাতে অস্বাস্থ্য আসিবে কেন? বরং পার্থিব নিয়ম অপেক্ষা ইহা অধিক পরিমাণে স্বাস্থ্যবর্দ্ধক হইবারই কথা। বস্তুতঃ স্বর্গের বিধিতে অস্বাস্থ্য নাই, তাহা অশেষ কল্যাণ ও শান্তির আকর। যখন স্বর্গীয় নিয়মানুসারে দল গঠিত হয়, তখন দলে কখন বিকার আসিবে ইহা মনে হয় না, কিন্তু মানুষ স্বর্গেও সংসার রচনা করে। এই জন্য স্বর্গীয় বিধিতে সাংসারিক ভাব প্রবিষ্ট হইয়া রোগোৎপাদন করে। তখন রুগ্ন ব্যক্তি স্বার্থ অহঙ্কার অবিশ্বাস প্রভৃতির অনাদর করিয়া স্বর্গীয় বিধির সমাদর করিতে পারে না। রুগ্ন ব্যক্তি বিশেষতঃ আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি, যেমন সুপথ্য ও সদাচারের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে পারে না সেইরূপ। চিকিৎসকের পরামর্শ আর সৎ বলিয়া গ্রহণ করিতে তাহার অধিকার থাকে না। এই কারণে স্বর্গীয় দলে সর্ব্বদাই বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া চতুর্দ্দিকে ভীতি উৎপাদন করে। বাস্তবিক বিকার অপ্রকাশিত থাকিলে যেরূপ ভয়ের কারণ হয়, প্রকাশ পাইলে আর সে ভয় থাকে না। স্বর্গীয় দলের যিনি চিকিৎসক তিনি রোগীর অবাধ্যতা সত্ত্বে সুচিকিৎসা করিতে সমর্থ। পৃথিবীর চিকিৎসকেরা রোগীর আর্ত্তনাদ দূর করিবার জন্য "ক্লোরফরম" দ্বারা তাহাকে অজ্ঞান করিয়া লন। বিধানের বহিভূ্র্ত স্থলে ক্লোরফরমের অনুরূপ ব্যবস্থা আছে, কিন্তু স্বর্গের দলে অজ্ঞানতার সমাদর নাই। এখানে সজ্ঞানে চিকিৎসিত হইবার নিয়ম। যিনি চিকিৎসক তাঁহার সুকৌশলে সজ্ঞানেই রোগীর চিকিৎসা সুন্দররূপে নির্ব্বাহ হয়। কেন না যত দিন রোগ হইয়াছে বলিয়া রোগী বুঝিতে পারে না, তত দিন কোন প্রতীকার হইবার সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু রোগী রোগ বুঝিতে পারিলেই সে আপনি রোগমুক্ত হইবার জন্য যত্ন করে। স্বর্গের চিকিৎসক অজ্ঞান রোগীকে সজ্ঞান করিয়া তাহার রুগ্নাবস্থা তাহাকে বুঝাইয়া দেন। এ জন্য অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে পরীক্ষা হইতে পরীক্ষান্তরে তাহাকে নিক্ষিপ্ত করেন। যত দিন রোগী আপনার রুগ্নাবস্থা বা বিকৃতাবস্থা বুঝিতে না পারে তত দিন তিনি বিরত হন না। চিকিৎসকের হস্ত অনেকে দেখিতে না পাইয়া নিজ হস্তে চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিতে ব্যগ্র হন। ইহা একান্ত অনধিকারচর্চ্চা। চিকিৎসক থাকিতে অপরের তাদৃশ ব্যগ্রতা স্বর্গীয় চিকিৎসকের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

ভক্তশ্রেষ্ঠ যবন হরিদাস, কথিত আছে, অহোরাত্রে তিন লক্ষ হরিনাম জপ করিতেন। নামের শক্তিসম্বন্ধে তাঁহার কি প্রকার প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, কাহার না জানিতে কুতূহল হয়? তিনি এক দিন সপ্তগ্রামে হিরণ্য মজুমদারের গৃহে উপস্থিত হন। হিরণ্য মজুমদার ও গোবর্দ্ধন মজুমদার উভয় ভ্রাতা যেমন বিদ্যোৎসাহী তেমনি ধর্ম্মানুরাগী

ছিলেন। সর্ব্বদাই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন। হরিদাস উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহারা গাত্রোত্থান করিয়া চরণে প্রণাম করিলেন, এবং বসিবার আসন অর্পণ করিয়া আপনাদিগের ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতগণ হরিদাসের সুখ্যাতি করিয়া হরিনামের মহিমা গান করিতে লাগিলেন, কেহ বলিলেন, হরিনামে পাপ ক্ষয় হয়, কেহ বলিলেন, হরিনামে জীবের মোক্ষলাভ হয়। হরিদাস বলিলেন, "এই দুই ফলের জন্য ভক্ত হরিনাম সাধন করেন না, ভক্তের নিকট মুক্তি অতি তুচ্ছ বস্তু, উহা নামাভাসেই সিদ্ধ হয়. তিনি ভক্তির ভিখারী। যেমন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই অন্ধকার পলায়ন করে, নিশাচরেরা লুক্কায়িত হয়, হরিনামের গুণে তেমনি নাম গ্রহণারম্ভমাত্রে সমস্ত পাপ ক্ষয় হয়, নাম উচ্চারণে হরিপাদপদ্মমধুতে চিত্তমধুকর প্রেমে আবদ্ধ হইয়া পড়ে, তখন আর তাহার মুক্তিচিন্তার অবকাশ থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে ;—

এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নাম কীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥

এই প্রকার ব্রতধারী ভক্ত আপনার প্রিয় পরমেশ্বরের নাম কীর্ত্তনে অনুরাগী ও আর্দ্রচিত্ত হইয়া কখন উচ্চৈঃস্বরে হাসেন, কখন কাঁদেন, কখন শব্দ করেন, কখন গান করেন, কখন অলৌকিক ভাবে নৃত্য করিয়া থাকেন। পদ্যাবলিতে শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন ;—

অংহঃ সংহরদখিলং সকৃদুদয়াদেব সকললোকস্য।
তরণিরিব তিমিরজলধিং জয়তি জগন্মঙ্গলং হরের্নাম॥

সূর্য্যোদয়ে যে প্রকার অন্ধকার অপহৃত হয়, সেই প্রকার হরিনামের অভ্যুদয়ে সকল লোকের নিখিল পাপান্ধকার অপহৃত হয়। ঈদৃশ হরির নাম জয়যুক্ত হউক।"

আচার্য্যের উপদেশ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

বৃহস্পতিবার ২২ আষাঢ় ১৭৯৯ শক।

কোন সুপণ্ডিত বলিয়াছিলেন আমি ক্ষুদ্র পত্র লিখিতে পারিলাম না আমার এই অপরাধ ক্ষমা করিও। ইহার কারণ আমার সময় অল্প। সাহিত্যে এই কথা, ধর্ম্মরাজ্যেও এই কথা। অধিক আয়াস স্বীকার না করিলে হৃদয়ের সমস্ত ভাবকে অল্পস্থানে সন্নিবিষ্ট করা যায় না। যদি উপাসনাকে অল্পকালের মধ্যে সফল করিতে হয় তবে বিশেষ সতর্কতার সহিত অনেক দিন সাধন করিতে হইবে। অল্প কএকটি শব্দ দ্বারা যদি হৃদয়ের ভাব পরিপক্ক করিতে চাও তবে আগে আগে খুব সরল ভাবে সাধন কর। এখনি সুদীর্ঘ প্রার্থনা করা যায় ; কিন্তু দুটী কথার মধ্যে প্রার্থনার সমস্ত ভাব ব্যক্ত করা কঠিন। দুই দণ্ড প্রার্থনা করা সহজ, কিন্তু দুই মিনিট প্রার্থনা করা কঠিন। সমস্ত দিন পূজা করা যায় ; কিন্তু এক মিনিট যথার্থ পূজা করা কষ্টকর। অল্প কথা মুখে বাধিয়া যায়, অল্প কথার উপাসনা করায় রসনা আপনাকে অনিপুণ বলিয়া স্বীকার করে। কথা বলিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ ভাবের উদয় হয়, এমন কথা কে বলিতে পারে? ভাবশূন্য হইয়া অনেক গান করা যায় ; কিন্তু ভাবের সহিত একটি গান করা কঠিন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শব্দ দ্বারা ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করিতে পারি না। দীর্ঘ প্রার্থনা হয় কি জন্য? মন অপ্রস্তুত। অল্প কএকটি সরল বাক্যে ব্রহ্মপূজা করিতে পারি সে প্রকার শিক্ষা লাভ করি নাই। ক্রমে ক্রমে শিক্ষা করিতে হইবে। দশটি শব্দকে ক্রমে পাঁচটি শব্দে, পাঁচটি শব্দকে ক্রমে দুইটি কি একটি শব্দে প্রকাশ করিতে হইবে। জিনিষ স্থায়ী হইবে ; কিন্তু অল্প স্থান, অল্প কাল। সত্যং এই একটি শব্দ গুরুতর হইবে। এত বলের সহিত সেই শব্দবাণ নিক্ষিপ্ত হইবে যে তাহা পলকের মধ্যে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে উপস্থিত হইবে। অল্প কথাকে গুরুতর করিবার জন্য সাধনের প্রয়োজন। আমরা সাধন করি না এই জন্য যেখানকার শব্দ সেখানেই থাকে। সামান্য শব্দকে ব্রহ্মের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। এক বার ভক্তির সহিত "ঈশ্বর" এই একটি নাম কেহ বলে না। সকলেই এক শত আট নাম গ্রহণ করে। যে ভক্তের দিকে তাকাই তাঁহার গলায় অনেক নামের মালা দেখি। একটি নাম বলিতে না বলিতে চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া গেল এবং অর্দ্ধেক কথা মনের মধ্যে রহিয়া গেল এমন ভক্ত দেখা যায় না। একবার যে ভক্তির সহিত "ঈশ্বর" বলিয়া ডাকিতে পারে, সে মরে না, যে সহস্র বার বলে সে বরং মরে। অল্প সময়ের মূল্য অধিক, অল্প স্থানের মূল্য অধিক। পিত্তল, লৌহ অনেক স্থানে থাকে ; কিন্তু স্বর্ণ, হীরকখণ্ড অল্প স্থানে। ঈশ্বরের অনন্ত ব্যাপ্তির কথা সকলেই বলে ; কিন্তু এক বিন্দুতে তিনি আছেন সকলে বলিতে পারে না, কেন না লৌহ সকল ঘরে আছে, মুক্তা সকলের ঘরে নাই। নামেতে ঈশ্বরকে পাওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না। লৌহ অনেক স্থান অধিকার করিয়া থাকে ; কিন্তু ক্ষুদ্রাকৃতি স্বর্ণখণ্ড বিন্দুমাত্র স্থানে থাকে। সেইরূপ ঈশ্বরের একটি ক্ষুদ্র কিন্তু অমূল্য নাম যদি হৃদয়ে ধারণ করিতে পারে, সাধক সুখী হয়। যাহাদের সাধন অল্প তাহারা অনেক বার ঈশ্বরের অনেক নাম উচ্চারণ করে। তাহারা বড় বড় উপাসনা করে। ক্ষুদ্র নামরূপ সর্ষপকণার মধ্যে স্বর্গকে আনা কেবল যোগীর পক্ষেই সম্ভব। অল্প স্থানের মধ্যে বহুমূল্য সঞ্চয় করা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। যদি প্রকৃত সাধক

হইতে চাও তবে প্রকাণ্ডকে ক্ষুদ্র কর। আকাশের ঈশ্বরকে হৃদয়ের বিন্দু মাত্র স্থানে রাখ। ক্ষুদ্র স্থানে যদি ব্রহ্মকে পাও তবেই সুখী হইবে। বড়কে ছোট করিতে হইবে ইহার মধ্যে অনেক গভীর তত্ত্ব আছে। খুব বড় সুধাসাগর পাইয়া আনন্দিত হইও না, 'এখনও এক বিন্দু পাও নাই, ইহা জানিয়া খুব গভীর সাধন কর। সাধন ক্রমাগত ঘন হইতে ঘনতর হইতে থাকুক।

প্রাপ্ত।

পরলোকগত শ্রীমান্ রমণীকান্ত চন্দ।

অত্যন্ত শোকসন্তপ্ত হইয়া লিখিতেছি যে প্রিয়তম রমণীকান্ত আর এই পৃথিবীতে নাই। শ্রীহট্টের কলাকার টেলিগ্রাম এই শোককর সংবাদ বহন করিয়া আনিয়াছে, "রমণী আশ্চর্য্যরূপে ঈশ্বর বিশ্বাস প্রদর্শন করিয়া অদ্য প্রাতঃকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে।" রমণীকান্তের বয়ক্রম ২৫।২৬ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মোৎসাহী শুদ্ধচরিত্র সুদৃঢ় বিধানবিশ্বাসী ভক্তিমান্ সুবিনীত যুবা আমি কখন কোথাও দেখি নাই। দেড় বৎসরও পূর্ণ হয় নাই আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রেরিত ভাই কেদারনাথ দে মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যাকে রমণী বিবাহ করিয়াছিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে পাত্রীর রূপের বিষয়ে কোন প্রশ্ন না করিয়া ধর্ম্মভাব ও উপাসনাশীলতার বিষয় বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। পত্নী সহ শ্রীহট্ট নগরে বাস করিতেছিলেন। রমণী তথাকার জেল হস্পিটালের ডাক্তার ছিলেন. এ দিকে শ্রীহট্টে একজন উৎসাহী বিধানপ্রচারকের কার্য্য করিতেছিলেন। প্রিয়তম রমণীকান্ত ১৪ দিনের বিকার জ্বরে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন। রোগের বৃত্তান্ত ও তৎকালীন তাঁহার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীহট্টস্থ জনৈক বন্ধু ভাই বঙ্গচন্দ্রকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

"আপনি ভাই রমণীকান্তের ভয়ানক পীড়ার কথা পূর্ব্বে টেলিগ্রামে জানিতে পারিয়াছেন। তিনি নয় দিবস যাবৎ অত্যন্ত খারাপ রকমের রেমিটেণ্ট জ্বরে আক্রান্ত হইয়া নিতান্ত কষ্ট পাইতেছেন। ১৬ই তারিখে আপনার নিকট যে টেলিগ্রাফ করিয়াছিলাম, সে দিন তাঁহার অবস্থা নিতান্ত খারাপ; তাহার পর দিন রোগের কিছু উপশম বোধ হইল, কিন্তু তৎপর আবার বৃদ্ধি পাইল। কল্যাবধি প্রায় এক অবস্থায়ই আছেন, সময় সময় সংজ্ঞাশূন্য হন, এবং নানা প্রকার প্রলাপ বাক্য বলেন। তাঁহার জীবনের কোন স্থিরতা নাই, ভগবানের কৃপার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর। তিনি কৃপা করিলে বাঁচাইতেও পারেন। এখনও আমরা সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হই নাই। জগদীশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা, আমাদের প্রিয় ভাই যেন এই আসন্ন অবস্থাতে তাঁহা হইতে বিশেষরূপে বল প্রাপ্ত হইয়া রোগের ঈদৃশ ক্লেশ যন্ত্রণা আনন্দ মনে সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন। সিবিল সার্জন ডাক্তার মেকনেমেরা ও স্থানীয় অন্যান্য ডাক্তারগণ তাঁহাকে বিশেষ যত্ন সহকারে দেখিতেছেন। রমণীকান্তের প্রতিবেশী ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস এম. বি প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট থাকেন। ভ্রাতা রমণীকান্ত সর্ব্বদাই "হরি" এবং "দয়াময়ীর" নাম উচ্চারণ করিতে বড় ভাল বাসেন, এমন কি তাঁহার জ্ঞানশূন্যাবস্থাতেও পরমেশ্বরের নাম লইতে চীৎকার করিয়া বলা হয়, তখন যেন তিনি সংজ্ঞা লাভ করেন এবং আনন্দ মনে সেই নাম করিতে থাকেন। কতিপয় ব্রাহ্মধর্ম্মবিশ্বাসী যুবক ও অন্যান্য কয়েক জন ভদ্রলোক অত্যন্ত পরিশ্রম সহকারে ভাই রমণীকে শুশ্রূষা করিতেছেন। শুশ্রূষাতে কোন ত্রুটি হইতেছে না, বেশ ভাল রকমই চলিতেছে।

আপনার স্নেহের প্রসন্ন কুমার গুহ।"

প্রিয়তম রমণীকান্ত কিছুদিন হইল শ্রীহট্টের কতকগুলি উৎকৃষ্ট আনারস আমার নিকটে উপহারস্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে ৩১ শে জুলাই ১ খানা কার্ড লিখিয়াছিলেন। এই আমার নিকটে তাঁহার শেষ পত্র। পত্রখানা অতি পরিষ্কার সুন্দর অক্ষরে লিখিত। এ স্থানে তাহার সমগ্র অনুলিপি করিয়া দেওয়া গেল।

[মা
নববিধান।
(হস্তাঙ্কিত সুন্দর একটি নিশানের ভিতর)]

পরম ভক্তিভাজনেষু—

"শ্রীচরণসরোজে বিনয় ও ভক্তিপূর্ণ অগণন প্রণিপাত পুরঃসর নিবেদনমিদং—

বহুকাল পরে মহাশয়ের আশীর্ব্বাদ বার্ত্তা পাইয়া সুখী হইলাম। আপনি পদে আঘাত পাইয়া অচল হইয়া পড়িয়াছিলেন শুনিয়া অতিশয় চিন্তিত হইয়াছিলাম। দয়াময়ীর করুণায় আরোগ্যলাভ করিতেছেন শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। আনারস পাঠাইতে চেষ্টা করিব। আমরা সকলে ভাল আছি। শ্রীচরণকুশল ভিক্ষা করিতেছি। অল্প দিবস যাবৎ এখানে বিধাননারীসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ৩।৪ টী মেয়ে সমবেত হইয়া উপাসনা, প্রার্থনা, সঙ্গীত ও সৎপ্রসঙ্গ করিয়া থাকেন। আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন, বিধানপতি এই ক্ষুদ্রসমাজ অবলম্বন করিয়া শ্রীহট্টে নারীহৃদয়ে বিধান প্রতিষ্ঠিত করিতে যেন সুযোগ লাভ করেন।

৩১ শে জুলাই — সেবক—
শ্রীহট্ট — শ্রীরমণীকান্ত চন্দ।"

"পরম ভক্তিভাজন, প্রেরিতদেব—
শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় শ্রীচরণকমলেষু।"

ঢাকা জিলার অন্তর্গত মযগ্রাম রমণীকান্তের জন্মভূমি।

তাঁহার মাতা ও তিনটি সহোদর ভ্রাতা বিদ্যমান। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীমান্ বিহারীকান্ত চন্দ বিধানবিশ্বাসী ব্রাহ্ম। ইনি ময়মনসিংহে বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে বাস করেন। বাল্যকাল হইতে রমণী একান্ত শান্ত ও শুদ্ধচরিত্র ছিলেন। রমণী যৌবনের প্রথম হইতেই আমিষভক্ষণ ও পাড়ওয়ালা বস্ত্র পরিধান পরিত্যাগ করেন। বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ বর্দ্ধিত হয়। একান্ত দারিদ্র্যাবস্থা বশতঃ অন্যদীয় সাহায্যে বহু কষ্টে তাঁহাকে বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইয়াছিল। অনেক ব্রাহ্মবন্ধু দয়া ও স্নেহ করিয়া তাঁহার লিখা পড়া শিক্ষার সাহায্য দান করেন। ময়মনসিংহে গবর্ণমেণ্টস্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাস করিয়া ঢাকায় মেডিকেল স্কুলে প্রবিষ্ট হন। সেখানে রৌপ্যপদক ও ছাত্রীয় বৃত্তি পাইয়া যোগ্যতার সহিত তৃতীয় বার্ষিকী পরীক্ষায় অর্থাৎ শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পাস হইবার কিয়দ্দিন পরেই আসামের অন্তর্গত ধুবড়ি নগরে ৩০ টাকা বেতনে গবর্ণমেণ্টের কাজে নিযুক্ত হইয়া যান। পাঠাবস্থায়ই তাঁহার জীবনে অসাধারণ ধর্ম্মানুরাগ, উপাসনাশীলতা, বিধানবিশ্বাস সাধুভক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল। ধুবড়ির ব্রাহ্মবন্ধুগণ তাঁহাকে পাইয়া বিশেষ উপকৃত হন। তিনি মহোৎসাহে সেখানে বিধানের কার্য্য করিয়া সকলের মন জাগাইয়া তোলেন। অল্পদিন পরেই রমণী ৪২৲ বেতনে শ্রীহট্টের জেল হস্পিটলের কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়া তথায় যান। তিনি যেখানে গিয়াছেন, সেখানেই আপন জীবনের সৌন্দর্য্য ও চরিত্রের মাধুর্য্যে এবং একান্ত ধর্ম্মানুরাগে সকলের মন আকর্ষণ করিয়াছেন। রমণীর ন্যায় সুদৃঢ় বিধানবিশ্বাসী যুবা আর আছে কি না সন্দেহ। নববিধানসমাজে কত ঘোর বিপ্লব হইল, কত খ্যাতনামা বড় বড় বীর পুরুষ তাহাতে বিচলিত হইলেন, কিন্তু ভয়ানক বিপদ পরীক্ষার মধ্যেও রমণীর মন টলে নাই। শ্রীহট্টের মূল ব্রাহ্মসমাজ নিয়ুটাল, প্রথমতঃ রমণী সেই সমাজের উপাচার্য্যের কার্য্য করেন। এক দিন উপাসনার সময়, তিনি নববিধানাঙ্কিত নিশান সহ উপস্থিত হন। তাহাতে অনেক সভ্য আপত্তি উত্থাপন করেন। তদবধি সেই সমাজের সংস্রব তিনি পরিত্যাগ করিয়া নিজবাটীতে সমাজ স্থাপন করেন। ইদানীং তাঁহার সমাজেরই উন্নতি হইয়াছিল। তিনি ছাত্রসমাজের নেতা ছিলেন, ছাত্রগণ তাঁহাকে অত্যন্ত ভক্তি করিত। তথাকার খৃষ্টীয় প্রচারক মহা পণ্ডিত জোন্স সাহেব রমণীর বিশ্বাস ও ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় বন্ধুতা স্থাপন করিয়াছিলেন। গত বৎসর আমি শ্রীহট্টে প্রচারার্থ উপস্থিত হইয়া ৭ দিন তাঁহার আলয়ে স্থিতি করিয়াছিলাম। আমি তাঁহার বিনয় ভক্তি উপসনাশীলতা ও উৎসাহ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলাম। দয়াময় হরি আমাদের প্রিয়তম ভ্রাতাকে এই পৃথিবীর অনুপযুক্ত দেখিয়াই বুঝি স্বর্গে গ্রহণ করিলেন। আনন্দময়ী জননী তাঁহার দুঃখিনী পত্নী ও শোকার্ত্ত মাতা ভ্রাতা ও বন্ধুদিগের মনে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

শ্রীমান্ মনোমতের ১০ই ভাদ্র তারিখের পত্র হইতে উদ্ধৃত।

"ভগবান্ দয়া করিয়া একটি সুন্দর জীবন আমাদের পরিবারের সহিত গ্রথিত করিয়া দিয়াছিলেন, আবার তাঁহার ইচ্ছায় আপনার কোলে তাঁহাকে টানিয়া লইলেন। আমরা অভাগা, তাই আমরা ওরূপ জিনিষের আদর করিতে পারি নাই। তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। এরূপ জীবন খুব কম আছে। আমি পূর্ব্বে এত জানিতাম না। আহা! কি অটল বিশ্বাস। অসুখের সময় একবারও বলিলেন না যে আমার কষ্ট হইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেই বলিতেন 'আমি বেশ আছি, খুব ভাল আছি।' ভিতরে অত্যন্ত যন্ত্রণা হইত তাই বলিতেন, 'তবে, ভিতরে একটা কিরূপ কিরূপ বোধ হইতেছে।'

"তাঁহার যাইবার সময়ের অবস্থা দেখিলেই আর দুঃখ করিবার কিছু থাকে না। নাড়ী নাই, হাত, পা ঠাণ্ডা, কিন্তু হরিনাম করিলেই আবার নাড়ী পাওয়া যায়, হাত, পা গরম হয়। ডাক্তারেরা দেখিয়া আশ্চর্য্য, বলেন 'এমন আমরা কোথাও দেখি নাই।' তখন কেবল মা নাম করিতে লাগিলেন। দুই দিন ধরিয়া কোন কথা কহেন নাই। কিন্তু ভিতরে বেশ জ্ঞান ছিল বুঝা যাইত। নাম গান করিলেই শান্ত হইতেন, দুইটি হাত যোড় করিতে চেষ্টা করিতেন, এক এক বার হাতভালি দিয়া হাসিতেন। 'হরি বোল হরি চল যাই বাড়ী' এই গানটি করাতে যে কি আনন্দ প্রকাশ করিলেন তাহা আর বলা যায় না। ঠিক যাইবার সময় ভিতরে বেশ জ্ঞান হইয়াছিল, কোন কথা কহিলেন না। হেমার দিকে চাহিয়া কিছু ক্ষণ রহিলেন। নাম পাঠ শুনিতে চাহিলেন। আমি ও হেম নাম পাঠ করিলাম। কয়েকবার মা মা মা বলিয়াই স্বর্গারোহণ করিলেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আর কি করিয়া দুঃখ করিবে? আরও কত সুন্দর সুন্দর কথা বলিয়াছেন, পরে শুনিতে পারিবে। ঠিক ভোর ছয়টার সময় প্রাণবায়ু শেষ হইয়াছিল। তাহার পর যথানিয়মে স্নান করান, নূতন বস্ত্র পরান হইল। সংহিতামতে আরও সকল সুসম্পন্ন হইল। পরে আর একটি ঘর ফুল ইত্যাদি দিয়া সাজাইয়া উপাসনা হইল। ভাব খুব গভীর হইয়াছিল। অনেকে প্রার্থনা করিলেন। অবশেষে হেম (পায়ের কাছে বসিয়া ছিলেন) যে একটী সুন্দর প্রার্থনা করিলেন তাহা অতি গভীর হইয়াছিল। সকলে তাহা শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আবার শান্ত হইলেন! পরে যথানিয়মে সুন্দর খাটে করিয়া জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরি বলিতে বলিতে শ্মশানে যাওয়া হইল। অনেক ভদ্রলোক সঙ্গে গেলেন। চার জন সাহেব— ডাক্তর সাহেব, Rev. Jones পাদরী, একজন missionary doctor M. D. ও আর এক জন Revd. Missionary সঙ্গে গিয়াছিলেন। সেখানেও প্রার্থনা, স্তোত্র পাঠ হইল। Revd. Jone's prayer করিলেন। আমরা ৪ টার সময় বাটী ফিরিলাম, দশটার সময় বাহির হইয়াছিলাম।"

রমণীকান্ত শ্রীহট্টনগরে যে যে সৎকার্য্য করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিতেছি।

(১) তিনি তথায় বিধানফণ্ড স্থাপন করিয়াছেন। সেই ফণ্ডের অর্থ দ্বারা দরিদ্রদিগকে দান, পুস্তক ও পত্রিকাদি বিতরণ করিতেন।

(২) তিনি রবিবাসরিক নীতিবিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

(৩) নববিধান সমাজস্থাপন করিয়াছেন এবং নিজের ব্যবহার্য্য গৃহ সমাজের জন্য দান করিয়াছেন।

(৪) বিধাননারীসমাজ স্থাপন করিয়াছেন।

(৫) সঙ্গতসভা স্থাপন করিয়াছেন। প্রতি রবিবারে অপরাহ্নে তাহার অধিবেশন হইত।

(৬) বিধান লাইব্রেরী স্থাপন করিয়াছেন। তাহাতে বিনামূল্যে সকলে পুস্তক ও পত্রিকা পাঠ করিতে পারেন। মফস্বলে কোথাও এরূপ মূল্যবান্ সৎপুস্তকে পরিপূর্ণ পুস্তকালয় আছে কিনা সন্দেহ। এ জন্য তিনি নিজের বহু অর্থ ব্যয় করিয়াছেন।

(৭) তাঁহারই বিশেষ উদ্যোগে তথায় একটি বাই-বেল ক্লাস স্থাপিত হইয়াছে। তিনি স্বয়ং এবং সুপণ্ডিত স্থানীয় খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক জোন্স সাহেব ইহার কার্য্য সম্পাদন করিতেন। জোন্স সাহেব তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং সর্ব্বদা তাঁহার গৃহে গমনাগমন করিতেন ও সামাজিক ব্রহ্মোপাসনায় তাঁহার সঙ্গে যোগ দিতেন। সাহেব সময়ে সময়ে এই সমাজের জন্য অনেক অর্থ সাহায্য করিয়াছেন।

(৮) তিনি বিনা মূল্যে ঔষধ বিতরণ এবং বিনা ভিজিটে যে কোন রোগীর হউক চিকিৎসা করিতেন। নিয়মিত যে বেতন পাইতেন তদ্ব্যতীত কোন বিষয়ে এক-পয়সাও কাহা হইতে গ্রহণ করিতেন না। অনেক সাহে-বের মেমকে তিনি গুরুতর রোগ হইতে আরোগ্য করিলে, সাহেব স্বর্ণঘড়ী ও ৫০৲ টাকা তাঁহাকে পুরস্কার দিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা নীতিবিরুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। তিনি দাতব্য কার্য্য সর্ব্বদা গুপ্ত রাখিতে চেষ্টা করিতেন।

(৯) মধ্যে মধ্যে নিকটস্থ গ্রামসকলে যাইয়া নব-বিধানতত্ত্ব প্রচার করিতেন।

(১০) জেলখানার কয়েদিদিগের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার এবং তাহাদিগকে লইয়া রবিবারে একত্র উপাসনা করিতেন।

(১১) তিনি স্থানীয় কোন কোন ব্রাহ্মপরিবারের মধ্যে সাপ্তাহিক উপাসনা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং নিজে প্রতি-দিন স্নানান্তে ২।২॥ ঘণ্টা কাল উপাসনা করিতেন।

(১২) তিনি সরকারী কার্য্য বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে সম্পাদন করিতেন। একদা ইনিস্‌পেকটার জেনারেল সাহেব জেল পরিদর্শন করিয়া, প্রীত হইয়া প্রকাশ করেন যে, এরূপ সুযোগ্য কার্য্যকুশল লোক আমি কোথায়ও দেখি নাই। ইহার সমুদায় কাজ সুশৃঙ্খল-রূপে নিষ্পন্ন।

(১৩) কোন কোন উৎপীড়িত ব্রাহ্ম ছাত্রকে তাহা-দের পরিবার সহ সাহায্য করিতেন। তাঁহার আয় যাহা ছিল তাহা হইতে তিনি কিছুই সঞ্চয় করিতেন না। দৃষ্টান্ত স্থলে অবগত করিতেছি যে, একদা কোন বন্ধু জীবনবিমা "Life Insurance" করিবার জন্য অনুরোধ করাতে তিনি বলিয়া উঠিলেন "এ কার্য্য আমার নিকট বড়ই অস্বাভাবিক বোধ হয়। আমি কাল মরিয়া গেলে এক জনকে বঞ্চনা করিয়া অর্থ গ্রহণ করা হইবে; তোমরা ভারি অবি-শ্বাসী। কল্যকার জন্য এত ভাব কেন?"

(১৪) তিনি নববিধানের প্রতি এরূপ গাঢ় বিশ্বাসী ছিলেন যে, সামান্য দুই ছত্র লিখিতেও "নববিধানের নিশান" অঙ্কিত না করিয়া লিখিতেন না এবং তাঁহার ব্যব-হার্য্য ঘটী, বাটী ইত্যাদি তৈজস পাত্রে নববিধানের নিশান অঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণে এবং গৃহাভ্যন্তরে উপাসনাস্থলে নববিধানপতাকা স্থাপিত ছিল। তিনি শ্রীহ-ট্টের হিন্দু, মুসলমান খৃষ্টানাদি সর্ব্ব সম্প্রদায়ের একান্ত প্রিয় ছিলেন। হিন্দুগণ তাঁহাকে ভক্ত বলিয়া শ্রদ্ধা করি-তেন এবং হিন্দুপর্ব্ব উপলক্ষে বাসায় আসিয়া তাঁহাকে মালা পরাইয়া দিতেন।

(১৫) একটী বিবি বিধানসমাজের বাড়ীর জন্য এক খণ্ড প্রশস্ত ভূমি বিনা মূল্যে তাঁহাকে দিয়াছেন। বাড়ীর প্ল্যান পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

(১৬) শ্রীদরবারের প্রতি তাঁহার এমনই অটল বিশ্বাস ছিল যে যাঁহারা দরবারের আনুগত্য স্বীকার করিতেছেন না তাঁহাদের প্রতি তাঁহার কিছু আস্থা ছিল না।* তাঁহাকে কেহ কখনও রাগ করিতে বা কটূক্তি করিতে দেখে নাই। তাঁহার আহার পরিচ্ছদাদি যার পর নাই সামান্য ছিল, এমন কি তিনি এক টাকার ঊর্দ্ধ মূল্যের বিনামা ব্যবহার করিতেন না। বিবাহের সময় পাড়ওয়ালা কাপড় পরিধানের জন্য বিশেষ অনুরোধ করা হইয়াছিল তিনি কিছুতেই সম্মত হন নাই। তিনি বিধানতত্ত্বসম্বন্ধীয় একখানি মাসিক পত্রিকা আগামী আশ্বিন মাস হইতে প্রকাশ করিবার আয়ো-জন করিয়াছিলেন। তিনি এক জন সুলেখক ছিলেন। ঢাকা মেডিকেল স্কুলে যখন অধ্যয়ন করিতেন, তখন একদা এক সভাতে আত্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় সুগভীর ভাবপূর্ণ এক প্রবন্ধ লিখিয়া পাঠ করেন। সেই সভায় সুপ্রসিদ্ধ বক্তা বাবু কালী-চরণ বন্দোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেই প্রবন্ধ শুনিয়া মুগ্ধ হন এবং শ্রদ্ধেয় বঙ্গ বাবুর নিকট রমণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। পরিচয় পাইয়া বলিলেন, মেডিকেল স্কুলের ছাত্রের এরূপ উচ্চতর ভাবে আমি চমৎকৃত হইলাম। তাঁহার হস্তাক্ষরও অতিসুন্দর ছিল।

প্রচার বিবরণ।

শ্রীদরবারের সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

শ্রীদরবারের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া গত ২৯ এ আষাঢ় উলুবেড়িয়া আসিয়া পঁহুছিলাম। ষ্টেসন মাষ্টার বাবু হরিচরণ পাল এক জন ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী. তাঁহার বাসায় বাস এবং বৈকালে সঙ্গীত হইল ও রাত্রে ষ্টীমারের উপর কয়ে-কটি ভদ্রলোকের সহিত উপাসনা ও আলোচনা হইল। পর দিন ঐরূপ সঙ্গীত আলোচনায় দিবাভাগ অতিবাহিত এবং অপরাহ্ণে ৫। ৬টি ভদ্রলোক যুটিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া উপাসনা করিলাম। এখানকার খৃষ্টীয় প্রচারকটি ব্রাহ্মদিগের সহিত বিশেষ উদারতা সহ যোগ দান করেন, তিনিও ছিলেন। আমাদের আশালতা (Band of Hope) সভার সম্পাদক মাদকবৈরী ভ্রাতা প্রিয়নাথ মল্লিক এই প্রদেশের লোক, তিনিও আসিয়া মিলিলেন। পর দিন প্রাতে উকীল মোক্তার ও ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট ইত্যাদির সহিত আলাপাদির পর মধ্যাহ্ন কালে কয়েকটি ভ্রাতাকে লইয়া গঙ্গাবক্ষে উপাসনা হইল। সন্ধ্যার পর খালের ষ্টীমার যোগে প্রিয়নাথের সহিত তাঁহার বাসস্থান বাঁটুল গ্রামে চলিলাম। সেখানে কেহ নামিতে চাহিলে জাহাজ থামে, কিন্তু জেটি নাই। অদ্য অত্যন্ত বৃষ্টি এবং খালের মুখো-মুখী জল, আমরা তিন জন এখানে নামিব, জাহাজ দাঁড়া-ইল বটে, কিন্তু নামিবার জন্য একখানা তক্তাও ফেলিয়া দিল না। সঙ্গী দুই জন সুক্ষ্মকায়বশতঃ অনায়াসেই লাফাইয়া পড়িলেন তাহাতে জাহাজখানি তীর হইতে একটু সরিয়া আসিল, আমি যেমন ঝাঁপ খাইলাম অমনি ঝুপ করিয়া খালের মধ্যে পড়িয়া গেলাম, একটি অঙ্গুলি ভিন্ন অন্য কোথাও আঘাত লাগে নাই। পর দিন প্রাতে

বাঁধের উপর বাঁটুল ব্রাহ্মসমাজের কুটীরে সামাজিক উপাসনা হইল। খালের দুই ধার হইতে কতকগুলি উৎসাহী যুবক আসিয়া যোগ দিলেন. নববিধানের আবশ্যকতা বিষয়ে উপদেশ হইল। মধ্যাহ্নে রবিবাসরিক নীতি বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে উপদেশ দেওয়া হয়। ৩রা শ্রাবণ মুগকল্যাণ গ্রামে ডাক্তার বাবু বিহারীলাল ঘোষের বাসায় আলোচনা সঙ্গীতাদি হইয়া পর দিন সমসপুর গ্রামে গমন করি। তথায় কয়েকটী উৎসাহী যুবা আছেন, তথাকার বিদ্যালয়ে বাসা হইল। মধ্যাহ্নে উপরোক্ত কয়েকটি ভ্রাতা আমি এবং প্রিয়নাথ মল্লিক ও কয়েকটি কৃষক মিলিত হইয়া উপাসনা করিলাম। চারি দিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে প্রকৃতির প্রিয়পুত্র কৃষক ভ্রাতৃগণ সহ একত্র বসিয়া উপাসনা অতি মধুর হইল। বৈকালে বিদ্যালয়ের বালকদিগকে নীতি উপদেশ. সন্ধ্যার পর সঙ্গীত ও প্রার্থনা, তৎপরে আলোচনা। এখানে একটি নববিধান সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল।

ভ্রাতা প্রিয়নাথ আমার সঙ্গে আছেন, ইহাঁর উদ্যোগে এবং বিশুদ্ধ চরিত্রের প্রভাবে এ সবডিভিজনে যুবকদিগের বিশেষ মঙ্গল হইতেছে। পর দিন প্রাতে উলুবেড়িয়ার সবডিভিজন ছাড়িয়া তমলুকে আসিলাম। তমলুকে এণ্ট্রান্স বিদ্যালয়ে "নববিধান" বিষয়ে বক্তৃতায় অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন. অনেকগুলি বৃদ্ধ এবং উকীল মোক্তার শিক্ষক ও উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রে প্রায় ১৫০ শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন। বক্তৃতান্তে তাঁহাদের অনুরোধে সঙ্গীত হইল, তাঁহারা বিশেষতঃ বৃদ্ধেরা আশীর্ব্বাদ করিলেন। এখানে প্রাতঃকালে পথে ও লোকের দ্বারে দ্বারে কীর্ত্তন হইয়াছিল. নিত্য উপাসনায় কয়েক জন যুবা উপস্থিত হইতেন। ৭ই তারিখে এখান হইতে গেঁওখালি গমন করিলাম, তথায় সন্ধ্যার পর কীর্ত্তন ও আলোচনা হইল। লোকেরা বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ৮ই তারিখে ডায়মণ্ডহারবার হইয়া কলিকাতায় পঁহুছিলাম।

দুই দিবস কলিকাতায় থাকিয়াই পুনরায় বাহির হইহইলাম, এক দিনে ষ্টীমার যোগে ঘাটাল আসিলাম। এখানে ব্রাহ্মসমাজাদি কিছুই নাই, যেখানে বাসা করিলাম তাঁহারা প্রথমে যথেষ্ট বিদ্রূপ ও নিন্দা করিয়াছিলেন। এখানকার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, মুনসেফ ও হেড মাষ্টার প্রভৃতির সহিত আলাপাদি হইল। প্রাতে দ্বারে দ্বারে কীর্ত্তনে অনেক শ্রোতা পাইয়াছিলাম। রাত্রে স্কুলগৃহে বক্তৃতাকালে এমন ভয়ানক ভিড় হইয়াছিল যে, বসিবার স্থানাভাবে অনেক লোক বাহিরে দণ্ডায়মান ছিলেন। প্রায় সমস্ত প্রধান লোক উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গীত ও বক্তৃতার পর হিন্দুকেরা আপনা হইতে আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা ও নববিধানের প্রকৃতত্ব স্বীকার করিতে লাগিলেন। এখান হইতে গোপকটে চন্দ্রকোণা গমন করি, তথায় ব্রাহ্মধর্ম্মের নাম গন্ধ নাই। চন্দ্রকোণা অনেক গুলি শিক্ষিত লোক প্রসব করিয়াছেন, কিন্তু এ সময় সকলেই কার্য্যস্থানে থাকায় গ্রামটীতে কেবল কতকগুলি অশিক্ষিত তন্তুবায় বাস করিতেছে। আমি মেদিনীপুর কলেজের প্রধান শিক্ষক বাবু শ্যামাচরণ বক্সী মহাশয়ের গৃহে বাস করিতে লাগিলাম। এখানে উপাসনা, প্রার্থনা, সঙ্গীত ও ধর্ম্মালোচনায় চারি দিন কাটান গেল, পঞ্চম দিবসে বাহির হইয়া সপ্তম দিবসে মেদিনীপুরে পঁহুছিলাম। এখানে দুইটী ব্রাহ্মসমাজ আছে, দুইটিই নববিধানবিরোধী। আমি এখানে ১৫ দিবস বাস করিয়াছিলাম। প্রত্যহ প্রাতে বাসার উপাসনা হইত, সুবিধামত লোকেরা আসিয়া যোগ দিতেন। রবিবার প্রাতে অনেকগুলি আসিতে পারিতেন, আসিবার পূর্ব্বে এক জন নববিধানীর গৃহে উপাসনায় অনেকে যোগ দিয়াছিলেন। এখানকার বেদি হলে দুই দিন দুইটি বক্তৃতা হইয়াছিল। এখানকার বিধানবিরোধী ভ্রাতাদিগের বিশ্বাস, "নববিধানের দ্বারা ভবিষ্যতে পৌত্তলিকতা আসিতে পারে এমন সম্ভাবনা আছে বোধ হয়।" আমি দুই দিনের বক্তৃতায় এবং আলোচনাদিতে পরিষ্কার ভাবে দেখাইয়াছি যে, উপরোক্ত আশঙ্কা করিয়া যাঁহারা স্বতন্ত্র হইয়াছিলেন, পৌত্তলিকতা কুসংস্কার ও গুরুগিরী কেমন প্রকাশ্য ভাবে তাঁহাদিগের দ্বারা এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিয়াছে। ভাদ্রোৎসব উপলক্ষে শ্রীদরবারের অনুমতি অনুসারে কলিকাতায় আসিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু মেদিনীপুরে কিছু কাল থাকিয়া কার্য্য করা আবশ্যক। ৯ই শ্রাবণ, ২১৯৫, শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দত্ত।

সংবাদ।

বিপদ্ বিপদ্‌কে এবং শোক শোককে আহ্বান করে। আমরা রমণীকান্তের অভাবে শোকভারাক্রান্ত হইয়াছি তাহার উপর আবার সংবাদ পাইলাম, আমাদিগের বিশ্বাসী, এবং ভক্ত ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন যিনি বহু বৎসর হইতে গয়া ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছিলেন, বিগত ৮ই ভাদ্র তারিখে তাঁহার ঢাকাস্থ ভবনে সজ্ঞানে মা মা বলিতে বলিতে পরলোকে চলিয়া গিয়াছেন। ইনি কয়েক বৎসর হইতে বহুমূত্ররোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ইনি এক জন প্রকৃত বিধানবিশ্বাসী। আদেশের মতের ইনি এক জন প্রকৃত পক্ষপাতী। কুচবিহারবিবাহসম্বন্ধীয় আদেশে ইনি এক দিনের জন্যও সন্দিহান হন নাই। ব্রহ্মমন্দিরের বেদীর গোলযোগে ইহাঁর আদেশসম্বন্ধে বিশ্বাসকে কেহ টলাইতে পারে নাই। ইহাঁর তুল্য প্রকৃত বিশ্বাসী ও ভক্ত লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাঁর ভক্তিবিশ্বাস দর্শনের সুদৃঢ় ভূমির উপরে সংস্থাপিত ছিল। শেষ জীবনে রোগের নানাপ্রকার উপদ্রবে শরীর ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু মানসিক বল কিছুমাত্র কমে নাই. বরং আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। জীবনের শেষ নিঃশ্বাসবায়ু পড়িবার অল্পক্ষণ পূর্ব্বাবধি ইনি মা মা শব্দ মুখে উচ্চারণ করিয়াছিলেন। পরম মাতা তাঁহার এই সুসন্তানকে আপনার কোলে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সকল প্রকার শারীরিক যন্ত্রণা হইতে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন। ক্রমে সেই অমরধামের শ্রীসৌন্দর্য্যের আকর্ষণ বৃদ্ধি হইতে চলিল। যে সকল সাধু আত্মা পৃথিবীর কার্য্য সুচারুরূপে শেষ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সেখানে গিয়া পরমানন্দ সম্ভোগ করিবেন।

ভাদ্রোৎসবে যে কয়েকখানি নূতন পুস্তক বাহির হইবার প্রস্তাব ছিল তাহা বাহির হইয়াছে। আমরা আগামী পক্ষে সেই সমস্ত পুস্তকের সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

ধর্ম্মতত্ত্ব পত্রিকার বাৎসরিক মূল্য পাঠাইবার জন্য আমরা গ্রাহকদিগকে বিশেষরূপে অনুরোধ করিতেছি।

এই পত্রিকা ৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্॥
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে॥

২৩ ভাগ। ১৭ সংখ্যা। | ১লা আশ্বিন, রবিবার, ১৮১০ শক। | বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২।০ মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা।

হে চিরনূতন পরমেশ্বর, তুমি নিত্যনূতন বিধি প্রতিদিন প্রকাশ করিতেছ, তুমি কখনও পুরাতন হও না, কিছুই পুরাতন হইতে দাও না। যদি আমরা পুরাতন বস্তু লইয়া থাকি, সেই পুরাতন মন, সেই পুরাতন হৃদয় যদি ক্রমান্বয়ে চলিতে থাকে, তবে বল তোমার সঙ্গে আমাদিগের মিল হইল কোথায়? আমরা নববিধানের লোক, আমাদিগের মধ্যে নিত্য তোমার নূতন বিধান প্রকাশিত হইবে, যদি তাহা না হয়, তবে যে আমরা এ নাম কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারি না। প্রভো, যখন তোমার লীলা নিত্য চলিতেছে, তখন যদি আমরা সেই লীলা প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তবে কি আর আমাদিগের পুরাতন হইবার সম্ভাবনা থাকে? যদি আমরা লীলা দেখিতে না পাই, তবে আমরা তোমার লোক বলিয়া বিদিত হইব কি প্রকারে? হে লীলাময় হরি, সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে, সংসারের প্রতিপরিবর্ত্তনের মধ্যে যেন আমরা তোমার সুন্দর হস্ত নিয়ত দেখিতে পাই। আমরা যে সমুদায় ঘটনার ভিতর দিয়া যাইতেছি, সে সকল ঘটনা যদি তোমাবিবর্জ্জিতরূপে দর্শন করি, তাহা হইলে, নাথ, আমরা যে ঘোর নাস্তিকতায় নিপতিত হইলাম। জীবিতেশ্বর, আমাদিগের সংসার তোমার সংসার, আমাদের জীবন তোমার নিত্যলীলাস্থল ইহা যদি না হয়, তাহা হইলে আমরা তোমার বিধানের লোক বলিয়া কি প্রকারে পরিচিত হইব? আমরা যদি সকল সময়ে সকল অবস্থায় তোমায় দর্শন করি, তাহা হইলে তো আমরা কিছুতেই পুরাতন থাকিতে পারি না। হৃদয় যখন তোমা ছাড়া হয়, তখনই উহা মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়, হৃদয়ে আর নূতন ভাবের সমাগম হয় না। যদি নূতন ভাবের সমাগম না হইল, তখন আমরা বাঁচিয়া আছি কি প্রকারে বলিব? শরীরে যদি নিত্য নূতন শোণিতের সমাগম না হয়, তাহা হইলে শরীর কি কখন বাঁচিয়া থাকিতে পারে? তুমি নব নব ভাবরূপ শোণিত হৃদয় মধ্যে প্রেরণ না করিলে আমরা কি প্রকারে জীবিত আছি মনে করিব। হে দীনবন্ধো, তাই তোমার নিকটে প্রার্থনা করি, তুমি আমাদিগের প্রাণের ভিতরে নিত্য নূতন লীলা বিস্তার করিতেছ, ইহা যেন আমরা দেখিতে পাই। তোমার নিত্য নূতন লীলা দেখিলে, আমাদিগের জীবন নূতন স্ফূর্ত্তি লাভ করিবে। যাহাতে আমরা তোমার মত নিত্য নূতন ভাবে সঞ্জীবিত হইয়া কৃতার্থ হই, তুমি এই প্রকার অশীর্ব্বাদ কর।

অবতার ও অবতারী।

আমাদিগের দেশীয় শাস্ত্রে অবতার ও অবতারী এ দুইয়ের মধ্যে যে প্রভেদ আছে, সাধারণ লোকে তাহা অবগত নহেন। অবতার বলিতেই স্বয়ং ব্রহ্ম ভূতলে অবতরণ করিয়াছেন দেশীয়গণ ইহাই বুঝিয়া থাকেন। শাস্ত্রকারেরা দর্শনের বিরোধী, তত্ত্বজ্ঞানের বিরোধী কথা কখন বলেন নাই। আধুনিক সাম্প্রদায়িক পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগের কথার অর্থান্তর ঘটাইয়া স্বস্বসম্প্রদায়ের মত সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং আপন আপন অনুসর্ত্তব্য ভাবানুরূপ অবতারকে পূর্ণ ব্রহ্মরূপে প্রতিপন্ন করিতে যত্ন করিয়াছেন। এই সকল পণ্ডিতের মত খণ্ডন করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। প্রাচীন অবতার ও অবতারীর মত কিরূপে নূতন প্রণালীতে নিয়োগ করিতে পারা যায়, ইহাই প্রদর্শন করিতে আমাদিগের অভিলাষ।

যাঁহা হইতে অবতারগণ বিনিঃসৃত হইয়া ভূতলে কার্য্য করেন, তিনি অবতারী। অবতারগণ ইহাঁর অতিক্ষুদ্র অংশ বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যে শ্রীকৃষ্ণ বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক পূর্ণব্রহ্মরূপে পরিগৃহীত হইয়াছেন, তিনি এই অবতারী পুরুষের একগাছি কৃষ্ণবর্ণ কেশমাত্র। যত অবতার শাস্ত্রে উল্লিখিত আছেন, এইরূপ অংশাংশ ভিন্ন পূর্ণ নহেন। এখন দেখা যাউক, এই অবতারী পুরুষ কাহাকে বলা যায়। নির্ব্বিকার পরব্রহ্ম হইতে অসীম বিশ্ব সমাগত হইল। এই বিশ্বের অন্তর্ব্বর্ত্তী মহান্ আত্মা অবতারিপুরুষরূপে শাস্ত্রে বিখ্যাত। জড় বিশ্ব বিরাট্ মূর্ত্তি, তন্মধ্যে বৈরাজ পুরুষ অবস্থিতি করিতেছেন। এই বৈরাজ পুরুষ সমষ্টিতে অবতারী, ব্যষ্টিতে অর্থাৎ একটি একটি করিয়া গ্রহণ করিলে অবতার। অবতার এবং অবতারী এ উভয়ের মধ্যে স্বরূপগত একতা আছে। কেন না অসীম বিশ্বে যিনি প্রকাশিত, তিনিই প্রতিজীবে প্রতিবস্তুতে প্রকাশিত। এই প্রকাশ বস্তুভেদে ভিন্ন হয় বলিয়া, অবতারে অবতারীর ভাববিকাশে তারতম্য হইয়া থাকে।

আমরা এত দূর যাহা বলিলাম, তাহাতে বিষয়টি যে বেশ সুস্পষ্ট হইল তাহা নহে। এখন নূতন প্রকারের নিয়োগ দ্বারা বিষয়টি সুস্পষ্ট বুঝাইতে যত্ন করা যাউক। ব্রহ্ম অনন্ত নিত্য নির্ব্বিকার ভাবে আপনাতে আপনি অবস্থিত। আপনাতে আপনি অবস্থিত ইহার অর্থ, সমুদায় শক্তি ও স্বরূপ আপনাতে প্রত্যাহার করিয়া সত্তামাত্রে অবস্থিত। যখনই তাঁহাতে বিলীনভাবে অবস্থিত শক্তি চরাচর বিশ্ব প্রসব করিল, তখন তিনি অবতারিরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। অবতারিরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন, ইহার অর্থ কি? ব্রহ্মেতে সমগ্র জীব ও জগৎ নিদ্রিত ভাবে স্থিতি করিতেছিল, অর্থাৎ শক্তিমাত্রে অবস্থিত ছিল, এখন তাহারা এক একটি করিয়া যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে অভিব্যক্ত হইতে লাগিল। এইরূপে অভিব্যক্ত জীব ও জগতে ব্রহ্মাংশের অবতরণ অর্থাৎ সেই সেই জীব ও জাগতিক পদার্থের গ্রহণসামর্থ্যানুরূপ ব্রহ্মস্বরূপের বিকাশ হইল। সুতরাং অবতারী ব্রহ্ম বহু অবতারের মূলরূপে আত্মপ্রকাশ করিলেন। এইরূপে ব্রহ্মের আপনাতে আপনি স্থিতি, অবতারিরূপে প্রকাশ, এবং অবতাররূপে অভিব্যক্তি, এ তিনেরই মধ্যে স্বরূপতঃ ঐক্য আছে। কেন না ব্রহ্ম যখন আপনাতে আপনি অবস্থিত ছিলেন, তখন তিনি এই ভাবে অবতারী ছিলেন যে, তাঁহাতে কোটি কোটি জীব ও জগৎ শক্তিরূপে অবস্থিত ছিল, এবং সে সকল যখন প্রকাশ পাইল, তখন তাহাতে ব্রহ্মের স্বরূপ অনুপ্রবিষ্ট রহিল। এই অনুপ্রবিষ্ট স্বরূপ অবতার নামে অভিহিত, কেন না ব্রহ্মেতে অবস্থিত স্বরূপ জীবাদিতে প্রবিষ্ট হইয়া বাহিরে প্রকাশ পাইল, সুতরাং তাহার অবতরণ হইল বলা যাইতে পারে।

একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সকল দেশে সকল কালে ব্রহ্ম, অবতারী ও অবতার এ তিনের পার্থক্য রক্ষিত হইয়াছে। নির্ব্বিকার ব্রহ্মের নির্ব্বিকারত্ব মানবজাতি অতিমাত্র অবহিত চিত্তে রক্ষা করিয়াছে। সকল দেশেই এক সময়ে বহু দেব দেবীর প্রাধান্য ছিল। এই দেবদেবীগণের যেমন দেবোচিত গুণ ছিল, তেমনি মানবসুলভ দুর্ব্বলতাও তাঁহাদিগেতে বিদ্যমান ছিল। এই সকল দেবদেবীকে কোন কালে নির্ব্বিকার ব্রহ্মরূপে কেহই নির্দ্দেশ করেন নাই। মিসর গ্রীক প্রভৃতি সকল দেশেই সর্ব্বোপরি এক অজ্ঞেয় আদিকারণ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত ছিলেন। তিনি আছেন সকলেই মানিত, কিন্তু মানবজীবনের পক্ষে তাঁহার উপযোগিতা নাই বলিয়া কেহ তাঁহার অর্চ্চনাবন্দনায় প্রবৃত্ত হইত না। মানবগণের চরিত্রানুরূপ দেবদেবী সকল জনসাধারণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইত। এই সকল দেবদেবী সেই অজ্ঞেয় আদিকারণের কেবল অধীন ছিলেন তাহা নহে, তাঁহারা সকলেই তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন। তাঁহা হইতে সমুৎপন্ন এবং তদধীন হইয়াও, ইহাঁরা তাঁহারই অবতার।

এই অবতারবাদ একান্ত অপরিহার্য্য। যদি ব্রহ্ম আপনাতে আপনি থাকিতেন, সৃষ্টি না হইত, তাহা হইলে অবতারবাদের কথা কে তুলিত। যখন সৃষ্টি হইয়াছে, এবং সৃষ্টিমধ্যে ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন, তখন তাঁহাকে আত্মাতে এবং জগতে দেখিতে গেলেই সেই নির্ব্বিকার পরব্রহ্মের অবতরণ মানিতে হইবে। অবতারবাদ দূষিত এবং তাহা হইতে পৌত্তলিকতা এই জন্য সমাগত হইয়াছে যে, নির্ব্বিকার ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টিকে একেবারে স্বতন্ত্র রাখিয়া, জীবে বা জাগতিক পদার্থে যে সকল শক্তিজ্ঞানাদির বিকাশ হইয়াছে, তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। এইরূপে ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছেদে সকল দেশ পৌত্তলিকতার পাপে নিমগ্ন হইয়াছে। সৃষ্টির অপূর্ণ ভাব স্রষ্টাতে পাছে আরোপ হয়, এই ভয়ে ব্রহ্মকে স্বতন্ত্র রক্ষা করা হইল, কিন্তু তাহাতে এই ফল হইল যে, দু একটি লোক ব্যতীত অপরে আর ব্রহ্মযোগে যোগী হইল না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবদেবীর পূজক হইয়া পড়িল। যে ব্রহ্ম কেবল সত্তা মাত্র, যাঁহাকে আরাধনা করিতে গিয়া সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াশূন্য হইতে হয়, তাঁহার আরাধনায় লোকে কেন প্রবৃত্ত হইবে? সুতরাং ব্রহ্মবাদ কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গেল, ক্ষুদ্র বহুদেবদেবীবাদ দেশকে প্লাবিত করিয়া ফেলিল।

নববিধান বা সত্য ব্রাহ্মধর্ম্মের সমাগম এই জন্য হইয়াছে যে, ব্রহ্মের সহিত কাহারও আর বিচ্ছেদ থাকেবে না। বহুদেববাদ মনুষ্যকে ঈশ্বর হইতে দূরে নিঃক্ষেপ করিয়াছে,অবতারবাদ পৃথিবীতে অযুক্ত ধর্ম্ম আনয়ন করিয়াছে, ব্রহ্মখণ্ডে ব্রহ্মখণ্ডে বিবাদ উপস্থিত করিয়া দিয়াছে, এক মনুষ্যসমাজকে শত শত সমাজে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এই সমুদায়কে পুনরায় এক করা, অখণ্ড ব্রহ্মের অখণ্ডত্ব স্থাপন করা বর্ত্তমানবিধানসমাগমের উদ্দেশ্য। ব্রহ্মের সহিত যদি মানবজীবনের সংস্পর্শ না রহিল, তবে পূর্ব্বেও তিনি যে প্রকার অজ্ঞেয় এবং অপূজার্হ ছিলেন, এখনও তিনি তাহাই থাকিলেন, লোকে স্বস্বপ্রয়োজনসিদ্ধির জন্য হয় প্রকৃতির, নয় শক্তিমান্ জীবসমূহের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। এরূপ করিতে গিয়া তোমার আমার ইষ্ট বস্তু এক না হওয়াতে পার্থক্য এবং বিরোধ চলিবে। যখন ব্রহ্মের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিল, তখন জীবের সঙ্গে জীবের বিচ্ছেদ অনিবার্য্য। এই বিচ্ছেদ অতিপ্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, নববিধানের অভ্যুদয়ে এই বিচ্ছেদের তিরোধান হইয়াছে।

বিধান আসিয়াছে, অথচ অনেক ব্রাহ্মের মন হইতে আজও বিচ্ছেদ অন্তর্হিত হয় নাই,

ইহার কারণ কি? কারণ অবিশ্বাস। সংশয়িগণের সংশয়বাদ আজও অনেক ব্রাহ্মের মনকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, তাই ব্রহ্ম খণ্ড খণ্ড হইয়া বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তোমার ঈশ্বর আমার ঈশ্বর নন, আমার ঈশ্বর তোমার ঈশ্বর নন, আজও এই কথা অনেক মানুষের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। এমন কি অনেকে ইহাও বলেন, ব্রাহ্ম হইয়াও লোকে ঈশ্বরকে মনের মত করিয়া গঠন করিতেছে। যদি সত্য ব্রাহ্মধর্ম্মের সমাগম হইয়া থাকে, তবে এ কথার প্রতিবাদ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। ব্রাহ্ম হইয়া একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্মের পূজা আরম্ভ হইয়াছিল, আবার বহুদেববাদে নিপতনের প্রক্রম। কে বলিল তোমার ঈশ্বর আমার ঈশ্বর এক নহেন, তুমি তোমার মত ঈশ্বর গঠন করিতেছ, আমি আমার মত ঈশ্বর গঠন করিয়া লইতেছি? তবে কি ব্রহ্ম ব্রাহ্মদিগের ভয়ে পলায়ন করিলেন, আবার অজ্ঞেয় দুর্জ্জেয় হইয়া মেঘের অন্তরালে লুকাইলেন, বিধান তবে আইসে নাই, বিধান বিধান চীৎকার করা ভ্রম? ইহা কখন হইতে পারে না। কেন হইতে পারে না, আমাদিগকে দেখিতে হইতেছে।

প্রতিজীবে আমরা ব্রহ্মের অবতরণ মানি। তিনি তোমাতে অবতীর্ণ, আমাতে অবতীর্ণ, শত শত নরনারীতে অবতীর্ণ। অবতীর্ণ বলি এই জন্য যে, তিনি আমাদের নিকটে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন, শত শত নরনারীর নিকটে আত্মপ্রকাশ করিতেছেন। সৃষ্টের সঙ্গে সম্বন্ধবিরহিত ব্রহ্ম আপনাতে আপনি অবস্থিত, সৃষ্টের সঙ্গে সম্বদ্ধ ব্রহ্ম অবতীর্ণ ব্রহ্ম। ব্রহ্মের শক্তি জ্ঞান প্রেম পুণ্য অনন্ত, সুতরাং অতিগভীর। আমার, তোমার, এবং অপর শত শত নরনারীর বিন্দুমিত শক্তি, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য যত বাড়িতে থাকে, তত অতিগভীরত্বনিবন্ধন সেই অনন্তশক্তিজ্ঞানপ্রেমপুণ্যের বিচিত্রতা আমাদিগের নিকটে প্রতিভাত হইতে থাকে। তোমার, আমার, অপর শত শত নরনারীর শক্তি জ্ঞান প্রেম পুণ্যের যুগপৎ বর্দ্ধন হয় না, সুতরাং অনন্তশক্তিজ্ঞানপ্রেমপুণ্যের বিচিত্রতা প্রকাশে তারতম্য হয়। আমাতে পাপ সমুপস্থিত, তিনি শাস্তৃরূপে আমার নিকটে প্রতিভাত হইলেন, তোমার মনে সংশয় আসিয়াছে, তুমি তাঁহাকে গুরুরূপে দেখিতে পাইলে, অপর ব্যক্তি আত্মবিবর্জ্জিত হইয়া তাঁহাকে আনন্দঘনরূপে নিত্য অনুভব করিতেছে। একই ঈশ্বর পাত্রভেদে ভিন্নরূপে উপলব্ধ হইলেন, কিন্তু তিনি একই রহিয়াছেন। আমাদিগের বিচিত্রতানিবন্ধন স্বয়ং ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন হইলেন না, কেবল তাঁহার স্বরূপের গভীরতা জন্য আমাদিগের বিচিত্রতানুসারে উহা বিচিত্ররূপে প্রতিভাত হইল এইমাত্র। এই বিচিত্রতাতে আমাদিগের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিল না, কেন না আমরা একই ঈশ্বরকে দেখিতেছি বলিয়া আমাদিগের মধ্যে একতা রহিল, তবে আমরা তাঁহার বিচিত্র প্রকাশের বৃত্তান্ত পরস্পরের নিকট ব্যক্ত করিয়া ভক্তিরসে ডুবিয়া যাইব, এ আরও সুখের কথা। কেন না এক মাতার দশ সন্তান থাকিলে, তাহাদের মা কোন্ দিন কি দিলেন, কি বলিলেন, কাহার প্রতি কখন কি ভাব তিনি প্রকাশ করিলেন, পরস্পর তৎসম্বন্ধে কথোপকথন করিয়া তাহারা আনন্দিত হয়, এবং এক মার সন্তান বলিয়া পরস্পরের মধ্যে তজ্জন্য ভ্রাতৃত্ববন্ধনের ছেদন হয় না, বরং দিন দিন বাড়িতে থাকে। আমাদের প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া পড়িল সুতরাং এখানে বাধ্য হইয়া শেষ করিতে হইল।

বিজ্ঞান সত্যধর্ম্মের সহায়।

আমরা যখন সত্যধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, তখন আর আমরা বিজ্ঞানকে ভয় করি না, বরং সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার অপনয়নের হেতু জানিয়া আমরা তাহাকে সহায় বলিয়া

গ্রহণ করি। মূর্খতা অজ্ঞানতা কখন উচ্চতম তত্ত্বলাভের পক্ষে অনুকূল নহে। ঈশ্বরতত্ত্ব সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, সেখানে অজ্ঞানতার প্রবেশ নাই. অজ্ঞানতা ঈশ্বরকে সংস্পর্শ করিতে না পারিয়া ধর্ম্মের নামে অনেক অযথাসংস্কার উৎপন্ন করে। ব্রাহ্মধর্ম্ম জ্ঞানপ্রধান ধর্ম্ম সকলেই জানেন. এই ব্রাহ্মধর্ম্ম যাঁহারা বিধান বলিয়া বিশ্বাস করেন না. তাঁহারা জাগ্রৎ ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিবিধ কুসংস্কারে নিপতিত হইতে যাইতেছেন। এই সকল লোক মধ্যে এক প্রকার মানসিক বিকার উপস্থিত, যাহা তাঁহারা উচ্চতম যোগের নামে অভিহিত করিয়া অজ্ঞান লোকদিগকে বিপথে ফেলিতেছেন। আমরা ইহাঁদিগের দুশ্চেষ্টা নিবারণ করিতে পূর্ব্বেও যত্ন করিয়াছি, আজও চেষ্টা করিতেছি। যদি কোন কারণে সত্যধর্ম্মের বিকার সমুপস্থিত হয়, আমরা সে কারণের উচ্ছেদ না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারি না. তাই আবার এ সম্বন্ধে আমাদিগের পুনরুদ্যম।

ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রকৃতিবিরোধী অলৌকিক ক্রিয়া সমুপস্থিত হইবে, ইহা আমরা মনে করিতে পারি নাই, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে ইহার দুটি লোক আপনাদিগকে অদ্ভুত ক্রিয়াকারিরূপে উপস্থিত করিয়াছেন। এই দুই ব্যক্তির এক জন সকলের পরিচিত নহেন, সুতরাং তাঁহাকর্ত্তৃক সমধিক অনিষ্ট হইতেছে না। অতি সামান্য লোকেরা তাঁহার নিকটে দুঃসাধ্য রোগ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য আসিয়া থাকে। আর এক ব্যক্তির নাম অতি প্রসিদ্ধ, তাঁহাকর্ত্তৃক অনেক ভদ্র সন্তান বিপথে প্রস্থান করিতেছেন। ইনি যে সকল অদ্ভুতক্রিয়ার কথা উল্লেখ করিয়া লোকের ভ্রান্তি উৎপাদন করেন, সে সকল আমাদিগের দেশের যোগশাস্ত্রে যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার বর্ণিত আছে, তাহার অনুরূপ। এই জন্যই লোকের ভক্তি সমুৎপন্ন হয়, এবং অন্ধের ন্যায় অনেকে তাঁহার অনুসরণ করিয়া থাকেন।

প্রথম 'পরকায়প্রবেশ' বলিয়া যোগ শাস্ত্রে একটি অদ্ভুতক্রিয়ার উল্লেখ আছে. এই ব্যাপারে ইনি বিশ্বাস করেন। এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ এই যে, পথে একটি শব পড়িয়াছিল. এক জন যোগী যোগে নিবিষ্ট হইয়া সেই শবকে উঠাইয়া ছিলেন। এ ঘটনা ঠিক সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলে কাহার মনে না অদ্ভুত ব্যাপার বলিয়া প্রতীত হইবে? কিন্তু এই ব্যাপার যে স্নায়ুবিকারগ্রস্ত লোককর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইতে পারে, ইহা অনেক প্রামাণিক বিজ্ঞানবিদগণ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ আছে। ঈদৃশ রোগাক্রান্ত একটি ফ্রান্স দেশীয় কৃষকবালিকা দূরবর্ত্তী বস্তু স্পর্শ না করিয়াও তাহাতে গতি উৎপাদন করিতে পারিত। * এ দৃষ্টান্ত জানিয়া আর মৃত শরীরকে স্পর্শ না করিয়া তাহাতে গতি উৎপাদন করা কিছু অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না। একজন অপরের মনের কথা বলিতে পারা এ সম্বন্ধেও এখন ক্রমান্বয়ে পরীক্ষা চলিতেছে, এবং কিরূপে একজন আর এক জনের চিত্তের কথা বলিয়া দেয় ইহার কারণ নির্দ্ধারণ যদিও নিশ্চয়রূপে বাহির হয় নাই, তথাপি পূর্ব্বতম যোগিগণ ইহার যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তহা অযুক্ত মনে হয় না।

"প্রত্যয়স্যপরচিত্তবিজ্ঞানম্।" ৩। ১৯।

অপরের চিত্তে সংযম করিলে পরচিত্ত জানিতে পারা যায়। এই সংযম অপরের মুখরাগাদি দর্শন পূর্ব্বক তাহাতে চিত্তাভিনিবেশ করিয়া করিতে হয় [কেনচিৎ মুখরাগাদি লিঙ্গেন গৃহীত্বা যদা সংযমং করোতি তদা পরকায়চিত্তস্যজ্ঞান মুৎপদ্যতে]।

দূরস্থ ব্যক্তিকে নিকটে দর্শন, এইটিকে একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার করিয়া তোলা হইয়াছে। এটি যে মানসিক ব্যাপার ইহা এখন নিঃসংশয়-

* There is a case authenticated by the signatures of several leading physicians in Paris, in which a peasant girl, under certain condition of morbid excitement, was able to move objects at some distance from her without touching them.—*The Nineteenth Century.* August 1885.

রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। দূরস্থ ব্যক্তিকে নিকটে দেখা এ সম্বন্ধে এত গুলি নিঃসংশয় প্রমাণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে যে, সে গুলি পাঠ করিয়া আর যোগপ্রভাবে এই ব্যাপার নিষ্পন্ন হয় কাহারও বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। আমরা চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা যখন কোন বস্তু দর্শন করি, তখন আমাদিগের নেত্রস্থ স্নায়ু যোগে বস্তুর প্রতিমূর্ত্তি মস্তিষ্কে গিয়া প্রতিভাত হয়। পরিশেষে আমরা চিন্তা করিলেই সেই প্রতিমূর্ত্তি মনে জাজ্বল্যমান পরিগ্রহ করিতে পারি। যখন মস্তিষ্কের সেই ভাগ অতিমাত্র উত্তেজিত হয়, তখন উদ্বুদ্ধ প্রতিমূর্ত্তি এত উজ্জ্বলতা লাভ করে যে যে প্রণালী দিয়া উহা মস্তিষ্কে গমন করিয়াছিল, সেই প্রণালী দিয়া বহির্বিনিঃসৃত হইয়া সম্মুখস্থ পদার্থের ন্যায় ভ্রান্তি উৎপাদন করে। আমরা এ সম্বন্ধে অনেক গুলি প্রামাণিক বৃত্তান্ত দিতে পারি। এখানে একটি সামান্য ঘটনা উল্লেখ করিতেছি, তাহাতেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন, রূপ দর্শনবিষয়ে কি বিচিত্র ব্যাপার ঘটিয়া থাকে। ডাক্তার টমাস্ বাউষ্টেড এম ডি গৃহ হইতে প্রায় পঞ্চাশৎ ক্রোশ দূরে অবস্থিতি করিতে ছিলেন। তিনি এক দিন ক্রিকেট খেলিতে ছিলেন। সমাগত বল ব্যাট দ্বারা আঘাত করিতে না পারায় উহা প্রাচীরের নিকটে গিয়া পড়ে। বল আনয়ন করিতে গিয়া দেখেন তাঁহার প্রিয়তম শ্যালক প্রাচীরের উপরে শিকারের পোশাক পরিয়া বন্দুক স্কন্ধে লইয়া দণ্ডায়মান। সে ঈষৎ হাসিতেছে এবং তাঁহাকে অঙ্গুলিযোগে ইঙ্গিত করিতেছে। যখন এই ঘটনা হয়, তখন একটা বাজিতে দশ মিনিট ছিল। পরে তাঁহার নিকটে সংবাদ আইসে যে, তাঁহার শ্যালকের ঠিক্ সেই সময়ে রক্তোদ্গম হইয়া মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার শ্যালক ক্ষয় রোগাক্রান্ত ছিলেন। যে দিন এই ঘটনা হয় সে দিন ভাল ছিলেন, ডাক্তার সাহেবের পিতার নিকটে অনুমতি লইয়া শিকার করিতে যাইবার জন্য তদুপযুক্ত পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক বন্দুক স্কন্ধে লইয়া বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কৈ ডাক্তার এখনও গৃহে আসিলেন না। ইহাতে বৃদ্ধ উত্তর দিলেন তাঁহার পুত্র পঞ্চাশৎ ক্রোশ দূরে অবস্থিত আসা সহজ ব্যাপার নহে, বিশেষ সমধিক ব্যয়সাপেক্ষ। ইহা শুনিয়া যুবক ক্রোধে অন্ধ হইয়া গেল। সক্রোধে প্রবলধ্বনিতে বলিল,আমি ব্যয় বুঝি না আমি তাহাকে দেখিতে চাই। ইহাতে তাঁহার একটি শোণিতপাত্র (blood vessel) ফাটিয়া যায়, এবং রক্তাগমে হইয়া মৃত্যু ঘটে।

এতদপেক্ষা আরও অদ্ভুত ঘটনা প্রামাণিক লোক কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ আছে সে সকল যাঁহারা ইচ্ছা করেন স্বয়ং পাঠ করিতে পারেন, আমাদিগের সে সকল উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন আমরা কেবল এই দেখাইতে চাই যে, যে সকল ব্যাপার অবস্থাবিশেষে অযোগিগণের নিকটে ভ্রান্ত হইয়াও সত্যবৎ প্রতিভাত হয়, সেই সকল ব্যাপারকে যোগীর যোগিত্বদ্যোতক বলিয়া বিশ্বাস পূর্ব্বক প্রকৃত যোগকে কেন লঘু করা হয়। এই সকল বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানার্থে ইউরোপে যে সভা প্রতিষ্ঠিত আছে তাহাতে তাহারা ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সুদৃঢ় ইচ্ছা যোগে দূরস্থ ব্যক্তিতেও ঈদৃশ ভ্রান্তি সমুৎপাদন করা যাইতে পারে।* আমাদিগের বিভ্রান্ত বন্ধুগণ যত আশ্চর্য্য অলৌকিক ব্যাপারের কথা বলিয়া কেন লোকদিগকে বিপথে লইয়া না যাউন, বিজ্ঞানপ্রধান উনবিংশ শতাব্দী তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত সকল ভ্রান্তির মূলে কুটারাঘাত করিবে। অল্পদর্শী লোকদিগকে তাঁহারা বিপথে লইয়া যাইতে পারেন, এবং

* একজন এই মানস করিয়া শয়ন করিলেন যে, তাঁহার এক জন বন্ধুর সঙ্গে দুপ্রহর রাত্রির সময়ে গিয়া সাক্ষাৎ করিবেন এবং তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিবেন। তাঁহার বন্ধু লিখিয়াছেন যে, "On Saturday night 22nd March, 1884, I had a distinct impression that Mr. B. was in my room. I distinctly saw him, whilst widely awake. He came towards me and touched my head.—*The Nineteenth Century*, July 1884.

যোগের নামে শিষ্যবর্গের স্নায়ুঘটিত বিকার উৎপাদন করিয়া দিতে পারেন, কিন্তু জ্ঞানী বহুদর্শী লোক এ সকল ভ্রান্তিসম্ভূত জানিয়া তাঁহারা উহাতে প্রবৃত্ত হইবেন না। যাঁহারা ভ্রান্ত হইয়াছেন, এবং অল্পজ্ঞতা নিবন্ধন ভ্রান্ত হইবেন, তাঁহাদিগের জন্য আমাদিগের দুঃখ। মনের সুস্থাবস্থা বিনষ্ট করিয়া বিকার উৎপাদন এবং সেই বিকারকে উচ্চাবস্থা বলিয়া গ্রহণ; ইহা সামান্য পরিতাপের বিষয় নহে। যে ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার তিরোহিত করিয়া দিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, তাঁহারই লোকদিগের মধ্যে ঈদৃশ ভ্রান্তি সমুপস্থিত, ইহা দেখিয়া এই মনে হয়, ঈশ্বরের সাক্ষাৎভাবনায় যাঁহার হৃদয় পরিশুদ্ধ হয় নাই, তিনি যে কবে কোথায় গিয়া নিপতিত হইবেন, তাহার কিছুই বিশ্বাস নাই।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

আমাদিগের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক আছেন। এক শ্রেণীর লোক তাঁহাদের চর্ম্মচক্ষু দ্বারা চালিত হন, অপর শ্রেণীর লোক অন্তর্দৃষ্টির আলোকে বিচরণ করেন। যাঁহারা চর্ম্মচক্ষু দ্বারা চালিত হন, তাঁহারা একটু বিপদ বিঘ্ন বাধা দেখিলে একেবারে নিরাশ ও অবসন্ন হইয়া পড়েন। তাঁহারা অবস্থার দাস, অবস্থা অনুসারে আপনাদের আশা ও বিশ্বাসকে পরিবর্ত্তিত করেন, সহজেই নৈরাশ্য অন্ধকার ও অবিশ্বাসের হস্তে আত্ম সমর্পণ করিয়া অকালমৃত্যুর গ্রাসে পতিত হন। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি যাঁহাদের নেতা, তাঁহারা "আঁধার ঘরে চাঁদ গেলেন" এবং "চৌদ্দ ভুবন ধ্বংস হলেও আপনাদেতে বানান ঘর।" তাঁহারা ভগবানের নিয়োগ ও লীলার প্রতি কেবল দৃষ্টি স্থির রাখেন, এই অন্ধকারময় সংসারে তাঁহারই মুখের বাণী তাঁহাদের একমাত্র আশা আলোক ও যষ্টিস্বরূপ হইয়া থাকে। ভগবান্ যে বলিয়াছেন, তাঁহার বিধান আসিয়াছে তিনি তাহা স্বকর্ণে শুনিয়াছেন। যদি মণ্ডলীর মধ্যে মতভেদ ও বিরোধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, এবং যদি সমস্ত মণ্ডলী তদ্দ্বারা দগ্ধ হইতে বসে, অথবা যদি অন্য কোন বিষম বিভীষিকা আসিয়া ভয় প্রদান করে, তথাপি তিনি নববিধানসম্বন্ধে নিরাশ হন না। অন্য লোকে যে সমস্ত প্রতিকূল ঘটনা দেখিয়া নিরাশ অবসন্ন হন তিনি তাহারই ভিতর ভগবানের অভিপ্রায় ও বিধানের পূর্ণতার লক্ষণ দেখিয়া আনন্দিত হন। অন্য লোকে তাঁহার বিশ্বাস ও ভাবকে অসঙ্গত জ্ঞান করিয়া নানা প্রকার বিদ্রূপ করে, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস অটল ও সুদৃঢ় থাকে। ঈদৃশ লোকই ভগবানের আলোকে চলেন। যখন ঈশা ক্রুসে নিহত হইলেন, তখন যে ঈশা য়িহুদীদিগের রাজা হইবেন বলিয়া এত প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহাকে ঘৃণিত তস্করদিগের সহিত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইতে দেখিয়া তাঁহার শিষ্যদিগের সকলের মনের আশা চলিয়া গিয়াছিল। তাঁহারা তাঁহাদের প্রভু ব্যতীত আর কিছু জানিতেন না, সুতরাং এরূপ সময়ে তাঁহারা সকলেই এত দিন আত্মপ্রতারিত হইতেছিলেন ইহাই জ্ঞান করিলেন। কথিত আছে যে তখন এরূপ অবস্থা হইয়া উঠিয়াছিল যে শিষ্যগণ তাঁহার মৃত্যুর পর আপনাপন ব্যবসায় অবলম্বনপূর্ব্বক সংসারে প্রবেশ করিতে গিয়াছিলেন। কেবল যথাসময়ে পবিত্রাত্মার আবির্ভাবেই তাঁহাদের বিশ্বাস ও আশার অগ্নি আবার প্রজ্জ্বলিত হইয়াছিল, তাঁহারা নবজীবন লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের পরাক্রমে পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল। ঈশার যে মৃত্যু দেখিয়া পূর্ব্বে তাঁহারা নিরাশ ও মৃতবৎ হইয়াছিলেন পবিত্রাত্মা আসিয়া সেই ঘটনার মধ্যে তাঁহাদিগকে নবজীবনের মূল তত্ত্ব দেখাইয়া দিয়াছিলেন। কেবল এক পবিত্রাত্মাই অন্ধকারকে আলোকে, নৈরাশ্যকে আশায় ও মৃত্যুকে জীবনে পরিণত করিতে পারেন। আমাদের মধ্যে সেই সমস্ত ব্যক্তিই ধন্য, পবিত্রাত্মা যাঁহাদিগের অন্তর্দৃষ্টি উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহাদের চর্ম্মচক্ষু দ্বারা নহে বিশ্বাসচক্ষু দ্বারা চালিত হন, এবং ঘোর অন্ধকার ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বিধানের সমাগম ও জয় সন্দর্শন করিয়া বিধাতাকে প্রণাম করেন।

প্রেরিত, সাধক অথবা বিশ্বাসী নামধারী যাঁহারা নববিধানের সাক্ষী হইয়া পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছেন তাঁহাদের দায়িত্ব অত্যন্ত অধিক। তাঁহারা পৃথিবীর নিকট উপযুক্তরূপে সাক্ষ্য প্রদান করিতে সক্ষম না হইয়া সংসার হইতে চলিয়া যাইলে তাঁহাদের বিষম শাস্তি। এমন উচ্চ বিধানতত্ত্ব সকল এ সংসারে কে শ্রবণ করিতে সক্ষম হয়? আমরা যাহা এত বৎসর দেখিলাম সে উচ্চতম দৃশ্য কয় জন লোক দেখিতে পান? আমাদিগের অপেক্ষা সংসারে অনেক পুণ্যবান জ্ঞানবান্ লোক আছেন, তথাপি যখন তিনি এই অনুপযুক্তদিগকে এরূপ নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া এমন দৃশ্য দেখাইলেন ও এরূপ কথা শুনাইলেন তখন তাঁহার গূঢ় অর্থ এই যে সে সমস্ত ব্যাপার নিষ্ফল যাইবে না। আমাদের জীবনে তাহা সুফল দান করিবে এবং সংসারের নিকট সে জন্য আমরা সাক্ষী হইয়া বিধানের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত

করিব। সংসার চিরকালই অন্ধকারে আচ্ছন্ন। স্বর্গের আলোকের এখানে অত্যন্ত অভাব। নরনারী সকল জীবন পাপ অবিশ্বাসে দলে দলে মরিতেছে, এ অবস্থায় ভগবান আমাদিগকে তাঁহার অমূল্য বিধান রত্ন দেখাইয়াছেন। আমাদের দায়িত্ব ভয়ানক। ভগবানের হইয়া সাক্ষ্য দিবে, বিধানের জয় প্রতিষ্ঠিত করিবে এ সংসারে এমন আর কয় জন লোক আছে? আমরা মূর্খই হই আর দুর্ব্বলই হই, তত্ত্ব সদ্গুণসম্পন্ন অথবা লোকের নিকটও মান্য গণ্য নাই হই, ভগবান তাঁহার বিধানের পূর্ত্তির জন্য আমাদের মুখের দিকে আশার সহিত দৃষ্টি করিয়া আছেন। তিনি স্বহস্তে আমাদিগের অন্ন বস্ত্রের ভার এত দিন গ্রহণ করিয়া যেরূপ নিশ্চিন্ত করিয়াছেন ও আমাদের প্রতি দয়া করিয়াছেন, কোন পিতা বা মাতা তাঁহার সন্তানকে এরূপ করিতে পারে না। এ অবস্থায় যদি এখন আমরা প্রত্যেকেই উপযুক্ত রূপ সাক্ষ্য দিতে অক্ষম হই অথবা স্বার্থপরতা সুখপ্রিয়তা বা আলস্যের বশবর্ত্তী হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিই তাহা হইলে আমাদের মত বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ আর ত্রিসংসারে কেহ নাই। জুডাস তাঁহার প্রভুকে বঞ্চনা করিয়া ঘোর মৃত্যু ও অন্ধকারে পড়িয়া ছিল, শেষ জীবনে যদি আমরা আমাদিগের স্বর্গস্থ প্রভুর ষোল আনা কার্য্য না করিয়া তাঁহাকে বঞ্চনা করি, আমাদিগের পাপ ও অন্ধকার জুডাস অপেক্ষা অল্প হইবে না। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা ঘোর দুঃখ দুর্ব্বলতা ও প্রতিকূল অবস্থায়, কেবল ভগবানের মুখের প্রতি দৃষ্টি করিয়া আপনাদের সুখ স্বচ্ছন্দতায় উদাসীন হইয়া কেবল জীবনের মহা ব্রত পালন করেন। এবং শেষ জীবনে ভগবানের জন্য সংগ্রাম করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন।

আচার্য্যের উপদেশ।

ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির।

বৃহস্পতিবার, ২৯ আষাঢ় ১৭৯৯ শক।

এই মন্দিরে যিনি বিরাজ করিতেছেন তিনি সত্যং। বেদের প্রথম যেমন ওঁকার, ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রথম তেমনি সত্যং। যে ফুলগুলি একত্র করিয়া সাধক ধর্ম্মজীবন সাধন করেন তাহার প্রথম ফুল এই সত্যং। যখন মৃত্যু আক্রমণ করিবে তখন মৃত্যু গ্রাস হইতে বাঁচিবার উপায় এই সত্যং। বার-বার এই সত্য গ্রহণ করিতে হইবে। সত্যই পরিত্রাণ। যতক্ষণ সেই সত্যং ততক্ষণ কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম। ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেবল ঈশ্বর 'আছেন' এই মাত্র জ্ঞান হইয়াছে। কিন্তু এই নির্গুণ সাধন সামান্য সাধন নহে। এই আকাশ সমুদ্র মন্থন করিয়া সত্য বাহির করা সহজ নহে। কিছুও কোথাও নাই আমি কেমন করিয়া বলিব সত্যং। যখন আবার বিশ্বাস শুকাইল তখন সত্যং বলিয়া চীৎকার করা আরও কঠিন ব্যাপার। যাহার চক্ষু হইতে ঈশ্বর অন্তর্হিত হইলেন সে কিরূপে ঈশ্বরকে সত্য বলিবে? সে বলিল আমি কেবল এই সৃষ্টি দেখি, সে কি সত্য দেখিবে? যে অচেতন বস্তু মধ্যেই জড়িত সে কি আপনার মনকে জাগাইয়া তুলিতে পারে? কিন্তু বিশ্বাসের হেতু নাই, ভক্তির ও হেতু নাই। যখন বিশ্বাসের সহিত সাধক সত্যং এই শব্দ উচ্চারণ করেন তখন মন দূরে থাকুক শরীর পর্য্যন্ত কম্পিত হয়। সর্ব্বাগ্রে সত্য স্বীকার। ঈশ্বর সত্য। উপাসনা তত পরিমাণে গভীর হইবে যে পরিমাণে ঈশ্বরকে সত্য বলিয়া অনুভব করিবে। যে পরিমাণে ঈশ্বর সত্য এই কথা অসার মনে হইবে সে পরিমাণে উপাসনা গাম্ভীর্য্যবিহীন হইবে। যতই বলিবে মস্তকের উপরে সত্যং, বক্ষঃস্থলে সত্যং হৃদয়ের মধ্যে সত্যং, ততই ক্রমে ক্রমে উপাসনা গম্ভীর হইয়া আসিবে। যখন সত্য দর্শন হয় না তখন সত্যহারা প্রাণ আশা পথ নিরখিয়া 'সত্য এস, সত্য এস' এই বলিয়া ডাকে, কিন্তু যদি সত্য দেখান যায় তবে সেই সময় কি করিতে হইবে? হয় সত্য ধরিবে নতুবা জড়ের ন্যায় হইয়া বলিবে, হা সত্য! হা সত্য! তুমি আমার কাছে আসিলে না, আমি কেবলই জড় দেখি, সত্য দেখি না। পূর্ণমাত্রায় কাহারও সত্য দর্শন হয় না, এই দুর্ভাগ্য কিসে যায় কেহ বলিতে পারে না। আমি উপদেশ দিতে পারি না, তুমি দৃষ্টান্ত দেখাইতে পার না। কি দুঃখের কথা এই সত্য ধারণ করিতে না পারিলে সকলই মিথ্যা। সত্য নিকটে থাকিলে, জ্ঞান স্বরূপ, সুধাস্বরূপ পুণ্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ সকলকেই লাভ করা যায়। যখন সত্যস্বরূপ দর্শন হয় না তখন মহাকষ্ট। জলের মত সত্য, বায়ুর মত সত্য সকলকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে অথচ অবিশ্বাসী সত্য ধারণ করিতে পারে না। কিন্তু যখনই একবার এই সত্য অনুভূত হয় তখন ইহাতে প্রাণগত বিশ্বাস হয়। অনেক বৎসর অতীত হইল এখনও আমাদের মধ্যে সকল সাধনের প্রথমবর্ণ এবং মূল যে এই সত্য ইহাই ভাল রূপে সাধন হইল না। আলোচনা অথবা জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা এই সত্যকে নিকটে আনা যায় না। সত্যের অভিমান আছে, তাঁহাকে একটুকু সন্দেহ কিংবা অভক্তি করিলে তিনি আর নিকটে আসেন না। তিনি অতি সহজে আসেন; কিন্তু একটু আঘাত পাইলেই আবার চলিয়া যান। ঈশ্বরের সত্য স্বরূপকে ধারণ করা এই জন্য বড় শক্ত। মঙ্গলময়ের কার্য্য স্মরণ করিয়া মঙ্গলময়কে আনিতে পার, পবিত্র চরিত্র হইয়া পুণ্যময়কে আনিতে পার; কিন্তু নির্গুণ সত্যকে কিরূপে আনিবে? উপায় সত্য, লক্ষ্য সত্য, এই জন্য সত্যস্বরূপ সাধন শক্ত। ঈশ্বর বলিতেছেন আমি গরিবের মত হইয়া সকলের নিকট যাই কিন্তু যাহারা আত্মীয়

অনাদর করে আমি কিরূপে তাহাদের নিকট থাকিব? দুঃখী সে যার ঘরে সত্য আশ্রয় পাইলেন না! নিরুৎসাহ নির্জ্জীব ব্রাহ্ম, সত্য বিনা উৎসাহ হইবে না। ভিতরে সত্য দর্শন না হইলে যে দিকে তাকাও কেবলই অসার দেখিবে, সত্যকে মান, চারিদিকে সত্য দেখিবে, তখন চক্ষু হইতে, প্রাণের ভিতর হইতে আগুণ বাহির হইবে। উপাসনা মিথ্যা যদি সত্য হাতে না থাকে, সেই উপাসনা নীরস এবং নির্জীব যদ্দ্বারা সত্য করতলস্থ না হয়। হাজার কেন পৃথিবী নিরুৎসাহ করুক না, যদি সত্য হাতে থাকে কোন ভয় নাই। সহজ ভাবে সত্য লইবে।

বৃহস্পতিবার ১লা ভাদ্র, ১৭৯৯ শক।

বুদ্ধি চিরকালই প্রেম ভক্তির সঙ্গে শত্রুতা করিয়াছে। কেন না প্রেম ভক্তি ঈশ্বরের সন্তান, বুদ্ধি মনুষ্যের অহঙ্কারের সন্তান। দেবপ্রকৃতি ভক্তির সঙ্গে মনুষ্যপ্রকৃতি বুদ্ধির মিলন হইতে পারে না। বুদ্ধি পদে পদে ভক্তির প্রতিবন্ধক হয়। বুদ্ধির শাস্ত্র এই আমি বুঝিব, প্রেমের শাস্ত্র এই ঈশ্বর আমাকে চলাইতেছেন। বুদ্ধির শাস্ত্র এই আমি ভাল পথে চলিতেছি না মন্দ পথে চলিতেছি এবং আমি বুঝিয়া চলিতেছি ইহা জানিলে বুদ্ধির আরাম হইল। আমি কোন পথে যাইতেছি ভক্তি জিজ্ঞাসা করেন না, ঈশ্বর আমাকে লইয়া যাইতেছেন ইহাতেই ভক্তির আরাম। আমি বুঝিয়া চলিব, আর আমি না বুঝিয়া ঈশ্বরের দ্বারা পরিচালিত হইব এই দুইয়ে অনেক প্রভেদ। এই দুই তুলনা করিয়া দেখ, যেটি ভাল তাহা গ্রহণ কর। বুদ্ধির পথে চলিলে দেখিবে আমি চালাইতেছি, অহং সেখানকার কর্ত্তা। ভক্তি এবং প্রেমের পথে অহং নাই, সেখানে কেবল ঈশ্বরই কর্ত্তা। ভক্তিপথে আমি যদি ভাবিয়া দেখি আগে যাহা বুঝিতাম এখন তাহাও বুঝি না। আগে উপাসনা বুঝিতাম, আগে মনে করিতাম এইরূপে একাগ্রতা সাধন করিতে হয়, এখন উপাসনার কোন অঙ্গই বুঝিতে পারি না। এখন মনে উপাসনা একটি স্রোতের ন্যায়, কেমন করিয়া যে সেই আপনার মধ্যে ফেলিয়া আমাকে টানিয়া লইয়া যায়, বুঝা যায় না। মনে হয় উপাসনা একটি বায়ু। কিরূপে কখন যে সেই বায়ুর ভিতরে পড়ি কিছুই জানি না। এইরূপে সাধক না বুঝিয়া স্রোতে পরিচালিত হইতেছে। পৃথিবীতে যেমন পরিবর্ত্তন, যে খানে ঘরছিল সেখানে পুষ্করিণী হইল, যে খানে পুষ্করিণী ছিল সেখানে উদ্যান হইল, যেখানে পথ ছিল সেখানে নদী হইল, যেখানে নদী ছিল সেখানে পথ হইল, সেইরূপ মনের ভিতরেও, আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সকল হইতেছে। আগে মনে করিতাম যৌবনে পরিত্রাণ, এখন দেখিতেছি বাল্যাবস্থায় পরিত্রাণ। আগে জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ জানিতাম, এখন দেখিতেছি মূর্খতাই ভাল। উপাসনার সময় কোথায় গিয়া বাস তাহা কি বুঝিতে পারি? পৃথিবীতে, না স্বর্গে, না মধ্য স্থানে? উপাসনার সময় আত্মাকে স্থাপিত করিলে কিসের উপরে? ঈশ্বর কি দূরে ছিলেন? ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার সন্নিকর্ষ হইতেছে কিসে? কি ব্যবধান ছিল? ঈশ্বরের আবির্ভাব কি? ঈশ্বরত আর দূরে ছিলেন না, নিকটেও আসিলেন না, তবে উপাসনার সময় কি হইল? তুমি কি ঈশ্বর ছাড়া ছিলে? তবে আবির্ভাবে মগ্ন হওয়া কি? তুমি যে তাঁহার পানে তাকাইয়া আছ তাঁহার রূপ কেমন? একবার তাঁহাকে দেখিয়া আবার অন্ধকার কেন দেখ? তিনিত ঠিক সেখানেই আছেন, তবে কেন তাঁহাকে হারাইলে? এ সকল গভীর প্রশ্নের উত্তর কেহ দিতে পারে না। বোধ হয় ঈশ্বরের ইচ্ছাও এই আমারা এ সকল বিষয়ে মূর্খ থাকিব। যখন এইটি বুঝিব, যে আর কিছু বুঝিবার প্রয়োজন নাই তখন পরিত্রাণ পথে অগ্রসর হইব। অনেক পরিমাণে বুদ্ধি দ্বারা পতন হইয়াছে। ভক্তির অমুক কথায় আমার বুদ্ধি সায় দিতেছেনা এই জন্য গ্রহণ করিব না; এই রূপে বারম্বার আমাদের পতন হইয়াছে। অন্যের উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া জন্মান্ধ দৌড়িতেছে, বুদ্ধিমান সন্দেহ করিয়া পতিত হইতেছে। জন্মান্ধ ভক্তগণ ক্রমাগত দৌড়িতেছেন। তাঁহাদের পক্ষে ঈশ্বর যাহা দেন তাহাই ভাল, তাঁহারা বিচার করেন না। বিষ, মধু, রাত্রি, দিন, বিপদ, সম্পদ সকলই ভাল। অতএব আমাদিগকে অন্ধ হইতে হইবে। যদি দেখিতে হয় ঈশ্বরের চক্ষে দেখিব। আমার বুদ্ধির চক্ষে দেখিলে নিশ্চয়ই পতন, নিশ্চয়ই মরণ।

আলেগজেণ্ড্রিয়াতে এস্লামধর্ম্ম প্রচার।

২য়।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে ইজিপ্টের অধিপতি আরস্তলয়স এস্লামধর্ম্ম প্রচারকদিগের আক্রমণে ভীত হইয়া রজনীযোগে আলেগজেণ্ড্রিয়া হইতে পলায়ন করেন। পলায়ন করিবার পূর্ব্বে এক দিন তিনি উক্ত প্রচারকদিগের সম্মুখে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তদুপলক্ষে সংগ্রামক্ষেত্রে উপস্থিত হজরত মোহম্মদের প্রত্যাদেশলেখক শর হবিল ও তাঁহার পরস্পর যে কথোপকথন হইয়াছিল; আরব্য মেশরবিজয় পুস্তক হইতে অনুবাদ করিয়া এস্থানে গ্রহণ করা গেল।

ইজিপ্টের অধিপতি আরস্তলয়স বলিলেন "হে আরব্য সম্প্রদায়, তোমরা আমাদের নিকট হইতে ফিরিয়া যাও, আমরা তোমাদের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে ইচ্ছুক নহি। তোমরা আমাদের রাজধানী ও সন্নিদপ্রদেশ সম্পূর্ণ ও রিফ প্রদেশের অধিকাংশ অধিকার করিয়াছ, আমাদের রাজ্যের অতি অল্পই আমাদের হস্তে, তোমরা তাহার অধিকাংশেই

আধিপত্য বিস্তার করিয়াছ, যাহা তোমরা আমাদিগ হইতে কাড়িয়া লইয়াছ, তজ্জন্য আমরা তোমাদের সঙ্গে বিরোধ করিব না, যদি তোমরা আমাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন কর আমরা তোমাদের সঙ্গে সন্ধি করিতে প্রস্তুত। তাহাতে তোমাদের প্রতি ও আমাদের প্রতি তাহার শুভ ফল ফলিবে। আমাদের প্রতি তোমরা ন্যায় বিচার কর, ও সন্ধিস্থাপনে অত্যাচার করিও না। যদি তোমরা ইহা অগ্রাহ্য কর, তবে আমরা বিশুদ্ধভাবে ও সরল অন্তরে তোমাদিগকে পরাস্ত করিয়া পশ্চাৎ পদ করিব ও দুরবস্থাপন্ন করিয়া তাড়াইয়া দিব। এতদ্ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সঙ্গে যে কেহ শত্রুতা করিয়াছে, সেই দুর্গতি ভোগ করিয়াছে ও পরাস্ত হইয়াছে। যেহেতু আমরা এমন একধর্ম্মসম্প্রদায় যে আমাদের মধ্যে উপাসনামন্দির ও সাধনকুটীর, ধর্ম্মদীক্ষা, ধর্ম্মজ্ঞানী ও বৈরাগ্যাশ্রিত লোক এবং বাইবেলগ্রন্থ, বলি উপচার বিধি ও বলিভূমি এবং ক্রুশ আছে। অনন্তর হে আরব্য সম্প্রদায়, তোমাদের নিকটে ইহার উত্তর কি আছে বল।" মহারাজ আবস্তনস্ এই কথা বলিয়া নিবৃত্ত হইলে পর, মহাপুরুষ মোহম্মদের প্রত্যাদেশলেখক অগ্রসর হইয়া এইরূপ উত্তর দান করিলেন, "তবে তোমার প্রতি দুঃখ হউক, তুমি সেই সকল বিষয় লইয়া গর্ব্ব করিতেছ যাহা তোমাকে বিনাশের দিকে লইয়া যাইতে চাহে এবং তোমাকে নরকে লইয়া গিয়া শাস্তি দিবে। তোমার প্রতি দুঃখ হউক, তুমি আমাদের নিকটে অধর্ম্ম ও গর্হিতাচার এবং ক্রুশ পূজা ও ঈশ্বরের অংশিস্থাপন বিষয় লইয়া গর্ব্ব করিতেছ। আমরা বিরাগী, বিশ্বাসী, পরিত্রাণের অধিকারী, স্বর্গাশ্রিত, কাবাভিমুখীন, কোরাণের অধিকারী, হজ্জব্রতধারী, নমাজ ও রোজার অনুবর্ত্তী। আমাদের ধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আমাদের পেগম্বর অলৌকিকতা ও উজ্জ্বল নিদর্শন ও প্রমাণ সহ আবির্ভূত হইয়াছেন, এবং তাঁহার প্রতি কোরাণগ্রন্থ অবতারিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি তাঁহার অনুসরণ করে, সে ক্ষমা প্রাপ্ত হয় এবং যে তাঁহার প্রমাণকে অগ্রাহ্য করে সে সেই প্রতিফলদাতা ঈশ্বরের ক্রোধে আক্রান্ত হয়, যিনি স্থানেতে ও কালেতে বদ্ধ নহেন, যিনি নিজের জন্য ঈশ্বরত্বের সাক্ষ্য দান করিয়াছেন, যিনি গুণেতে অনাদি, যিনি স্বরূপতঃ একমাত্র, তাঁহার রাজত্ব অবিনশ্বর, তাঁহার পরাক্রম সুস্পষ্ট, তাঁহার শাসন দৃঢ়, তাঁহার বিধি অবিচলিত, তাঁহার সিংহাসন সমুচ্চ, তাঁহার রচনা বিচিত্র, তিনি জনক নহেন, জাত সন্তান নহেন, তাঁহার স্বরূপেতে সীমা নাই, তাঁহার স্থিতিতে কাল নির্দ্ধারিত নাই, তাঁহার মহত্ত্বে মস্তক সকল অবনত হয়, তাঁহার ভয়ে নরপালগণ কম্পিত হয়, তাঁহার গৌরবের নিকটে সকল লোকের মুখ মলিন, তাঁহার বলে সকল বল পরাস্ত, তাঁহার গুণ অনায়ত্ত, তাঁহার দান অক্ষয়, তাঁহার মহিমা লুপ্ত হয় না। তোমার প্রতি দুঃখ হউক। তাঁহার ঈশ্বরত্বের সঙ্গে বিরুদ্ধ ভাবে, তাঁহার প্রতিপালকত্বের সঙ্গে অংশিত্ব স্থাপনে কেমন করিয়া তোমাদের সুখ বোধ হয়, ঈশ্বরকে তাঁহার একত্বের ভিতরে পুত্র করিতেছ।" তৎপর শর হবিল কোরাণের এই বচনটি পাঠ করিলেন, যথা;— "সেই দিবস ঈশ্বরের শত্রুগণ নরকাগ্নির দিকে সমুত্থাপিত হইবে, অবশেষে তাহারা একত্রীকৃত হইবে।"

প্রাপ্ত।

শ্রীমান্ রমণীকান্ত চন্দ।

(ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের ২য় পত্র।)

১। পূর্ব্ব পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে, রমণীকান্ত শ্রীহট্ট নগরে নববিধান মন্দির নির্ম্মাণে উদ্যোগী হইলে তত্রত্য কোন বিবি এক খণ্ড প্রশস্ত ভূমি তাঁহাকে তজ্জন্য বিনা মূল্যে প্রদান করিয়াছেন। এইক্ষণ তাঁহার এক জন বন্ধুর প্রমুখাৎ অবগত হইলাম যে, শ্রীহট্টের বর্ত্তমান জজ সাহেব, এবং সিবিল সার্জ্জন মেকনেমারা সাহেব এবং পাদরি জোনস্ সাহেব সেই মন্দির নির্ম্মাণের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা ছিল, রমণীর প্রতিষ্ঠিত নববিধান সমাজে ২৫।২৬ জন উপাসক হইয়াছিল, এইক্ষণ সমুদয় বিনষ্ট হইতে চলিয়াছে। বিধাতার কি ইচ্ছা জানি না।

২। শ্রীহট্টের নিয়ুট্রাল সমাজে রমণী নববিধানের বিজয় পতাকা লইয়া উপাস্থত হইলে তাঁহাকে এক জন বিধান বিরোধী বাবু বলিয়াছিলেন যে, ইঁহার কাণ কাটিয়া দেওয়া উচিত। পরে সেই বাবুটি রমণীর জীবনের প্রভাবে পরাস্ত হইয়া নববিধানের শরণাপন্ন হন, এবং রমণীর সঙ্গে একত্র বাস ও উপাসনা করেন এবং তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নববিধান সমাজের মেম্বর হন। আর এক জন বিধানবিরোধী বাবু এইরূপে পরাস্ত হইয়া রমণীর সঙ্গে যোগ দান করেন। ইহাই অলৌকিকতা।

৩। শ্রীহট্টের ধর্ম্মানুরাগী বর্ত্তমান জজ গ্রীবস্ সাহেব রমণীর বাসায় আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ পূর্ব্বক রমণীকে এক পত্র লিখেন। রমণী এই পত্র পাইয়া এক জন বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া সাহেবের বাঙ্গলায় স্বয়ং উপস্থিত হন। জজ সাহেব তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ ও রুটি বিস্কুট এবং চা দ্বারা অভ্যর্থনা করেন। নববিধানসম্বন্ধে অনেক কথা জজ সাহেব রমণীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। রমণী সাহেবকে একখানা "নিউ ডিস্পেন্সেশন্ পুস্তক" ও "টু ফেইথ" উপহার দেন। একটি ক্ষুদ্র পর্ব্বতের চূড়াতে সাহেবের বাঙ্গালা। রমণী বিদায় গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময় তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের

পর্ব্বতের মূল পর্য্যন্ত জজ সাহেব তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিলেন এবং কতকগুলি আম্রফল উপহার স্বরূপ তাঁহার গৃহে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। জেলখানার একজন সামান্য নেটিভ ডাক্তারের প্রতি জেলার সর্ব্বপ্রধান রাজপুরুষের এরূপ আদর সম্মান প্রদর্শন জীবনের বিশেষ মহত্ত্ব না দেখিলে কি হইতে পারে?

৪। একদা শ্রীহট্ট নগরের দূরস্থিত "ঢাকা দক্ষিণ" নামক স্থান হইতে একটি চিররুগ্ন স্ত্রীলোক আস্তে ব্যস্তে রমণীর নিকটে আসিয়া বলিয়াছিলেন যে আপনি আমাকে স্পর্শ করুন, স্বপ্নে দেখিয়াছি তাহা হইলে আমি পীড়া হইতে মুক্ত হইব। রমণী প্রথমতঃ স্ত্রীলোকটিকে স্পর্শ করিতে সম্মত হন নাই। পরে তাহার একান্ত কাতরোক্তিতে ও বন্ধুদিগের অনুরোধে স্পর্শ করেন। পথে রমণীকে দেখিতে পাইলে অনেক ঠাকুরবাড়ীর পাণ্ডা পদস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিতে চাহিত, রমণী সঙ্কুচিত হইয়া তাহা করিতে দিতেন না। তিনি দুঃখিত হইয়া বলিতেন আমার অনুপযুক্ত জীবন, আমার প্রতি এরূপ অনুচিত সম্মান হইতেছে বোধ করি শীঘ্রই আমাকে এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে।

৫। রমণী এক দিন কোন কোন বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া নিকটস্থ এক ক্ষুদ্র পর্ব্বতের চূড়ায় আরোহণ করিতেছিলেন। পাহাড়ের এক স্থানে বিকশিত সুন্দর পুষ্পপুঞ্জ দেখিতে পান। ফুলগুলি দর্শন করিবামাত্র তাঁহার গতিরোধ হয়, তিনি স্থির ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া নিমেষশূন্য স্থির নয়নে তাহার দিকে তাকাইয়া থাকেন। বন্ধু অগ্রসর হইয়া সত্বর চলিয়া আসিবার জন্য তাঁহাকে ডাকিতে থাকেন, রমণীর মুখে উত্তর নাই। বন্ধু তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখেন, তিনি ভাবে বিগলিত হইয়া দর দর ধারায় প্রেমাশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। ইহা কি সামান্য ঈশ্বরপ্রেমের লক্ষণ? এক দিন পর্ব্বতের নির্ঝর দেখিয়াও রমণীর এরূপ ভাব হইয়াছিল।

৬। রমণী প্রেমে বিগলিত হইয়া নিত্য নূতন ভাবে সুমিষ্ট উপাসনা করিতেন, তাঁহার উপাসনা প্রার্থনা উপাসকদিগের বিশেষরূপে চিত্ত আকর্ষণের বিষয় ছিল, তাহাতে তাঁহাদের অশ্রু বিগলিত হইত। বিগত ৮ই জানুয়ারি আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণের দিন উপলক্ষে তিনি যে উৎসব করেন, সেই উৎসবের উপাসনায় ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল। তিনি স্বীয় নব সহধর্ম্মিণী হেমলতার সম্বন্ধে বন্ধুদিগের নিকটে এরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, আমি হেমলতাকে পাইয়া বড় সুখী হইয়াছি, হেমের বেশ ধর্ম্মানুরাগ ও উপাসনাশীলতা। রমণী নিয়মিত দৈনিক উপাসনা ব্যতীত সন্ধ্যার পর বন্ধুদিগকে লইয়া কীর্ত্তন করিতেন। ১১।১২ বৎসর বয়ঃক্রম কাল হইতে রমণী নিয়মিত দৈনিক উপাসনা করিয়া আসিয়াছিলেন। রমণী কোন সভাতে উপস্থিত হইলে সকলের পশ্চাদ্ভাগে চুপ করিয়া বসিতেন। রমণীর বিশেষ উদ্যোগে ও উৎসাহে ঢাকায় ছাত্রসমাজ স্থাপিত হয়।

৭। পরলোকগমনের কিছু দিন পূর্ব্বে রমণী ক্রমে দুই দিন সমাজে গভীরভাবপূর্ণ দুইটি সুন্দর উপদেশ পরলোকবিষয়ে দান করিয়াছিলেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন যে, স্বর্গগত আচার্য্যদেবের পদতলে স্থান পাইতে পারিলে আমি কৃতার্থ হইব। তিনি অচিরে পরলোকে চলিয়া যাইবেন বলিয়াই বুঝি এই সকল কথা বলিয়াছিলেন। রমণী আচার্য্যদেবকে দেহাবস্থানে কখন দেখেন নাই। চিরকাল যাঁহারা আচার্য্যের সঙ্গ করিয়াছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা তিনি যে তাঁহাকে অধিকতর আত্মাতে লাভ ও দর্শন করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

শ্রীহট্টস্থ রমণীর বন্ধুদিগের নিকটে, বিশেষতঃ তাঁহার বিশেষ বন্ধু ভ্রাতৃবর প্রসন্নকুমার গুহ মহাশয়ের নিকটে বিনীত নিবেদন যে তাঁহারা রমণীর সংকীর্ত্তি সকল যেন যথাসাধ্য রক্ষা করেন, তাহা হইলে স্বর্গগত বন্ধুর প্রতি তাঁহাদের যথার্থ শ্রদ্ধা ও আদর প্রকাশ পাইবে, এবং রমণীর এক খানি জীবনী শ্রীহট্টস্থ বন্ধুগণ দ্বারা প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। শ্রীহট্টে রমণী ন্যূনাধিক চারি বৎসরমাত্র জীবন যাপন করিয়াছিলেন।

সংবাদ।

আমরা স্থানাভাবে এবার আমাদের শ্রীহট্টস্থ বন্ধুর পত্র প্রকাশ করিতে না পারিয়া দুঃখিত হইলাম।

ভাই গৌরগোবিন্দ রায় দিনাজপুরের অধীন ফুলবাড়ী ব্রাহ্মসমাজের উৎসব উপলক্ষে তথায় গমন করিয়াছেন। অদ্যই তিনি তথা হইতে আসিয়া ব্রহ্মমন্দিরের কার্য্য করিবেন এইরূপ কথা আছে।

ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল গাজিপুরে এবং ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার রংপুরে প্রচার করিতেছেন।

ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য পুনরায় আরম্ভ হইয়াছে। ভাই মহেন্দ্রনাথ বসু প্রতি শনিবার বেলা ৫॥ টার সময় ব্রহ্মমন্দিরে খৃষ্টধর্ম্মসম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন। খৃষ্টধর্ম্মসম্বন্ধে বলা শেষ হইলে উপাধ্যায় ভাই গৌরগোবিন্দ রায় সমস্ত ধর্ম্মের সহিত নববিধানের সামঞ্জস্য দেখাইবেন।

ভাই গিরিশচন্দ্র অনেকটা সুস্থ হইয়াছেন। পায়ের বেদনা সম্পূর্ণরূপে যদিও আজও সারে নাই, তথাপি তিনি শীঘ্রই কলিকাতায় আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। হাফেজ প্রভৃতি কয়েক খানি নূতন গ্রন্থ ছাপাইবার তাঁহার একান্ত আগ্রহ হইয়াছে।

ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত কুচবিহার ব্রহ্মমন্দিরের উপাচার্য্যের কার্য্য করিবার জন্য শ্রীদরবার কর্তৃক তথায় প্রেরিত হইয়াছেন। আশা করি, দেবপ্রসাদে তাঁহার পরিশ্রম ও যত্ন সফল হইবে। এক্ষণকার সময়ে কুচবিহার একটি প্রশস্ত কার্য্যক্ষেত্র। প্রতি রবিবার তথাকার ব্রহ্মমন্দিরে প্রায় এক শত লোক উপস্থিত হইয়া থাকেন। আমরা জানি, কলিকাতা ও ঢাকা ভিন্ন উপাসনাতে এত লোক আর কোথাও হয় না।

আমরা হৃদয়ের সহিত আমাদের শ্রীহট্টস্থ বন্ধুদিগকে বার বার ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। তাঁহারা প্রিয় রমণীকান্তের জন্য বিশেষরূপে পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। রমণীকান্তের চরিত্রে তাঁহারা মুগ্ধ হইয়া এবং তাঁহার বিধবা সহধর্ম্মিণীর অসহায়াবস্থা দেখিয়া তাঁহারা তাঁহার যথেষ্ট উপকারের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের এ সকল শুভ উদ্দেশ্যের জন্য আমরা তাঁহাদের নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞতাঋণে আবদ্ধ রহিলাম। রমণীকান্ত "কল্যকার জন্য ভাবিতেন না" সুতরাং তাঁহার পীড়িত অবস্থাও ও দেহান্তে যে সমস্ত অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহার অধিকাংশই বন্ধুদিগের সাহায্যে নির্ব্বাহ হইয়াছে। বন্ধুরাই যত্নপূর্ব্বক টাকা সংগ্রহ করিয়া আমাদের কন্যাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়াছেন। উপকারী বন্ধুদিগকে দয়াময় ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধাস্পদ;

শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

বিগত ৮ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণে আমাদের পরম বন্ধু গয়ার গবর্ণমেণ্ট স্কুলের দ্বীতীয় শিক্ষক শ্রদ্ধাস্পদ শ্যামাচরণ সেন মহাশয় ৫৫ বৎসর বয়সে ঢাকাস্থ বিধান পল্লিতে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন, ঢাকা জেলার অন্তর্গত মত্তগ্রামে তাঁহার জন্মস্থান। বিধানসমাজের ইনি একজন স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। বিধানমণ্ডলীর মধ্যে ইঁহার ন্যায় শুদ্ধ শান্ত চরিত্র গভীর উপাসনাশীল প্রকৃত বিশ্বাসীলোক বিরল ছিল। গয়া নগরে ইনি শেষ জীবনের ২০।২১ বৎসর কাল যাপন করিয়াছেন। সেখানে তিনি যেরূপ অবিচলিত ঈশ্বরবিশ্বাস ও বিধানের আনুগত্য এবং ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় দান করিয়াছেন, গয়ার বন্ধুগণ মুক্তভাবে তাহার সাক্ষ্য দান করেন। প্রায় একবৎসর কাল হইতে তিনি বহুমুত্র ঘটিত ক্ষত ও উদরাময় ইত্যাদি রোগে বিশেষ রূপে আক্রান্ত ও দুর্ব্বল হইয়া ঢাকাস্থ বিধান পল্লিতে আসিয়া স্থিতি করেন। বিগত শীত ঋতুতে আমি ন্যূনাধিক দুই মাস কাল তাঁহার সহিত এক গৃহে একত্র অবস্থান করিয়াছিলাম। তাহাতে তাঁহার সঙ্গে আমার হৃদয়ের নিগূঢ় সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে। আমি তাঁহার অটল বিশ্বাস ও অবিচলিত ভাব দেখিয়া অনেক শিক্ষা পাইয়াছি। শ্রীদরবারের প্রতি তাঁহার অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস এবং ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেক প্রেরিতের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা দেখা গিয়াছে। যাঁহারা দরবারের আনুগত্য অস্বীকার করিয়া বরং বিরুদ্ধাচরণ করিয়া চলিতেছেন তাঁহাদের প্রতিও কখন তাঁহাকে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই। তিনি ধর্ম্মের গভীরতার ভিতরে বিশেষ রূপে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার মুখে বিশ্বাসের নিগূঢ় কথা অনেক শুনিতে পাইয়াছি। এক মুহূর্ত্তের জন্যও আচার্য্য দেবের প্রতি ও শ্রীদরবারের প্রতি তাঁহার মন বিচলিত হয় নাই। রোগে জীর্ণ শীর্ণ, হস্ত পদে ভয়ানক ক্ষত, চলিতে অক্ষম, অজীর্ণ দোষে আহার করিতে পারিতেন না, এমন অবস্থায়ও প্রাতঃকালে স্নান প্রক্ষালন করিয়া কষ্টে দেবালয়ে যাইয়া প্রতিদিন নিয়মিত রূপে দুই ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা কাল সকলের সঙ্গে আদ্যোপান্ত উপাসনায় যোগ দিয়াছেন। একান্ত অচল ও শয্যা গত হইয়া না পড়িলে তিনি সেই পারিবারিক উপাসনা হইতে কখন বিরত হন নাই। এমন উপাসনানিষ্ঠ আমি কাহাকেও দেখি নাই। মধ্যাহ্নে ভোজনান্তে পল্লীর কয়েকটি বালিকাকে তিনি ইংরেজি শিক্ষা দিতেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে যখন যে অনুষ্ঠান ও আলোচনাদি হইত সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাতে তাঁহার যোগ ছিল। এমন উৎসাহ যে গুরুতর রুগ্নাবস্থায়ও ময়মনসিংহে যাইয়া বিধানের কার্য্য করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলেন। কলিকাতাস্থ কতিপয় বিধনাশ্রিত ভ্রাতা প্রেরিতদিগকে যে আক্রমণ ও নিন্দা করিয়া পুস্তিকা সকল প্রচার করিতে ছিলেন, তাহা পাঠ করিয়া তিনি আমার নিকটে গভীর মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন। এক দিনের জন্যও আমি তাঁহার চিত্ত চাঞ্চল্য বা ক্রোধ দেখিতে পাই নাই। মৃত্যুর ৩৪ দিন পূর্ব্ব হইতে বড় কষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু রোগের কষ্ট তিনি কাহার নিকটে প্রকাশ করিতেন না। মৃত্যু কালে বেশ ঈশ্বর জ্ঞান ছিল। উচ্চৈঃস্বরে মা, মা বলিয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার এক মাত্র পুত্র ও দুঃখিনী সহধর্ম্মিণী এবং বৃদ্ধা অন্ধ মাতা বিদ্যমান। দয়াময় হরি তাঁহাদের অন্তরে শান্তি বিধান করুন।

ঢাকা
২২ শে ভাদ্র।

নিবেদক—
শ্রীগিরিচন্দ্র সেন,

এই পত্রিকা ৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্ ।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্ ।
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে ।

২৩ ভাগ । ১৮ সংখ্যা ।	১৬ ই আশ্বিন, সোমবার, ১৮১০ শক ।	বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷• মফঃস্বল ঐ ৩৲

প্রার্থনা ।

হে প্রেমের অনন্ত প্রস্রবণ, প্রেমসম্বন্ধে এবার তোমার অতি সুদৃঢ় আদেশ, আমরা সংসারী জীব হইয়া বল সে আদেশ কি প্রকারে পালন করি । প্রেম—অতিব্যাপী প্রেম আমরা কোথায় পাইব ? কোন অবস্থাতেও কাহারও প্রতি অণুমাত্র অসদ্ভাব প্রকাশ করিবার উপায় নাই, এমন কি ধর্ম্মের নামেও হৃদয়ের সুকোমল ভাব পরিত্যাগ করা অপরাধ, এরূপ উচ্চ ধর্ম্ম কি, প্রভো, আমাদিগের সম্ভবে ? তুমি এবার কোন কথাই মানিবে না, প্রেম দিতেই হইবে, প্রেম করিতেই হইবে, এই তোমার শক্ত হুকুম । হে দেবাদিদেব, তুমি এই জন্যই এবার আমাদিগকে সংসার ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে দেও নাই, আমাদিগকে স্ত্রী পুত্র পরিবারে পরিবেষ্টিত করিয়াছ । যদি নিঃস্বার্থ প্রেম শিখিব বলিয়া তোমার অভিনব এই ব্যবস্থা হইল, তবে, দেব, সেই সংসার কেন স্বার্থের নিগড় হইয়া আমাদিগকে তাহার সঙ্গে বান্ধিয়া ফেলিল । কোথায় মাতা, পিতা, স্ত্রী, পুত্র কন্যাগণ মধ্যে যে প্রেম স্নেহ দেখিলাম, শিখিলাম, অর্পণ করিলাম, উহা প্রশস্ত ও উদার হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে, তাহা না হইয়া এ কি হইল ? আমাদিগের ভালবাসা গৃহ ছাড়িয়া যে এক পাও বাহিরে যাইতে চায় না । বাহিরে যাওয়া দূরে, ঘরেতে ভালবাসা বদ্ধ হওয়াতে ঘরের বাহিরে যাঁহারা আছেন, তাঁহাদিগের প্রতি অপ্রেম ঘৃণা ও বিদ্বেষই বাড়িল । আমাদিগের দেহজাত সন্তান সন্ততিগণ, বা দেহাংশভাগিনী পত্নী যদি অপরাধ করে, অপ্রিয় কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, আমাদিরে প্রাপ্য আমাদিগকে অর্পণ না করে, আমরা অনায়াসে ক্ষমা করি, কেবল ক্ষমা করি তাহা নহে, স্নেহ ও প্রেম দিতে কুণ্ঠিত হই না, আর বাহিরের লোকের তাহার দশাংশের একাংশ অপরাধ, অপ্রিয় ব্যাবহার সহ্য করিতে পারি না । কেবল এই পর্য্যন্ত নয়, আত্মপরিবারের লোক যদি অপরের সঙ্গে অন্যায় ব্যাবহার করে, সে ব্যবহার অন্যায় বলিয়া বুঝিতে পারি না, অনায়াসে পক্ষ সমর্থন করি, আর অপরের পরিবার যদি আমাদিগের পরীবারের প্রতি অণুমাত্র অসদ্ব্যবহার করে, আমাদিগের নিকটে তাহাদিগের এক গুণ অপরাধ দশ গুণ বলিয়া প্রতীত হয় । প্রভো, এ কি হইল ? সংসারে রহিলাম প্রেম শিখিবার জন্য, শিখিয়া বিস্তৃত জনমণ্ডলীকে উহা অর্পণ করিবার জন্য, তাহা না হইয়া বরং যে বিপরীত ঘটিল । বল, নাথ, এ বিষম মোহপাশ তোমা বিনা আর আমাদিগের

কে ছিন্ন করিয়া দেয়। তাই, প্রণতজনবন্ধো, তোমার চরণে পড়িয়া এই প্রার্থনা করিতেছি, এক বার আমাদিগের প্রেমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দাও, একেবারে উহা প্রবল বেগে সমুদায় নর-নারীর উপরে ভাই ভগিনীর উপরে বিস্তৃত হইয়া পড়ুক। যেন এক স্থানে বদ্ধ থাকিয়া উহা স্বার্থপতার তীব্র তাপে শুকাইয়া না যায়, বিকৃত হইয়া না যায়, এই তব পাদপদ্মে বিনীত ভিক্ষা।

স্বাধীনতা ও বাধ্যতা।

স্বাধীনতা ও বাধ্যতার সামঞ্জস্য কি প্রকারে হইতে পারে আমরা পূর্ব্বে ইহা প্রদর্শন করি নাই তাহা নহে। এ বিষয়ের পুনঃসমালোচন এখন প্রয়োজন, কেন না দেখা যাইতেছে, আমাদিগের মধ্যে অনেক সময়ে এই স্থলেই গোল উপস্থিত হইয়া থাকে। স্বাধীনতা ও বাধ্যতা যাহাতে সহজে একীভূত হইয়া কার্য্য করিতে পারে, আমরা তাহার উপায়ান্বেষণে প্রবৃত্ত হইতেছি।

স্বাধীনতাকে আমরা ঐশ্বরিক গুণ বলিয়া স্বীকার করি। যখন স্বাধীনতা ঐশ্বরিক গুণ হইল, তখন তাহার বিপরীত অধীনতা কখন গুণ মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। স্বাধীনতা এবং অধীনতার মধ্যে যে প্রকার বিপরীত সম্বন্ধ, স্বাধীনতা এবং বাধ্যতার মধ্যে কি সেই প্রকার বিপরীত সম্বন্ধ? অমুক ব্যক্তি একান্ত অধীন, এ কথা বলাও যাহা, অমুক ব্যক্তি অত্যন্ত বাধ্য, এ কথা বলাও কি তাহা? এ দুই এক, কেহ বলিবেন না। কেন এক নয়, দেখা আবশ্যক। অধীনতা যখন স্বাধীনতার বিপরীত, তখন উহার অর্থ ভগবান্ ভিন্ন অন্য আর কিছুর অধীনতা। এরূপ অধীনতা কখন গুণমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না। বাধ্যতা এ শব্দের মধ্যে এরূপ বিপরীত ভাব কিছুই নাই। যাঁহার নিকটে বশ্যতা স্বীকার সমুচিত, তাঁহার নিকটে বশীভূত হওয়া সদ্‌গুণ ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? বাধ্যতা সদ্‌গুণ হইলেও তাহার অপব্যবহার আছে। কোন্ এমন সদ্‌গুণ আছে যাহার অপব্যবহার হইতে পারে না?

বাধ্যতা যদি যথার্থই সদ্‌গুণ হয়, তাহা হইলে যেখানে বাধ্যতা আছে, সেখানে স্বাধীনতা সম্পূর্ণ রক্ষিত হইতে পারে। স্বাধীনতা ও বাধ্যতা দুই সমঞ্জস ভাবে কি প্রকারে একত্র থাকিতে পারে, সেইটি দেখা সমুচিত। ঈশ্বরের নিকটে বাধ্যতা ও স্বাধীনতা এ দুই এক, ইহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। আমরা যখন ঈশ্বরের ইচ্ছার সম্পূর্ণ বাধ্য হই, তখন বিষয় বা প্রবৃত্ত্যাদির অধীনতা অবস্থিতি করে না, আত্মা পরমাত্মার সঙ্গে একত্ব লাভ করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতায় অবস্থিতি করে। সুতরাং ঈশ্বরের নিকটে বাধ্যতা স্বীকারে যখন স্বাধীনতা গেল না, বরং তাহা পূর্ণ হইল, তখন মনুষ্যসমাজের সঙ্গে যে বাধ্যবাধকতা আছে, তাহার সঙ্গে স্বাধীনতার সম্বন্ধ কি, এইটি দেখা প্রয়োজন। আমরা পূর্ণ স্বাধীন, সুতরাং কোন বাধ্যবাধকতা নাই, এ কথা বলিলে এই দোষ পড়ে যে, জনসমাজের মধ্যে ঈশ্বরের কোন ক্রিয়া নাই; তিনি কেবল প্রতিজনহৃদয়েই আপনার ইচ্ছা অভিব্যক্ত করিয়া থাকেন। এমত অতীব দূষণীয়, ইহা এক প্রকার কার্য্যে নাস্তিকতা। কিন্তু এখানেই যত প্রকার গোলযোগ।

জনসমাজে ঈশ্বরের ক্রিয়াপ্রকাশ যাঁহারা স্বীকার করেন, তাঁহারা জনসমাজসম্বন্ধে বাধ্যতা কখন অস্বীকার করিতে পারেন না। এই বাধ্যতা স্বীকার করিতে গিয়া যদি স্বাধীনতা-সঙ্কোচ হয়, তবে তাহা অবশ্য দূষণীয়। সচরাচর জনসমাজের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিতে গিয়া স্বাধীনতা সকল সময়ে রক্ষা করিতে পারা যায় না। তবে যে লোকে বিধি ব্যবস্থা মানিয়া চলে, উহা কেবল সুখ সুবিধার জন্য। যাঁহারা

ধর্ম্মেতে জীবন অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সুখ ও সুবিধার দিকে দৃষ্টি করিয়া কার্য্য করিতে পারেন না। যাহা ঈশ্বরের ইচ্ছাসঙ্গত নহে, সুবিধার জন্য তাহার অনুসরণ করিলে ঈশ্বরের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ পায়। ঈদৃশ উপেক্ষায় ধর্ম্ম রক্ষা পায় না। কি হইলে বাধ্যতা অর্পণেও স্বাধীনতা পূর্ণ মাত্রায় রক্ষা পায়, ধর্ম্ম দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে, দেখা আবশ্যক।

সত্য, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য যেখানে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ পায়, সেখানে ভগবানের ক্রিয়া সকলেই দেখিতে পান। যেখানে রাগ, দ্বেষ, হিংসা, বা অন্যবিধ নীচ প্রবৃত্তি হইতে কিছু হয়, সেখানে ভগবানের ক্রিয়া প্রচ্ছন্ন, মানুষের পাপ সেখানে আধিপত্য করে। যাহা সত্য, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য অনুমোদিত, তাহার অনুসরণ এবং ভগবানের অনুসরণ একই কথা। যে জনমণ্ডলীর অনুশাসন সত্যাদিসম্মত, তাহার অনুবর্ত্তনে আমরা কখন বলিতে পারি না যে, আমাদের স্বাধীনতার সঙ্কোচ হইল। যাহারা এরূপ কথা বলে, তাহারা স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারকে সিংহাসন অর্পণ করিয়া থাকে। বিস্তৃত জনমণ্ডলী হউক, অথবা অল্পসংখ্যক বন্ধুনিচয় হউক, ব্যক্তিবিশেষ হউক, সত্যেতে জ্ঞানেতে প্রেমেতে এবং পুণ্যেতে এক হইলে সে স্থলে মস্তক প্রণত করা কিছু স্বাধীনতার বিরোধী নহে। যদি মস্তক এস্থলে প্রণত না হইয়া উদ্ধত হয়, তাহা হইলে সেখানে স্বাধীনতা নাই, স্বেচ্ছাচারিতা প্রবেশ করিয়াছে, অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়।

অপরের অভ্যন্তরে সত্যাদির প্রকাশ, এবং আপনার অভ্যন্তরে সত্যাদির প্রকাশ, এ দুই কখন বিরোধী হইতে পারে না। দুই আত্মা কেন, শত আত্মা এইরূপে এক হইয়া যায়। এই একতা হইতে যে ক্রিয়া সমুপস্থিত হয়, তন্মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতা বিরাজমান। এখানে একই ভগবান্ শত আত্মাতে প্রকাশিত হইয়া তাহাদিগের মধ্যে আপনার ইচ্ছা ব্যক্ত করিতেছেন, সুতরাং এক অপরের সহিত কার্য্যেতে ব্যবহারেতে কথাতে রুচিতে সংস্কারে মিলিত হইয়া পূর্ণ স্বাধীন অবস্থিত করেন। আমরা রাগ দ্বেষাদিতে অপরের সহিত মিলিত হইব, ইহা কেহই অনুরোধ করিতে পারেন না, এবং ইহা অসম্ভব। এখানে মিলন কখনই হইতে পারে না। স্বেচ্ছাচার কি প্রকারে মিলন আনয়ন করিবে? মিলন হয় পূর্ণ স্বাধীনতায়, স্বেচ্ছাচারিতায় নহে। দুজন ক্রোধী বা অপরবিধ নীচ প্রবৃত্তির অধীন লোকের মিলন কে কোথায় প্রত্যক্ষ করিয়াছে? স্বাধীনতা এবং বাধ্যতা, এ দুই বিরোধী সামগ্রী নয় বলিয়াই এখানে সম্মিলন অবশ্যম্ভাবী। যদি এ দুই কোন ব্যক্তিতে যুগপৎ বিরাজ না করে বুঝিতে হইবে, সেখানে স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা প্রবেশ করিয়াছে। আমি স্বাধীন অথচ যে কোন স্থানে অবস্থিত সত্য জ্ঞান প্রেম পুণ্যের সঙ্গে আমার মিলন নাই, ইহা অতি মিথ্যা কথা। অহঙ্কার অভিমান নীচ বাসনা প্রভৃতি লোকের মনে প্রবেশ করিয়া যখন তাহাদিগকে স্বেচ্ছাচরণে প্রবৃত্ত করে, তখন তাহারা অন্ধ হইয়া পড়ে, এবং স্বাধীনতার নামে বাধ্যতাকে বিদায় করিয়া দেয়। স্বাধীনতা ও বাধ্যতার বাসভূমি সত্যাদি, ইহা জানিয়া যেন এ দুইকে আমরা যুগপৎ আদরের সহিত হৃদয়ে ধারণ করি।

ন্যায়ের তীব্রতা।

নববিধানে ভালবাসিবার নিয়ম অত্যন্ত সুদৃঢ়। লোকে যদি সহস্র অপরাধ করে, তবুও ক্ষমা করিতে হইবে, ভাল বাসিতে হইবে, ইহা ভগবানের সম্মুখের আদেশ। এ আদেশ আমরা কোন কারণে অবহেলা করিতে পারি না, অথচ প্রাচীন বিধানসমূহের সঙ্গে এ বিধানের ঐক্য থাকিবে কি প্রকারে, ইহা দেখা নিতান্ত প্রয়োজন। আমরা জানি, ন্যায় ও প্রেম একই

সামগ্রী, কিন্তু পৃথিবী ইহা জানে না, সুতরাং প্রাচীন ও নূতন বিধানে সম্মিলন প্রদর্শন একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

প্রাচীনকালে "দন্তের পরিবর্ত্তে দন্ত, চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু", ন্যায়ের এই বিধি ছিল। ন্যায়ের বিধান যখন প্রেমে পূর্ণ হইল, তখন শত্রুকে ভালবাসা, সহস্র অত্যাচারেরও প্রতিশোধ না লওয়া প্রবর্ত্তিত হইল। এ দুই পরস্পরের এমনই বিপরীত যে, এ দুইকে এক সামগ্রী বলিয়া কিছুতেই বুঝিতে পারা যায় না। মানুষ এত দুর্ব্বল যে, ন্যায় ও প্রেমকে এক স্থানে কখনই স্থান দান করিতে পারে না। একটির অনুসরণ করিতে গিয়া অপরটিকে হারাইয়া ফেলে। এমন কোন পন্থা আবিষ্কৃত হইতে পারে কি না, যাহাতে দুর্ব্বল মনুষ্যও ন্যায়ের অনুরোধে প্রেমকে, প্রেমের অনুরোধে ন্যায়কে খণ্ডন করিবে না। ন্যায় ও প্রেম যাহাতে এক হয় নাই, সে ব্যক্তির সম্বন্ধে এই উপায় বিলক্ষণ কার্য্যকর হইতে পারে।

প্রেম যে প্রকার প্রিয়পাত্রের প্রাপ্য বিষয় দান করিতে পারে, এমন আর কে করিতে পারে? ঈশ্বর অনন্ত প্রেম, তাই তিনি জীবের প্রাপ্য এমন সুক্ষ্ম বিচারের সহিত অর্পণ করিতে পারেন। পৃথিবীতে মা যেমন সন্তানের প্রতি কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে পারেন, এমন আর কে পারে? চুল চিরিয়া বিচার করিয়া দেখ, মার স্নেহ সন্তানের প্রাপ্য কেমন ষোল আনা অর্পণ করিয়া থাকে। এখানে ন্যায় ও প্রেম মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। এখানে বুদ্ধি বিচার চিন্তা নাই, এক প্রেমেই সমুদায় বিধি পূর্ণ হয়। প্রগাঢ় অনুরাগ যেখানে আছে, সেখানে আর বিধিপালনের জন্য প্রয়াস প্রযত্ন করিতে হয় না; সুতঃ বিধি প্রতিপালিত হয়, কর্ত্তব্য নিষ্পন্ন হয়। "দন্তের পরিবর্ত্তে দন্ত, চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু" এই ন্যায়ের তৌলদণ্ড প্রেম আসিয়া যে বিপরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিল, তাহার কারণ ইহা নহে যে, প্রেম আসাতে ন্যায়ের এই সুক্ষ্ম বিচার চলিয়া গেল, কারণ এই যে, প্রেম যাহার যাহা প্রাপ্য তাহা দিতে সাধকগণকে এমনই সামর্থ্য দান করিল যে, আর পূর্ব্ববিধি থাকিবার প্রয়োজন রহিল না।

এখন কথা হইতেছে, যে সকল ব্যক্তি দুর্ব্বল, যাহাদিগের মধ্যে প্রেম ও ন্যায় এক হয় নাই, তাহারা কি উপায় অবলম্বন করিয়া ক্ষমা ও ভালবাসার সুদৃঢ় নিয়ম প্রতিপালন করিবে। বিধান প্রস্ফুট আকার ধারণ করিবার পূর্ব্বে যে সময়ে নীতিসাধন অতি প্রবল ছিল, সে সময়ে যে একটি বিধি হয়, তাহা প্রায় অনেকেই ভুলিয়া গিয়াছেন। সে বিধি এই, পাপীর পাপকে ঘৃণা করিবেক, কিন্তু পাপীকে ঘৃণা করিবেক না। এ বিধিটি কালে ব্রাহ্মগণের নিকটে এমনই দুষ্প্রতিপাল্য হইয়া উঠিয়াছে যে, এখন পাপ ও পাপী এ দুয়ের পার্থক্য আর কেহই করিতে পারেন না, পাপের প্রতি ঘৃণা যত দূর না হউক, পাপীর প্রতি ঘৃণা এখন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। যখন নীতিসাধন প্রবল ছিল, তখন প্রতিসাধক আপনার চরিত্রের প্রতি অতি সুক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতেন, এবং বিবেকের আলোকে পাপ দর্শন করিয়া তাহাতে ঘৃণা করিতেন। এইরূপে তিনি পাপকে ঘৃণা করিতেন বলিয়া যে আপনার প্রতি প্রীতিশূন্য হইতেন তাহা নহে। মানুষের যদি আত্মপাপের প্রতি সুক্ষ্ম দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে স্বাভাবিক নিয়মে পাপকে ঘৃণা করা এবং পাপীকে ঘৃণা না করা অনায়াসে অভ্যাস হয়। যেখানে দেখিতে পাওয়া যায়, পাপীর প্রতি ঘৃণা অত্যন্ত বাড়িয়াছে, সেখানে ইহা নিশ্চয় কথা যে, পাপের প্রতি ঘৃণা কমিয়া গিয়াছে। এ কথা শুনিতে আশ্চর্য্যবোধ হইলেও আশ্চর্য্য নহে। কেন না পাপের প্রতি পূর্ব্ববৎ ঘৃণা থাকিলে, পাপীর প্রতি ঘৃণা কখন আসিতে পারিত না। ঠিক যেখানে পাপের

প্রতি ঘৃণা সেখানে পাপসম্বন্ধে আত্মপরপ্রভেদ থাকে না। যেখানে আত্মপরভেদ নাই, সেখানে আপনার পাপের প্রতি ঘৃণা, আপনার প্রতি প্রীতি যেরূপ স্বভাবের নিয়মে হইয়া থাকে, সেইরূপ পরের পাপের প্রতি ঘৃণা, এবং সেই ব্যক্তির প্রতি প্রীতি একই নিয়মে উপস্থিত হয়। যখনই কোন ব্যক্তি পাপীকে ঘৃণা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখনই বুঝিতে পারা যায়, সে ব্যক্তি স্বভাববিচ্যুত হইয়াছে, আপনার প্রতি তাহার দৃষ্টি হ্রাস হইয়াছে, অন্যথা পাপের প্রতি ঘৃণা পাপীর প্রতি প্রীতি ঠিক থাকিত। স্বভাবে স্থিতি করিয়া কে কোথায় আপনার পাপকে ঘৃণা করার সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে ঘৃণা করিয়া থাকে? অতিপ্রথমে পাপ ও পাপিসম্বন্ধে যে নৈতিক বিধি স্থাপিত হইয়াছিল, যদি আজ তাহা রক্ষিত হইত, তাহা হইলে ক্ষমা ও ভালবাসার বিধি প্রতিপালনে কখন কাহার ক্লেশ উপস্থিত হইত না।

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, মানুষ স্বভাবের নিয়ম প্রতিপালন করিতে পারে না বলিয়াই সাধন অবলম্বন করিয়া থাকে, এখানে এমন কি সাধন আছে, যাহাতে এই বিধি প্রতিপালিত হইতে পারে? এ জিজ্ঞাসার সুস্পষ্ট উত্তর এই যে, যদি এরূপ অবস্থায় এক জন উপস্থিত হইয়া না থাকে যে, পাপীকে ঘৃণা না করিয়া পাপকে ঘৃণা করে, তাহার পক্ষে উচিত এই যে, অপরের সম্বন্ধে এককালীন বিচার পরিহার করে, কেবল আপনার প্রতি নিরন্তর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখে। এরূপ করিলে ফল এই হইবে যে, সে আত্মপাপ দর্শন করিয়া সেই সকল পাপকে ঘৃণা করিবে, অথচ আপনার প্রতি প্রীতি বহন করিবে। এইরূপে পাপকে ঘৃণা, পাপীকে প্রীতি করা তাহার অভ্যস্ত হইয়া পড়িবে। এই সাধন যে সদোষ ইহা কখন আমাদিগের মনে হয় না, কেন না যে ব্যক্তির অপরের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম নাই, ন্যায়তঃ তাহার অপরের দোষ দেখিয়া আক্রমণ করিবার কোন অধিকার নাই। সন্তানকে মারিতে পারে এ অধিকার যার আছে; কেন না তৎপ্রতি তাঁহার স্নেহ অতি গভীর। পাপীকে তুমি বিন্দুমাত্র ভালবাসা দিতে পারিলে না, অথচ আঘাত করিবার বেলা বিলক্ষণ উদ্যমপূর্ণ, ইহা কোন নীতিরই অন্তর্ভূত হইতে পারে না।

আমরা যে বিষয় উল্লেখ করিলাম স্বভাবের নিয়ম অনুসরণ করিলে এতদপেক্ষায় আরও উচ্চবিধি এবং তদনুযায়ী সাধন আমাদিগের চক্ষুর নিকটে প্রতিভাত হয়। প্রাচীনকালে ন্যায়ের সঙ্গে ক্রোধ যোগ দান করিয়া ন্যায়কে অতিশয় তীব্র করিয়া তুলিয়াছিল, কালে দুঃখ আসিয়া ক্রোধের স্থানকে অধিকার করিল, এবং ন্যায় ও দুঃখ হস্ত ধরাধরি করিয়া চলিতে প্রবৃত্ত হইল। প্রতিসাধকের আত্মপাপসম্বন্ধে ন্যায়ের তীব্রতা পূর্ব্বে যেমন ছিল তেমনই রহিল, কিন্তু অপরের পাপসম্বন্ধে দুঃখ আসিয়া প্রাণকে সুকোমল করিয়া দিল। পাপীর প্রতি হৃদয়ের এরূপ সুকোমল ভাব মহাত্মাদিগেতে এত প্রবল যে, তাঁহারা পাপীর জন্য নিয়ত অশ্রু বর্ষণ করেন। সাধারণ লোকের সেরূপ হৃদয়ের সুকোমল ভাব হইবে আশা করা যাইতে পারে না। কিন্তু মহাত্মাদিগেতে যাহা সিদ্ধবৎ উপস্থিত হয়, অপর লোকের তাহা সাধনের বিষয়। কাহার নিজের পুত্র যদি কোন পাপ করে, পিতার হৃদয়ে তজ্জন্য অতীব ক্লেশ হয় হয়। আমরা যে সংসারে পরিবারপরিবেষ্টিত হইয়া স্থিতি করিতেছি, তাহা এই জন্য যে, পাপীর প্রতি দুঃখানুভব করিবার পক্ষে আমরা এই স্বাভাবিক ভাবকে সাধনের অনুকূল করিয়া লইব। সংসার এইরূপে উচ্চভাব সাধনের উপায় হইলে সংসার যে লোককে স্বার্থাদি দ্বারা হীন করিয়া ফেলে, সে দোষ আর থাকে না। আমরা এইরূপে দেখিতেছি, নববিধানের সমাগমে শুদ্ধ প্রেমপ্রদর্শনের যে সুদৃঢ় বিধি হইয়াছে, তাহা

সর্ব্বোভাবে স্বাভাবিক। এ কালে আর ন্যায়ের তীব্রতা কখন সাধকে স্থিতি করিতে পারে না। তীব্রতা আত্মসম্বন্ধে. অপরসম্বন্ধে সুকোমল ভাব, ইহাই বিধিসঙ্গত, ইহাই স্বভাবসঙ্গত। এস্থলে ইহাও বিচার্য্য যে, দন্তের পরিবর্ত্তে দন্ত চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু, ইহা বিচারকগণের বিচার-সাহায্য জন্য লিপিবদ্ধ বিধি, প্রতিব্যক্তি দন্তের পরিবর্ত্তে দন্ত বা চক্ষুর পরিবর্ত্তে চক্ষু উৎপাটন করিয়া লইবে, এজন্য ইহা ব্যবস্থাপিত হয় নাই। ন্যায়বিচার নির্দ্দিষ্ট বিচারকগণের হস্তে প্রতিব্যক্তির হস্তে নহে। এ নিয়ম প্রতিপালন করিলে প্রেমসাধন অক্ষুন্ন থাকে, ইহা কিছু সাধকের পক্ষে অল্পলাভকর নহে।

গাজিপুরের বাবাজি।

"পবহারী" বাবা প্রায় পাঁচ বৎসর কাল গুফার মধ্যে থাকিয়া পুনরায় দেখা দিয়াছেন এবং নবভাবে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনকাহিনী শ্রবণের জন্য বোধ হয় অনেকেরই কৌতূহল জন্মিয়া থাকিবে। বাবাজীর পূর্ব্ব নাম হরভজন দাস, জন্মস্থান জোনপুরের নিকট প্রেমাপুর নামক স্থানে, পিতার নাম অযোধ্যারাম. জাতিতে ব্রাহ্মন। ইহাঁর পিতৃব্য এক জন সাধক ছিলেন এবং তাঁহাকেও লোকে পবনাহারী বাবা কহিত। তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত কুটীরে হরভজন দাস গুফা নির্ম্মাণ করিয়া ছেন। বাল্যকালে ইনি পিতৃব্যের সেবা করিতেন, আর গাজীপুরের কোন পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র শিক্ষা করিতেন। পরে সিপাহী বিদ্রোহের কিছুকাল অন্তে উক্ত পিতৃব্য সাধুর পরলোকপ্রাপ্তি হয়। তাঁহার শ্রাদ্ধক্রিয়া সমাপন করিয়া বাবাজি কিছুকাল তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। কয়েক বৎসর ধরিয়া নানা তীর্থ ভ্রমণ করেন, কিছু দিন বহরমপুরের গঙ্গার ধারে থাকেন, তার পর প্রায় ১২। ১৪ বৎসর অতীত হইল স্বীয় পিতৃব্যপ্রতিষ্ঠিত আশ্রমে এক গুফা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার ভিতরে ধ্যান যোগ সমাধি পূজা পাঠ স্তব স্তুতি বন্দনায় নিযুক্ত আছেন। বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইবে। মূর্ত্তি অতি শান্ত, চিত্ত প্রসন্ন, বাক্য সুমধুর। বাবাজীর আশ্রমটিও অতি রমণীয় স্থান, দেখিলেই পূর্ব্ব কালের মুনি ঋষিদের তপোবনের কথা মনে পড়ে। গাজীপুর নগরের পশ্চিম প্রান্তে, বিস্তৃতবক্ষঃ গঙ্গার তটে এক উচ্চ ভূমিতে উহা সংস্থাপিত। শান্তিরসপিপাসু যোগীর ঐশ্বর্য্য-বিলাসভোগের পক্ষে যাহা কিছু প্রয়োজন তাহার সমুদয় গুলির একত্র সমাবেশ এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণে উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রশস্তহৃদয় প্রসন্ন সলিলা ভাগীরথী, পূর্ব্ব দিকে পরিখার ন্যায় ক্ষুদ্র একটি জলস্রোত, উত্তর ও পশ্চিমে বিশুদ্ধবায়ুসেবিত শস্যতৃণপূর্ণ শ্মশান ভূমি। নিম্ন গঙ্গার উচ্চ পাড়ের উপরই এই আশ্রম, তাহার চারিদিকে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বৃক্ষরাজি, তাহাতে নানাবিধ পক্ষী গান করিতেছে। শান্তি যেন এখানে মূর্ত্তিমতী। অদূরে কুর্থা নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লী। তথাকার প্রজাবর্গ বাবাজীর আজ্ঞাধীন। তাঁহার যখন যাহা আবশ্যক হয় তাহারা সংগ্রহ করিয়া দেয়। আশ্রমের নিকট গ্রাম্য কৃষকগণ কখন গণ্ডগোল চিৎকার করে না, যোগীর কাছে থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার চরিত্রপ্রভাবে তাহারাও চুপ করিতে শিখিয়াছে। এই সরলহৃদয় গ্রাম্য লোকগুলি বাবাজীর অনুরোধে পাপ অসৎ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকে। পাছে তাঁহার মনে কোন দুঃখ হয় এই ভয়। ফলতঃ তাঁহাকে তাহারা যথেষ্ট ভক্তি শ্রদ্ধা করে। বাবাজীর কুটীরের এখন শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। পূর্ব্বে ছিল একটি মাত্র খোলার ঘর। তাহার ভিতর প্রায় চৌদ্দ হাত লম্বা এক পাকা সিঁড়ি নামিয়া গুফার মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। তাহাদ্বারা নীচে নামা যায়। নিম্নে পাঁচ হাত প্রশস্ত একটি স্থান আছে, তাহার শক্ত দেয়ালের কুলঙ্গিতে এবং নিম্ন ভূমিতে বেশ বসা যায়। তাহার উপর দিয়া ধোঁয়া বাহির হওয়ার জন্য চিমনি আছে, ভিতরে তিনি আগুন রাখেন, কিন্তু বাতাস নাই। এই স্থান বাবাজীর ধ্যান সমাধির জন্য, ইহা দেশ কালের অতীত। এখানে যখন তিনি থাকেন, ভগবানের নিত্যসত্তায় বিকল্পবিরহিত চিত্তে তখন অবস্থিতি করেন। এই যোগই তাঁহার চরিত্রের বিশেষ লক্ষণ। আবার ভক্তি চরিতার্থের জন্য খোলার ঘরের ভিতর রাম সীতা রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতির মূর্ত্তি আছে। বাবাজী অনেক সময় দেবমূর্ত্তির সেবা করেন, নানা সাজে তাহাদিগকে সাজান, গৃহ মার্জ্জন করেন। ঘরের ভিতরে হোম আরতি পূজাও নাকি হইয়া থাকে।

সম্প্রতি এই ঘরের পরিবর্ত্তে একটা দুই তালা পাকা ঘর এবং তাহার মধ্যে একটা নূতন গুফা প্রস্তুত হইতেছে। প্রায় এক বিঘা জমী দেড় তালা সমান উচ্চ প্রাচীর দ্বারা ঘেরিয়া লওয়া হইয়াছে। শরীর অসুস্থ হওয়াই বোধ হয় এই পরিবর্ত্তনের কারণ।

তিনি গত পাঁচ বৎসরের পর উঠিয়া এক মহাযজ্ঞ করেন, তাহাতে বহু সহস্র লোক এবং দুই শত আন্দাজ মহান্ত সন্ন্যাসী মঠধারী দণ্ডী, পরমহংস ফকির জমিয়াছিল, দশ বার দিন মেলার ভিড় হয়। বাবাজী সকলকে ভোজন দিয়াছেন, সাধু মহান্তদিগকে বস্ত্র এবং মুদ্রা দান করিয়াছেন, কিন্তু তিনি নিজে বাড়ীর বাহির হন নাই। কোথা হইতে

টাকা আসিল, কে এসব সমারোহের কার্য্য সম্পন্ন করিল ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। তাঁহাকে একবার দর্শন করিবার জন্য লোক সকল যেন উন্মাদপ্রায় হইয়াছিল। পুলিসের সাহায্যে গোল থামাইতে হইয়াছে। অধিকাংশ লোকেই তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই। তিনি কুটীরের কপাট খুলিয়া তাহার মধ্যেই বসেন, চৌকাঠের বাহিরে আসেন না। কেবল সম্মুখের কতকগুলি লোকে তাঁহাকে দেখিতে পায়। মেলার কয় দিন মাঠে, আশ্রমের প্রাঙ্গণে লোকারণ্য হয়। ইহাদের সেবার জন্য কেবল ঐ কুর্থা গ্রামের স্ত্রী পুরুষদিগকেই তিনি ভার দেন। বাবাজীর আশ্রমে রাত্রিকালে কাহারো থাকিবার অনুমতি নাই। সে সময় আশ্রম বড় গম্ভীর শান্তমূর্ত্তি ধারণ করে। চারিদিকের নিস্তব্ধতা গাম্ভীর্য্য এবং নির্জ্জনতার ভিতর একা যোগী পরমাত্মার অনন্ত বক্ষে বিহার করেন।

বাবাজী বড় দর্শনদুর্লভ। যখন তখন আসিলেই যে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে তাহার উপায় নাই। কিছু দিন আনাগোনা করিতে হয়। বহির্জগতের প্রতি তাঁহার টানও নাই, আবার ঘৃণাও নাই। লৌকিকতা সৌজন্যের ধার ধারেন না, অথচ বিনয়ের অবতার। তিনি বেশ ভাবুক প্রেমিক যোগী। একবার দেখা সাক্ষাৎ কথা বার্ত্তা হইলেই চেনা যায়।

আমি পনর দিবসের চেষ্টার পর দুই দিন তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে পাইয়াছি। তাঁহার অজ্ঞাতবাস কালের মধ্যে দুই বার আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছিলাম, তাহা শুনিয়া এবার আসিবার জন্য এক প্রকার আহ্বান করেন। কিন্তু আমায় এখনও দেখা দেন নাই, কপাট বন্ধ ঘরের ভিতর থাকিয়া সুমিষ্ট সৎপ্রসঙ্গ করিয়াছেন। বাক্যের সাহায্যে আত্মায় আত্মা আলাপ, ইহা এক প্রকার মন্দ নহে। তাঁহার বাক্যার্থে, মৃদু মধুর শব্দে শান্তি প্রসন্নতা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারিলাম। বাস্তবিক অর্থযুক্ত গভীর আধ্যাত্মিক বচনে যাহা প্রকাশ পায়,তাহা দর্শনাপেক্ষা অতীব সুগভীর। মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত ও হিন্দি ভজন, তাহার সঙ্গে সৎপ্রসঙ্গ, অন্তরের সার সার কথা, বেশ জমাট বাঁধিয়া গেল। প্রায় দুই ঘণ্টা কাল নানা কথার প্রসঙ্গ করিলেন। পরমহংস রামকৃষ্ণের অনুসন্ধান লইলেন,তিনি পরলোকগত হইয়াছেন তাহা জানিতেন না। ভক্তগণের মধ্যে যাঁহাকে যাঁহাকে দেখিয়াছেন তাঁহাদেরও সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। আচার্য্যকৃত যোগের সংস্কৃত অনুবাদ কিছু পড়িয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন।

বাবাজী এখন "পাহুনাহ" অর্থাৎ কুটম্বিতা করিতেছেন। কুটুম্বটা কে তাহা বোধ হয় অনেকে জানেন না। পীড়াকে তিনি কুটুম্ব বলেন। আজকাল সেই কুটুম্ব তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছেন, তাই দেখা দিবার ব্যাঘাত হইতেছে। দুই তিন দিন একটু সময় ছুটি পাইয়া আমাদের সঙ্গে কথা কহিলেন। বলিলেন, কুটুম্বের আগমনে প্রীতি বৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ রোগের পীড়নে ভগবানের প্রতি ভালবাসার টান বাড়ে, ইহা কি একটা সাধন? এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইলে উত্তর করেন, ইহা সিদ্ধকোটের অবস্থা, অর্থাৎ সিদ্ধাবস্থা ভিন্ন কেহ রোগকে কুটুম্ব জ্ঞান করিতে পারে না। বাবাজী এখানে পাকে চক্রে ধরা পড়িয়া গেলেন। আমাদের স্বর্গীয় আচার্য্যদেবের উৎকট ব্যাধি এবং তাহার উপর তাঁহার যোগবলের প্রভাবের কথা শুনিয়া বলিলেন ".কেশো বাবা অবতার হৈঁ"। পাহুনের নাম কি তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, বলেন "না বাতাই"। এ পাহুন তাঁহার সমাধি যোগ ভঙ্গ করিতে পারে না, অধিকন্তু প্রেমকে বৃদ্ধি করে।

যে গেতে কোন বিক্ষেপ হয় কি না? তদুত্তরে বলিলেন, বিক্ষেপ আরো ব্যাকুলতা অনুরাগ বৃদ্ধি করিয়া দেয়। ভক্তির লক্ষণ বলিলেন, যেমন নির্ম্মলী ঘোলা জলে বিলীন হইয়া জলকে নির্ম্মল করে, তেমনি ভক্তি অগ্রগামিণী হইয়া আপনাকে লুকাইয়া রাখে, যোগকে প্রকাশ করে। ভক্তি আগে, পরে যোগ, তার পরে আবার ভক্তি। আধ্যাত্মিকভাবে ভক্তিরস চরিতার্থের কথাও বলিলেন। প্রিয়ব্রত রাজার উপাখ্যানের কথায় সংসারাশ্রমের উচ্চ ভাব ব্যাখ্যা করিলেন।

বাবাজীর ধর্ম্মমত অবশ্য প্রচলিত হিন্দুশাস্ত্রের মত, কিন্তু তাঁহার আধ্যাত্মিক যোগ ভক্তির ধারণা অনুভব শাস্ত্রাতীত। শিক্ষার্থীদিগের জন্য অধিকারভেদে সাধনপ্রণালীর যে শাস্ত্র আছে তাহাই মানেন, কিন্তু ধ্যান সমাধি যোগ ভক্তি প্রেমের আসল যে সকল সারগর্ভ বচন তাহাতে আর কোন জড়ভাব কৃত্রিমতা, হঠযোগের রাজসিক ভাব নাই। সকলই আধ্যাত্মিক এবং সরস। ভিতরে অভিজ্ঞতার কথা যাহা বলিলেন তাহা লিখিলে রস থাকিবে না, এবং তাহা ভাষায় ব্যক্ত হইবারও নয়, কেবল বিশ্বাসভক্তির কর্ণে হৃদয়যোগে শুনিয়া তাহা আস্বাদন করিতেই ভাল লাগে। অনেক বিষয়ে তিন দিবস কাল সন্ধ্যার সময় ক্রমান্বয়ে সৎপ্রসঙ্গ করা গেল। এ সপ্তাহ তাঁহার সঙ্গে প্রতিদিনই এইরূপে মিলিবার কথা আছে।

উচ্চতর বৈরাগ্যের কথায় বলিলেন, ভগবানের ঐশ্বর্য্য বিভূতি লীলা সম্ভোগ সম্বন্ধেও বৈরাগ্য আছে। সে অবস্থায় অনন্ত নিত্য সত্তায় পরিজ্ঞানবিহীন হইয়া সাগরজলের লবণের ন্যায় জীব ব্রহ্মেতে স্থিতি করে। সে অবস্থা বাক্যে প্রকটিত হয় না। কেশো বাবা বলিতেন, গভীর জলে ডুব দিলে পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ বোধশক্তি যেমন বিলুপ্ত হয়, ইহাও তদ্রূপ। নেতীধোতি রেচক পূরক কুম্ভক প্রভৃতি হঠ-যোগের সাধনসম্বন্ধে বলিলেন, সে এক প্রকার মায়া, তাহাতে নির্ব্বিকল্প সমাধি হয় না, যেহেতু

শরীরকে নিত্য নিত্য পরিষ্কার রাখিবার জন্য তৎপ্রতি মনোনিবেশ করিতে হয়। সে সাধনে লোক অনেক দিন বাঁচিয়া থাকে, স্থিরযৌবনসম্পন্ন হয়, কিন্তু প্রকৃত সমাধি তাহাতে নাই। চিত্তবৃত্তির নিরোধ দ্বারা শনৈঃ শনৈঃ পরব্রহ্মে মগ্ন হওয়াই সাত্ত্বিক যোগ। প্রীতি ভক্তি বিনা সে যোগ সম্পাদন হয় না। ভক্তই যোগের প্রয়োগী।

"পবহারী" নামটির সঙ্গে এ বাবাজীর সম্বন্ধ কি, তাহার কোন অর্থ আছে কি না, ইহাও অবশ্য একটি জ্ঞাতব্য বিষয়। পবহারী অর্থ যিনি পবন আহার বা বায়ু ভক্ষণ করিয়া জীবিত থাকেন। বাস্তবিকই বাবাজী এ বিষয়ের এক দৃষ্টান্ত। তিনি তিমিরাচ্ছন্ন গভীর গর্ত্তের ভিতর অনেক সময় শারীরিকক্রিয়াবিবর্জ্জিত হইয়া সমাধিমগ্ন থাকেন, তদবস্থায় তাঁহার অনেক দিন কাটিয়া যায়। নিজমুখে বলিয়াছেন, দশ পনের দিন অনাহারে একাসনে সমাধিতে তাঁহার অতিবাহিত হইয়াছে। মাস বর্ষ সে ভাবে গত হইতে পারে কি না জিজ্ঞাসা করা গেল। তাহাতে বলিলেন, তাহাও সম্ভব। যত দিন ভগবানের কৃপা তত দিনই থাকা যায়, তবে শরীর ক্রমে শুষ্ক হয়। বস্তুতঃ বাবাজী বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া গুফার ভিতরে অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকেন, ইহা প্রামাণ্য কথা। এ বিষয়ে তাঁহার কোনরূপ বাহাদুরী প্রকাশ নাই, আত্মাভিমান নাই, ভগবৎকৃপা যত ক্ষণ, তত ক্ষণ সমাধিমগ্ন থাকা যায়, এই কথা তিনি বলেন। আরও বলেন যে, ভগবানের প্রেরণা অনুসারে কখন নির্গুণ কখন সগুণের লীলাভূমিতে গমনাগমন করিতে হয়। বাস্তবিকই বাবাজী চিদানন্দে নিত্যযোগে জীবিত। আশ্রমে সহচর অনুচর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের নিকটেও তিনি গুপ্ত। সহোদর জ্যেষ্ঠকে বাবাজী বলিয়া ডাকেন। তিনি অধ্যাত্মরাজ্যের অমর যোগী আত্মা, নিয়ত ব্রহ্মসহবাসে নির্জ্জনে থাকিবার দিকেই বেশী টান। বাহিরে বেশী আর দেখা দেন না, তাহাতে বড় অশান্তি কোলাহল উপস্থিত হয়। কুটীর দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে শুনিলেই চারি দিক হইতে লোক আসিতে থাকে, একবারে যেন মেলার ভিড় হয়। তখন কেহ ঔষধ চায়, কেহ দুঃখের কান্না কাঁদে, কেহ দারিদ্র্যকষ্টের কথা বলে, কিন্তু আত্মার সম্বলের জন্য কেহ ব্যাকুল হয় না, এই জন্য দরজা প্রায় বন্ধই থাকে।

বাবাজীর আশ্রমে দুঃখী দরিদ্র অতিথি কাঙ্গাল আসিলে আহারও পায়। গঙ্গার গর্ভে ভিতর বিশ ত্রিশ বিঘা জমি আছে, তাহার শস্য এবং দর্শনার্থীদিগের দান উপহার দ্বারা অতিথি সেবা চলে। আশ্রমের পার্শ্বে ভক্ত রামদাস নামে এক গরিব গৃহস্থ সাধক আছেন। এরূপ গৃহস্থ ভক্ত শাস্ত্রী পণ্ডিত ধর্ম্মপিপাসু লোক এ দেশে মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়। ভক্ত রামদাসও বড় উদার প্রেমিক। তাঁহার স্ত্রী কৃষিকর্ম্ম করে, তিনিও তাঁহার আজ্ঞাধীন হইয়া সংসার চালান। ক্ষেত্রের শস্য পাহারা দিবার ভার তাঁহার উপর। রামদাস বাবাজী পাহারা দেন, কিন্তু কোন জন্তু বা পক্ষী শস্য ভক্ষণ করিতে আসিলে তাহাকে কিছু বলেন না, সে জন্য স্ত্রীর নিকট ধমক খাইতে হয়। পবহারী বাবা এই ভক্ত রামদাসকে বড় ভালবাসেন।

বাবাজী বক্তৃতা করেন না, কাহাকেও উপদেশও দেন না, কোন কথা সাক্ষাৎভাবে জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "দাস ক্যা জান্তা। স্বামীজী কুছ্ কহিয়ে।" তাঁহার এ প্রণালী বড় অল্প নয়। বাস্তবিক যে পিপাসু, যে ব্যক্তি ধর্ম্মচিন্তা বা সাধন করে, প্রকারান্তরে তাহার সঙ্গে নিগূঢ় তত্ত্ব কথা আপনাপনি হইয়া পড়ে। আমাদের ব্রাহ্মসমাজের রাজ্যে উপদেশ বক্তৃতার বড়ই উৎপীড়ন। উপদেশপীড়িত লোক সকল কেবল উপদেশ শুনিতে চায়। কাহারও সঙ্গে ধর্ম্মপ্রসঙ্গ উত্থাপন হইলে, হয় তো তিনি বলিয়া বসেন, "মহাশয় একটা বক্তৃতা করুন না।" বস্তুতঃ যাঁহারা ব্রাহ্ম নহেন, তাঁহারা ব্রাহ্ম দেখিলেই বক্তৃতা করিতে বলেন। ব্রাহ্মগণ যেন বক্তৃতার যন্ত্র। আমাদের পবহারি বাবা ভিতরের কথা শুনিলে ভিতরের কথা বাহির করেন, তাহা উপদেশ বক্তৃতার অপেক্ষা বহু গুণে শিক্ষাপ্রদ এবং হৃদয়গ্রাহী। বাবাজী প্রসঙ্গস্থলে আমাদের আচার্য্যদেবের বচনাবলী মাঝে মাঝে উল্লেখ করিয়া থাকেন। বিনম্র মধুর ভাবের সঙ্গে আবার বেশ রসিকতাও প্রকাশ পায়। আমি বলিলাম, আপনি গুফার মধ্যে রত্নরাশি সঞ্চয় করিয়া চারি দিক্ দ্বার বন্ধ করিয়া একাকী বসিয়া আছেন, আমরা বহু দূরের ভিখারী, মহাজনের দ্বারে ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি, দর্শন না দিলে চলিবে কেন? বাবাজী বলিলেন, যাঁহারা উদার দাতা তাঁহারা আপনার ঘর ছাড়িয়া লোকের বাড়ী বাড়ী দান বিতরণ করেন। আমি ন্যাংড়া পঙ্গু এইখানে পড়িয়া আছি, ভিক্ষাই আমার জীবিকা। কথায় বাবাজীকে কেহ বড় করিতে পারিবে না, আগে কেহ প্রণাম করিতে পাইবে না, "দাস" ভিন্ন অন্য কথা নাই, স্বামী ভিন্ন সম্বোধন নাই, কিন্তু কাজে তিনি মাথার মণি। মাটী হইয়া, তৃণের ন্যায় নত হইয়া স্বর্গের আদর্শ প্রদর্শন করেন। তীব্র ভাষায় কঠোর উপদেশ, হাড় জ্বালান চিম্‌টি কাটা কথা তিনি জানেন না, কিন্তু সুমধুর বিনয় ভক্তি প্রেম যোগের সার বাক্যে শিক্ষা প্রদান করেন। এত প্রাণ খুলিয়া গভীর কথা কহিলেন, তথাপি বাহির হন না। পীড়িত শরীরে দেখা দেওয়া বোধ হয় নিয়মবিরুদ্ধ হইবে। যাহা হউক, বর্ত্তমান সময়ে এরূপ প্রেমিক যোগী ব্রহ্মগত প্রাণ সাধুর সঙ্গ লাভ, তাঁহার সহিত সৎপ্রসঙ্গ, একটি অমূল্য অধিকার। নববিধানের যোগ ও আদেশ বিষয়ক সঙ্গীত

শুনিয়া তিনি বড় আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। তারের খবরের সঙ্গে আদেশের যে তুলনা সঙ্গীতে আছে, তাহার "পলকে হয় একাকার" কথাটীও তাঁহার অনেক বিলম্ব বোধ হইল। পলকের অপেক্ষাও শীঘ্র গতিতে সে রাজ্যে সংবাদ গতাগাত করে।

গাজীপুর, ২৬।৯।৮৮ ভ্রমণকারী তীর্থযাত্রী।

ব্রাহ্মধর্ম্ম সর্ব্বগ্রাসী।

রবিবার ২২ অগ্রহায়ণ, ১৮০১ শক।

যিনি সম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে শীঘ্রই সেই কৃত্রিম ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে হইবে। যদি কোন হিন্দু সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্ম হইয়া থাকেন, তবে পরিণামে তাঁহাকে প্রকাণ্ড হিন্দুসমাজসমুদ্রে বিলীন হইতে হইবে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম আজ সজীব থাকিতে পারে; কিন্তু কাল নির্জীব হইবে। বড় বস্তু ছোট বস্তুকে টানিয়া লইবে। হে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্ম, তুমি অহঙ্কারে আস্ফালন করিও না; কেন না তোমার সংকীর্ণ ব্রাহ্মধর্ম্ম তোমার হস্ত হইতে কাড়িয়া লইয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রাস করিবে। এই সংসারসমুদ্রে কত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বুদ্বুদের ন্যায় উঠিল এবং আবার তাহারা বিলীন হইয়া গেল। প্রত্যেক শাখাসমাজ হিন্দুসমাজের খাদ্য। হে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্ম, তোমার গৌরব থাকিবে না। অতএব সাবধান হও, এখন যে প্রকাণ্ড বীরের ন্যায় আস্ফালন করিতেছ, এক দিন তোমাকে ভূমিশয্যায় শয়ান হইতে হইবে এবং তোমার অসার বীরত্ব প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

যথার্থ ব্রাহ্ম সাম্প্রদায়িক নহেন। তিনি হিন্দু অপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ। যাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাহা অনন্ত কালের ধর্ম্ম, পূর্ব্বে ছিল, পরেও থাকিবে। তাহাকে হিন্দুসমাজ গ্রাস করিতে পারে না। পিপীলিকা কি হস্তীকে গ্রাস করিতে পারে? ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রহ্মাণ্ড অপেক্ষাও বড়, এক ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে কোটি কোটি হিন্দুসমাজ কিংবা খৃষ্টসমাজ বাস করিতে পারে। অতএব সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মসমাজকে গৌরব দিও না, অনন্তকালব্যাপী এবং সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মসমাজকে গ্রহণ কর। ব্রাহ্মধর্ম্ম অনন্ত দেশের এবং অনন্ত কালের ধর্ম্ম। পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্ম এই ব্রাহ্মধর্ম্মসমুদ্রে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছে। যেমন যত নদনদী এদিক্ ওদিক্ হইতে আসিয়া বঙ্গসাগরে পড়িতেছে, তেমনিই পৃথিবীর নানা দেশে যুগে যুগে যত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত ও প্রচারিত হইয়াছে সমুদয় আসিয়া এই ব্রাহ্মসমাজরূপ প্রকাণ্ড সমুদ্রে পড়িতেছে। এই জন্য যিনি যথার্থ ব্রাহ্ম, তিনি সুচতুর হইয়া সকল ধর্ম্ম হইতেই সার মধু গ্রহণ করেন। হিন্দু বলিলেন;—"আমার দ্বারে সিদ্ধিদাতা গণেশকে বসাইয়া রাখিব।" ব্রাহ্ম দেখিলেন, তাঁহার গৃহে অনন্তকালের গণেশ স্বয়ং ভগবান্ বসিয়া আছেন। হিন্দু গঙ্গা পূজা করেন, ব্রাহ্ম বলেন;—"প্রত্যেক নদীতে আমার ব্রহ্ম ভাসিতেছেন।" যেমন প্রকাণ্ড সমুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীসকলকে গ্রাস করে, সেইরূপ অনন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম পৃথিবীর সমুদয় ধর্ম্মকে গ্রাস করিয়াছেন। কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি গণেশপূজক, কি অন্যান্য দেবতার উপাসক, সকলের ভিতর হইতেই ব্রাহ্মসমাজ সত্য গ্রহণ করেন। প্রকৃত ব্রাহ্ম সমুদয় সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার অখণ্ড ব্রহ্মের ভগ্নাংশ দেখিতে পান। তিনি দেখিতে পান, বিবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায় তাঁহার সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে তেত্রিশ কোটি বিভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ব্রহ্মের এক এক ভিন্ন অংশ হইতে তেত্রিশ কোটি ধর্ম্মসম্প্রদায় উৎপন্ন হইল। যখন ব্রাহ্ম এই সঙ্কেত বুঝিতে পারিলেন তখন তিনি দেখিলেন, হিন্দুসমাজ অনন্তকালের ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে বিলীন হইয়া গিয়াছে। হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মসমাজের একটি অঙ্গ। অতি সামান্য উপহাসজনক হিন্দুদেবতার মধ্যেও গভীর অর্থ আছে। যাঁহারা যথার্থ অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার মধ্যে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীকে দেখিয়াছেন। প্রকৃত ব্রাহ্ম ঘরে বসিয়া দেখিতে পান, সকল ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের পরিচর্য্যা করিতেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মরূপ অনন্ত বৃক্ষের ছায়া লাভ করিয়াছে, সে উপধর্ম্মরূপ ক্ষুদ্র পরিমিত বস্তু চাহিবে কেন? যোগী ঋষিদিগের বেদবেদান্ত, জ্ঞান, যোগতত্ত্ব শিখিতে চাও, যোগেশ্বরের নিকট শিখিতে পাইবে; বৈষ্ণবদিগের প্রেমভক্তির ধর্ম্ম লাভ করিতে চাও, ঈশ্বরের প্রেমস্বরূপের মধ্যে তাহা দেখিতে পাইবে। আর যদি অনুষ্ঠান দেখিতে চাও, তবে ঈশ্বরের ইচ্ছার মধ্যে সমস্ত সৎকার্য্যের বিধি দেখিতে পাইবে। সমস্ত যোগী ঋষি, সন্ন্যাসী বৈরাগী ঈশ্বরের ভিতরে আছেন। যদি হিন্দুসমাজের ভিতর হইতে সার সত্য আকর্ষণ করিতে চাও, তবে ঈশ্বরের সঙ্গে গাঢ় যোগ স্থাপন কর। আদি ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম, আর আর সমস্ত ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্গত। সমস্ত ঋষি ভক্তদিগের সঙ্গে, তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্মের সম্পর্ক রহিয়াছে। কেহই সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মনাম লইয়া কলঙ্কিত হইও না। অনুদার সাম্প্রদায়িক ভাব ক্ষণস্থায়ী ও সময়ের ব্যাপার। সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্ম অনন্ত কালের ধর্ম্ম। যে ধর্ম্ম সমস্ত ধর্ম্মকে গ্রাস করে, সেই উদার প্রশস্ত ধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্ম। ব্রাহ্মগণ, সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্মকে বিষবৎ পরিত্যাগ কর। হিন্দুর সঙ্গে ব্রাহ্মের চিরবিরোধ এই অনৃত বাক্য বলিয়া কলঙ্কিত হইও না। যত শাখা ধর্ম্ম ছিল, সে সমস্ত হিন্দুসমাজ গ্রাস করিল; কিন্তু যদি তোমরা যথার্থ উদার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাক, চৈতন্য প্রভৃতি সাধুভক্তগণ সকলেই তোমাদের। যোগ ভক্তি তোমাদেরই, তোমরা প্রকাণ্ড ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছ। অন্য সমুদয় ধর্ম্ম এই

প্রকাণ্ড ধর্ম্মের শাখা প্রশাখা। ব্রাহ্মধর্ম্মে ঘৃণার অংশ শেষ হইল। সমস্ত লোকের প্রতি বিরোধ পরিত্যাগ করিয়া সকল ধর্ম্মের সাধকদিগের প্রতি শ্রদ্ধা কর এবং তোমাদের দৃষ্টান্তে সমস্ত পৃথিবী ঈশ্বরের উদার অসাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্বর্গের শোভা ধারণ করুক?

সংবাদ।

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার রংপুরে একটী ইংরেজীতে ও একটী বাঙ্গলাতে বক্তৃতা এবং এক দিন মন্দিরে উপাসনার কার্য্য করিয়াছিলেন। বক্তৃতা সাধারণের বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। এইক্ষণ তিনি দর্জ্জিলিং পর্ব্বতে অবস্থিতি করিতেছেন।

ঢাকার নববিধানসমাজের সাংবৎসরিক উৎসব বিগত ২ রা আশ্বিন সমাপ্ত হইয়াছে। ১৮। ১৯ দিন ব্যাপিয়া ক্রমান্বয়ে বক্তৃতা উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তনাদি হইয়াছিল। পূর্ব্ব বাঙ্গালার অনেক স্থান হইতে অনেক ব্রাহ্মবন্ধু আসিয়া এই উৎসবে যোগ দান করিয়াছিলেন।

ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত কোচবিহারে উৎসাহের সহিত বিধানের কার্য্য করিতেছেন। বিদ্যালয়ের অনেক গুলি ছাত্র প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে তাঁহার সঙ্গে প্রার্থনা ও কীর্ত্তনাদিতে যোগ দান করিয়া থাকে। রবিবার ও ছুটির দিন প্রাতঃকালে কয়েকটি ছাত্র তাঁহার সঙ্গে উপাসনায় যোগ দান করে। অন্য কোন বন্ধুর আবাসে সাপ্তাহিক নিয়মিত রূপে পারিবারিক উপাসনা হয়, তাহাতে অনেকগুলি মহিলা ও বিদ্যালয়ের ছাত্র যোগ দেন। রবিবার উপাসনা কালে মন্দিরের আসন সকল লোকে পূর্ণ হইয়া থাকে।

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। ঢাকায় অবস্থান কালে তিনি কয়েকটি যুবাকে লইয়া সপ্তাহে ২। ১ দিন ধর্ম্মালোচনা, রবিবার প্রাতঃকালে উপাসনা, এবং প্রায় প্রত্যহ পারিবারিক উপাসনা করিতেন। ঢাকার বিধানসমাজের উৎসব উপলক্ষে এক দিন মন্দিরে "অমরত্ব" বিষয়ে বক্তৃতা এবং ছাত্রসমাজের উৎসবের দিন সায়ংকালীন উপাসনা করিয়াছিলেন।

ভাই বঙ্গচন্দ্র রায় কতিপয় বন্ধুকে সঙ্গে করিয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলে প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন।

প্রীতিভাজন ভ্রাতা বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র আস, শ্রীমান্ নগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও অন্য কয়েকটি ব্রাহ্মবন্ধুকে সঙ্গে করিয়া মঙ্গলগঞ্জ হইতে রাণাঘাট ও বনগ্রাম কৃষ্ণনগরে যাইয়া বক্তৃতা ও কীর্ত্তনাদি করিয়া আসিয়াছেন।

গত কল্য কোচবিহার মহারাণীর জন্মদিন উপলক্ষে দেবালয়ে বিশেষ প্রার্থনা হইয়াছে।

ভাই বলদেব সহায় গোরখপুর হইয়া লক্ষ্ণৌ প্রচারার্থ গমন করিয়াছেন। ভাই লক্ষ্মণচন্দ্র পাওা মোজফরপুর হইয়া মতিহারীতে গিয়াছেন। ভাই নন্দলাল বন্দোপাধ্যায় বালেশ্বরে স্থিতি করিতেছেন। তিনি মধ্যে এক বার কাঁথিতে আসিয়াছিলেন।

শ্রুত হইল, রেভেরেণ্ড জোন্‌স সাহেব স্বর্গগত রমণীকান্তের নামে শ্রীহট্টস্থ বাইবেল ক্লাস চিহ্নিত করিয়াছেন। ব্রহ্মমন্দিরের জন্য যে এক খণ্ড ভূমি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে রমণীকান্তের সমাধিস্তম্ভরূপ কোন স্মরণীয় চিহ্ন শ্রীহট্টস্থ বন্ধুগণ স্থাপন করিতে পারিলে বড় সুখের বিষয় হয়।

প্রেরিত।

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক,

স্বর্গগত শ্রীমান্ রমণীকান্ত চন্দের অন্তিম সময়ের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত একখানা পত্র তাঁহার শ্রীহট্টস্থ প্রিয় বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন কুমার গুহ মহাশয় এবং এক খানা পত্র শ্রীহট্টের জিলাস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত দুর্গাকুমার বসু মহাশয় আমাকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশার্থ প্রেরিত হইল। প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

অনুগত,

শ্রীগিরিশ চন্দ্র সেন।

"প্রিয় ভ্রাতা রমণীকান্তের পরলোক যাত্রার সংবাদ ইতিপূর্ব্বে টেলিগ্রামে অবগত হইতে পারিয়াছেন। ভ্রাতা অসময়ে আমাদিগের মধ্য হইতে অপসৃত হইলেন, ইহা স্মরণ হইলে মন দুঃখে আকুলিত হয়, কিন্তু তাহার মধ্যেও যে ভগবানের আশ্চর্য্য লীলা দেখা গেল তাহা আর কোন প্রকারে ভুলিতে পারি না। ভ্রাতা তাঁহার পীড়ার চতুর্দ্দশ দিবসে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। গত শুক্রবার প্রাতে ৫ ঘণ্টা ৫৭ মিনিটের সময়ে তাঁহার আত্মা ভবলীলা শেষ করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছে। পীড়ার তৃতীয় দিবসে ভ্রাতা রমণীকান্তের ভয়ানক শিরঃপীড়া হয়, তাহাতে তিনি অত্যন্ত কষ্ট পান। যন্ত্রণা এত বেশী হইয়াছিল যে, সময় সময় তাঁহাকে ধৈর্য্যত্যাগ করিয়া চীৎকার করিতে হইত। তিনি বলিয়াছিলেন যে, "চীৎকার না করিতে আমি চেষ্টা পাই, কিন্তু কোন প্রকারে পারিয়া উঠি না বলিয়াই মধ্যে মধ্যে চীৎকার করিতে হয়।" মাথায় জোঁক ও ব্লিষ্টার দেওয়ার পরে বেদনা অনেকটা কমিয়া যায়, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে বিশেষ কোন উপশম দেখা যায় না। ক্রমে অচৈতন্য হইয়া পড়িতে লাগিলেন, এইরূপ অচৈতন্যাবস্থায় প্রায় ৮।১০ দিন ছিলেন। উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে উত্তর করিতেন, এবং অসংলগ্ন ভাবে কথা কহিতেন, চক্ষু মেলিলে লোক চিনিতেন। কিন্তু ব্যারামের বর্দ্ধিত অবস্থায় মনের কোন কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারেন নাই। কিন্তু হরিনাম হইলেই চক্ষু সতেজ হইয়া উঠিত, এবং

নামের প্রত্যেক কথায় যেন জীবন সঞ্চারিত হইত। সঙ্গীতে মধ্যে মধ্যে আনন্দের সহিত যোগদান করিতেন। ক্লান্তির অবস্থায় ঠোঁট নাড়িয়া তাঁহার নাম করিতেন। অচৈতন্যাবস্থায় যে হাত তুলিবার শক্তি ছিল না সঙ্গীতের সময়ে নৃত্যের ভাবে সেই হাত উঠাইয়া তাহার সঞ্চালন করিতেন। দুই হাত একত্র করিয়া ভগবানকে নমস্কার করিতে চেষ্টা পাইতেন। যখন তাঁহার পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাঁহার বন্ধু বান্ধবগণ আশা পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, এমন কি ডাকিলে পর্য্যন্ত অনেক সময় উত্তর করিতেন না, তাঁহার কথা বুঝা যাইত না, কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রলাপ করিতেন, সংক্ষেপতঃ যে সময়ে অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন, অর্থাৎ কোমার অবস্থায় ছিলেন, যে অবস্থায় কোন প্রকার ঔষধেও চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারে নাই, হরিনাম সেই মোহাবস্থায় আশ্চর্য্যরূপে চৈতন্য দান করিত, ভগবানের নাম হইলে আর প্রলাপ থাকিত না। অমনি স্থির গম্ভীরভাবে পড়িয়া থাকিতেন, মাঝে মাঝে হাত তুলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন। সঙ্গীত কালে কোন কোন সময় সজোরে নাম গান করিতেন। মুখে পূর্ণ হাসির লক্ষণ প্রকাশিত হইত। আনন্দময়ী মার নাম হইলেই ঘন ঘন শ্বাস পর্য্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থা ধারণ করিত। এমন কি যখন তাঁহার ঘন ঘন শ্বাস দেখিয়া আমাদের ভয় হইত, এবং কোন প্রকার ষ্টিমুলেণ্টে যে উপকার হইত না, দয়াময় হরির নামে সেই উপকার সুস্পষ্ট দেখা যাইত। শ্বাস তখন স্বভাবিক হইয়া আসিত, এবং কতক সময় পর্য্যন্ত ভাল অবস্থায় থাকিতেন। মাথা ব্যাথার পর হইতে আর কোন যন্ত্রণার কথা বলেন নাই মাথা ব্যথা কেবল দুই দিবস মাত্র ছিল। ইহার পর হইতে যখন তাঁহার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করা যাইত বলিতেন বেশ আছি; এই কথা যৎক্ষণ পর্য্যন্ত কথা বলিতে পারিতেন তাঁহার মুখে শুনা গিয়াছে। সংসারের কথা কিছুই বলিতেন না, এক দিবস আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আমাকে চিনিতে পারেন কি? তখন বলিলেন "Kindly tell me your name" নাম বলিবা মাত্র মুখে হাসি আসিল, এবং একটু লজ্জার ভাব ও প্রকাশ পাইল। মৃত্যুর তিন চারি দিবস পূর্ব্বে কোন লোকের পরিচয় পাইতেন না। তখন সম্পূর্ণ কোমার অবস্থা ছিল। একদিবস সেই ভয়ানক কোমার অবস্থায় যখন রমণী মানুষ চিনিতে পারিতেছিলেন না, তাঁহার চক্ষু খোলা ছিল, তখন একজন বন্ধু আচার্য্যদেবের ফটোগ্রাফ তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ইনি কে? রমণী তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, ইনি আচার্য্যদেব। এক দিবস তাঁহার শ্যালক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাকে চিনিতে পারেন কি? বলিলেন "Kamp"। শেষে দুই এক শব্দ যাহা বলিতেন তাহা সম্পূর্ণ অসংলগ্ন হইত, কিন্তু ঐ অবস্থায় আবার হরিনামে চৈতন্যোদয় হইত, এবং নাম গান করিবার জন্য অঙ্গ সঞ্চালন দ্বারা ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেন, ঠোঁট নাড়িতেন, এবং তাঁহার নাম এক এক সময়ে পরিষ্কাররূপে উচ্চারণ করিতেন। এরূপ অবস্থায়ও হরিনামের সময়ে তাঁহার মুখে অনেক সময়ে হাসি প্রকাশ পাইয়াছে। যে দিবস প্রাতে তাঁহার মৃত্যু হয়, তৎপূর্ব্ব রাত্রি নয়টার সময় যখন দেখিতে পাইলাম যে, নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ, পাওয়া যায় কিনা যায় বোধ হয়, দুই এক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিবেন, ঐ সময় সুন্দরী বাবুকে একটি সঙ্গীত করিতে বলা হইল, সঙ্গীত হওয়া মাত্র তাঁহার মুখের অবস্থা অন্যরূপ হইয়া পড়িল, কিঞ্চিৎ পরে হাসিয়া ফেলিলেন ও হাত তুলিয়া তাঁহার নামের গৌরব প্রকাশ করিবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। মৃত্যু সময়ে অতি সুস্পষ্ট রূপে "মা মা" বলিয়া হাসিয়া ফেলিয়াছিলেন। ইহার একটু পূর্ব্বে আনন্দময়ী মার নাম গান হইয়াছিল। মৃত্যুর সময়ে তাঁহার মুখে যে হাসি ছিল, সেই আনন্দজনক হাসি শব অগ্নিতে দগ্ধ হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার মুখে প্রকাশ পাইয়াছিল। যখন তাঁহার দেহ বাহিরে আনা হইয়াছিল, তখন তাঁহার মুখের শ্রী ও হাস্য ভাব দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার পীড়ার সময়ে তাঁহার ভক্তির আশ্চর্য্য ভাব দেখিবার জন্য হিন্দু মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোক আসিতেন, সময়ে সময়ে ঘর লোকে একেবারে ভরিয়া যাইত। যাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল না এরূপ কত উচ্চ পদস্থ ভদ্রলোক আগ্রহের সহিত আসিয়া দেখিয়া যাইতেন। অনেক ভদ্র বিশিষ্ট ও শিক্ষিত লোকের নিকট শুনা গিয়াছে যে, এরূপ আশ্চর্য্য মৃত্যু তাঁহারা কখনও দেখেন নাই। বাস্তবিকই এরূপ মৃত্যু কখন শ্রীহট্টে দেখা যায় নাই। কত রূপ ষ্টিমুলেণ্টের ঔষধ তাঁহাকে দেওয়া গেল কোন উপকারই দর্শিল না, কিন্তু ভগবানের নামরূপ ষ্টিমুলেণ্টে তাঁহাতে আশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার পীড়ার সময়ে যদি কোনরূপ ঔষধে উপকার হইয়া থাকে তাহা একমাত্র হরিনামেই হইয়াছে।

তাঁহার চিকিৎসাসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া পত্র খানা শেষ করিতেছি। সিবিল সার্জ্জন ডাক্তার মেকনামারা, এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস এম, বি, ডাক্তার কৃষ্ণচন্দ্র সান্যাল, ডাক্তার বিশ্বেশ্বর সেন ও ডাক্তার বংশীধর সেন যথাসাধ্য পরিশ্রম করিয়া তাঁহার চিকিৎসা করিয়াছেন। সুন্দরী বাবু সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে থাকিতেন। তিনি যে কেবল ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন তাহা নয়, সুমিষ্ট হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া ভ্রাতার সেই সঙ্কটাপন্ন রোগের সময়ে তাঁহার আত্মার শান্তি দান করিতেন। সিবিলসার্জ্জন দুই বেলা আসিতেন। তাঁহার বাড়ী হইতে

অতিউৎকৃষ্ট সোডাওয়াটার ও সুপ প্রভৃতি নিয়ত পাঠাইয়া দিতেন। এক দিবস কোন দূরস্থ চাবাগিচা হইতে বরফ পর্য্যন্ত আনাইয়া দিয়াছেন। ভগবানের কি আশ্চর্য্য কৃপা এই সময়ে শিলঙ্গ পাহাড় হইতে পাদ্রী ডাক্তার গ্রিফিথ এম, ডি, আসিয়া শ্রীহট্টে পৌছেন। তিনি ভ্রাতার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া এখানকার পাদ্রী Mr. Jones সাহেবের সঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে আইসেন, এবং তাঁহার পীড়াসম্বন্ধে ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। তৎপর প্রায় দিনে দুই-বার করিয়া তিনি রমণীকান্তকে দেখিতে আসিতেন। এক-দিবস রাত্রিতে Rev. Jones সাহেব তাঁহার শয্যা পার্শ্বে হাঁটু গাড়িয়া একটি উৎকৃষ্ট অতি সুন্দর প্রার্থনা করেন। সিবিল-সার্জ্জন ডাক্তার মেকনামারা সাহেব মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন রাত্রিতে রমণীকে দেখিয়া গভীর দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিয়া-ছিলেন "হায় আমি রমণীকে হারাইলাম।" তিনি মৃত্যুর পরে রমণীর বাসায় আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, রমণীর কোন ভাই বন্ধু গবর্ণমেণ্ট কাজের প্রার্থী আছে কি না।

রমণীর শব শ্মশানে নেওয়ার কালে নানা সম্প্রদায়ের লোক সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন। দশ বটিকার সময়ে শব শ্মশানে নেওয়া হয় বলিয়া অনেকে কাচারী ছাড়িয়া প্রোসেসনে যোগ দিতে পারেন নাই। সাহেবদিগের মধ্যে Rev. J. P. Jones, Rev. Jerman Jones, Rev. Dr. Griffiths, Civil Surgeon Dr. Macnamara এই চারি জন সম্ভ্রান্ত ইংরেজ শ্মশান পর্য্যন্ত উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা জল কাদা ও জঙ্গল ও ময়লা ভাঙ্গিয়া শবের সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছিলেন। শ্মশানে মৃতদেহ নেওয়ার পরে আমা-দিগের প্রার্থনা শেষ হইলে Rev. J. P. Jones সাহেব একটি সুমিষ্ট প্রার্থনা করেন। তৎপর সাহেবেরা আমাদের অনুরোধমতে চলিয়া আসেন। কোন কোন উচ্চপদস্থ হিন্দু শবদাহ শেষ হওয়া পর্য্যন্ত তথায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীহট্টে এরূপ দৃশ্য আর কখনো হয় নাই। এক জন অতি উচ্চ-পদস্থ বড়লোকের প্রতিও এত দূর সম্মান শ্রদ্ধা প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। Mr. R. H. Greaves জজ সাহেবও তাঁহার শ্মশানে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যানুরোধে যাইতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

ভ্রাতা রমণীকান্ত পীড়ার বর্দ্ধিত অবস্থায় ও কোমায় সময়ে যে যে কথা মাঝে মাঝে আপনা হইতে বলিয়া উঠি-তেন, তাহার কয়েকটি নিম্নে দেওয়া গেল।

"হরির ভিতরে না গেলে রোগ যন্ত্রণা যাবে না।" "হরি আমাকে তাঁহার ভিতরে টানিয়া লইয়া যাইতেছেন" "আমার কেবল তাঁহার ভিতরেই যাইতে ইচ্ছা হয়।" "কি মধুময়" 'নিকুঞ্জ কানন" "কেশবানন্দ কি মধুর" 'যোগযুক্ত হইতে পারিতেছি না" "মন শান্ত হইতেছে না", শান্ত না হইলে সমাহিত হয় না।" একদিন কোমার অব-স্থায় জোরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন "এই কি ভক্তা এই কি মত্তা" "আনন্দময় বোধ হইতেছে।" মৃত্যুর এক দিন কি দুই দিন পূর্ব্বে তাঁহার সহধর্ম্মিণী নিকটে ছিলেন, তাঁহার সম্বন্ধে কথা হইতেছিল, তাহাতে রমণী বলিয়া উঠিয়াছিলেন যে, "যোগ শিক্ষা করিতে হইবে। *

বিনয়াবনত—
শ্রীপ্রসন্নকুমার গুহ।

রমণী বাবুর উৎকট রোগের সংবাদ পূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়াছেন। অতীব দুঃখের সহিত লিখিতেছি যে, অদ্য প্রাতে ৬ ঘটিকার সময় রমণী বাবু ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি যেরূপ পুণ্যাত্মা ও উপাসনাশীল ছিলেন তাঁহার মৃত্যুও তদনুরূপ হইয়াছে। বস্তুতঃ এইরূপ মৃত্যু সচরাচর লক্ষিত হয় না। ঈশ্বরজ্ঞান শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অতি উজ্জ্বলভাবে তাঁহাতে ছিল। দৃষ্টতঃ অজ্ঞান হইয়া আছেন, ডাকিলে সকল সময়ে ভাল-রূপ উত্তর পাওয়া যায় না। কিছু কিছু ঘনশ্বাসও হই-য়াছে, নাড়ী অত্যন্ত ক্ষীণ, এমন অবস্থায়ও নাম গান হইলে তিনি হাত, পা, ঠোঁট নাড়িয়া তাহাতে যোগ দিয়াছেন। যাঁহারা এই দৃশ্য দেখিয়াছেন, তাঁহারাই মুগ্ধ হইয়াছেন। ঔষধ ষ্টিমিউলেণ্টে (stimulant) তাঁহাকে যে স্ফূর্ত্তি দিতে পারে নাই, হরিনামে মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহাকে তাহা দিয়াছে। ডাক্তারেরা পর্য্যন্ত ইহাতে বিস্মিত হইয়া-ছেন। এই প্রকার ঈশ্বরজ্ঞান রক্ষা করিয়া ও তাঁহার ভাবে নিমগ্ন থাকিয়া মা, মা, শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে আমি উপস্থিত ছিলাম না, কিন্তু শুনিলাম, তখন জ্ঞান আরও উজ্জ্বল হইয়াছিল, এবং "আনন্দময়ী মা" এই নাম তাঁহার কর্ণে উচ্চারণ করা হইতেছে, এমন সময়ে তিনিও "মা মা" বলিয়া উঠিলেন, এবং ঐ সঙ্গে মুখ দিয়া একটুকু জল বাহির হইয়া তাঁহার মৃত্যু হইল। মৃত্যুর সময়ে তাঁহার হাস্যবদন। মৃত্যুর পরে আমরা সেই হাস্যবদন দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। এইরূপে হাসিতে হাসিতে তিনি আনন্দময়ীর ক্রোড় প্রাপ্ত হইলেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমুদয় নবসংহিতা মতে সম্পাদিত হইয়াছে। ডাক্তার সাহেব, তিন জন পাদরী সাহেব, হিন্দু ও ব্রাহ্ম অনেকেই শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন। চিকিৎসায় ও শুশ্রূষায় কোন রূপ ত্রুটি হয় নাই। রমণী বাবু সকলেরই প্রিয় ছিলেন, ব্যারামের সময়ে ছোট বড় কত লোকে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন।

রমণী বাবু তাঁহার স্নেহময়ী জননীর অমৃতময় ক্রোড়ে শান্তি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার বিধবা স্ত্রীর যাতনা ভাবিয়াই কষ্ট বোধ হয়। ঈশ্বর তাঁহার হৃদয়ে শান্তি বিধান করুন ও তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যে সহায় হউন। তাঁহার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক।

বশংবদ—
শ্রীদুর্গাকুমার বসু।

---

* দুই একটি কথা রমণীকান্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মুখে শ্রবণ করিয়া পত্রে যোগ করিয়া দেওয়া গিয়াছে।

☞ এই পত্রিকা ৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম্।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থং সত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম্।
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম্।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে।

২৩ ভাগ।
১৯ সংখ্যা।

১লা কার্ত্তিক, মঙ্গলবার, ১৮১০ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য		২।০
মফঃস্বল	ঐ	৩

প্রার্থনা।

হে পতিতপাবন, তোমার বিধান পরিত্রাণ দান করিবার জন্য সকল ভাবে পূর্ণ হইয়া জগতে অবতরণ করিল। এমন পূর্ণাবয়ব বিধান আসিল, অথচ আমরা তাহাকে পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিতে পারিলাম না। আমরা আমাদের নিজের অপরাধে এমন উৎকৃষ্ট বিধানের ফল হইতে বঞ্চিত হইতেছি, বল, শ্রীহরি, কি উপায় অবলম্বন করিয়া এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করি। আমরা যে আর সেই মুঙ্গেরের ভক্তি আশ্রয় করিতে পারিতেছি না। কি যে অবিশ্বাস আসিয়া প্রাণের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে, এখন আর তোমার নাম যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগকে বিশ্বাস দিতে পারি না। আগেকার সে ভাব, প্রভো, কোথায় গেল? ভক্তগণের প্রতি ভক্তি না হইলে যে প্রাণের শুষ্কতা কঠোরতা কিছুতে যায় না, প্রাণে পূর্ণ বিশুদ্ধি উপস্থিত হয় না, তোমার প্রতি অনুরাগ প্রগাঢ় হয় না। আমরা মনে করিলাম তোমার মান বাড়াইব, এখন দেখিতেছি, তাহার বিপরীত ফল ফলিল। তুমি তোমার ভক্ত সন্তানগণকে এত আদর কর, যাঁহারা তোমায় প্রাণ অর্পণ করেন, অথবা তোমায় চান, তাঁহাদিগের প্রতি তোমার এত টান, এ যদি আমরা সে সময়ে বুঝিতাম, আমরা কি এরূপ গুরুতর অপরাধ করিতাম। তুমি বল, "আমি আমার ভক্ত ছাড়া কাহার বাড়ীতে পদার্পণ করি না। যে আমার হয়, সে আমার যাহারা তাহাদিগকে কি আদর না করিয়া থাকিতে পারে?" সত্যই তো, মা, তোমার আদর করিলাম, আর তোমার সন্তানগণকে বিদায় করিয়া দিলাম, এ দুই কেমন করিয়া একত্র থাকিবে। তোমার সঙ্গে তোমার ভক্ত সন্তানগণ এমনি অভিন্ন ভাবে গ্রথিত যে, একের প্রতি অনুরক্ত হইলে অপরের প্রতি অনুরক্ত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। নাথ, তবে বিশ্বাসী কর, বিশ্বাসী—তোমার ভক্তগণের প্রতি-বিশ্বাসী। ভক্তবিশ্বাস ভিন্ন ভক্তি হয় না, প্রাণ বিগলিত হয় না, বিগলিত প্রাণে সকলে মিলে তোমার সঙ্গে এক হইয়া যাওয়া যায় না, এ সকল কথা তো, মাতঃ, স্বতঃসিদ্ধ। তবে আর কেন, মা, সে মুঙ্গেরের ভক্তির জন্য প্রাণ লালায়িত হয় না, সেই ভক্তিরসে প্রাণ গলিয়া যায় না। আশীর্ব্বাদ কর, যেন এ প্রাণ সেই ভক্তির জন্য একান্ত ব্যাকুল হয়, এবং সেই ব্যাকুলতাতে তোমার করুণা হইতে ভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। হে ভগবন্, ভগবদ্ভক্তভক্তি দান করিয়া দাসদিগের জন্ম সফল কর, এই তব পাদপদ্মে বিনীত ভিক্ষা।

নীতি, ভক্তি ও যোগ।

যখন বিধান সমাগত হয়, তখন আধ্যাত্মিক সমুদায় বিষয় মূর্ত্তিমান্ হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। পুস্তকস্থ নীতি, ভক্তি ও যোগ তেমন জীবনপ্রদ নহে। এক এক বিধানে এক এক ভাব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, এ বিধানে সমুদায় ভাব প্রস্ফুটাকার ধারণ করিয়া পরস্পরের সংযোগে এক বিচিত্র মূর্ত্তি নিষ্পন্ন করিয়াছে। আমরা যদি এই বিচিত্র মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া তদনুরূপ না হই, তাহা হইলে আমাদিগের সম্বন্ধে বিধান-সমাগম হওয়া না হওয়া সমান হইয়া পড়ে। ভাবের মূর্ত্তিমত্তা যে আমাদিগের মধ্যে হইয়াছে, আমরা তাহা প্রদর্শন করিতেছি।

প্রথমতঃ আমাদিগের মধ্যে নীতির প্রাধান্য সমুপস্থিত হয়। সঙ্গতের সময় কাহার না মনে আছে? সে সময় ব্রাহ্মগণ সুদৃঢ়ভাবে বিবেকের অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হন। নীতি এ সময়ে কথায় ছিল না, কার্য্যে ছিল। সত্য ন্যায় কর্ত্তব্য-সাধন, এ তিন সকলের ব্রত ছিল। ব্রাহ্মগণ সত্যবাদী, ন্যায় ও কর্ত্তব্যপরায়ণ বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত হন। ব্যবহারে কথায় তাঁহারা এমনই বিবেকী ছিলেন যে, আত্মপরিচয় দান না করিলেও তাহাতেই তাঁহারা সকলের নিকটে পরিচিত হইতেন। কি পল্লীগ্রামে, কি নগরে, কি কার্য্যালয়ে এক জন ব্রাহ্ম এক এই নীতিমত্তায় প্রাধান্য লাভ করিতেন। তাঁহার কর্ত্তব্যপরায়ণতাদর্শনে সকলেই মুগ্ধ হইতেন। কর্ত্তব্যপরায়ণতার সঙ্গে স্বাধীনতা ও নির্ভীকতা ছিল, ইহাতে যদিও তোষামোদ ও লৌকিকভদ্রতা-প্রিয় উচ্চপদস্থ লোকেরা অনেক সময়ে ক্ষুব্ধচিত্ত হইতেন, কিন্তু কর্ত্তব্যানুরাগ হইতে তাঁহাদিগের যে কার্য্যনৈপুণ্য উপস্থিত হইত, তাহাতে সেই সকল উচ্চপদস্থ লোকও তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া চলিতেন। কোন স্থানে কাহারও বিপদ্ সমুপস্থিত হইলে, ব্রাহ্মগণ সেখানে সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হইতেন, এবং এমনই করিয়া সেবাদি নির্ব্বাহ করিতেন যে, তাঁহারা জাতি-ভঙ্গাদি বিবিধ সমাজবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াও সকলের সম্মান ও কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করিতেন। ব্রাহ্মগণ একান্ত নিরলস ছিলেন, তাঁহারা প্রতি দিনের নিয়মিত কার্য্য করিয়াও অবশেষ সময় দেশহিতকর কার্য্যে নিয়োগ করিতেন।

বিবেকী ব্রাহ্মগণ যখন এইরূপে সত্য ন্যায় ও কর্ত্তব্যপরায়ণতায় অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িলেন, তখন একটি গুরুতর অভাব তাঁহাদিগকে নিপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল। কেবল সত্য ন্যায় ও কর্ত্তব্যে তাঁহাদিগের মন আর সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না। হৃদয়ক্ষেত্র শুষ্ক মরুভূমি হইয়া তাঁহাদিগকে ক্লেশ দিতে লাগিল। এই ক্লেশ তাঁহাদিগের পক্ষে এত গভীর হইয়া পড়িল যে, কাহারও কাহারও মনে নিরাশা আসিবার উপক্রম করিল। এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে বিবেকের উচ্চতম ক্রিয়া ছিল, একটু চিন্তা করিলেই সকলে দেখিতে পাইবেন। সুতীক্ষ্ণ বিবেক দিন দিন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাপ সকল দেখাইতে লাগিল। কেবল সত্য, ন্যায় ও কর্ত্তব্যের অনুসরণে পাপ নিবৃত্ত হয় না, বরং পাপ দেখাইয়া দিয়া চিত্তকে আকুল করিয়া তুলে। এই অবস্থায় অনুতাপ আসিয়া চিত্তকে আর্দ্র করে, এবং সেই আর্দ্র চিত্তে ভক্তির অভ্যুদয় হয়। যখন নীতিপ্রধান সময় ছিল, তখন প্রার্থনা ভিন্ন অন্য কিছু সম্বল ছিল না, অনুতাপের সময়ে দৈনিক নিয়মিত উপাসনা প্রবৃত্ত হইল। এই উপাসনাতে পাপনিবৃত্তি জন্য এমনই প্রার্থনাদি হইত যে, সমুদায় গৃহ অনুতাপের ক্রন্দনে পূর্ণ হইয়া যাইত। নীতি-প্রাধান্যের সময়ে যেমন সর্ব্বত্র নীতি প্রবল ছিল, অনুতাপজন্য ক্রন্দনের সময়ে সর্ব্বত্র ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল। এক এক দিন এক এক স্থলে রজনীতে এরূপ গভীর ক্রন্দনের রোল উঠিত যে, প্রতিবাসিগণ মদ্যপানে প্রমত্ত বলিয়া অনেক সময়ে ভ্রম করিত।

অনুতাপাশ্রু বর্ষিত হইয়া হৃদয় আর্দ্র হই-

বার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির সঞ্চার হইল। ভক্তির সমাগমে পূর্ব্ববিধ ক্রন্দন থামিল, সকলের মনে আশা, বিশ্বাস ও সুখ সমুপস্থিত হইল। যাহা কলিকাতায় হইল, সর্ব্বত্র তাহাই ছড়াইয়া পড়িল। এই ভক্তিসঞ্চারে মুঙ্গের আপনাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। মুঙ্গেরে মূর্ত্তিমতী ভক্তির অবতরণ হয়। আমাদিগের সে সকল দিন স্মরণ হইলে এখন স্বপ্ন বলিয়া প্রতীত হয়। এখন আর সে মধুর ভাব কোথাও দৃষ্ট হয় না। এক এক জন ভক্তিতে এমনি প্রমত্ত হইয়াছিলেন যে, দুই তিন দিন বা ততোধিক কাল ক্ষুধাতৃষ্ণাবিবর্জ্জিত হইয়া ঈশ্বরে নিমগ্ন হইয়া স্থিতি করিতেন। পরস্পরের প্রতি সে সময়ে কি এক প্রকারের যে আশ্চর্য্য ভক্তিভাবের সঞ্চার হইয়াছিল, এখন তাহা মনে করিয়াও উঠিতে পারা যায় না। তখন ভক্তগণের মন হইতে লোকভয়াদি একেবারে বিদূরিত হইয়া গিয়াছিল। পথে ঘাটে যেখানে সেখানে সাক্ষাৎ হইলে পরস্পরের পদধূলি লইয়া এমনই কাড়াকাড়ি উপস্থিত হইত যে, আত্মরক্ষা করা দায় হইয়া পড়িত। এ স্থলে প্রচারক ও অপর ব্রাহ্মে কিছুমাত্র ভেদ ছিল না। বরং প্রচারক পদধূলি পাইবেন না ভয়ে এমনও ঘটিয়াছে, একেবারে উপাসনাগৃহের সিঁড়ির নিম্নে আসিয়া তিনি প্রচ্ছন্ন ভাবে বসিয়া থাকিতেন, যে উপাসক নামিতেছেন, তাঁহারই পা ধরিয়া তিনি কাড়াকাড়ি করিতেন। ভগবানে ভক্তিসঞ্চার হইলে তাঁহার ভক্তগণেতেও ভক্তিসঞ্চার হয়, এই যে অব্যর্থ কথা, মুঙ্গের তাহা যে প্রকার সপ্রমাণ করিয়াছে, এমন আর এ কালে কোথাও হয় নাই।

যে ভক্তি ভগবানেতে এবং সমুদায় ভক্তেতে বিস্তৃত হইয়া পড়িল, অনুচিতরূপে সেই ভক্তি কেবল এক জনকে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া মহান্দোলন সমুপস্থিত হইল। সুকোমলা ভক্তি ইহাতে সঙ্কুচিতা হইলেন, এবং এই হইতে উদ্ধত ভাব আসিয়া প্রবেশ করিল। ইহার পরিণাম কি হইয়াছে, আমাদিগের বলিবার অপেক্ষা করে না। এই আঘাতের ফল এই হইল যে, পরিশেষে যোগ আসিয়া নীতি ও ভক্তিকে একত্র বান্ধিয়া ফেলিল, কিন্তু সেটি আর সকলের সম্পত্তি হইল না। ক্রমে যোগ যত ঘনীভূত হইতে লাগিল, তত বিচ্ছেদ বাড়িতে লাগিল; অগ্রবর্ত্তীর সঙ্গে অনুবর্ত্তিগণের এত পার্থক্য হইয়া পড়িল যে, তাঁহার ঘনীভূত যোগ আর অন্যত্র সংক্রামিত হইল না। অগ্রবর্ত্তীতে আমরা যে প্রগাঢ় যোগ দেখিয়াছি, তাহা আর কোথাও আজ পর্য্যন্ত আমাদিগের নয়নগোচর হয় নাই।

আমরা পুরাতন কথা এখন কেন তুলিলাম, তাহার অভিপ্রায় বলা প্রয়োজন। নীতি, ভক্তি ও যোগ এই তিন যদি মূর্ত্তিমান্ হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইলে বিধানস্থ লোকগণের এ কথা বলিবার অধিকার নাই যে, আমরা নীতি ভক্তি ও যোগ এ তিনকে কি প্রকারে একত্র প্রদর্শন করিব? সঙ্গতের নীতি, মুঙ্গেরের ভক্তি, আচার্য্যজীবনের যোগ, ইহা অদৃশ্য অপ্রত্যক্ষ সামগ্রী নয়। আচার্য্যজীবনে নীতি, ভক্তি, যোগ, এ তিনের যোগে যে মহাযোগ হয়, তাহাতে দীক্ষিত না হইলে মহাসম্মিলনের ব্যাপার কিছুতেই সম্ভবপর নয়। নবধর্ম্ম মিলনের ধর্ম্ম, সে মিলন নীতি, ভক্তি ও যোগের মিলনে সমুপস্থিত। যাঁহারা বিধান বিশ্বাসী, তাঁহারা যাহা মূর্ত্তিমান্ দেখিয়াছেন, তাহা আপনাদের জীবনে মূর্ত্তিমান্ করিতে না পারিলে কি প্রকারে বিধান পূর্ণ করিবেন? যদি কেহ বলেন, আচার্য্যজীবনে যাহা হইয়াছে, আমাদিগের সকলের জীবনে তাহা হইবে, ইহা কি কখন সম্ভবপর? এ কথা বলিলে এই হয় যে, আচার্য্যের সঙ্গে মণ্ডলীর চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, আর মিলনের সম্ভাবনা নাই, অন্যথা আচার্য্যেতে যখন কেবলমাত্র বিবেকের আধি-

পত্য ছিল, তখন সঙ্গত প্রতিষ্ঠিত হয়, সকল ব্রাহ্ম বিবেকী হন। যখন তাঁহাতে ভক্তিসঞ্চার হয়, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে ভক্তির তরঙ্গে সমুদায় ভাসিয়া যায়। এই ভক্তি আঘাত পাইয়া যখন সঙ্কুচিত হইল, তখন তাঁহার জীবনের সঙ্গে মণ্ডলীর জীবন পৃথক্ হইয়া পড়িল এবং তাঁহাতে যে আশ্চর্য্য যোগ উপস্থিত হইল, তাহা আর মণ্ডলীতে সংক্রামিত হইল না। এখন যদি পুনরায় সঙ্গতের নীতি ও মুঙ্গেরের ভক্তি মণ্ডলীমধ্যে পুনরুদ্দীপ্ত হয়, তাহা হইলে উহা হইতে যোগের সমাগম অবশ্যম্ভাবী। আমরা এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিতে চাই না, সকল সাধক অন্তরের প্রেরণা যদি আমাদিগের হৃদয়ের প্রেরণার সঙ্গে মিলিত হয়, আমরা নিশ্চয় বুঝিতে পারিব, আমাদিগের মণ্ডলীর শুভ দিনের অভ্যুদয় হইল, কেন না আচার্য্য আমাদিগের নিকট আর কিছু চান নাই, ইহাই চাহিয়াছেন।

আমাদের এত আশা কেন ?

এ সময়ে নিরাশার কথা মুখ দিয়া বাহির হয় না, এমন লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। যাঁহারা বহু দিন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, তাঁহারা যখন নিরাশার কথা বলিতেছেন, এবং চারি দিকে ধর্ম্মসমাজের অবনতি অবলোকন করিতেছেন, আমরা কোন্ সাহসে ধর্ম্মের জয় নির্ভীক ভাবে ঘোষণা করিতে প্রবৃত্ত। আমরা বন্ধুগণের মুখে নিরাশার কথা ক্রমান্বয়ে শুনিতেছি, তাঁহারা যে প্রমাণ প্রদর্শন করেন, সে সকল প্রমাণ আমরা অন্ধ বলিয়া দেখিতে পাই না তাহাও নহে, তবু আমরা কেবলই আশার ব্যাপার দর্শন করি, ইহার কারণ কি এক বার স্পষ্ট বলা সমুচিত, তাই আমরা আজ এ প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

প্রেরিত পুরুষ মোহম্মদ যখন মক্কা হইতে পলায়ন করিয়া যান, তখন শত্রুগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করে। তিনি একটি গিরিগুহায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহার সঙ্গে অবস্থিত আবুবেকর যখন ভয় প্রকাশ করেন, তখন মোহম্মদ বলেন, ভয় করিও না আমরা এখানে কেবল দুজন নহি, আমরা তিন জন আছি। আর এক জন কে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি উত্তর দেন, আমাদের দুজন ছাড়া ঈশ্বর আছেন। শত্রুরা আসিয়া গুহার দ্বারে উপস্থিত, কিন্তু তাহারা গুহার ভিতরে প্রবেশ করে না। কেন না তাহারা গুহার দ্বারে মাকড়শার জাল এবং কপোত ডিম পাড়িয়াছে দেখিতে পায়। তাহাদিগকে দেখিয়াই কপোত উড়িয়া যায়। ইহাতে তাহারা এই মনে করে যে, যদি কোন মানুষ এই গুহায় প্রবেশ করিত, তাহা হইলে মাকড়শার জাল ছিঁড়িয়া যাইত, কপোত কখন দ্বারে ডিম্ব প্রসব করিত না। মোহম্মদ গুহায় প্রবেশ করার পর মাকড়শা জাল প্রস্তুত করে, এবং কপোত ডিম্ব প্রসব করে। এই ঘটনায় তাঁহার জীবন রক্ষা পায়।

প্রেরিত মোহম্মদ কেবল সেই দিনই বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনি চিরকালই এই বিশ্বাসের পরিচয় দিয়াছেন। কোরাণের প্রবচনে উক্ত হইয়াছে "তোমরা যদি প্রেরিতকে সাহায্য না কর, নিশ্চয় ঈশ্বর তাহাকে সাহায্য দান করিবেন। যখন অবিশ্বাসীরা তাহাকে মক্কা হইতে তাড়াইয়া দেয়, সে দুজনের এক জন ছিল। যখন তাহারা উভয়ে গুহার মধ্যে ছিল, সে [মোহম্মদ] তাহার সঙ্গীকে বলিয়াছিল, দুঃখিত হইও না, কারণ ঈশ্বর আমাদিগের সঙ্গে আছেন।" "ঈশ্বর আমাদিগের সঙ্গে আছেন" এই কথা প্রেরিত মোহম্মদ উচ্চারণ করিবার শত সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে বিশ্বাসিগণের বদন হইতে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে, আজও সেই প্রতিধ্বনি চলিতেছে। যিনি বিশ্বাসী তিনি এই ধ্বনি নিয়ত শ্রবণ করেন, এবং রসনায় ক্রমান্বয়ে উচ্চারণ করেন। আমা-

দের আশা কেন, তাহার কারণ "ঈশ্বর আমাদিগের সঙ্গে আছেন" এই কথার মধ্যে স্থিতি করিতেছে।

আমরা এ জীবনে অনেক বিপদ পরীক্ষায় নিপতিত হইলাম, কিন্তু "ঈশ্বর আমাদিগের সঙ্গে আছেন" দেখিয়া আমরা সে সমুদায় বিপদের মধ্যে অবসন্ন হই নাই। এখন যে সকল বিপদ্ পরীক্ষা আসিতেছে, সে সকলের মধ্যে নিপতিত হইয়া কি আমরা বলিব, এত দিন ঈশ্বর আমাদিগের সঙ্গে ছিলেন, এখন আমাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন? যে কারণে আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, ঈশ্বর আমাদিগের সঙ্গে আছেন, আজও সেই কারণে বলিতেছি তিনি সঙ্গে বিদ্যমান রহিয়াছেন। বিধান যদি কোন সৌভাগ্য আমাদিগের সম্বন্ধে উপস্থিত করিয়া থাকে, তাহা এই পরম সৌভাগ্য। যে দিন আমরা আর এই কথা বলিতে পারিব না, সে দিন আমাদিগের সম্বন্ধে বিধান অন্তর্হিত হইবে। আমরা সকল প্রকারের দুর্ভাগ্য সহ্য করিতে পারি, কিন্তু এই দুর্ভাগ্য কখনও সহ্য করিতে পারি না।

যখন বিধান সমাগত হইয়াছে, তখনই বিধানাশ্রিত ব্যক্তিগণ ভগবান্ তাঁহাদিগের সঙ্গে বিদ্যমান, বিশ্বাস করিয়াছেন। এই বিশ্বাস তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা দুঃখ ক্লেশ বিপদ পরীক্ষার মধ্যে আশান্বিত রাখিয়াছে। বর্ত্তমান বিধান ঈশ্বরের বিদ্যমানতাসম্বন্ধে বিশেষ বলিতে হইবে, কেন না অন্যান্য বিধানে প্রেরিত পুরুষের যে সাক্ষাদ্দর্শন ছিল, তাহা এ বিধানে বিধানাশ্রিত মাত্রের সম্বন্ধে সাধারণ হইয়াছে। যদি আমরা বিধানের গুণে দেখিতে পাই, এই আমাদের ঈশ্বর নিয়ত আমার নিকটে বিদ্যমান আছেন, তাহা হইলে আমরা ভয় পাইব কেন, নিরাশ হইব কেন? শিশু যখন মার কোল ছাড়া হয় তখনই তাহার ভয়, কোলে থাকিলে তাহার ভয় কি? ঘোর অন্ধকারে যদি আমাদের জননীর মুখ আচ্ছন্ন না হয়, বরং অন্ধকারের মধ্যে আরও উজ্জ্বলরূপে তাহা আমাদিগের নিকট প্রতিভাত হয়, তাহা হইলে আমরা নিরন্তর আশ্বস্ত থাকিব তাহাতে আর সংশয় কি?

আমরা মার জয় প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিতেছি। যখন মার পরাজয় বিধানের পরাজয় কখন হইবে না, তখন আমাদের পরাজয় আমরা মনেও করিতে পারি না। যে দিন সেরূপ মনে করিব, সে দিন জানিব আমরা মা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি, তাঁহার সঙ্গে যোগ কাটিয়া গিয়াছে। আজও যখন মাকে নিকটে দেখিতেছি, বিধানসম্পর্কীয় তাঁহার কাজ কর্ম্ম যেমন তেমনই চলিতেছে, তখন তাঁহার জয়ে জয় ঘোষণা করিব না তো কি করিব? জয় দেখিয়া পরাজয় মুখে আনা তীব্র মিথ্যা, আমাদের জয় পরাজয়ের সঙ্গে যখন ভগবানের জয় পরাজয় গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে, তখন পরাজয় কখন স্বীকার করিতে পারি না; কেন না তাহা হইলে ভগবান্ পরাজিত হইলেন এই ঘোর ঈশ্বরাবমাননাসূচক কথা আমাদিগকে বলিতে হয়। কোথায় দুজন লোকের কি অবস্থা হইয়াছে তাহা ভাবিয়া কি আমরা বলিব, এবার ভগবান্ হারিয়া গেলেন, তাঁহার যাহা করিবার ছিল করিয়া উঠিতে পারিলেন না। সেই দিন আমরা নিশ্চয় এ কথা বলিব, যে দিন ভগবান্ হইতে আমাদিগের দৃষ্টি ভ্রষ্ট হইবে।

আমরা যাহা বলিলাম, তাহাতে অনেকে অবিনয় দর্শন করিবেন। এ যদি অবিনয় হয়, তবে ঈদৃশ অবিনয় প্রদর্শন করিতে আমরা ভীত নহি। যাহা সত্য, তাহা নির্ভীক হৃদয়ে আমরা বলিব। এ সময় সত্য চাপিয়া রাখা আর সমুচিত নয়। যখন নিরাশা ও অবিশ্বাসের চিৎকার ধ্বনি চারি দিকে উত্থিত হইয়াছে, তখন কি আর লোকে অবিনয়ী বলিবে বলিয়া সত্য গোপন রাখিতে পারা যায়। মার জয়ে যখন আমাদের জয়, তখন আমাদের ভয় কি? আমরা মার পক্ষ ছাড়িয়া কি পৃথিবীর পক্ষ হইব? যাহারা পৃথিবীর পক্ষ হয়, তাহারাই নিরাশ হয়, অন্ধ-

কার দেখে। নিজের বুদ্ধি নিজের সামর্থ্য নিজের কল কৌশল যেখানে, সেখানে পৃথিবীর ব্যাপার। অখণ্ড্য নিয়মে সে সকল চূর্ণ হইবেই হইবে, এবং সেই চূর্ণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে নিরাশার অন্ধকার আসিয়া সেই সকল লোককে গ্রাস করিবে। আমরা কখন পৃথিবীর হইব না, চিরকাল যার থাকিব, এই জন্য আমাদিগের এত আশা।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

সংসারে সকল প্রকার উপায়ান্বেষণ পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা আপনাদের জীবন ঈশ্বরের চরণে তাঁহার কার্য্য করিবার জন্য উৎসর্গ করিলেন, তাঁহারা প্রেরিত, কেন না প্রেরিতদের ইহাই লক্ষণ। যাঁহারা সংসারে থাকিয়া সাংসারিক উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহারা আপনাদের পরিশ্রম, বুদ্ধির নৈপুণ্য, কার্য্যদক্ষতা প্রভৃতি অবলোকন করেন, তন্মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পান না। সংসারিগণ কি তবে ঈশ্বরেতে বিশ্বাস করেন না? অবশ্য বিশ্বাস করেন, কিন্তু সে বিশ্বাসের আহার পান পরিচ্ছদাদি সামান্য সংসারের বিষয়ের সঙ্গে কোন যোগ নাই, পারলৌকিক ব্যাপারের সঙ্গে তাহার যোগ। কি খাইব, কি পরিব, এ বিষয়ে যেখানে স্থিরতা নাই, অথচ তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই, কেন না মন এই বলিয়া আশ্বস্ত যে স্বয়ং ভগবান্ সে সকল যোগাইবেন, নিজের কর্ত্তব্য কেবল প্রাণ দিয়া সেবা করা, সেখানে প্রেরিতত্ব স্পষ্ট বিদ্যমান। এখানে প্রেরিতত্ব সুস্পষ্ট কেন? সুস্পষ্ট এই জন্য যে, যে যাহার দাস তাহা হইতে তাহার জীবিকা লাভ হইয়া থাকে। সে জানে আমি প্রভুর কাজ করিব, খাবার পরিবার তিনি দিবেন। কাহার প্রভু কে, এই এক লক্ষণেই বুঝিতে পারা যায়। যেদিন কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের মুখাপেক্ষা পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীর মুখাপেক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইল, সেই দিন তাহার পতন হইল। সে ব্যক্তি যেরূপ আহার পরিচ্ছদাদি চায়, প্রভু সেরূপ যোগাইলেন না বলিয়াই তাঁহার দ্বার ছাড়িয়া সে পৃথিবীর দ্বারে গমন করিল। সুস্পষ্ট পৃথিবীর দ্বারে ভিক্ষা করিতে লজ্জা হয়, এজন্য প্রকারান্তরে ধর্ম্মের নামে পৃথিবীর মনে সহানুভূতি উৎপাদন করিয়া বা উপায়ান্তর অবলম্বন করিয়া ভদ্রতা সহকারে পৃথিবীর দ্বারস্থ হয়, ইহাতে যে প্রেরিতত্বে ব্যাঘাত উপস্থিত হয় না, তাহা নহে। সর্ব্বথা ভগবানের চরণে জীবন সমর্পণ করিয়া সেখান হইতে ফিরিয়া পৃথিবীর দ্বারস্থ হওয়া এতদপেক্ষা আর বিধাতার অপমাননা অধিক কিছু হইতে পারে না। এক জন সাধারণ লোকের পতনাপেক্ষা প্রেরিতের পতন এই জন্য অতীব অমঙ্গলকর। পৃথিবীতে যত প্রকারের দূষিত মত ও ধর্ম্ম উৎপন্ন হইয়াছে, এই সকল লোক কর্ত্তৃক। তান্ত্রিক ব্যভিচার, এবং অন্যবিধ সংসারবিমিশ্র ধর্ম্মের মূল কোথায় অন্বেষণ করিলে এই সকল লোককে তাহার প্রবর্ত্তক বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

অপরাধীর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কি? পৃথিবী বলে, যাহার নিকটে অপরাধ ঘটিয়াছে, তাহার নিকটে ক্ষমা গ্রহণ করা প্রায়শ্চিত্ত। স্বর্গের শাস্ত্রে ক্ষমা নাই, এ কথা এখন আমাদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে, অথচ সে শাস্ত্রের মূল কি মনে থাকে না বলিয়া আমরা ক্ষমা চাহিতে ব্যাকুল হই। যে ব্যক্তির প্রতি অপরাধ হইল, সে ব্যক্তির ক্ষমা করিবার কোন অধিকার নাই, কেন না মানুষ যখন মানুষের প্রতিকূলে অপরাধ করে, তখন মানুষের প্রতিকূলে অপরাধ হয় না ঈশ্বরের প্রতিকূলে অপরাধ হয়। আমি আমার বিবেকের নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া বা তৎপ্রতি বধির হইয়া ভ্রাতার বিরুদ্ধে পাপাচরণ করিলাম, ইহাতে আমার অপরাধ ঘটিল এই জন্য যে, আমি ঈশ্বরের কথা অমান্য বা তৎপ্রতি কর্ণপাত করিলাম না। যদি অপরাধের মধ্যে এ ব্যাপার না থাকিত, তবে আর তাহা অপরাধ হইবে কেন? যদি প্রত্যেক অপরাধে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপাচরণ হয়, তাহা হইলে যাহার প্রতি প্রতিকূলাচরণ হইল সে কি প্রকারে ক্ষমা করিবে? এক ব্যক্তির প্রতি অনুষ্ঠিত অপরাধ কি অপরে ক্ষমা করিতে পারে? কখনই না। আবার যদি অপরাধী ব্যক্তি ভগবানের নিকটে ক্ষমা চায়, তাহা হইলে সেই ক্ষমা চাহাতেই তাহার অপরাধ হয়, কেন না ক্ষমার অর্থ ক্রোধসংবরণ করা। ভগবান্ ক্রোধ করেন বা করিতে পারেন, এ কথা মনে তোলাও অপরাধকর। সুতরাং অপরাধী কি করিবে, সে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এই কঠিন অবস্থায় পড়িয়া তাহার প্রাণ আকুল হয়। এই আকুলতা হইতে সে যাহা করিয়াছে তজ্জন্য অনুশোচনা উপস্থিত হয়, সেই অনুশোচনাই তাহাকে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত করে এবং যাহার প্রতি সে প্রতিকূলাচরণ করিয়াছে, সেও সেই অকৃত্রিম অনুশোচনা দর্শন করিয়া তৎকৃত অত্যাচার সমুদায় ভুলিয়া যায়। অপরাধীর অপরাধনিষ্কৃতির মধ্যে কি আশ্চর্য্য স্বাভাবিক নিগূঢ় নিয়ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে! এই নিগূঢ় নিয়মোৎপন্ন ফলই অপরাধের প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত।

প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ।

(১৮০৯ শকের ১লা অগ্রহায়ণের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিতের পর হইতে)

৪ঠা অগ্রহায়ণ (১৭৯৪ শক) সোমবার—

১ নির্দ্ধারণ—আশ্রমের বর্ত্তমান বিশৃঙ্খলা নিবারণ জন্য

প্রথমতঃ প্রচারকগণকে নিয়মিত সময়ে উপাসনায় উপস্থিত হইতে হইবে।

২ নির্দ্ধারণ—ধর্ম্মতত্ত্বের শেষ প্রুফ শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় দেখিবেন।

৩ নির্দ্ধারণ—প্রচারের ইতিবৃত্ত বলিয়া যে এক খানি গ্রন্থ হইবে, তজ্জন্য প্রতিজনের প্রচারের ইতিবৃত্ত পৌষের প্রথম সপ্তাহে প্রেরণ করিতে হইবে।

৪ নির্দ্ধারণ—প্রতি সপ্তাহের প্রচারবৃত্তান্ত প্রচারকগণের সভাতে দিতে হইবে।

৫ নির্দ্ধারণ—তিন সপ্তাহ মধ্যে শ্লোক সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে।

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়।
সম্পাদক।

১১ই অগ্রহায়ণ সোমবার সিন্দুরিয়াপঠী ব্রাহ্মসমাজের সাংবৎসরিক জন্য এই দিবসে সভা না হইয়া সপ্তাহের অপরাপর দিনে এক জন না এক জন উপাসনার্থ স্থানান্তরে বদ্ধ আছেন জন্য বৃহস্পতিবারে সভা হয়। এই দিনে কোন্ প্রকারের ভাবে আমাদিগকে সমুদায় কার্য্য করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে আলোচনা হয় এবং তাহার মূল বিষয়ে সকলে এক মত হন।

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়।
সম্পাদক।

---

১৮ অগ্রহায়ণ, সোমবার, পার্থিবকার্য্যসম্বন্ধে যে যে স্থলে পরস্পরে প্রতিঘাত হইবার সম্ভাবনা, সেই সকল স্থলের মধ্যে কতক গুলির সম্বন্ধে যাহাতে প্রতিঘাত না হইতে পারে, এরূপ নিয়ম নির্দ্ধারিত হয়।

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়।
সম্পাদক।

---

২৫ এ অগ্রহায়ণ—সোমবার।

১ নির্দ্ধারণ—অধীনস্থ ব্যক্তিগণকে কখন কদুক্তি বা কখন তাহাদিগের গাত্রে হস্তস্পর্শ করা হইবে না।

২ নির্দ্ধারণ—তর্কাতর্কি সময়ে রাগপ্রকাশ বা চীৎকার না করিয়া প্রশান্ত ভাবে উহা নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

৩ নির্দ্ধারণ—রূঢ় বাক্যে স্ত্রীলোকগণকে ভৎর্সনা করা হইবে না।

৪ নির্দ্ধারণ—দোষ সংশোধন জন্য দোষের উল্লেখ সময়ে সময়ে আবশ্যক হইবে, কিন্তু এই দোষের উল্লেখ অহঙ্কার বা নীচ কুপ্রবৃত্তি সাধন জন্য না হইয়া যেন প্রীতি হইতে হয়।

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়।
সম্পাদক।

৩রা পৌষ সোমবার।

অদ্য মুঙ্গেরে ব্রহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অধিকাংশ অনুপস্থিত থাকা প্রযুক্ত সভার অধিবেশন হয় না।

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়।
সম্পাদক।

---

১৯ শে পৌষ বুধবার।

১ নির্দ্ধারণ—১১ই মাঘের পর এক খানি রিপোর্ট বাহির হইবে। শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার উহার সম্পাদন করিবেন।

২ নির্দ্ধারণ—প্রচারের ইতিবৃত্তের বৃত্তান্ত সংগ্রহ শ্রীযুক্ত গৌরগোবিন্দ রায় করিবেন।

৩ নির্দ্ধারণ—শ্লোকসংগ্রহ ১১ই মাঘের পূর্ব্বে বাহির হইবে। শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ গুপ্ত সংগ্রহাদির কর্ম্ম করিবেন।

২৮শে পৌষ, শুক্রবার।

"অধিকসংখ্যক একত্রিত হইয়া যাহা নির্দ্ধারিত হইবে, যাঁহারা তৎকালে তাহাতে অমত থাকিবে তাঁহাকেও তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে" অনেক স্থলে এ নির্দ্ধারণ অনুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য করা অন্যায় হইতে পারে; শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রস্তাব করাতে আগামী রবিবার ২ টার পর এতৎসম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইয়া নির্দ্ধারণ হইবে নির্দ্ধারিত হয়।

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়।
সম্পাদক।

আচার্য্যের উপদেশ।

জ্যেষ্ঠা কন্যার প্রতি।

কুচবিহার।

সোমবার প্রাতঃকাল, ১৪ই ফাল্গুন, ১৭৯৯ শক।

(১) বড় সংসার বলে অহঙ্কারী হবে না, যিনি দিচ্ছেন তাঁকে পিতা বলে ভাল বাসবে।

(২) সংসারের মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছামত কার্য্য করিবে, বড় বড় বিদ্বান্ আপনার মনের মত কাজ করে মরে।

(৩) কোন পৌত্তলিক কার্য্যে যোগ দিবে না। আর দেবতা নাই, সেই এক প্রভুর চরণে দাসী হইয়া থাকিবে, আমি রাণী চাইনা, আমি চাই ঈশ্বরের দাসী। অন্য দেব

দেবীর কাছে মাথা হেঁট করিও না। সেই এক দেবতার কাছে ভাত কাপড় নেবে, বিপদে সম্পদে তাঁহাকে ডাকিবে। যখন জন তোমাকে যখ রকম অলঙ্কার দিবেন, আমি তোমাকে এই আশীর্ব্বাদ করি, তোমার হৃদয় যেন ঈশ্বরকে খুব বাপ বলে ভাল বাসে। তিনি তোমাকে ভাল বাস্বেন। তিনি তোমাকে ধর্ম্মের পথে, কল্যাণের পথে রাখুন। তুমি আর এক বার ভক্তির সহিত সেই দয়াময় পিতাকে প্রণাম কর।

কুচবিহার, রবিবার ২৭ ফাল্গুন ১৭১১ শক।

যখনই ধর্ম্ম জগতে একটি অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, সেই অগ্নি একটি প্রচ্ছন্ন অনাবিষ্কৃত সত্যকে প্রকাশ করে। সেই অগ্নি একটি সত্য শিখাইবেই শিখাইবে. ঈশ্বরের ধর্ম্ম-রাজ্যের গঠন এইরূপ। ঈশ্বরের রাজ্যে কি যুদ্ধ কি পরীক্ষার অগ্নি কিছুই বিফল হয় না। সমক্ষে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে, তন্মধ্যে অপরাধবিহীন আত্মা সীতার ন্যায় বসিয়া থাকে। জল যেমন, তাঁহার পক্ষে অগ্নিও তেমন। পরীক্ষার অগ্নিতে নিরপরাধী দগ্ধ হইবে না। ইহাতে জগতের কল্যাণ হইবে। অধিক অগ্নির প্রয়োজন। যেখানে অনেক শতাব্দীর জ্ঞানালোক দ্বারাও মনুষ্যের চৈতন্য হইল না. সেখানে খুব উজ্জ্বল অগ্নির প্রয়োজন। এই জন্য এই বর্ত্তমান আন্দোলন অগ্নি। ধর্ম্মরাজ্যে উদ্বাহ কাহাকে বলে, এবং পশুরাজ্যে উদ্বাহ কাহাকে বলে আমরা জানি না, এই অগ্নি আমাদিগকে তাহা শিখাইবে। স্বর্গের আদর্শ বিবাহ কি এখন জগৎ তাহা বুঝিবে না, লক্ষ বৎসর পরে যদি জগৎ তাহা বুঝে তা হলেও ভাল। পশু জগতে, আসুরিক, শারীরিক, সাংসারিক বিবাহ হয়; তাহারা আত্মায় আত্মায় বিবাহ কি বুঝিতে পারে না। যাঁহারা ঈশ্বরের রাজ্যের অধীন হইয়াছেন, তাঁহারা পশু বিবাহকে ঘৃণা করেন। ঈশ্বরের আজ্ঞাতে যেখানে দুই জন নর নারী উদ্বাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন, সেখানে স্বর্গীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। বর্ত্তমান আন্দোলনে এই স্বর্গীয় উদ্বাহশাস্ত্র প্রকাশিত হইবে। অতএব ধন্য তাঁহারা যাঁহারা এই বিবাদ উত্তোলন করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় যন্ত্রীর অভিপ্রায় যন্ত্র বুঝিল না। আমরা যেন পৃথিবীকে সেই দিকে অগ্রসর হইতে দেখিতে পাই, যেখানে ধ্যান, যোগ, সংসার এবং বিবাহ এক হইবে। সংসারের সমুদয় শুভানুষ্ঠানে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া লইতে হইবে। যেখানে প্রকৃত বয়স লাভ করিয়া আত্মা আত্মার সঙ্গে মিলিত হয়, পৃথিবীকে সেই উদ্বাহরাজ্যে অগ্রসর হইতে হইবে। সেখানে ঈশ্বর স্বয়ং পাত্র পাত্রীকে উদ্বাহসূত্রে বন্ধন করিয়া তাহাদিগকে বলেন, তোমরা হৃদয়ে হৃদয়ে একত্র হইয়া আমার সদ্গুণ কীর্ত্তন কর। যখন নরনারী এই স্বর্গীয় বিবাহে বদ্ধ হইবে, তখন পৃথিবীর প্রকৃত কল্যাণ হইবে। আর শারীরিক, জঘন্য, জড়, পশু বিবাহের তত্ত্ব শুনিতে ইচ্ছা নাই। ঈশ্বর করুন যেন মনুষ্য জাতি হইতে শীঘ্রই পশুভাব, জঘন্য কলঙ্ক একেবারে চলিয়া যায়! সকলে ঈশ্বরের কৃপায় সংসারকে সংশোধিত করিয়া স্বর্গে পরিণত করুন! পৃথিবীতে সকলে হরিনামের মহিমা প্রকাশ করুন!

কুচবিহার, রবিবার, ২৭ এ ফাল্গুন, ১৭১১ শক।

ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া নিকৃষ্ট পথ পরিত্যাগ করা এবং উৎকৃষ্ট পথ অবলম্বন করা নিকৃষ্ট অধিকারীদিগের পথ। বুদ্ধি বিবেচনা নিম্ন শ্রেণীর ধর্ম্ম। যখন মনুষ্য উচ্চতর সাধনে নিযুক্ত হন তখন তিনি বুঝিতে পারেন, মনুষ্য আপনার বুদ্ধি দ্বারা আপনাকে ধর্ম্ম পথে রক্ষা করিতে পারে না, ধর্ম্মজীবন রক্ষা করিতে হইলে কেবল ঈশ্বরের কৃপা স্রোতে আপনাকে ফেলিয়া দিতে হইবে। এই বিশ্ব চলিতেছে, ইহার গতি মঙ্গলের দিকে। মঙ্গলসংকল্প ঈশ্বর ইহার উপরে বসিয়া আছেন। তাঁহার অঙ্গুলি নির্দ্দেশে বিশ্ব গড়াইতে গড়াইতে অনুগত এবং প্রণত হইয়া তাঁহার মঙ্গলাভিপ্রায় সকল সম্পন্ন করিতেছে। ভক্তেরা কেবল নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন, ঈশ্বরের কৃপাস্রোত কোন্ দিকে বহিতেছে। একবার যখন সেই স্রোতের গতি ঠিক করিতে পারেন, তখন তিনি আপনার জীবনকে সেই দিকেই ভাসাইয়া দেন, সে দিকে কেবলই মঙ্গল এবং শুদ্ধতা। ভক্তের হস্ত পদ চক্ষু কর্ণ সমুদয়ই ঈশ্বরের নির্দ্দেশের অনুবর্ত্তী হইয়া কেবলই মঙ্গলের দিকে নিয়োজিত হয়। প্রত্যেক সাধক প্রথম অবস্থায় ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা করিয়া জীবনের অনুষ্ঠান সকল সম্পন্ন করে; কিন্তু সাধনের উচ্চ অবস্থায় যখন সাধক সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের কৃপার অধীন হয়, তখন বিবেচনা, পরামর্শ করিয়া কার্য্য করাকে অধর্ম্ম অথবা অহঙ্কার, নাস্তিকতার ধর্ম্ম বলিয়া পরিত্যাগ করে। যেখানে বিচার, পরামর্শ, সেখানে অধর্ম্ম, যেখানে দেবভাবের আবির্ভাব সেখানে দুইভাব নাই, সেখানে ভাল মন্দ নাই, দুই পথ নাই, পশুবুদ্ধি নাই। দেবতারা পশুভাবের বিরোধী পথ অবলম্বন করেন। যে পথে চলিলে কেবলই সত্য; শুদ্ধতা, পুণ্য সঞ্চিত হয়, তাঁহারা কেবল সেই পথেই চলেন। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা কলাফলবাদী এবং বিবেচক। কিন্তু যখন সাধক আপনার বুদ্ধি জ্ঞানের অসারতা দেখিতে পায়, তখন আপনাকে দেবভাবের তরঙ্গে নিক্ষেপ করে। যখন বুদ্ধি আসে, তখনই নানা প্রকার সন্দেহ অবিশ্বাসজালে মন জড়িত হয়। তখন মন ঈশ্বরকে মুক্তিদাতা বলিয়া স্বীকার করিতে না পারিয়া আপনাকেই আপনার মুক্তিদাতা মনে করিয়া আপনার হস্তে আপনার পরিত্রাণের ভার গ্রহণ করে। কিন্তু পূর্ণ বিশ্বাসী সাধক চিন্তার ভার ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিয়া আপনাকে কেবল তাঁহার ইচ্ছাপালনে নিযুক্ত

করেন। তখন তিনি যেদিকে যান সেই দিকেই কল্যাণ। আপনার জন্য যাহা করেন তাহাতেও কল্যাণ, পরের জন্য যাহা করেন তাহাতেও কল্যাণ। ভক্ত উপাসনা করেন কেন? ঈশ্বর উপাসনা করান। ভক্ত ভক্তিতে মাতেন কেন? ঈশ্বর তাঁহাকে মাতান। ঈশ্বর পুণ্যনদী, কৃপানদী, ভক্তগণ সামান্য তৃণের ন্যায় সেই স্রোতে ভাসিয়া যান। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন সেই প্রেমের ধর্ম্ম লাভ করিতে পারি, যে ধর্ম্মে বিচার বিবেচনা নাই; কিন্তু যাহাতে নিশ্চয়ই আত্মা কল্যাণের দিকে অগ্রসর হয়।

নূতন পুস্তক।

দৈনিকপ্রার্থনা ৪র্থ ভাগ। ডিমাই ১২ পেজী ৯ ফর্ম্মায় সমাপ্ত মূল্য ।৹ আনা। আচার্য্যদেব কমলকুটীরে প্রতিদিন যে সকল নূতন নূতন প্রার্থনা করিতেন তাহা সেই সময়েই কোন মহিলা কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ক্রমান্বয়ে সেই সকল প্রার্থনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে। এ পুস্তকের ভূমিকাতে এইরূপ লেখা আছে যথা—

"আমরা অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রার্থনাপ্রিয় উপাসকবৃন্দকে জ্ঞাত করিতেছি যে, শ্রীমদাচার্য্যদেবের অনেকগুলি দৈনিকপ্রার্থনালিখিত কাগজ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় আমরা আমাদের ইচ্ছানুরূপ তাঁহার সমস্ত প্রার্থনা প্রকাশ করিতে অক্ষম হইলাম। যে সকল অমূল্য বস্তু হারাইয়া গেল তাহা আর পৃথিবী কখন পাইবে না। এই সকল দৈনিকপ্রার্থনারূপ স্বচ্ছ দর্পণে আচার্য্যজীবন যেমন প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, এমন আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। যে সকল ব্যক্তি আচার্য্যের তিরোধানে নিতান্ত শোকসন্তপ্তহৃদয় হইয়া পৃথিবীতে বাস করিতেছেন, আমরা জানি যে, এই সকল প্রার্থনা পাঠে তাঁহারা বিশেষরূপে উপকার লাভ করিয়া থাকেন। বাস্তবিক এক একটি প্রার্থনা অলস নির্জ্জীব আত্মাকে চেতনা দান করে, নিরাশ মনে আশা আনিয়া দেয়, ঘোর অন্ধকারের মধ্যে আলোক প্রদান করে।"

মাঘোৎসব ১ম ভাগ। ডিমাই ১২ পেজী ১২ ফর্ম্মায় সমাপ্ত, মূল্য ।৹ আনা। এই পুস্তকের ভূমিকায় এইরূপ লেখা আছে যথা—

"অনেকেই ইচ্ছা করেন যে, শ্রীমদাচার্য্য দেব উৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মমন্দিরে যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হয়। সেই সকল উপদেশে প্রতি বৎসরেই এক একটি বিশেষ নূতন ভাবের উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়াই সে গুলিকে এক সঙ্গে দেখিতে অনেকের ইচ্ছা। আমরা তাঁহাদিগের সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য "মাঘোৎসব" নাম দিয়া ক্রমান্বয়ে আদিসমাজ হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত উপদেশ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। দয়াময় ঈশ্বর আমাদিগকে এ কার্য্যে নিশ্চয়ই সহায়তা করিবেন এই আমাদের বিশ্বাস।"

"আচার্য্যদেব মাঘোৎসবের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত এক মাস কাল কিরূপ জলন্ত উৎসাহের সহিত উন্মত্ততা সহকারে কার্য্য করিতেন এই গ্রন্থ পাঠে পাঠকগণ তাহারও আভাস পাইবেন। ১লা জানুয়ারি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন এক একটি নূতন নূতন ব্যাপার লইয়া তিনি ব্যস্ত থাকিতেন। যে দিন যে বিশেষ ভাবের উদয় হইত, সেই দিন সেই সম্বন্ধে প্রার্থনা করিতেন, এবং উপদেশ দিতেন। মহোৎসবের পূর্ব্বে সকলের মনকে প্রস্তুত করিবার জন্য তিনি প্রারম্ভিক ছোট ছোট উৎসব করিতেন। এই গ্রন্থের ১ম হইতে পাঠ করিলেই সেই সকল বিষয়ের মর্ম্ম সকলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। আমরা আশা করি, সকল ব্রাহ্মই যেন আচার্য্যদেবের ন্যায় বৎসরের প্রারম্ভ হইতেই উৎসবের জন্য প্রস্তুত হন। তাঁহার প্রদত্ত এই সকল উপদেশ ও প্রার্থনা, সকলের প্রস্তুতির পক্ষে বিশেষ সহায়তা প্রদান করিবে।"

সংবাদ।

আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, গত শনিবার শিমলা পর্ব্বত হইতে তারযোগে এই বিশেষ সংবাদ আসিয়াছে যে, ভারতসম্রাট্ শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া সবিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক কোচবিহারের সর্ব্বকনিষ্ঠ রাজকুমারের God-mother (ধর্ম্মমাতৃ) পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এদেশস্থ ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী প্রজার প্রতি ভারতেশ্বরীর এই রূপ বিশেষ অনুগ্রহ ও উচ্চ সম্মান প্রদর্শন এই প্রথম হইল। যিনি যে কুমার বা কুমারীর God-mother হন, তিনি তাহার নীতি চরিত্র শিক্ষা উন্নতির অনেক পরিমাণে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভারতেশ্বরীর ধর্ম্মমত অত্যন্ত উদার, তিনি আচার্য্যদেবের পরম বন্ধু খ্রীষ্টীয় মহাযাজক ডিন ষ্টেনলির উদার মতাবলম্বিনী। বোধ করি, মহারাজ্ঞী উদার নববিধানের সঙ্গে আপন ধর্ম্মমতের অধিক পার্থক্য না দেখিয়া এবং আচার্য্যদেবের প্রতি ও তাঁহার প্রিয়তমা কন্যা কোচবিহারের মহারাণীর প্রতি গাঢ় অনুরাগবশতঃ কোচবিহাররাজপরিবারের সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আপনাকে সম্বদ্ধ করিলেন। রাজকুমারের এইক্ষণ পাঁচ মাস মাত্র বয়স। এ পর্য্যন্ত তাঁহার নামকরণ হয় নাই, ভারতেশ্বরী কোচবিহারের মহারাজ ও মহারাণীর নিকটে তারযোগে কুমারের ভিক্টর (বিজয়ী) নাম রাখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

শারদীয় ছুটি উপলক্ষে বিদেশ হইতে অনেক ব্রাহ্ম বন্ধু আসিয়া দেবালয়ে ও মন্দিরে উপাসনায় যোগ দিয়াছেন।

প্রতি বৃহস্পতি বার সন্ধ্যার পর প্রচারকগণ মঙ্গলবাড়ীস্থ মহিলাদিগকে লইয়া সৎপ্রসঙ্গ ও উপাসনা করিয়া থাকেন।

শিমলা পর্ব্বত হইতে ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল লিখিয়া পাঠাইয়াছেন,"আমি আগষ্ট মাসের শেষে কলিকাতা ছাড়িয়া ভাগলপুরে আসি, তথায় চারি দিন থাকি। এক-দিন সমাজে, এক দিন ব্রাহ্মিকাদের জন্য, অবশিষ্ট পরিবারমধ্যে প্রত্যাহিক উপাসনা হয়। পরে মোকামায় এক দিন পারিবারিক এক দিন প্রকাশ্য উপাসনা হইয়াছিল। পরে তিন সপ্তাহ কাল গাজীপুরে বাবাজীকে দর্শনের জন্ত থাকি। তাঁহার সঙ্গে পাঁচ দিন কথোপকথন সৎপ্রসঙ্গ, এক দিন হিন্দি উপাসনা হইয়াছিল। নৃত্যগোপাল বাবুর বাড়ী-প্রতিষ্ঠা, সমাজে এবং পরিবারে উপাসনা হইয়াছে। তদনন্তর আলিগড়ে সবজজ নীলমাধব বাবুর বাড়ীতে এক দিন পারিবারিক এক দিন প্রকাশ্য উপাসনা হয়। পরে হিমালয় মন্দিরে উপাসনা হয়। এখানে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে মন্দিরে পাঠ ও কীর্ত্তন হইয়া থাকে। লাহোরসমাজের উৎসবে যাইবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছি।"

গাজিপুরস্থ হিন্দু যোগী পবনাহারী বাবার কুটীরে হিন্দিতে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছে। ভাই দীননাথ মজুমদার এবং ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল সম্মিলিত ভাবে উপাসনা করিয়াছেন। শ্রুত হইল পবনাহারি বাবা সেই উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন।

বিগত ২০ শে আশ্বিন বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজমোহন বসুর নবকুমারের শুভ নামকরণ নবসংহিতানুসারে সম্পাদিত হইয়াছে, কুমারের নাম নির্ম্মলচন্দ্র রাখা হইয়াছে।

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ নাথ চক্রবর্ত্তীর নবকুমারীর এবং শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র সিংহের প্রথম কুমারের এবং মুদিয়ালিস্থ বন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী দেবের নবকুমারের জাতকর্ম্ম নবসংহিতানুসারে সম্পন্ন হইয়াছে।

শারদীয় বন্ধ উপলক্ষে ব্রহ্মবিদ্যালয়ের কার্য্য স্থগিত আছে।

ময়মনসিংহ নববিধান সমাজ হইতে ধর্ম্মপ্রকাশ নামক এক খানা মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। আমরা তাহার দুই সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। নববিধানতত্ত্ব প্রচার করাই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। স্থানীয় একজন ব্রাহ্ম প্রচারক তাহা সম্পন্ন করেন। পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। "মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীর জিহ্বা" নামক এক খানা ত্রৈমাসিক পত্রিকা টাঙ্গাইল নববিধান সমাজ হইতে প্রকাশিত হইতেছে।

টাঙ্গাইলস্থ বিধানবাদী ব্রাহ্মদিগের উদ্যোগে তথায় একটি বিধান লাইব্রেরি স্থাপিত হইয়াছে। তথাকার ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও মোন্সেফ বাবুগণ ও অন্য অন্য প্রধান প্রধান লোক উক্ত পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠার সময় উপস্থিত হইয়া বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ ও সহায়তা করিয়াছেন, দেলদুওয়ারের ভূম্যধিকারিণী শ্রীমতী করিমোন্নেসা খানম চৌধুরাণীর মেনেজার শ্রীযুক্ত মির মনাবেক হোসেন সাহেব পুস্তকাবলী স্থাপনের জন্য আলমারী দান করিয়াছেন। অসময়ে প্রাপ্ত হওয়া প্রযুক্ত এবং স্থানাভাবে এ বিষয়ে টাঙ্গাইলের বন্ধুর দীর্ঘ পত্র প্রকাশ করিতে আমরা অসমর্থ হইলাম।

প্রেরিত।

সম্মিলন কেন হইতেছে না?

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদক মহাশয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পত্রখান প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

আচার্য্যদেব একদিন দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "আমি আপনাকে পাপী বলিয়া জানি, ইঁহারা পুণ্যাত্মা সাধু বড়লোক সিদ্ধ পুরুষ হইয়াছেন, ইহাঁদের পাপবোধ নাই, সুতরাং এই পাপীর সঙ্গে ইহাঁদের মিলন হইতে পারিতেছে না।" বাস্তবিক সকলে বিনয় ভক্তি দীনতার পথ অবলম্বন ও অবিশ্বাস স্বেচ্ছাচারিতা পরিহার করিলে এক্ষণই মিলন হয়। বিধানমণ্ডলীতে এত গোলযোগ ও অমিল কেন? এক এক জনের উচ্চপদ পাইতে ইচ্ছা, এবং অন্য ভ্রাতাকে ছোট ও নীচ মনে করা তাহার এক প্রধান কারণ। জীবনে ও চরিত্রে বড় না হইলে, ভগবান্ বড় না করিলে, শরীরের বলে, পৃথিবীর বিদ্যা বুদ্ধির বলে কেহ ধর্ম্মরাজ্যে বড় হইতে পারে না; বরং তাহার বিপরীত ফল হয়। প্রাচীন বাইবেলে উক্ত হইয়াছে যে,"অহঙ্কার বিনাশের অগ্রে গমন করে, পতনের অগ্রে দম্ভ।" মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আপনাকে নত করে তাহাকে উন্নত করা হইবে, এবং যে আপনাকে উন্নত করে তাহাকে নত করা হইবে।" বাস্তবিক অহঙ্কারেতে পতন, এ রাজ্যে যিনি সকলের পদানত হইবেন তাঁহারই উন্নতি। বিধাতার এই বিধি ও নিয়ম। বর্ত্তমান সময়ে বিধানমণ্ডলীর অনেকে অহঙ্কারে ও পদগৌরবলালসায় নিজে মারা পড়িতেছেন, ও মণ্ডলীর মধ্যে অশান্তি ও বিপ্লব আনয়ন করিতেছেন। আচার্য্যদেব তাঁহার অনুগামী লোকদিগের নিকটে মুঙ্গেরের বিনয় ভক্তি এবং সঙ্গতের নীতি প্রত্যাশা করিয়াছিলেন। তাহা হইলে সমুদায় দিক্ রক্ষা পাইত, স্বর্গীয় সম্মিলন স্থাপিত হইত। তাঁহার বন্ধুগণ সেই পথ ছাড়িলেন বলিয়া তিনি বার পর নাই মনে কষ্ট পাইয়াছেন। ১৮৮৩ সালের ২০ শে নবেম্বর শ্রীআচার্য্য আপন জন্মদিন উপলক্ষে প্রার্থনাতে গভীর দুঃখ সহকারে এই সকল কথা বলিয়াছেন "যার যা খুসি কচ্ছেন, আরও যদি কিছু দিন থাকি আরও কত স্বেচ্ছাচার দেখিতে হইবে।" "আমার মুঙ্গেরের সে ছবি কোথায়

গেল? সে বিনয়, সে ভক্তি, সে বিশ্বাস, পরস্পরের প্রতি অনুরাগ কোথায় গেল? একটু সন্দেহ দ্বিধা নাই কথাতে।" "আমি যেন গরিব বানের জলে ভেসে এসেছি, কেবল যেন দুটো কথা এঁদের শিখাতে এয়েছি, তা করিলে তো হবে না। যদি মানিতে হয় ষোল আনা মানিতে হইবে। তা এতে একজন থাকুন, দেড় জন থাকুন। আমার এখনও এমন ক্ষমতা আছে, আমি সমুদায় পৃথিবীকে ধানের ক্ষেত্র করে ফসল করি। আমার বৃদ্ধ শরীরে এখনও তরুণ হাড়, তোমার হুকুম পেলে আমি কি না করেছি, মরি আর বাঁচি। মা, আমি এখন গঙ্গার ধারে বসে ভাব্‌ছি কি করিলাম, স্বাধীন প্রচারক তৈয়ার করিলাম, যাঁহারা অনেক শিষ্য করিতে পারেন।" "এঁরা শান্তির উপদেশ দেন লোককে, কিন্তু নিজের মনে কত রাগ, এঁরা শিষ্যদের উপদেশ দেন কিন্তু নিজেরা কি রকমে চলেন।" "সে মুঙ্গের আর হল না, জগদীশ, এই কয়টি লোককে স্বেচ্ছাচার হইতে বাঁচাও, এখন আমার এই বিশেষ প্রার্থনা ও ব্যাকুলতার কথা হয়েছে। মা, আজ আমার জন্ম দিন, ৪৪ বৎসর পূর্ণ হয়ে ৪৫ বৎসর আরম্ভ হইল। আজ এঁদের জীবনের পরিবর্ত্তনের দিন। আজ মুঙ্গেরের প্রত্যাগমন। আজ সঙ্গতের নীতি, মুঙ্গেরের ভক্তি নববিধানের ধর্ম্ম।" "এক শরীরের সকলে অঙ্গ এই বিশ্বাস।" "আমাকে সেবা করিতে হবে না এঁদের, বাহিরে সম্ভ্রম দিতে হবে না। আমি বাহিরে সেবা আর নেব না। আমি সকলের কাছে ধর্ম্ম শস্তা কর্ত্তে গিয়াছিলাম। আজ ৪৪ বৎসর পরে হিসাব মিলাতে পাল্লাম না। মা আমায় ধমক দিলেন। বল্লেন, তুই দেড় আনা, এক আনা, তিন আনা, যে যা দিয়েছে সকলকে এর ভিতরে আনিলি, আমি বলেছি ষোল আনা যে দেবে, সে এর ভিতরে আসবে, মা আজ বলছেন জন্মদিনে যে আমার ভক্তকে ষোল আনা বিশ্বাস দিবে, সেই আসুক আর কেহ নয়।" "আগেকার গুরু-আচার্য্য নয়, ভাই বলে পরস্পরকে ভালবাসা দেওয়া, কোলাকোলি করা, বিশ্বাস দেওয়া।" "আমরা যেন সকলে এই ষোল আনা বিধি পালন করিয়া, ষোল আনা বিশ্বাস তোমাকে, তোমার বিধানকে, তোমার প্রত্যাদেশকে, তোমার ভক্তকে দিয়া স্বর্গের উপযুক্ত হইতে পারি।"

দম্ভ, অভিমান ও অবিনয় ব্যক্তিগতভাবে এক এক জনের যেমন পতনের কারণ হইয়াছে ও মণ্ডলীর মধ্যে অমিল, বিশৃঙ্খলা এবং অশান্তি আনয়ন করিয়াছে, দ্বিতীয়তঃ এক এক জনের স্বেচ্ছাচারিতা তদ্রূপ ঘোর অসম্মিলন ও গোলযোগের কারণ হইয়াছে। এক এক জন নিজের নিজের পছন্দ ও রুচি অনুসারে বাদ সাদ দিয়া নূতন গড়িয়া কেশবচন্দ্রকে লইতেছেন, কেহ কেহ নিজে নূতন কেশবচন্দ্র হইয়া তাঁহার প্রবর্ত্তিত বিধি ব্যবস্থা শাস্ত্র স্বেচ্ছানুসারে ভাঙ্গিতেছেন ও গড়িতেছেন। ক্রাইষ্ট বলিয়াছিলেন যে, আমার পরে অনেক ভাক্ত ক্রাইষ্ট আসিবে। অন্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের পরেও ভাক্ত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক দেখা দিয়াছিল। বিধান-প্রবর্ত্তক কেশবচন্দ্র অপেক্ষা কাহার কাহার অধিকতর "Authority" দেখিয়া অবাক্ হওয়া যাইতেছে। দর্শন ও প্রত্যাদেশ সম্বন্ধে উচ্চতম স্বর্গের বড় বড় অপরিটির কথা কাহার কাহার রসনা ও লেখনী হইতে যেরূপ অবিশ্রান্ত বিনির্গত হয়, আচার্য্য কেশবচন্দ্রের হাজার হাজার উপদেশ ও প্রার্থনা খুঁজিয়াও সেরূপ কথা বড় অধিক পাওয়া যায় না, কিন্তু তাঁহাদের জীবন ও চরিত্র সেই কথার কিছুই সাক্ষ্য দান করে না, এই দুঃখ। এজন্য সাধারণে তৎপ্রতি আদর ও বিশ্বাস না করিয়া বরং হাস্য উপহাস করে, এবং এক প্রকার নূতন মিষ্টিসিজিম মনে করিয়া থাকে। অনেকেই তাহাতে অন্তরের সহিত যোগদান করিতে পারেন না।

৩য়তঃ বিশ্বাসের অভাব। ক্রাইষ্টের শরীর অন্তর্হিত হওয়ার বহু বৎসর পরে তাঁহার প্রেরিতবর্গ ও মণ্ডলী প্রভৃতির যখন কোন চিহ্ন ছিল না, তখন ক্রাইষ্ট বিদ্যমান বলিয়া কতগুলি লোকের দৃঢ় বিশ্বাস হওয়াতে পৃথিবীতে স্বর্গীয় অগ্নি জ্বলিয়া উঠে। বিধানপ্রবর্ত্তক আচার্য্যের সঙ্গে যাঁহারা ২০।২৫ বৎসর একত্র উপাসনা সৎপ্রসঙ্গ, একত্র কার্য্য, একত্র বাস করিয়াছেন সেই সকল প্রেরিতমণ্ডলী এবং আচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত তাঁহার অতি আদরের শ্রীদরবার, মন্দির ও দেবালয় প্রভৃতি জাজ্বল্যমানরূপে এইক্ষণও বিদ্যমান, বিশ্বাস নাই যে আচার্য্য তাহাতে আছেন। এজন্য সে কলের প্রতি আদর ও সম্মান নাই, বরং তৎসমুদায় উচ্ছিন্ন ও উন্মূলন করার জন্য বিধিমতে চেষ্টা অনেকে করিয়া থাকেন। এইরূপ আচার্য্যের প্রতি অনাদর ও অবিশ্বাসই সর্ব্বনাশের কারণ। আচার্য্যদেব আপন বন্ধু প্রচারকদিগের তাদৃশ উচ্চ সাধন ও উচ্চ জীবন হইতেছে না দেখিয়া অনেক সময় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং তিনি শিক্ষার জন্য "বিষ্ঠা ভিক্ষা" ইত্যাদি শক্ত কথারও প্রয়োগ কখন কখন করিয়াছেন। আবার অন্য দিকে তাঁহাদিগকে মহা-সম্মান ও শ্রদ্ধা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, ইহাঁরা আমার অঙ্গ, ইহাঁদের এক জনকে যে অগ্রাহ্য করে সে আমাকে অপমান ও অগ্রাহ্য করে। ইহাঁদের মধ্যে আমি ব্রহ্মাবতরণ দর্শন করিয়া থাকি। ১৮০৫ শকের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রকাশিত আচার্য্যদেবের দুই খানা পত্র ও পত্রের অংশ আমরা প্রমাণস্বরূপ এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। প্রথমতঃ হিমালয় হইতে উক্ত বৎসর ১৯ শে জুলাই, কলিকাতাস্থ একজন পেবিতকে তিনি এরূপ লিখেন, "মনে হইল যেন আমার দল বিষ্ঠা ভিক্ষা করিতেছে। ছি ছি ছি ছি, বলে কাপড় দেও, টাকা দেও, মান দেও, উচ্চ পদ দেও, বাহাবা দেও, বাহাদুর উপাধি দেও। অর্থাৎ বিষ্ঠা দেও। আমি দিতে পারি না, দিব না, এই জন্য আমাকে কলিকাতায় যাইতে বল? কোটি টাকার সোণার স্বর্গ দিয়াছি, এখন ময়লা দিব? কি লজ্জার কথা।" ২রা আগষ্ট আবার আর এক জন প্রেরিত বন্ধুকে এই পত্র লিখেন, "আমার সঙ্গে যোগ আছে কি না ইহা আমার বলা ঠিক নয়। একথাটি তো আমার উত্তরসাপেক্ষ নহে, লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে হইবে। আমার যোগ বৈরাগ্য চরিত্র যেখানে, সেই খানে আমি। আমার সহিত গূঢ় যোগ সেইখানে। এ সকল না থাকিলে ভালবাসা হইতে পারে, মায়া হইতে পারে; কিন্তু যোগ ও বিশ্বাস সম্ভব নহে। আমার

দলের সমস্ত লোকের এবং প্রত্যেক লোকের আমি যেমন দেবত্বের অংশ ও ব্রহ্মাবতরণ দর্শন করি, সেইরূপ দর্শন করিতে হইবে। দল ছাড়া আমি এক জন আছি ইহা ভ্রান্তি, সুতরাং দল ছাড়িয়া আমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করা কিরূপে সম্ভব হইবে? দল ও আমি এক জন, সমুদায় লইয়া নববিধান, একটি লোকের প্রতি ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা আর আমাকে অস্বীকার। প্রত্যেকের পদধূলি ভক্ষণ ও প্রত্যেকের মধ্যে দেবিকাস্বরূপ দর্শন ইহা ভিন্ন আমাকে পাইবার উপায় দেখিতেছি না। রিপুগুলি ছাড়িয়া পরস্পরের হইয়া আমাকে লইতে হইবে। কে প্রস্তুত? দল ছাড়া দলপতির নিকটে আসিবার পথ নাই। অন্য পথ চোরের পথ। আমরা এক-জন আমি এই বিশ্বাস করি। চির সেবক, শ্রী কে।" প্রার্থনাতেও তিনি এক সময় এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। মিশাইই পিটারকে এক সময় শয়তান বলিয়া গাল দিয়াছিলেন, যখন পিটার বলিয়াছিলেন, আমি আপনার জন্য প্রাণ দিব কিন্তু তাঁহার দুর্ব্বলতা জানিতেন, তিনি বলিয়াছিলেন যে তুমি আমাকে তিন বার অস্বীকার করিবে ও মিথ্যা বলিবে। আবার ইহাও বলিয়াছিলেন যে, তোমার হস্তে স্বর্গের চাবি, অর্থাৎ যে তোমাকে স্বীকার করিবে তাহার জন্য স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত। বিধানের প্রেরিতকে স্বীকার না করিয়া বিধান স্বীকার হয় না। মহাতেজস্বী শক্তিশালী বিধানপ্রবর্ত্তককে স্বীকার করা সহজ, নানাদোষদুর্ব্বলতানিপীড়িত বিধানের অনেক প্রেরিতকে স্বীকার করা সকলের পক্ষে সহজ নহে। কিন্তু তাঁহাদিগকে স্বীকার না করিলে বিধানপ্রবর্ত্তককেও স্বীকার করা হয় না। আচার্য্যদেব এক সময় বলিয়াছেন যে, "আমার ভর্ৎসনায় বন্ধুরা চটেন কেন? আমাদের ন্যায় লোক যাহাদিগকে ভর্ৎসনা করে, পৃথিবীর লোক তাঁহাদিগকে পূজা করে।" যাঁহারা প্রেরিতদিগকে আচার্য্যের ন্যায় সেরূপ সম্মান করিতে ও ভালবাসিতে জানেন না, তাঁহারা কটু কাটব্য প্রয়োগ করেন শোভা পায় না। ইহাতে তাঁহাদের অধোগতি ব্যতীত অন্য কোন ফল হইতেছে না। এদিকে তাঁহাদের গালাগালি ও অত্যাচারে প্রেরিতদিগের কোন ক্ষতি হইবে না, বরং উপকার হইবে। আচার্য্যের সঙ্গে প্রেরিতদিগের যে প্রকার সম্বন্ধ তাঁহাদের সঙ্গে কি সেই প্রকার সম্বন্ধ? যাঁহারা নিজের অবস্থা ও জীবনের গতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলেন না, পূর্ব্বে কি জীবন ছিল এক্ষণ কতদূর নীচে নামিয়া পড়িয়াছে যাঁহারা ভাবেন না, তাঁহাদের জন্য বড় দুঃখ হয়। বৃদ্ধ বয়সে উপাসনাবৈমুখ্য এবং নব নব বিলাস আমোদ ও শারীরিক সুখস্পৃহা এক এক জনের মধ্যে কি শোচনীয়রূপে প্রবেশ করিয়াছে, ইহা কি তাঁহারা ভাবেন?

সকল প্রেরিতের পালাক্রমে উপাসনা করার বিধি আচার্য্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কেহ কেহ আপন ভ্রাতার উপাসনায় যোগ দিতে পারেন না, তাহাতে উপকার মনে করেন না। সেই সকল ভ্রাতা ঠিক উপাসনা করিতে পারেন তাঁহাদের এইরূপ বিশ্বাসও হয় না। এই প্রকার সংস্কার যে, কেবল তাঁহার ভিতর দিয়াই স্বর্গের প্রত্যাদেশ ও বিধি আইসে, তাঁহার উপাসনাতেই অন্য সকলের নিরন্তর যোগ দান করা কর্ত্তব্য। নিজে স্বাধীন দলপতি ও স্বতন্ত্র নেতা বা গুরু হওয়ার গূঢ় অভিপ্রায় ইহার ভিতরে রহিয়াছে, স্বার্থপরতা ও 'আমিই সব' ইহার মূলে বিদ্যমান। অনেক স্থলে অন্য ভ্রাতার উপাসনা ভাললাগে না, নিজের মন ভাল নয় বা নিজের উপাসনা সাধনা নাই তাহাই কারণ। এই সকল কারণে পরস্পর যোগ ও সাম্মিলনের বিষম ব্যাঘাত হইতেছে

ধর্ম্মতত্ত্বে সেই গাজিপুরের যোগী মহর্ষির মধুর বিনয়ের কথা পড়িয়া কি আনন্দই বোধ হইতেছে। এমন উচ্চ স্বর্গীয় জীবন, তথাপি যেন তৃণ অপেক্ষা দীন। তিনি বলেন "দাস কা দাস্তা, স্বামীজি কুচ কহিয়ে।" সকলের নিকটেই তাঁহার এই রূপ বিনয়ের কথা। ২১।২৬ বৎসর যাঁহারা আচার্য্যের সঙ্গ করিয়াছেন তাঁহাদের বিশ্বাস, আর ২৫।২৬ বৎসর বয়স্ক যুবা যিনি একদিনও আচার্য্যকে স্বচক্ষে দেখেন নাই, সেই স্বর্গগত রমণী কান্তের বিশ্বাস, এই দুইয়ে কত প্রভেদ একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। সেই যুবা বিনয়, বিশ্বাস ও ভক্তির জীবনে বড় বড় খ্যাতনামা ব্রাহ্মের গালে চূণ কালী দিয়াছেন। অবিনয়, অবিশ্বাস ও স্বেচ্ছাচারিতা দূর হইলেই অমিল ও গোলযোগ মিটিয়া যায়, এই মূল কথা। সকলে শ্রীদরবারে মিলিত হউন ও শ্রীদরবারের অধীন হউন। ভ্রাতার নিন্দা করিয়া বেড়াইলে বা লোকের দয়া মায়া ও আদর পাইবার জন্য দুঃখের কান্না কাটিলে কখন মিলন সম্ভব নহে।

একজন সম্মিলনার্থী।

ভাই রামচন্দ্র সিংহ স্বীয় পত্নী ও সন্তানগণের পীড়ার জন্য যে সাহায্য পাইয়াছিলেন তাহার হিসাব শ্রীদরবারে প্রদান করাতে শ্রীদরবারের অভিপ্রায় মত ইহা প্রকাশিত হইল।

আয়।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহেন্দ্রনাথ মিত্র টালাপ, ডিব্রুগড় আসাম	...	২০৲
আসাম, গোলাঘাটের বন্ধুগণ।		
শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঘোষ	...	৫৲
" রাজকৃষ্ণ ঘোষ	...	৫৲
" ডাক্তার ভগবতীচরণ ঘোষ	...	৫৲
" রতিকান্ত চক্রবর্ত্তী	...	১৲
" শশিচন্দ্র দাস	...	১৲
" অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	...	১৲
ও অপর দুই জন বন্ধু	...	২৲
" ডাক্তার বঙ্গচন্দ্র সেন, নিগ্রীটীং	...	৪৲
" কৃষ্ণকান্ত সাহা, রামপুর বোয়ালিয়া	...	৫৲
" শশিভূষণ বসু, কলিকাতা	...	১০৲
" দ্বারিকানাথ বসু, দিনাজপুর	...	১০৲
		৬৯

ঔষধ ও পথ্য প্রভৃতিতে এই টাকা ব্যয় হইয়া এখনও ৪১ টাকা আন্দাজ ঔষধ ও দুগ্ধের দেনা আছে।

এই নগদ টাকা ভিন্ন শ্রীযুক্ত বাবু লক্ষ্মণচন্দ্র দাস মহাশয় গত মাঘ মাস হইতে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে এক সের করিয়া দুগ্ধ প্রদান করিতেছেন।

☞ এই পত্রিকা ৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ধর্ম্মতত্ত্ব

সুবিশালমিদং বিশ্বং পবিত্রং ব্রহ্মমন্দিরম।
চেতঃ সুনির্ম্মলস্তীর্থংসত্যং শাস্ত্রমনশ্বরম।
বিশ্বাসো ধর্ম্মমূলং হি প্রীতিঃ পরমসাধনম।
স্বার্থনাশস্তু বৈরাগ্যং ব্রাহ্মৈরেবং প্রকীর্ত্ত্যতে।

২৩ ভাগ।
২০ সংখ্যা।

১৬ই কার্ত্তিক, বুধবার, ১৮১০ শক।

বাৎসরিক অগ্রিম মূল্য ২৷৹
মফঃস্বল ঐ ৩

প্রার্থনা।

হে পরীক্ষক, আমরা তোমার নিকটে ভীত হইয়া উপস্থিত। তুমি আমাদিগের জীবন নিরন্তর পরীক্ষা করিতেছ, এবং বলিতেছ, "অমুক অমুক বিষয়ে তোদের আজও কিছু হয় নাই।" তোমার মুখ হইতে এ কথা শুনিয়া যেন সেই সেই বিষয়ে আমাদের উন্নতিসাধনে একান্ত যত্ন হয়। তোমার বিচার অতি সূক্ষ্ম বিচার, আমরা আশা করি না যে, আমরা তোমার সে বিচারের নিকটে কোন দিন উত্তীর্ণ হইব। অনন্ত কাল যখন আমাদিগের উন্নতিসাধনের নির্দ্দিষ্ট কাল, এবং যে সকল বিষয়ে আমাদিগকে উন্নতি করিতে হইবে, তাহাও অনন্ত, তখন হে অনন্তদেব, আমাদিগের আশা উদ্যম কেন খর্ব্ব হইবে? যদি তিল তিল করিয়াও পরীক্ষিত বিষয়ে আমাদিগের উন্নতি হয়, তাহা হইলে, হে দেব, আমরা বুঝিতে পারিব, আমাদিগের উন্নতি হইতেছে, আমরা পশ্চাতে গমন করিতেছি না। তোমার পরীক্ষা যেমন এক দিকে অত্যন্ত কঠোর, অন্য দিকে আবার তেমনই মধুর। তোমার সূক্ষ্ম বিচারে যেমন অভাব প্রকাশ পায়, তেমনি কে কত দূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হয় নাই, তাহা যাহাতে হয়, তজ্জন্য উৎসাহ এই কারণে বাড়ে যে, যখন এত টুকু হইয়াছে, তখন যাহা হয় নাই, তাহা কেন হইবে না? হে পরীক্ষক, আমাদের বিশ্বাস কত দূর বাড়িল, আমরা শত্রুকে কত দূর ভাল বাসিতে পারিলাম, আমাদের হৃদয় কত দূর পবিত্র হইল, এ সকল বিষয়ে আমাদিগকে নিয়ত পরীক্ষা দিতে হইতেছে, এবং এই সকলে উত্তীর্ণ হইলে তুমি আমাদিগকে স্বর্গের দেবগণের সঙ্গে বিচরণ করিতে দিবে, আমরা জানি। যাহাতে আমরা শীঘ্র শীঘ্র পৃথিবীর পরীক্ষা গুলিতে উত্তীর্ণ হইয়া এখানে থাকিতে থাকিতেই দেবশ্রেণীতে আরোহণ করিতে পারি, প্রভো, তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে সেই আশীর্ব্বাদ কর। আমাদের জীবন বিফল হইল, তোমার বিধানের আশ্রয় পাইয়া আমাদের যে লাভ হইবার সম্ভাবনা ছিল তাহা বিঘটিত হইয়া গেল, যদি ইহলোকে আমাদিগের দেবগণের সঙ্গে বাস না হয়। তাই আমরা প্রণতভাবে তোমার চরণতলে পড়িয়া প্রার্থনা করিতেছি, হে দেবাদিদেব, তুমি নিরন্তর আমাদিগকে পরীক্ষা কর, এবং বলিয়া দাও কতটুকু আমাদিগের হইয়াছে, এবং এখনও দেবশ্রেণীতে উঠিবার জন্য কত টুকু করিতে হইবে। আমরা তোমার মুখে অভাবের

কথা শুনিয়া যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র সেই অভাব দূর করিতে পারি, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

পরীক্ষা কেন।

মনুষ্যজীবনে পরীক্ষা অনেক। এই সকল পরীক্ষায় পড়িয়া হয় মানুষ দেবতা হয়, না হয় মনুষ্যত্ব হারায়। দেবতা অতি অল্প লোকেই হইয়া থাকে, মনুষ্যত্ব হইতে পতন, ইহাই অনেকের সম্বন্ধে ঘটিয়া থাকে। পরীক্ষায় যখন ঈদৃশ আপদ বিদ্যমান, তখন মঙ্গলময়ের সংসারে পরীক্ষা কেন প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে? এই সকল পরীক্ষার জন্য যখন পৃথিবী হইতে নাস্তিকতা ও সংশয় বিদূরিত হইতেছে না, তখন কি পরীক্ষা প্রবর্ত্তিত না করিলে চলিত না? এক বার দেখা যাউক, সংসারের এত পরীক্ষা কেন?

আমরা যদি মনকে জিজ্ঞাসা করি, মন তুমি কি পরীক্ষাবিহীন জগতে থাকিতে ভাল বাস? মন উত্তর দেয়, পরীক্ষায় কষ্ট আছে বটে, কিন্তু পরীক্ষাশূন্যজগতে সে বাস করিতে চায় না। তাহার যে অস্তিত্ব আছে, তাহা কেবল এই সকল পরীক্ষার জন্য, অন্যথা সে জড়ের সঙ্গে মিশিয়া যাইত, তাহার মহত্ত্ব এবং গৌরব কিছুই থাকিত না। দিন দিন যে তাহার স্ফূর্ত্তি লাভ হইতেছে, তাহা কেবল পরীক্ষার জন্য। বস্তুতঃ আমরা পরীক্ষাকে ভয় করি বটে, কিন্তু পরীক্ষা না হউক, এরূপ অভিলাষ করি না। অধ্যয়নকালে পরীক্ষার নামে গা কাঁপে, অথচ পরীক্ষা না হইলে মন অসন্তুষ্ট হয়। সুতরাং পরীক্ষা ভয়ের কারণ হইলেও তাহার মধ্যে এমন কিছু আছে যাহার জন্য মন তাহা চায়।

প্রথমতঃ পরীক্ষা আমাদিগের উন্নতির পরিজ্ঞাপক। আমাদিগের উন্নতি কত দূর হইল পরীক্ষা বিনা তাহা কখন জানা যাইতে পারে না। বিশ্বাস, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, প্রেম, পুণ্যে আমরা কত দূর অগ্রসর হইলাম, পরীক্ষা না আসিলে, আমরা ইহা কিছুই জানিতে পারি না। যখন অবস্থা অনুকূল, প্রাত্যহিক জীবন জলস্রোতের ন্যায় চলিতে থাকে, তখন আমরা বলিতে পারি না, আমাদিগের বিশ্বাসাদি ঠিক আছে কি না? আমরা মনে করিতে পারি, আছে, কিন্তু সেরূপ মনে করা পরীক্ষার কালে ভ্রম বলিয়া বুঝিতে পারি। মানুষ আপনাকে যেমন ভালবাসে, তেমনি এই ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে একটী দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়, যাহার জন্য সে আপনার সমুদায় বিষয় অনুমোদন করে, একটিও তাহার অপছন্দ হয় না। এরূপ হওয়া স্বাভাবিক, কেন না যদি সে আপনার ভিতরে কি অননুমোদনীয় বিষয় আছে জানিতে পারিত, তাহা হইলে সে তাহা থাকিতে দিবেই বা কেন? কিন্তু যখন সে এমন কোন অবস্থায় পড়ে যাহাতে পরীক্ষা বুঝিতে পারে, সে যাহা আপনাকে মনে করিয়াছিল তাহা সে নয়, তখন তাহার চৈতন্য হয় এবং নিজের ন্যূনতা কিসে যায় তাহার জন্য সে যত্ন করিতে থাকে।

অতএব স্থির হইতেছে যে, আমাদের কত দূর উন্নতি হইল, ভিতরে কিছু অভাব আছে কি না জানিবার জন্য পরীক্ষার অত্যন্ত প্রয়োজন। ইহা না জানিলে আমরা দিন দিন নূতন পথে কিরূপে জীবন অগ্রসর করিতে পারি। ইহার উপরে আমাদিগকে এ কথাও স্বীকার করিতে হইতেছে যে, যদি প্রতিদিন আমাদিগের জীবন এরূপে চলে যে, কোন অভাবই আমরা অনুভব করি না, তাহা হইলে এ অবস্থা সুখের নহে, মৃত্যুর অবস্থা। পরীক্ষা বিনা এ মৃত্যু আর কিসের দ্বারা নিবারণ হইতে পারে? আমি মনে করিলাম আমি খুব বিশ্বাসী, ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা, ক্ষমা প্রেম পুণ্য আমার যথেষ্ট, মনুষ্যজীবন নির্ব্বাহ করিতে গিয়া আর তদপেক্ষা অধিক প্রয়োজন করে না, আমি এ সকল সম্বন্ধে সিদ্ধাবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি; এ অবস্থায় নিশ্চেষ্ট ও প্রশান্তভাবে স্থিতি ভিন্ন আমার

আর কি হইতে পারে। উপার্জ্জিতব্য গুণসমুদায়ে যদি আমি পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়া থাকি, তবে আর এরূপ নিরুদ্যম কেনই বা উপস্থিত হইবে না। কিন্তু এ সংসার এমনই ভাবে গঠিত যে, কাহারও আর এরূপ ভাবে নিরুদ্যম থাকিবার সম্ভাবনা নাই। স্বতঃ এমনই পরীক্ষা সকল উপস্থিত হইবে যে, অভাব বুঝিয়া তাহার পরিপূরণের চেষ্টা উপস্থিত হইবেই হইবে।

যত দিন পরীক্ষা উপস্থিত না হয়, তত দিন মানুষ আপনাকে বড় মনে না করিয়া থাকিতে পারে না। আমি মনে করি আমি খুব বিশ্বাসী, কিন্তু আমি এরূপ মনে করি এই জন্য যে, আজও আমার নিকটে তেমন পরীক্ষা উপস্থিত হয় নাই, যাহাতে আমার বিশ্বাস দোলায়মান হইতে পারে। অত্যন্ত বিশ্বাসী যিনি তিনিও পরীক্ষায় পড়িয়া কম্পিতকলেবর হন, কেবল প্রার্থনা করিয়া ও ধূলিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হন। মহর্ষি ঈশা যখন জানিলেন, তাঁহাকে কি প্রকার ক্লেশে জীবন অর্পণ করিতে হইবে, তিনি রাত্রি জাগরণ করিয়া প্রার্থনায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং অতিযত্নে আপনাকে সম্পূর্ণ ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন করত অসহ্যযন্ত্রণায় মৃত্যুকে বন্ধু বলিয়া বরণ করিলেন। বিশ্বাসচূড়ামণি মহর্ষি ঈশার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিয়া আমাদিগের ন্যায় দুর্ব্বলচিত্ত লোকের পরীক্ষার জন্য কি প্রকার প্রস্তুত হইতে হইবে, তাহা শিক্ষা করিতে হইতেছে। এ সংসারে প্রতি নিমেষে আমাদিগের বিশ্বাস প্রেম পুণ্যাদি পরীক্ষিত হইতেছে, কিন্তু সেই পরীক্ষায় যাহাতে আমরা উত্তীর্ণ হইতে পারি, আমাদিগের যত্ন সেই দিকে থাকা একান্ত প্রয়োজন।

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমাদিগের লাভ কি? এই কথার বিচার করিতে গিয়া পরীক্ষার দ্বিতীয় ফলের বিষয় আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইতেছে। পরীক্ষা যেমন আমাদিগের উন্নতির জ্ঞাপক, তেমনি উহা শক্তির উদ্ভাবক। এক একটী পরীক্ষা আমাদিগের ভিতরকার নিদ্রিত শক্তিকে জাগ্রৎ করিয়া দেয়। আমাদিগের যত সামর্থ্য আছে, পরীক্ষা কালে একত্র সমাবিষ্ট হইয়া থাকে। এই সমাবেশের ফল এই হয় যে, সেই সকল সামর্থ্য নূতন বল ধারণ করে। প্রার্থনা উপাসনা সাধন ভজন ব্রত নিয়মাদি পরীক্ষার সময়ে জীবন্তভাব ধারণ করে। সমুদয় অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রকৃতি পরীক্ষার অনভীষ্ট ফল প্রত্যাখ্যান করিয়া তাহা হইতে অভীষ্ট ফল লাভ করিবার জন্য স্বতঃ ব্যগ্র হয়। সুতরাং সকল শক্তি জাগ্রৎ হইয়া সবেগে উপযুক্ত উপায় সকল অবলম্বন করিয়া থাকে। অন্য সময়ে যাহা সিদ্ধ করিতে এক বৎসরের প্রয়োজন, এই সময়ে তাহা এক মাসে সিদ্ধ হয়। এই কারণেই অনেক সাধক নিয়ত কাল পরীক্ষার আগুন নির্ব্বাণ হইতে দেন না, তাঁহারা আহ্লাদের সহিত পরীক্ষা হইতে পরীক্ষান্তরে গিয়া নিপতিত হন।

পরীক্ষার আগুন নির্ব্বাণ হইতে না দেওয়া এ কিরূপ কথা? মানুষ কি আপনি ইচ্ছা করিয়া পরীক্ষা উপস্থিত করে? তাহা হইলে, ইহা তো মানবীয় ব্যাপার হইল। ইহার মধ্যে ঈশ্বরকে পরীক্ষক বলিয়া কি প্রকারে গ্রহণ করা যাইবে? পরীক্ষার আগুন নির্ব্বাণ হইতে না দেওয়া ইহার অর্থ ইহা নহে যে, পরীক্ষা নাই অথচ পরীক্ষা উৎপন্ন করা। ইহার অর্থ এই যে, নিয়ত বিদ্যমান পরীক্ষা হইতে আপনাকে দূরে রাখিয়া না দেওয়া। কথাটা আমরা কি বলিতেছি স্পষ্ট হইল না। স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, এই সংসার পরীক্ষাসঙ্কুল। মানুষ যত জাগ্রৎ হয়, তত এই সকল পরীক্ষা প্রত্যক্ষ করে, যত নিদ্রিত হইয়া পড়ে তত পরীক্ষা বুঝিতে পারে না। আমি যখন নিদ্রিত, তখন অতীব ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলেও আমি কিছুই জানিতে পারি না, পরীক্ষাসম্বন্ধে পৃথিবীর লোকদিগের প্রায় এইরূপ

অবস্থা। নিদ্রিতাবস্থায় ভয়ের কারণ উপস্থিত হইলে আমরা তত ক্ষণ কিছু জানিতে পারি না, যত ক্ষণ না সেই ভয়ের কারণ প্রবল আঘাতে আমাদিগের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দেয়। এ সংসারে পরীক্ষাসম্বন্ধেও এইরূপ ঘটিয়া থাকে। যত ক্ষণ পরীক্ষা ঘোরতর আকার ধারণ না করিতেছে, তত ক্ষণ আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। কিন্তু তদ্রূপ আকার ধারণ করিবার পূর্ব্বে যে উহা ছিল, হঠাৎ আইসে নাই, ইহা আমরা সহজে বুঝিতে পারি। কে বলিবে, বিশ্বাসাদিসম্বন্ধে যে পরীক্ষা উপস্থিত হয়, তাহার কারণ আমাদিগের মধ্যে বিদ্যমান নাই? যদি বিদ্যমান থাকে, তবে মানিতে হইবে, আমি জাগ্রৎ ছিলাম না বলিয়া পূর্ব্বে পরীক্ষা বুঝিতে পারি নাই।

আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে, যাঁহারা জাগ্রৎ, তাঁহারা সর্ব্বদা পরীক্ষা সম্মুখে দর্শন করেন, এবং দর্শন করিয়া তীব্রবেগে উপাসনা প্রার্থনাদিতে নিয়ত নিযুক্ত থাকেন। এখন দেখা যাউক, কি উপায়ে আমরা নিয়ত জাগ্রৎ থাকিতে পারি। আমাদিগের কার্য্যে প্রবর্ত্তক আমাদিগের অন্তরের বৃত্তি। এই বৃত্তি সমুদায় বাহিরের বিষয়ের সঙ্গে সম্বদ্ধ। অন্তরের বৃত্তির অবস্থানুসারে বাহিরের বিষয় সমুদায় আমাদিগের উপরে কার্য্য করে, বাহিরের বিষয় অনুসারে আমাদিগের অন্তরের বৃত্তি সমুদায় নিয়মিত হয় না। যদিও বৃত্তিনিচয়ের বিষয়াধীনতা উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে দুর্ব্বল এবং বিষয়ের আকর্ষণকে প্রবল ও অপরিহার্য্য বলিয়া মনে হয়, তথাপি বৃত্তিই বিষয়কে সেরূপ বল দান করে বলিয়া বৃত্তিগণকে আমাদিগের পরীক্ষার ভূমিরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। মানিলাম, বাহিরে এমন প্রতিকূল অবস্থা হইয়াছে যে, আর বিশ্বাস ঠিক রাখিতে পারা যায় না, কিন্তু তুমি যে বিশ্বাস ঠিক রাখিতে পারিতেছ না, তাহা কি তোমার আন্তরিক দৌর্ব্বল্যের, না বাহিরের ব্যাপারের অবশ্যম্ভাবী ফল। তুমি যে অবস্থায় পড়িয়াছ, তদপেক্ষা কঠিন অবস্থায় পড়িয়া যদি এক জন তাহার বিশ্বাস অক্ষুন্ন রাখিতে পারে, তবে তোমায় স্বীকার করিতে হইবে যে, বহির্ব্যাপারে কিছু দোষ নাই, তোমারই নিজ দোষে তুমি বিশ্বাস স্থির রাখিতে পারিলে না।

মনুষ্য আন্তরিক দৌর্ব্বল্যে পরীক্ষায় দাঁড়াইতে পারে না, অথচ আপনার প্রতি অন্ধতা এমনই প্রবল যে, সেই দৌর্ব্বল্যকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া সে আপনার মনকে প্রবোধ দান করে। এইটি ভয়ানক অবস্থা। এই অবস্থা অতি গুরুতর পরীক্ষা আনিয়া উপস্থিত করে। পরীক্ষা না হইলে যখন মনুষ্য আপনাকে আপনি চিনিতে পারে না, অভাব বোঝে না, উদ্যম উৎসাহে পূর্ণ হয় না, উন্নতির সোপানান্তরে আরোহণ করে না, তখন ইহা নিশ্চয় কথা যে, যে যত নিদ্রিত, পরীক্ষার প্রতি উদাসীন, তাঁহার সম্বন্ধে সেই পরিমাণে তীব্র পরীক্ষা আসিয়া তাহাকে জাগ্রৎ করিয়া দিবে। যাঁহারা সদা জাগ্রৎ, তাঁহাদিগকে পরীক্ষার তীব্রাঘাত সহ্য করিতে হয় না, কেন না নিরন্তর পরীক্ষার মধ্যে অবস্থিতি করাতে তাঁহারা পরীক্ষার ক্রমিক পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া গমন করেন। কেবল শুদ্ধ ইহাই নহে, ক্রমিক পরীক্ষাযোগে তাঁহাদিগের বিশ্বাসাদি সমুদায় উন্নত হইতে থাকে এবং পরপরবর্ত্তী পরীক্ষা তাঁহারা অনায়াসে বহন করেন। আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে পরীক্ষা কেবল যে অপরিহার্য্য প্রতিপন্ন হইল তাহা নহে, পরীক্ষা ভিন্ন জীবন মৃত্যুগ্রাসে নিপতিত হয়, যত্নোদ্যম চলিয়া যায়, উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহণ অসম্ভব হয়, ইহাও প্রতিপন্ন হইল। পরীক্ষা আমাদিগের পরম বন্ধু ইহা জানিয়া আমরা যেন নিয়তকাল তাহাকে আহ্লাদের সহিত আলিঙ্গন করিতে পারি।

প্রকৃতির সঙ্গে মিলন।

আমাদিগের দেশে প্রকৃতি ও পুরুষ—চেতন ও অচেতন, এই দুই ভাগে সমুদায় পদার্থ বিভক্ত। সমগ্র জড়ের সমষ্টি প্রকৃতি এবং জীবসমষ্টি পুরুষ। আমাদিগের দেহ এবং ইন্দ্রিয়নিচয় প্রকৃতির অন্তর্ভূত। পুরুষ বা জীব এই প্রকৃতি কর্ত্তৃক আবৃত হইয়া রহিয়াছে, তাই সেই মোহে মুগ্ধ, আপনাকে আপনি জানে না। প্রকৃতির ক্রিয়া সমুদায়কে আপনার ক্রিয়া মনে করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে পুরুষ আপনাকে এক করিয়া ফেলে, তাহার পরিবর্ত্তনাদিতে আপনাকে পরীবর্ত্তনশীল মনে করে। এ দেশের যোগশাস্ত্র পুরুষের এই বদ্ধাবস্থা বিদূরিত করিবার জন্য নিবদ্ধ। আমরা এ সম্বন্ধে নূতন কি বলি, এক বার প্রকাশ করিয়া বলিতে যত্ন করি।

প্রকৃতি জড়, সুতরাং উহা আবরণ, ইহা আমরাও মানি। কিন্তু এই আবরণ উন্মোচনের আমরা যে উপায় বলি, তাহা সম্পূর্ণ নূতন। প্রাচীনকালে প্রকৃতি কিছু নয়, কেবল মায়া, ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার, অসত্য, মিথ্যা এই বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা হইয়াছে, আমরা তাহা করি না। আমরা সেই উপায় অবলম্বন করি, যাহাতে প্রকৃতিকে ব্রহ্মের ক্রিয়াপ্রকাশের স্থল বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। এই উপায় অবলম্বন করিতে গিয়া আমরা সর্ব্বপ্রথমে চিন্তাযোগে প্রকৃতি হইতে ব্রহ্মকে প্রত্যাহার করিয়া দেখি, কিছু অবশেষে থাকে কি না? ব্রহ্মসত্তাতে প্রকৃতির সত্তা। সে সত্তা প্রত্যাহার করিলে প্রকৃতি অপদার্থ হইয়া উড়িয়া যায়। যখন আত্মা এইরূপে প্রত্যাহার ক্রিয়া দ্বারা ব্রহ্ম ও প্রকৃতির সম্বন্ধ ভাল করিয়া অনুভব করে, তখন প্রকৃতির শক্তিনিচয় মধ্যে ঈশ্বরের এক মহতী শক্তি অবলোকন করে। এই শক্তি প্রত্যাহৃত হইলে যখন প্রকৃতি কিছুই নয়, তখন প্রাকৃতিক ক্রিয়ানিচয়ের মধ্যে ব্রহ্মশক্তির ক্রিয়াদর্শন সহজ হইয়া পড়ে। ব্রহ্মের ক্রিয়া মঙ্গলপ্রসূতি, সুতরাং প্রাকৃতিক প্রত্যেক ক্রিয়া হইতে যে মঙ্গল সমুৎপন্ন হয়, ইহা সাধক বিশ্বাস করিতে বাধ্য হন। আপাততঃ অনেক গুলি ঘটনার তিনি কোন অর্থ ক'রতে না পারিলেও, ভগবানের প্রতি মনের একান্ত আশ্বস্ততানিবন্ধন প্রকৃতির অভ্যন্তরে তাঁহার যে ক্রিয়া প্রকাশ পায় তাহার চরম যে কেবল মঙ্গল, এ বিষয়ে তিনি অণুমাত্র সংশয় হৃদয়ে পোষণ করেন না। এইরূপে প্রকৃতিকে ব্রহ্মসত্তায় পূর্ণ দেখিয়া, তাহার ক্রিয়ার মধ্যে ব্রহ্মের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করিয়া, সাধক তাহার সঙ্গে আপনার সম্মিলন সাধন করেন। প্রকৃতির সঙ্গে মিলন না হইলে ব্রহ্মের সহিত মিলন যে অসম্ভব, তিনি তাহা তখন অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করেন।

আমরা যাহা বলিলাম তাহাতে দৃষ্ট হইতেছে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সঙ্গে আমাদিগের কি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। যাঁহারা ধর্ম্মোপদেষ্টা, তাঁহারা সাক্ষাৎ আত্মা ও তাহার সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন, আর যাঁহারা বিজ্ঞানবিৎ তাঁহারা আমাদিগের সঙ্গে প্রকৃতির কি সম্বন্ধ নৈপুণ্যসহকারে দেখাইয়া দেন। তাঁহারা এই পর্য্যন্ত করিয়া ক্ষান্ত হন, কিন্তু আমরা এই সকল আবিষ্কৃত বিষয়ের মধ্যে ঈশ্বরের ক্রিয়াপ্রণালী অবলোকন করি, এবং সেই সমুদায় ক্রিয়াপ্রণালীর সঙ্গে আমাদের মিল রক্ষাতে প্রকৃতির ঈশ্বরের সঙ্গে মিল রক্ষা আমরা সহজে উপলব্ধি করি। প্রকৃতির সঙ্গে অমিলে কেবল রোগ শোক বিপদাদি আসিয়া সমুপস্থিত হয় তাহা নহে, উহাতে আমাদিগের ঈশ্বরের সঙ্গে যোগে অন্তরায় উপস্থিত হয়। সুস্থ শরীরে সুস্থ মনে বহির্বিষয়ের সঙ্গে প্রশান্ত সম্বন্ধে নিবদ্ধ না হইলে যোগ হয় না। প্রকৃতিতে যে ঈশ্বরের ক্রিয়া, তাহার বিরোধে জীবন অতিবাহিত

করিলে কেনই বা শরীর মনে বিকার উপস্থিত হইবে না?

আমরা প্রকৃতির সঙ্গে মিলের কথা বলিতেছি, কিন্তু এই সঙ্গে জীব বা আত্মার কথাও আমাদিগকে বলিতে হইতেছে। প্রকৃতির সঙ্গে মিল হইবে কাহার? জীবের। প্রকৃতিতে ক্রিয়া শত সহস্র প্রকার, প্রাকৃতিক পদার্থ গণনাতীত। এক একটি জীবের সঙ্গে প্রকৃতির যত টুকু সম্বন্ধ তাহাও আবার দেশ কাল অবস্থাদি ভেদে অনেক প্রকারে ভিন্ন হয়। প্রতিজীবের সহিত প্রকৃতির যে যে বিষয়ে যত টুকু সম্বন্ধ তাহা কে নির্ণয় করিবে? যদি বল, প্রাকৃতিক শাস্ত্র তাহা নির্দ্ধারণ করিবে, তাহাও হয় না। কারণ প্রাকৃতিকশাস্ত্র সাধারণ ভাবে লিখিত, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিতে তাহার নিয়োগ বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির অবস্থাদিসাপেক্ষ। তাই প্রকৃতির সঙ্গে অনুরূপ সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া মিল সাধন করিতে হইলে আত্মাকে আত্মোপযোগী বিষয়নিচয় নির্ব্বাচন করিয়া লইতে হয়। সুতরাং আমরা এখানে দেখিতেছি, প্রকৃতির সঙ্গে মিল করিতে আত্মতত্ত্বজ্ঞান একান্ত প্রয়োজন।

এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে আমরা বিষয়টি অনায়াসে বুঝিতে পারিব। প্রথমতঃ দেহসম্বন্ধীয় অতিসামান্য বিষয় আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, যে সকল খাদ্য মনুষ্যের আহার্য্য, সে সকল সকল ব্যক্তির সম্বন্ধে সমান নয়। তোমার যাহা তুষ্টি ও পুষ্টিকর, আমার তাহা তুষ্টি ও পুষ্টিকর নয়, বরং বিপরীত। সুতরাং সকল খাদ্যই যে সকলের পক্ষে সমান খাদ্য তাহা নহে, সেখানে আত্মোপযোগিতা অনুসারে নিজ নিজ সম্বন্ধে খাদ্যা খাদ্য স্থির করিয়া লইতে হইবে। দেহের অন্যান্য আরও দশ প্রকার প্রয়োজন আছে, সে সকলও সকলের সম্বন্ধে সমান নয়। দেহের প্রয়োজন আছে, প্রকৃতিতে তাহার উপযোগী সামগ্রীও আছে, অতএব তাহার সম্ভোগ বিধিসিদ্ধ এ প্রকার যুক্তি অবলম্বন করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে মিল করিতে যাওয়া আর নরকের দ্বার খুলিয়া দেওয়া একই কথা। আমাতে বিবেক আছেন, তিনি বলিয়া দিয়া থাকেন, দৈহিক কোন্ কোন্ অভাব কোন্ কোন্ সময়ে কি কি ভাবে পূরণ করিতে হইবে। এখানে বিবেকের সঙ্গে মিল না করিয়া প্রকৃতির সঙ্গে মিল করিব মনে করিলে পাপ অপরাধ বৃদ্ধি হইবে, প্রকৃতি ও প্রকৃতির ঈশ্বরের সঙ্গে কদাপি মিল হইবে না।

যাহা প্রদর্শিত হইল তাহাতে এই প্রতিপন্ন হইতেছে, আত্মাতে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরের নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়া প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ নিবদ্ধ না করিলে প্রকৃতির সহিত মিল হয় না। এরূপ কেন হয় তাহার কারণ সহজে সকলেই বুঝিতে পারেন। প্রকৃতি অতিবিস্তৃত, তাহাতে সহস্র সহস্র জীবের সম্বন্ধোপযোগী বিষয়নিচয় আছে। এই সম্বন্ধ প্রতিজীবসম্বন্ধে ভিন্ন। সেই ভিন্ন সম্বন্ধ স্থির না হইয়া যথেচ্ছাচরণে প্রবৃত্ত হইলে প্রকৃতির সঙ্গে মিল না হইয়া অমিলই হইয়া থাকে। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমে আত্মাতে ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া, তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসরণপূর্ব্বক প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হওয়া, এবং প্রকৃতির ঈশ্বরের ক্রিয়া আত্মসম্বন্ধে এবং পরসম্বন্ধে অবলোকন করিয়া বিস্তৃত প্রকৃতির সঙ্গে বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধে নিবদ্ধ হওয়া প্রকৃত সম্মিলনের ব্যাপার। আমাদিগের একান্ত যত্ন করা প্রয়োজন যে, আমরা সকলে এইরূপে প্রকৃতির সঙ্গে মিলন সাধন করিয়া প্রকৃতির ও আত্মার ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন সাধন করি।

ধর্ম্মতত্ত্ব।

আমাদিগের দেশের যোগিগণ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু দর্শন করিতেন না। "ব্রহ্মদৃষ্টেরুৎকর্ষাৎ" সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন উৎকৃষ্ট, এই বলিয়া তাঁহারা সমুদায় বস্তু ব্রহ্মদৃষ্টিতে অবলোকন করিতেন। এদেশের ভাষা পর্য্যন্ত এই নিয়মের অধীন

হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীনকালের কথা দূরে, অজ্ঞাতসারে আমরাও এমন ভাবে শব্দ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, যাহার মধ্যে সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শননিয়ম অন্তর্ভূত হইয়া গিয়াছে। আমরা গৃহলক্ষ্মীশব্দ ব্যাবহার করিয়া থাকি। এই গৃহলক্ষ্মী শব্দ গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী এবং গৃহিণী উভয়ই বুঝায়। এখন দেখা যাউক, এরূপে শব্দপ্রয়োগ সদোষ কি নির্দ্দোষ। বিচার করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায়, অধিকারী ভেদে ঈদৃশ ব্যবহার সদোষ নির্দ্দোষ উভয়ই বলা যাইতে পারে। যিনি গৃহের সমুদায় সামগ্রীতে ব্রহ্মকে অবিভূর্ত দর্শন করেন, তিনি গৃহস্বামিনীতে লক্ষ্মীকে আবির্ভূত দর্শন করিবেন, ইহা কিছু আশ্চর্য্য নয়, এবং এরূপ দর্শন না করা অপবিত্রতার দ্যোতক। অন্য দিকে পৃথিবীতে যদি লক্ষ্মী সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিরাজ না করিলেন, তবে সে গৃহ লক্ষ্মীহীন বলিয়া অবশ্য পরিগণিত হইবে। গৃহস্থপত্নী আপনার আচার ব্যবহার চরিত্রাদিতে সর্ব্বদা লক্ষ্মীর আবির্ভাবের লক্ষণ সকল প্রকাশ করিবেন। ইনি যে কোন কার্য্যই করুন না কেন লক্ষ্মীর প্রেরণায় সমুদায় নিষ্পন্ন করিতেছেন, ইহাই তাঁহার জীবনে লক্ষিত হইবে। তাঁহাতে লক্ষ্মীর আবির্ভাব যোগনয়নে যে দেখিবে, সেই কৃতার্থ হইবে। সে গৃহের সন্তান সন্ততিগণ সেই আবির্ভাবগুণে বিনীত নীতিসম্পন্ন ও ধর্ম্মভীত হইবে। তাহাদিগের জীবনে কখন পিতা মাতার শোক করিবার কিছু থাকিবে না। কি পুরুষ, কি নারী সকলে আপনাদের জীবন এইরূপে নিয়মিত করিতে বাধ্য যে, তাঁহারা চরিত্র দ্বারা ঈশ্বরকে আচ্ছাদন করিবেন না, কিন্তু তাঁহার প্রকাশের স্থল হইবেন। এই তো গেল মানব ও ঈশ্বর উভয়দ্যোতক শব্দব্যবহারের নির্দ্দোষপক্ষ। সদোষপক্ষ বিচার করিতে গেলে বলিতে হয় যে, ঈদৃশ শব্দব্যবহার অনধিকারিগণের হস্তে পড়িয়া অত্যন্ত পাপবৃদ্ধি করিয়াছে। যাঁহারা পঞ্জাব দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি স্থলে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা বলিতে পারেন, ব্রহ্মের সহিত অভিন্নতাদ্যোতক শাস্ত্র সেই সেই দেশের কি সর্ব্বনাশ করিয়াছে। এক জন সামান্য নিরক্ষর দুষ্কর্ম্মনিরত অশ্বপাল বলিতেছে 'আমি ব্রহ্ম,' এতদপেক্ষা আর কি ভয়ানক হইতে পারে। অথচ শব্দব্যবহারের এমনই মোহিনী শক্তি যে, উহা অধিকারী অনধিকারী এ চিন্তা মনে রাখিতে দেয় না। ইহাতে ফল এই যে, মুখে অতি উচ্চ কথা উচ্চারিত হয়, অথচ জীবন অতি জঘন্য ভাব প্রদর্শন করে। আমরা সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনের পক্ষপাতী এবং তদ্ভিন্ন শান্তি নাই, সুখ নাই, পরিত্রাণ নাই, ইহা আমরা হৃদয়ের সহিত বিশ্বাস করি। আমাদের মত এই যে, কোন শব্দ ব্যবহার যেন আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া না যায়। যত দিন এক জন যে অবস্থাপন্ন, শব্দ যেন তাহার মুখে সেই অবস্থা জ্ঞাপন করে, তদপেক্ষা আর কিছু বুঝাইতে যেন উহা প্রযুক্ত না হয়।

"স্বর্গের শাস্ত্রে ক্ষমা নাই" এ কথা শুনিতে আপাততঃ আশঙ্কা হয়, তবে বুঝি আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া অনন্ত নরকের মত আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বর্গে যদি ক্ষমার শাস্ত্র নাই, তবে সর্ব্বদেশীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে ক্ষমার এত প্রশংসা কেন? ক্ষমা করিবার জন্য এত উপদেশ আদেশ কেন? "স্বর্গের শাস্ত্রে ক্ষমা নাই" এ সত্যের তাৎপর্য্য ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলে আর এ সমুদায় বিতর্ক মনে স্থান পায় না। প্রথমতঃ দেখিতে হইতেছে, সর্ব্বশাস্ত্রে কোন্ সময়ে ক্ষমা উপদিষ্ট হইয়াছে, এবং কাহাদিগের প্রতি ক্ষমা উপদিষ্ট হইয়াছে। ক্ষমাশব্দের মূল অর্থ অপরাধীর অপরাধ সহ্য করা। ক্ষাত্র যুগে লোকে অপরাধ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিত না। যে ব্যক্তি সহ্য করিত, তাহাকে লোকে কাপুরুষ ভীরু বলিয়া উপহাস করিত। যখন এই প্রকার অপরাধাসহিষ্ণুতায় জনসমাজ ঘোর বিপ্লবাধীন হইয়া পড়িল, তখন স্বর্গ হইতে ক্ষমার শাস্ত্র পৃথিবীতে অবতরণ করিল। ক্ষমা একটি ভাবপক্ষের গুণ নহে, অভাবপক্ষের। অভাবপক্ষটি যত দিন স্বাভাবিক না হয়, তত দিন ভাবপক্ষের অবতরণ হয় না। ক্রমে যখন ক্ষাত্র যুগের অবসান, এবং অপরাধীর প্রতি অসহিষ্ণুভাবের অপগম হইতে লাগিল, তখন স্বর্গ হইতে ভাবপক্ষের শাস্ত্র প্রেম অবতরণ করিল। পৃথিবীতে সকল সময়ে সকল অবস্থারই লোক থাকে। এখন যে ক্ষাত্র যুগ একেবারে চলিয়া গিয়াছে তাহা নহে। যাহাদিগের উপরে এখনও ক্ষাত্র যুগের কার্য্য চলিতেছে, তাহাদিগের পক্ষে এখনও ক্ষমার শাস্ত্র যেমন তেমনই আছে, কিন্তু যাঁহারা সহস্র নিপীড়নে নিপীড়িত হইয়াও অপরাধীর প্রতি মিত্রভাবাপন্ন থাকেন, তাঁহারা ক্ষমার শাস্ত্র অতিক্রম করিয়া প্রেমের শাস্ত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। এখানে ক্ষমাশাস্ত্রের প্রয়োগ হয় না এই জন্য যে, তাঁহারা সহনশীলতা অতিক্রম করিয়া মিত্রভাবে গিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছেন। যদি মানুষের সম্বন্ধে এই কথা হইল, তবে ভগবানের সম্বন্ধে এই কথা অনন্তগুণে ঠিক হইবে, সুতরাং "স্বর্গে ক্ষমার শাস্ত্র নাই" অর্থাৎ ঈশ্বর ক্ষমা বা দোষসহনশীলতার অতীত। এখন কথা হইতেছে, তবে কি অপরাধী অনন্তনরক ভোগ করিবে? যেখানে ঈশ্বরের অনন্ত প্রেম লইয়া কথা, সেখানে অনন্ত নরকের কথা উঠিতেই পারে না। অনন্ত প্রেমের বিরোধে পাপ করিয়া অপরাধী কত দিন অনুতাপ না করিয়া থাকিতে পারে? অনুতাপ করিলেই, তাহার হৃদয়ের মালিন্য বিদূরিত হইল, অপরাধজন্য চক্ষের সম্মুখে একটি যে অন্ধকারের আবরণ পড়িয়াছিল, তাহা সেই উত্তাপে বাষ্পবৎ বিলীন হইয়া গেল, আবার পাপী

সম্মুখে অনন্তপ্রেম ঈশ্বরকে দেখিল, তাহার প্রাণ সুশীতল, সুস্থির, শান্ত হইল। "স্বর্গের শান্তের ক্ষমা নাই" এই কয়েকটী কথার মধ্যে এত গুলি কথা নিবিষ্ট আছে।

প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৩০ শে পৌষ, রবিবার।

সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন; এবং শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপ মজুমদার, শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত বাবু অঘোর নাথ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সেন, শ্রীযুক্ত বাবু গৌরগোবিন্দ রায় উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার প্রস্তাব করেন, কোন্ কোন্ বিষয়ে মতের ঐক্য থাকিবে, কোন্ কোন্ বিষয়ে ব্যক্তিবিশেষের ভিন্নতা থাকিবে নির্দ্ধারণ হউক।

শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত বলেন, পূর্ব্বে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল ক্ষুদ্র হউক অক্ষুদ্র হউক সকল বিষয়ই এই সভায় নির্দ্ধারিত হইবে। শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু বলেন, সভায় পাঁচ জন একমত পাঁচ জন অন্যমত হইলে, বিভিন্ন মত এক করিয়া লইতে হইবেই। শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন বলেন, এখানে যাহা স্থির হইবে তাহা সকলকে মানিতে হইবে এ নির্দ্ধারণ অন্যমত করিবার কোন কারণ নাই। তবে কোন্ বিষয় সভার নির্দ্ধারণার্থ গৃহীত হইবে, কোন্ বিষয় হইবে না, তাহাও সভার দ্বারা নির্ণীত হইবে। এরূপ করিবার কারণ এই যে, যে স্থলে স্বাধীন প্রণালীতে কার্য্য হইতেছে, সেখানে বুদ্ধি এবং অবস্থাদি অনুসারে ভিন্নতা হইবেই। কিন্তু এ সকল ভিন্নতার মধ্যেও মূলে একতা থাকিবে; প্রণালীতেও (plan) সকলে এক হইবেন। সকলে একত্র হইয়া কার্য্য করিলে পরস্পরকে না বুঝার জন্য যে ভিন্নতা স্থলে ঐক্য করা অসম্ভব হয়, তাহাও বিদূরিত হইতে পারে।

শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু জিজ্ঞাসা করিলেন, সে দিবস শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার যে বলিয়াছিলেন, মতের একতা না হইলে, তিনি (wait) অপেক্ষা করিবেন, এ কথার অর্থ কি? ইহাতে শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বলিলেন, পূর্ব্বে যাহা বলা হইল, তাহাতেই সে কথার মীমাংসা হইয়া গেল। যাহা সভার আলোচনীয় হইবে না, তাহাতো সভাতে গৃহীত হইবেই না। যাহা সভার আলোচ্য বলিয়া স্থির হইল, তৎসম্বন্ধে সভা যাহা নির্দ্ধারণ করিবেন, তদনুসারে সকলকে কার্য্য করিতেই হইবে। কিন্তু পূর্ব্বে যে নির্দ্ধারিত হইয়াছে সভাপতির মত সকলের মতাপেক্ষা সমাদরণীয় তৎসম্বন্ধে এই বক্তব্য যে, যে কোন বিষয় সভাপতির মতের সহিত এক হইবে না, তাহা সম্মিলনের জন্য পুনরালোচিত হইবে।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন সর্ব্বশেষে নির্দ্ধারণ করিলেন যে, সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিয়া একতা রক্ষা করিতেই হইবে, অধিকাংশের মত, কি সভাপতির মত এ সকলের প্রাধান্যের প্রয়োজন নাই। এক শরীরের অঙ্গের ন্যায় প্রতিজনকে মানিতে হইবে। ইহাতেই এক অঙ্গ অন্য অঙ্গের বিরোধী কখন থাকিতে পারে না। অধিকাংশের মত লইয়া কার্য্য করিলে এই দোষ থাকিয়া যাইবে। সুতরাং যে পর্য্যন্ত সকলে একমত না হন, সে পর্য্যন্ত প্রয়াস প্রযত্ন দ্বারা এক করিতে হইবে। এইরূপে একতায় যাহা নির্দ্ধারণ হয়, কোন কথা না বলিয়া সকলে তাহার অনুসরণ করিবেন।

নির্দ্ধারণ—এই সভার সভ্যেরা এক শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের ন্যায় মূলে একতা রক্ষা করিয়া কর্ম্ম করিবেন।

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়।
সম্পাদক

৭ই মাঘ।

প্রচারকগণকে কেহ কিছু দিলে উহা প্রচার কার্য্যালয়ে অর্পণ করিতে হইবে এতৎসম্বন্ধে সমালোচনা হইয়া নির্দ্ধারণ হইল যে, প্রচারককে দান কেহ শুদ্ধ প্রচারসম্বন্ধ লইয়া অর্পণ করেন, কেহ সেই ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া দান করিয়া থাকেন। এ দান তাঁহার তাৎকালিক অভাবপরিপূরণার্থই অর্পিত হইয়া থাকে, সুতরাং প্রচারকার্য্যালয়ে প্রেরণ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে দানের বিষয়ে দাতার স্পষ্ট অভিপ্রায় জানা যায় না এবং সাধারণতঃ প্রচারসম্বন্ধ লইয়া দান প্রতীত হয়, তাহা প্রচারকার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ দাতার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তদনুসারে তাহা ব্যয়িত হইবে।

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়।
সম্পাদক

১৭ই মাঘ।

আশ্রমের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণান্তর নির্দ্ধারিত হয় যে,

১ নির্দ্ধারণ—প্রতি বৎসর ১১ মাঘের পর সমুদায় প্রচার কার্য্য নির্দ্ধারিত হইবে।

২ নির্দ্ধারণ—প্রতিদিন অন্যূন ২ ঘণ্টা প্রতিজন প্রচারের কার্য্য করিবেন।

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়।
সম্পাদক

---

২২ মাঘ, সোমবার,

এইরূপে কার্য্যবিভাগ হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ধর্ম্মতত্ত্ব সম্পাদন করিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কেশবচন্দ্র সেন "Theological School" এ শিক্ষা দান করিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার 'ব্রাহ্মবন্ধু সভা' এবং 'সঙ্গতের' কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্র যন্ত্রের ভার গ্রহণ করিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ বসু এক সপ্তাহের মধ্যে আয় ব্যয়াদির হিসাব তাঁহার নিকটে অর্পণ করিবেন।

শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার সেন 'শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের' আয়াদির কার্য্য করিবেন।

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়।
সম্পাদক

---

২৯ শে মাঘ, সোমবার,

শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত পীড়িত, তাঁহাকে অবসর প্রদান করতঃ অন্য কাহার উপর আশ্রমের ভার দেওয়া আবশ্যক। অতএব আশ্রমের আয়ব্যয়াদি সমুদায় নির্দ্ধারিত হইয়া তৎসম্বন্ধে বিবরণ অর্পণ করিবার ভার শ্রীযুক্ত বাবু উমানাথ গুপ্ত এবং শ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মিত্রের উপরে অর্পিত হয়।

আগামী বুধবার বৈকালে ৫ টার সময় আশ্রমসম্বন্ধে বিশেষ সভা হইবে।

১। নির্দ্ধারণ:—যেখানে শ্রাদ্ধ হইবে, কেহ আহারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন না।

২। নির্দ্ধারণ:—আইনে যে বয়স নির্দ্ধারিত আছে, তাহার ন্যূন বয়সে কেহ বিবাহ দিবেন না।

৩। নির্দ্ধারণ:—যিনি এখান হইতে কোন প্রচারক চাহিবেন, পূর্ব্বে তাঁহাকে তাহা জানাইতে হইবে।

৪। নির্দ্ধারণ:—শ্লোকসংগ্রহ অসম্পন্ন অবস্থায় না রাখিয়া শ্রীযুক্ত বাবু অঘোরনাথ গুপ্ত উহা যাহাতে বাহির হয় তদ্বিষয়ে যত্ন করিবেন।

শ্রীগৌরগোবিন্দ রায়।
সম্পাদক

আচার্য্যের উপদেশের সার।

চন্দননগর ব্রাহ্মসমাজ।

রবিবার ১৭ কার্ত্তিক, ১৮০১ শক।

আমরা তোমাদিগের নিকট হরিপ্রেমের কথা বলিতে আসিয়াছি। আমাদের আর কোন অভিপ্রায় নাই। তোমরা যদি শুন আমাদের প্রাণে কত আহ্লাদ হইবে। তোমাদের ন্যায় আমরাও দুঃখী। আমরা অনেক পাপের জ্বালা সহ্য করিয়া এখন রোগের ঔষধ পাইয়াছি। দুর্গতিহারিণী জগজ্জননী আমাদিগের দুর্গতি হরণ করিবার জন্য ব্যস্ত তোমাদিগকে এই বলিতে আসিয়াছি। আজ এই সহরে কেমন উৎসাহ, কেমন মত্ততা হইল দেখিলেত। দেখ ঈশ্বরের প্রেমের একটী কথা বলিলে সহর টলিতে থাকে। এমন প্রেমময় হরিকে ভুলিয়া কত নরনারী অধর্ম্মপথে গিয়া নরকে ডুবিতেছে। কবে হে হরি, তোমার সুখের সংবাদ এই দেশ শুনিবে? এত ডাকিতেছেন মা, তবু বঙ্গদেশ ঘুমাইতেছে। বন্ধুগণ, তোমরা মার কথা শুন, হরিনাম তত্ত্ব সাধন কর। এই নামৌষধ সেবনের অনেক গুণ। ইহাতে সমস্ত পাপবিকার চলিয়া যাইবে। এই ঔষধ সেবন করিলে রক্ত পরিষ্কার ও সতেজ হইবে। আবার যৌবনকালের পূর্ণ হাস্য দেখা দিবে, আনন্দের চন্দ্র উদিত হইবে। দিনের মধ্যে অন্ততঃ একবার প্রাণ ভরিয়া মাকে ডাক। মাকে ভক্তি করিলে, মাকে দেখিলে মনের ভিতরে পুলক এবং আনন্দ হইবে। সুখের খবর দিলাম, ইহা শুনিয়াও কি তোমরা দুঃখের অন্ধকারে থাকিবে? ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া নববিধান প্রেরণ করিয়াছেন। যাঁহারা এই বিধানের অনুসরণ করিবেন তাঁহারা পবিত্র এবং অত্যন্ত সুখী হইবেন। সকলে হরির আমোদে মত্ত হও। মা যেমন তাঁহার ছোট ছোট সন্তানগুলিকে হাতে ধরিয়া লইয়া বেড়ান, তেমনি ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি ঈশ্বর আমাদের হাত ধরিয়া লইয়া বেড়াইবেন। প্রসন্নবদন হরি সকলকে আপনার পবিত্র আনন্দ দিয়া পবিত্র ও সুখী করুন।

জগদ্দল, সোমবার, ১৮ই কার্ত্তিক, ১৮০১ শক।

(আচার্য্যের বক্তৃতার সার।)

বন্ধুগণ, কত লোক কত অভিপ্রায়ে গ্রামে গ্রামে ফিরিতেছে, আমরাও এক অভিপ্রায়ে তোমাদের গ্রামে আসিলাম। চারি দিকে লোকসকল মায়াপাশে বদ্ধ হইয়া হাহাকার করিতেছে। এই সময় এমন কি কেহ নাই, যাহারা দীন দুঃখী এবং অনুতপ্ত ও পরদুঃখে দুঃখী হইয়া কেবল ঈশ্বরের নাম শুনাইবে। এই সময় কেবল ভদ্রলোকের মত বক্তৃতা করিলে চলিবে না। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে এই দেশের আকাশ হরিধ্বনিতে পূর্ণ হইত। হরিভক্ত চৈতন্যদেব উন্মত্ত হস্তীর ন্যায় প্রমত্ত দল সঙ্গে লইয়া গ্রামে গ্রামে হরিসংকীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার ন্যায় জীবের প্রতি দয়া করিবে কে? এমন সকল ভক্তির ব্যাপার যে দেশে হইয়াছে, সেই দেশ কি এমন নীচ হইয়া থাকিবে? বড় ঘরের ছেলে হইয়া তোমরা কি পাপ

পিতামহের নাম ডুবাইবে? সেই চৈতন্য মহাপ্রভুর সময় কত লোক এই গঙ্গার দুই ধারে দাঁড়াইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন; হরিনামে গড়াইতেন। হরি হরি বলিতে বলিতে তাঁহাদের দুচক্ষে ধারা বহিত; বঙ্গদেশের শুভ দিন আবার আসিতেছে, ভক্তির শাস্ত্র আবার কাণে আসিতেছে। পঞ্চাশ কোটি হরিদাস জন্ম গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরের প্রেমের পরিচয় দিবে। যখন পৃথিবী হাহাকার করিল তখন চৈতন্যের চক্ষে জল পড়িল। তাঁহার হৃদয় দয়ার মহা সমুদ্র ছিল। তিনি আপনার স্ত্রী পুত্র সংসার ছাড়িয়া জীবের সেবায় নিযুক্ত হইলেন। দেশীয় বন্ধুগণ, তোমাদিগকে আমি সংসার ছাড়িতে বলিতেছি না, কিন্তু সংসারের সকলকে হরিভক্ত করিয়া সংসারের ভিতরে বৈকুণ্ঠধাম রচনা কর। অন্নে হরি, বস্ত্রে হরি, গৃহপরিজনে হরি, হরি সর্ব্বত্র। হরিকে ভুলিয়া যদি আমি কোন বস্তু ব্যবহার করি, চোর আমি। হরিকে না বলিয়া আমি হরির জিনিষ চুরী করিব? হরি আশীর্ব্বাদ করুন যেন হরিকে সংসারে এবং সর্ব্বত্র দেখিয়া আমরা শুদ্ধ এবং সুখী হই।

গোরক্ষনাথ।

মীননামক জনৈক পরিব্রাজকের গোরক্ষনামা শিষ্য ছিলেন। একদা তাঁহারা ভ্রমণ করিতে করিতে এমন এক রাজার রাজ্যে আসিয়া পঁহুছিলেন যে রাজা সম্পূর্ণ বিষয়ী, ধর্ম্ম বা পরকাল একেবারে বিস্মৃত হইয়া কেবল রাজকার্য্যে ও নিজ সুখসম্ভোগে দিবারাত্রি ব্যস্ত। গুরু শিষ্যকে বলিলেন, বাছা আমরা এই রাজার নিকট কিছু দিন বাস করিয়া ইঁহাকে ধর্ম্মপথে আনিবার চেষ্টা করি। তদুত্তরে গোরক্ষনাথ বলিলেন, এ প্রকার ধর্ম্মহীন রাজার সহিত বাস করিলে উহার অপবিত্র বায়ুস্পর্শে আমাদের পর্য্যন্ত অমঙ্গল হইবে, অতএব এখন হইতে শীঘ্র পলায়ন করাই উচিত। গুরু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তোমার মনে এখনও সম্যক বল হয় নাই তাই এ আশঙ্কা করিতেছ, মনুষ্যের উপকার করাই পরিব্রাজকব্রতের উদ্দেশ্য। কেবল ভ্রমণ করিলে কি ফল হইবে? উহার সংসর্গে যদি অনিষ্টই হয়, তবে এত কাল কি সাধন ভজন করিলে? শিষ্য প্রত্যুত্তর করিলেন না, কিন্তু তাঁহার মন গুরুর মতে কোন মতেই সায় দিতে পারিল না। গুরু রাজসভায় আসন গ্রহণ করিয়া রাজার সহিত ক্রমে এমন আত্মীয়তা করিয়া লইলেন যে, রাজা এক দণ্ডও তাঁহাকে অন্তরে রাখেন না। শিষ্য সে দিকে বড় অগ্রসর হন না। ক্রমে গুরুর ভাব পরিবর্ত্তন হইতেছে বুঝিতে পারিয়া তথা হইতে পলায়ন করিলেন। মীন দিন দিন উচ্চতর রাজসম্মান লাভ করিতে লাগিলেন, বিবিধপ্রকার আমোদ প্রমোদ নৃত্যগীত, এমন কি দ্যূত ক্রীড়ায় পর্য্যন্ত রাজার সহিত যোগ দিতে আরম্ভ করিলেন। কিছু দিন পরে রাজা আপনার একমাত্র কন্যার সহিত মীনের বিবাহ দিয়া তাঁহাকেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী করিয়া পরলোক গমন করিলেন। গুরু মীন এখন রাজা। প্রজাশাসন ও আমোদ প্রমোদে এত ব্যস্ত যে ধর্ম্ম কর্ম্মের আর তাঁহার সময় নাই। ক্রমে তিনি সে সকল বিস্মৃত হইয়া গেলেন, সামান্য কর্ত্তব্য মনে হওয়ায় সে সমস্ত পরিত্যক্ত হইল।

কিছুকাল পরে শিষ্য গোরক্ষনাথ গুরুর অবস্থা কিরূপ হইয়াছে দেখিবার জন্য তথায় আসিয়া প্রবেশ করিলেন, গুরুদেব এখন এদেশের রাজেশ্বর। ভিতরে প্রবেশ করিতে যান, দ্বারীরা বাধা দেয়। অনেক কৌশলে গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখেন, তাঁহার সে বেশও নাই, সে মূর্ত্তিও নাই, সে ভাবও নাই, আলাপাদি হইল বটে, কিন্তু সাংসারিক ভাবে। গোরক্ষনাথ গুরুর অবস্থা দেখিয়া মনে অত্যন্ত বেদনা প্রাপ্ত হইলেন, অথচ গুরুমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না। এক দিন নবভূপতির অবকাশ কালে উপস্থিত হইয়া কৌশলক্রমে বলিলেন, "গুরো! অনেক দিন আপনার সহবাসে বঞ্চিত হইয়া বিশেষ কষ্ট পাইয়াছি, আপনি যে সমস্ত অমূল্য তত্ত্ব আমাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্ববৎ আমার স্মরণে আছে কি না আপনাকে এক বার দয়া করিয়া শ্রবণ করিতে হইবে, যে যে স্থানে ভ্রম হইবে, কৃপা করিয়া সংশোধন করিয়া দিলে কৃতার্থ হইব।" এই বলিয়া, জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, সাধন, বৈরাগ্য, কর্ম্ম ইত্যাদি সমস্ত তত্ত্ব একে একে বর্ণন করিতে লাগিলেন। এই প্রস্তাবেই প্রথমতঃ গুরুর অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হইয়াছিল, অথচ পূর্ব্ব গৌরব বজায় রাখিবার জন্য নিবারণ করিতে পারিলেন না। শিষ্যমুখে তত্ত্বকথা যতই শুনিতে লাগিলেন ততই তাঁহার হৃদয়ে অগ্নি জ্বলিতে লাগিল। ক্রমে সেই অগ্নিসংযোগে তাঁহার পূর্ব্ব সাধনবলে সমস্ত আসক্তি দগ্ধ হইয়া গেল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "বৎস, গোরক্ষনাথ তোমাকে শিষ্য করিয়া আমি কৃতার্থ হইয়াছি। পুত্র যেমন বৃদ্ধ পিতাকে অন্ন দিয়া প্রাণ রক্ষা করে, আজ তুমি আমার তেমনি উপকার করিলে, এক্ষণে আমার কি কর্ত্তব্য তাহা বল।" এ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন কর্ত্তব্য, এই কথা শ্রবণমাত্র তিনি রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া শিষ্য সহ বাহির হইলেন। তাঁহার পৃষ্ঠে একটি থলিয়া দেখিয়া গোরক্ষনাথ বলিলেন, "গুরুদেব! শিষ্য রিক্ত হস্তে এবং গুরু ভার বহন করিতেছেন, ইহা ধর্ম্মতঃ অযৌক্তিক, অতএব উহা আমার মস্তকে অর্পণ করুন।" এই বলিয়া লইয়া দেখিলেন যে, তাহা মণিমুক্তা হীরকাদিতে পূর্ণ। ইহারাই আমার গুরুকে এত কষ্ট দিয়াছে এবং এখনও পরিত্যাগ করে নাই, মনে মনে এই বলিয়া তাহাদি-

দের এক একমুষ্টি লইতেছেন আর এদিক ওদিকের জঙ্গলে ছড়াইয়া ফেলিতেছেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে গুরু পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন থলিয়া প্রায় শূন্য, তদ্বিবরণ জিজ্ঞাসামাত্র গোরক্ষনাথ অবশিষ্ট গুলিকে নিকটস্থ জলাশয়ে নিক্ষেপ করিলেন। এতদ্দর্শনে গুরু মহাশোকে হায় হায়! কি করিলে বলিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, এ শক্ত গুলকে কেন সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন, আহা দেখুন দেখি আপনার হৃদয়ে কি ভীষণ বেদনা অর্পণ করিল।" গুরু বলিলেন, গোরক্ষনাথ, তুমি আমার সহিত উপহাস করিতেছ। পথে যদি অর্থাভাব হয়, তজ্জন্যই কিছু বহুমূল্য বস্তু লইয়াছিলাম, কেন উহাদিগকে অনাদরে নিক্ষেপ করিলে?" শিষ্য উত্তর করিলেন, "মহাশয়, এই ধনরত্নপূর্ণ বিশ্বের একমাত্র অধিপতিকে হৃদয়মন্দিরে আবদ্ধ রাখিয়াও যদি আপনার ধনকষ্ট হয়, তাহা হইলে এই কয়টা ধনে কি উপকার করিবে?" গুরু অধিকতর দুঃখের সহিত বলিলেন, "তুমি কখন এ সব বস্তু দেখ নাই, সুতরাং উহাদের মূল্য ও মর্য্যাদা কি বুঝিবে? চাকচক্য দেখিয়াও কি উহাদের মূল্য বুঝিতে পারিলে না?" তখন গোরক্ষনাথ আর থাকিতে পারিলেন না। অপূর্ব্ব ঘৃণিত বৈরাগ্যধর্ম্মের চিহ্নগুলির প্রতি গুরুর এখনও এত আসক্তি দেখিয়া অতিকুৎসিত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, "গুরুদেব, ক্ষমা করিবেন। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, মুক্তার কোনগুলি কি মুক্তা অপেক্ষা স্বচ্ছ নহে? মুক্তার বুদ্বুদোপরি সূর্য্যরশ্মি পতিত হইলে কি হীরকাদি অপেক্ষা সৌন্দর্য্য ধারণ করে না? তবে সে গুলির মূল্য কিসে অধিক হইবে আমি বুঝিতে পারিতেছি না।"

শিষ্যের এ প্রকার অনাসক্তি দেখিয়া মীনের জ্ঞানোদয় হইল। তিনি গোরক্ষনাথকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বৎস, আজ আমাকে তুমি বাঁচাইলে, আজ হইতে তুমি আমার গুরু উপযুক্ত হইলে।" এই বলিয়া উভয়ে আনন্দে হরিগুণ গান করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

প্রচার বৃত্তান্ত।

বাঁকিপুরস্থ ভাই দীননাথ মজুমদার হইতে প্রাপ্ত।

সম্প্রতি কিছু দিন হইল ছাপরায় গিয়াছিলাম। সেখানে ব্রাহ্মসমাজ নাই। শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা তথাকার জেলাস্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক, শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, বারিষ্টার শ্রীমান্ রাধিকাপ্রসাদ ঘোষের গৃহে ৬ ৭টি উপাসকের সঙ্গে যে সাপ্তাহিক উপাসনা করিতেন, তাঁহার স্থানান্তর গমনাবধি তাহা বন্ধ হইয়াছে। আমার তথায় অবস্থান কালের মধ্যে দুই দিন সাপ্তাহিক উপাসনা প্রকাশ্যরূপে হইয়াছিল, তাহাতে কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক যোগ দিয়াছিলেন। দৈনিক পারিবারিক উপাসনাতেও সময়ে সময়ে কোন কোন ভদ্র জন যোগ দিয়াছিলেন। তিন চারিটি সুশিক্ষিত উচ্চপদস্থ যুবার সঙ্গে উপাসনা, সৎপ্রসঙ্গ, ব্রহ্মসঙ্গীত ও ভোজনাদি যোগে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল, এবং দিন দিন তাঁহাদেরও কিছু আস্থা দেখা গিয়াছিল। তন্মধ্যে জনৈক শোকসন্তপ্ত জনের অন্তরে কিছু শান্তিসঞ্চারের সংবাদ ও তাঁহার প্রেরিত একখানি আসন উপহাররূপে উপস্থিত হইলে মঙ্গলময় ঈশ্বরের মাতৃভাব নিজ অন্তরে দৃঢ়ীভূত হইল। সেবার চরিতার্থতা প্রাণকে প্রশস্ত প্রেমের পথে কিছু অগ্রসর করিল।

খগোল। এখানে পূর্ব্বতন ব্রাহ্মনিকেতনবাসী জনৈক যুবার গৃহে কয়দিন বাস করিয়াছিলাম। দৈনিক পারিবারিক উপাসনা, ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ও সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন যোগে তাঁহার সঙ্গে কিছু নিকট যোগ হইল। উপাসনাতত্ত্ব ও কর্ম্মযোগবিষয়ে তাঁহার অন্তর আকৃষ্ট হইল, উপস্থিত অপর দুই এক জনের সঙ্গেও সহানুভূতির সঞ্চার হইল।

গাজিপুর। শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা নিত্যগোপাল বাবু উকীলের নিমন্ত্রণে তাঁহার নবগৃহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে তথায় গিয়াছিলাম। বার তের দিন যাবৎ সেখানে ছিলাম। সামাজিক উপাসনা, পারিবারিক উপাসনা, গৃহপ্রতিষ্ঠোপলক্ষে উপাসনাদি দ্বারা গার্হস্থ্য বৈরাগ্যবিষয়ে কয় দিন সাধন হইল। নগরপ্রান্তস্থ ভক্তযোগী পয়াহারী বাবা শ্রীমৎ রামভজন দাসের ভক্তি ও বৈরাগ্যের সদাদর্শ লক্ষ্য করিয়া সাধনাদি এবং কয়েক দিন তাঁহার সঙ্গে সদালাপ যোগ ও ভক্তিতত্ত্ব প্রসঙ্গ, ভজন ও উপাসনা এবং আশ্রমপ্রাঙ্গণে রন্ধন ভোজনাদি হইল। যোগি সহযোগে অন্তরে যোগপিপাসা বৃদ্ধি হইল।

ডিহিরি। এখানে তিন দিন ছিলাম। সঙ্গে দুইটি কৃতবিদ্য সম্ভ্রান্ত বন্ধু ছিলেন। প্রতিদিন উপাসনায় স্থানীয় ভদ্রলোক দুই এক জন উপস্থিত থাকিতেন। এক দিন প্রকাশ্যরূপ সঙ্গীত সঙ্কীর্ত্তন ও প্রার্থনাদি হইয়াছিল। স্থানীয় প্রায় সকল বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন। 'ব্রহ্মলাভে জগৎ লাভ হয়' এই বিষয় শ্রোতৃগণের অন্তর্নিবিষ্ট করিতে চেষ্টা করা হইল। অ্যাকাউণ্টেণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীপতি সরকার, অ্যাসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন্ শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন, এবং ওভারসিয়ার শ্রীযুক্ত শ্রীগোপাল বসু অতি আদর যত্ন ও প্রকৃষ্ট আয়োজনের সহিত নিজ নিজ গৃহে আহার দান করিয়া বিশেষ সহানুভূতি প্রেম স্থাপন করিলেন। সপরিবার শ্রীপতি বাবুর সদ্ব্যবহার, নিঃস্বার্থ অনুকরণীয় প্রেম ও সৌজন্য নিজ হৃদয়কে সুপুষ্ট করিল। সাসারাম, চৌরা, ও ষ্টিমারে সহযাত্রী জনৈক বেহারী সবডিপুটী প্রভৃতি কয়েক জন অপরিচিত ভদ্রলোকের এবং আরা ও বক্সারের দুই

পরিচিত লোকের উপর আহিলা প্রেমময় ঈশ্বরের বিচিত্র প্রেমের লীলা দেখাইয়াছিল। বিধাতা জননীরূপে বিশ্বাস পথের যাত্রীক যে কি অদ্ভুতরূপে প্রতিপালন করেন, পরকে আপন করাইয়া আপনাকে পরের করিয়া দেন, এবং তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার কার্য্য করিতে চেষ্টা করিলে যে অযাচিতরূপে জীবনের প্রচুর অভাব পূর্ণ হয়, তাহা দিন দিন কার্য্যক্ষেত্রে অতিস্পষ্টরূপে তিনি দেখাইতেছেন।

পরে কয় দিন যাবৎ প্রচারাশ্রমসমাগত বিদেশীয় বন্ধু-বান্ধবের অতিথিসৎকার ও তাঁহাদের সঙ্গে একত্র সপরিবারে ব্রহ্মোপাসনা করিয়া জননীর বিচিত্র লীলা প্রত্যক্ষ করা গেল। তাঁহাকে পেলে সকল মেলে, এবং মায়ের বাক্যে মায়া স্থান পায় না এ সত্য বিশেষরূপে উপলব্ধ হইয়া ভিক্ষুপরি-বারকে দৃঢ়হৃদয় করিল। গত দুই মাস এই রূপে জীবনা-তিবাহিত হইল।

সংবাদ।

ভাই প্রাণকৃষ্ণ দত্ত কোচবিহার হইতে লিখিয়াছেন যে, "সর্ব্বশক্তিমান তাঁহার লীলাভূমিতে আশ্চর্য্য কার্য্য করিতে-ছেন দেখিয়া অবাক্ হইতেছি। বন্ধের সময়ে কলেজ ও বিদ্যালয়ের কয়েকটি ছাত্র রীতিমত যোগ দান করিয়া প্রাতঃকালে উপাসনা করিতেছে ও পূজার চারি দিন প্রাত্য-হিক উপাসনায় বেশ লোক হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত বাবু হরি-মোহন চট্টোপাধ্যায়ের চতুর্থ পুত্রের নামকরণ অদ্য প্রাতে নবসংহিতামতে সম্পন্ন হইল। শিশুর নাম প্রভাকর চট্টোপাধ্যায় হইয়াছে। প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রিতে ইহাঁর বাসায় উপাসনা বেশ জমাট হইতেছে, অনেক ভদ্র-পরিবার আসিয়া থাকেন। মন্দিরে এত মেয়ে আসিতেছেন যে, এক দিকের গ্যালারিতে আর স্থান হয় না। অদ্য চেয়ারের পরিবর্ত্তে তথায় বিছানা পাতিয়া দেওয়া হইয়া-ছিল। মেয়েদের ভিতর বেশ আগ্রহ দেখা যাইতেছে। হরি বাবুর বাসায় উপাসনা দুই ঘণ্টা হয়, তাহাতেও সেখানকার মেয়েরা বলেন, এত শীঘ্র কেন ভাঙ্গিয়া যায়? এই সকল ব্যাপারের ভিতর শ্রীহরি নিজে কাজ করিতেছেন না ত কে করিতেছেন? আজ শারদীয় পূর্ণিমা উপলক্ষে রাত্রিতে মন্দিরে বিশেষ উপাসনা হইয়াছে। উপাসনা বেশ জমাট হইয়াছিল, লোক খুব হইয়াছিল।

ত্রিহুত প্রদেশের অন্তর্গত সমস্তিপুর হইতে কোন বন্ধু ভাই লক্ষ্মণচন্দ্র পাণ্ডার প্রচার বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহার পত্র হইতে সার উদ্ধৃত করা গেল। সমস্তিপুরে ভাই লক্ষ্মণ পাণ্ডার উপদেশ ও সঙ্গীতাদি শ্রবণের জন্য বহু লোকের সমাগম হয়, তিনি চারি দিন তথায় থাকিয়া উপাসনা বক্তৃতা ও সঙ্গীতাদি করেন। এক দিন তত্রত্য শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভবনে সঙ্গীত ও নব-বিধানতত্ত্ব বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। সমস্তিপুর হইতে তিনি দারভাঙ্গায় ও তথা হইতে মজঃফরপুরে যাইয়া প্রচার করি-য়াছেন। ত্রিহুত রেলওয়ের মেনেজার তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর ফ্রি পাস দিয়াছেন। সম্প্রতি ভাই লক্ষ্মণ পাণ্ডা জগৎপুর জেলার অন্তর্গত প্রতাপগঞ্জ নামক স্থানে গিয়াছিলেন। তথা হইতে পুনর্ব্বার মজঃফরপুরে গিয়াছেন, সেখান হইতে গোপপুর, হাজিপুর ও বাঁকি-পুরে তাঁহার যাওয়ার কথা। মোকামাতেও তিনি প্রচার করিয়াছেন।

বিগত শারদীয় পূর্ণিমা উপলক্ষে দেবালয়ের বরাকে সন্ধ্যার পর বিশেষ উপাসনা হইয়াছে।

শারদীয় ছুটীর সময় ভাই অমৃতলাল বসু কতিপয় ব্রাহ্ম-বন্ধু সহ তারকেশ্বর ও অন্য কোন কোন স্থানে যাইয়া মহা-উৎসাহসহকারে কীর্ত্তনাদি করিয়া আসিয়াছেন। সম্প্রতি ১২ দিন হইতে তিনি কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হইয়াছেন।

ভাই কেদারনাথ দে মঙ্গলগঞ্জে গিয়াছেন। ভাই বল-দেব সহায় লক্ষ্ণৌতে প্রচার করিতেছেন। ভাই দীননাথ মজুমদার ডিহিরীতে গিয়াছেন। ভাই রামচন্দ্র সিংহ আসাম প্রদেশে যাত্রা করিয়াছেন।

পঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজের উৎসব সম্পাদনার্থ সিমলা হইতে ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ও ভাই উমানাথ গুপ্ত লাহোরে গমন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ পাইয়াছেন।

সম্প্রতি ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার দার্জ্জিলিঙ্গে ইংরা-জিতে এক বক্তৃতা দিয়াছেন। বক্তৃতা স্থলে বহু সম্ভ্রান্ত লোকের জনতা হইয়াছিল। লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর সাহেব উপস্থিত ছিলেন।

ভাই নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বালেশ্বর হইতে লিখিয়া-ছেন যে, "বালেশ্বরের অধীন ৩। ৪ টী পল্লীসমাজ আছে, সেই সমাজ পরিদর্শন করিতে মফঃস্বলে গমন করি। প্রত্যেক সমাজে ৩ ৪ দিন থাকিয়া মাব গুণকীর্ত্তনাদি করিয়া ফিরিয়া আসি। এ বৎসর এতদ্দেশে বর্ষার খুব বাড়াবাড়ি, ঘর হইতে বাহির হওয়াই দুষ্কর। তাহাতে আবার সমস্ত পথ ঘাট জলমগ্ন থাকাতে অন্য কোন স্থানে না যাইয়া বালেশ্বর ভ্রাতা ভগিনীদিগের মধ্যে বিশেষ ভাবে উপাসনাদি করিতেছিলাম। একবার কাঁথি গিয়াছিলাম, কিন্তু অতিবৃষ্টিহেতু মন্দিরে ও বাড়ীতে বাড়ীতে উপাসনা ব্যতীত আর কিছু করিতে পারি নাই। কাঁথি হইতে তিন ক্রোশ দূরে চণ্ডীভাটি নামক গ্রামে ভ্রাতা ঈশ্বরচন্দ্র সাম-মল মহাশয়ের বাড়ীতে কয়েক দিন থাকিয়া উপাসনাদি করি। বক্তৃতা ও সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল, অনেক পুরনারী ও গ্রামস্থ পুরুষ ও স্ত্রীলোক আসিয়া সঙ্কীর্ত্তনাদি শ্রবণ করেন।" ভাই নন্দলাল স্বীয় জননীর গুরুতর পীড়াবশতঃ বালেশ্বরে থাকিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "যে, মাতার পীড়া দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। আমি শ্লোক-সংগ্রহ হইতে শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহাকে শুনাই ও গীত গাই, তিনিও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।"

☞ এই পত্রিকা ৭৮ নং অপার সারকিউলার রোড বিধান যন্ত্রে শ্রীরামসর্ব্বস্ব ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।